সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস

[হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)
-এর জীবন ও কর্ম]

[৫ম খণ্ড]

অনুবাদ
শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী
শিক্ষক, ফতোয়া বিভাগ, আল মাহাদুল ইসলামী, মিরপুর-১, ঢাকা
সহকারী সম্পাদক, পাক্ষিক মুক্ত আওয়াজ

মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮ বাংলাবাজার, ঢাকা-১০০০

প্রকাশকের কথা

১৯৯৮ সালের কথা। হাজির হই নদওয়াতুল উলামা লাখনৌতে, সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এর খেদমতে। হৃদয়ের আবেগ আর ভালোবাসা দিয়ে খুব কাছ থেকে প্রত্যক্ষ করি এ কর্মবীর মানুষটিকে। কীভাবে ডাকছেন মানুষকে হেদায়েতের পথে, আলোর পথে। গোটা ইনসানিয়াতের প্রতি তাঁর দরদ আর ভালবাসা, দায়িত্ববোধ তাঁকে তাড়িয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে অহর্নিশ। সফর করছেন দেশ হতে দেশান্তরে উল্কার বেগে। মুক্তিকামী মানুষদেরকে মুক্তির দিশা দিতে। দিলের উত্তাপ নিংড়ানো বক্তৃতা চলছে অবিরাম। পতনোন্মুখ মুসলিম জাতিকে ঘুরে দাড়াবার সবক দিচ্ছেন। বারবার আহবান করছেন তাদের হারানো ঐতিহ্য ফিরিয়ে আনতে। উম্মাহর চিন্তায় বিভোর এ মর্দে মুমিন শুধু বক্তৃতা করেই ক্ষ্যান্ত হননি। প্রস্তাবনা ও রূপরেখা পেশ করেছেন জাতির সামনে। দীর্ঘদিন ধরে তাঁর কলম লিখে চলছে অবিশ্রান্তভাবে। তাঁর কিছু রচনা গোটা বিশ্বে বেশ সমাদৃত হয়েছে। সেই থেকে আমি তাঁকে খুব শ্রদ্ধা করি, ভালবাসি। তাঁর থেকে দোয়া নিয়ে দেশে এসে তাঁর রচনাবলী বাংলা ভাষা-ভাষীদের কাছে পেশ করার মনস্থ করি। ইতোপূর্বে যদিও তাঁর কিছু লিখনি বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। এরই ধারাবাহিকতায় 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত' এর ভাবানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' নামে আমরা পাঠকদের হাতে তুলে দিয়েছি। পঞ্চম খণ্ড যা মূলত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) -এর জীবন ও কর্ম সম্পর্কিত; পাঠকমহলের বারবার তাগিদের ফলে অনুবাদ করতে দেই তরুণ আলেম ও লেখক শাহ আবদুল হালীম হুসাইনীকে। তিনি ইতোপূর্বে হযরতের অপর একটি কিতাব 'কারওয়ানে মদীনা' অনুবাদ করে সফলতার স্বাক্ষর রেখেছেন। যতটুকু পড়েছি আশা করি এতেও তিনি সফল হবেন। আল্লাহ তাকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

অবশেষে নির্দ্বিধায় বলতে চাই যে, আমরা নির্ভুল করতে সাধ্যাতীত চেষ্টা করেছি। কিন্তু সময়ের স্বল্পতার কারণে কিছু ভুল ত্রুটি ধরা পড়বে জানি। ইনশাআল্লাহ আগামী সংস্করণে আরো সুন্দর ও নির্ভুল করার চেষ্টা করব।

০৯.০৯.০৯ খৃ. প্রকাশক

অনুবাদকের কথা

نحمده ونصلى على رسوله الكريم

সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) এর বহু বইয়ের প্রকাশক জনাব আবদুর রউফ সাহেবের সাথে দেখা হয় পল্টনের নোয়াখালী হোটেলে। বসে বসে চা পান করছি। কোন এক প্রসঙ্গে তিনি তারিখে দাওয়াত ও আযীমতের ব্যাপারে আলোচনা করেন। বলেন, পাঠক মহল থেকে ৫ম খণ্ড প্রকাশ করার বারবার তাগিদ আসছে। কিন্তু এখনও এর অনুবাদ করাতে পারিনি। আপনি যদি হিম্মত করে অনুবাদ শুরু করতেন। আমি অকপটে রাজি হয়ে যাই, যদিও হযরতের লেখার মানসম্মত অনুবাদ করা আমার দ্বারা সম্ভব নয়। আমি ৫ম খণ্ড সংগ্রহ করে পাঠ করি। বারবার এর ভাষা ও বিন্যাস দেখে অভিভূত হই এবং এ ধারণা বদ্ধমূল হয় যে, এর অনুবাদ আমার দ্বারা সম্ভব নয়। কিন্তু জনাব আবদুর রউফ সাহেবের পীড়াপীড়িতে অনুবাদ করতে বাধ্য হই।

সুপ্রিয় পাঠক! মূলতঃ লেখক তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের এ সিরিজে সাইয়েদুনা হযরত হাসান বসরী এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত ওমর ইবনে আব্দুল আজীজ (র) এর আলোচনা দিয়ে শুরু করেন। এ ধারা প্রথম-দ্বিতীয় শতকের সংস্কারক ও মুজাদ্দিদগণ থেকে নিয়ে সকল স্তরের এবং মুসলিম বিশ্বের স্থান-কাল-ভূখণ্ড ও সীমানা অতিক্রম করে এগার-বার শতকের দুই মহান সংস্কারক ব্যক্তিত্ব হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র) ও হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী পর্যন্ত পৌঁছেছে। আর পঞ্চম খণ্ডে আলোচনা করা হয়েছে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এর জীবন চরিত।

পাঠক বইয়ের ভিতর প্রবেশ করুন। তবেই বুঝতে সক্ষম হবেন তার মুজাদ্দিদানা ও মুজতাহিদানা সংস্কার ও গবেষণাসুলভ কর্মকাণ্ডের পরিধি। আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে জানা ও মানার তাওফীক দান করুন এবং এ সকল নেক বান্দাদের সাথে থাকার সুযোগ দান করুন। এর সাথে সংশ্লিষ্ট সকলকে বিশেষতঃ বন্ধুবর হাফেজ মাওলানা আইয়ুবুর রহমান ও প্রকাশক জনাব আবদুর রউফ সাহেবকে জাযায়ে খায়ের দান করুন।

বিনীত

০৯.০৯.০৯ খৃ. শাহ আবদুল হালীম হুসাইনী

সূচীপত্র

প্রথম অধ্যায়
হিজরী বারো শতকের মুসলিম বিশ্ব

দ্বিতীয় অধ্যায়
ভারতবর্ষ

তৃতীয় অধ্যায়
শাহ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষ ও সম্মানিত পিতা

চতুর্থ অধ্যায়
সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

পঞ্চম অধ্যায়
শাহ্ সাহেবের সংস্কার কর্ম
আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত

ষষ্ঠ অধ্যায়
হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার,
ফিকাহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় আনার প্রয়াস

সপ্তম অধ্যায়

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার দর্পণে ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং হাদীসের তত্ত্ব-মর্মের পর্দা উন্মোচন

অষ্টম অধ্যায়

খেলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের প্রমাণ এবং তাদের অনুগ্রহ-দান "ইযালাতুল খফা' 'আন খিলাফাতিল খুলাফা" -এর দর্পণে

নবম অধ্যায়
রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল শাসনের ক্রান্তিকালে শাহ্ সাহেবের বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী কর্মকাণ্ড

দশম অধ্যায়
উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং তাদেরকে সংস্কার ও বিপ্লবের আহ্বান

একাদশ অধ্যায়
শ্রদ্ধাভাজন পুত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খলীফা
প্রসিদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব

দ্বাদশ অধ্যায়
শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর রচনাবলী

শুরুর কথা

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد واله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين.

'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' -এর পঞ্চম খণ্ড রচনা শেষে ভূমিকার এই লাইনগুলো লেখার সময় গ্রন্থকারের মন হামদ ও শোকরের আবেগে আবেগাপ্লুত। লেখক ও তার কলম আপন স্রষ্টার দরবারে কৃতজ্ঞতায় সিজদাবনত। কেননা তিনিই এ ধারাকে হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) এবং তার উত্তরসূরী খলীফাদের ধর্মীয় ও শিক্ষামূলক নানা খেদমত, তাদের সংস্কারমূলক ও সাহসী কর্মকাণ্ডের ইতিহাস ও ঘটনাবলি পর্যন্ত পৌঁছানোর তাওফীক দান করেছেন।

বলাবাহুল্য, হিজরী ১৩৭২ মহররম মোতাবেক ১৯৫২ খৃস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কয়েকটি বক্তৃতায় একটি সংক্ষিপ্ত স্মারককে সামনে রেখে যখন 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' রচনার কাজ শুরু করা হয়েছিল; সূচনা করা হয়েছিল, সাইয়িদুনা ইমাম হাসান বসরী (র) এবং খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ইবনে আবদুল আযীয (র)-এর আলোচনা দিয়ে, তখন কল্পনা করাও দুরূহ ছিল যে, এই ধারা প্রথম, দ্বিতীয় শতকের সংস্কারক ও মুজাদ্দিদগণ থেকে নিয়ে সকল স্তরের, এমনকি মুসলিম বিশ্বের স্থান, কাল, ভূখণ্ড ও সীমানা অতিক্রম করে এগার-বারো শতকের দু'মহান সংস্কারক ব্যক্তিত্ব হযরত মাওলানা মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র) এবং হযরত মাওলানা শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে। বয়সের ভার, স্বাস্থ্যের উত্থান-পতন, নানা ঘটনাপ্রবাহ, প্রচুর বক্তৃতা, দৃঢ়তা ও সাহসের অভাব, সফরের ধারাবাহিকতা, নিত্যনতুন প্রয়োজনাদি ও সমস্যা, অপরদিকে স্বয়ং লেখকের টানা চৌদ্দ বছর পর্যন্ত যথাযথভাবে মুতালা'আ ও স্বহস্তে লেখার অপারগতা থাকা সত্ত্বেও এই ধারা এতদূর পর্যন্ত এসে পৌঁছবে- কিভাবে ভাবা যেত! এটা শুধুমাত্র কুদরত ও আল্লাহ পাকের কারিশমা। এজন্য আল্লাহর যতই প্রশংসা করা হোক, তা-ও কম। অধম লেখক কুরআন শরীফের নিম্নোক্ত আয়াতের মাধ্যমে এই অশেষ শোকরিয়া জ্ঞাপনের ব্যর্থ প্রয়াস চালানো অপেক্ষা বেশি কিছু করতে পারে না। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

رب اوزعنى ان اشكر نعمتى التى ان انعمت على وعلى والدى وان اعمل صالحا ترضه وادخلنى برحمتك فى عبادك الصالحين-

'হে আমার প্রতিপালক! আপনি আমাকে তাওফীক দান করুন! আপনি আমার উপর এবং আমার পিতা-মাতার উপর যে অনুগ্রহ দান করেছেন, আমি যেন তার শোকরিয়া আদায় করতে পারি এবং এমন নেক কাজ করতে পারি যাতে আপনি সন্তুষ্ট হয়ে যান আর আমাকে নিজ করুণায় আপনার নেক বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত করে নেন।' (সূরা নাহল : ১৯)

হাদীস শরীফে এসেছে,

الحمد لله الذى بعزته وجلالته تتم الصالحات

'সকল প্রশংসা ঐ আল্লাহর, যার মাহাত্ম্য ও বড়ত্বে নেক কাজের তাওফীক ও পরিপূর্ণতা লাভ হয়।'

এ খণ্ডে মূলতঃ বুযুর্গ ও ওয়ালীআল্লাহদের আলোচনার এ ধারাবাহিকতা এবং এই মহৎ কাজের পরিসমাপ্তি ঘটেছে, যা ছিল হিজরী বারো শতকের সেসব সংস্কারকর্ম ও শুদ্ধি সংগ্রাম সংশ্লিষ্ট, যার বরকতময় প্রভাবসমূহ আজও অক্ষুণ্ন আছে। কমপক্ষে ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান, দ্বীনী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্রগুলো, ইসলামের শ্রেষ্ঠত্বের চেষ্টা-সংগ্রাম এবং ধর্মীয় শিক্ষামূলক ও লিখনী তৎপরতা প্রভৃতি চেষ্টার কারণে আজও মানুষ উপকৃত হচ্ছে। তারই ছায়ায় অতিক্রম করছে নিজ নিজ পথ । আরও একটি কারণে একথা অবাস্তব নয়। কেননা লেখক 'সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) -এর জীবন চরিত' (১-২) রচনার মাধ্যমে (যা ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল) তের শতকের শেষ পর্যন্ত (এবং যতদূর পর্যন্ত এশিয়া মহাদেশের সম্পর্ক রয়েছে), চৌদ্দ শতকের কতিপয় ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব, মহান পুরুষ ও দাঈদের বিশেষতঃ হযরত মাওলানা মুহাম্মদ ইলিয়াস (র) -এর জীবনকর্ম সন্নিবেশিত করে এ ধারাকে নিজের যুগ-সময় পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছেন। এভাবে বস্তুতঃ 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' এর ষষ্ঠ খণ্ড এবং সপ্তম খণ্ডের বিরাট এক অংশও রচিত হয়ে যায়। আর আজ এ কাজ তৎপরবর্তী লেখক-গবেষকদের। তারা হিজরী তের শতকের মুসলিম বিশ্বের দাওয়াত ও সংস্কারের পতাকাবাহী ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের খেদমত ও কর্মতৎপরতার উপর কলম ধরবেন, যারা বিভিন্ন মুসলিম অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করে আমৃত্যু ইসলামের দাওয়াত, সংস্কার ও জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহর কাজ আঞ্জাম দিয়ে গেছেন। এরপর চতুর্দশ শতকের বিশ্বময় সংস্কার, শিক্ষা ও চিন্তাধারা এবং দাওয়াতী কাজের জরিপ নিয়ে তার প্রতিচ্ছবি অংকন করবেন। কেননা 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' -এর বিষয়বস্তু বিশেষ কোন যুগ ও দেশের সাথে সুনির্দিষ্ট নয়। এর কার্যক্রম দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক প্রচেষ্টা, ইসলামী চিন্তাধারার সংশোধন, ধর্মীয় জ্ঞানের পুনর্জীবন ও প্রসার; সমকালীন বিভ্রান্তি, কুসংস্কার ও

প্রথা-প্রচলণের চাদর বিদীর্ণ করা আর দ্বীনের প্রাণ, বাস্তবতা, নিগুঢ়তা ও অমূল্য রত্নসমূহ উদ্ভাসিত করা। সমকালীন ফেৎনা-ফাসাদ, বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ও পথভ্রষ্টতা প্রতিরোধ ও বিদূরিত করার এই সংগ্রাম ততদিন পর্যন্ত চলতে থাকবে, যতদিন পর্যন্ত এই দ্বীন বাকী থাকবে এবং এই দুনিয়া টিকে থাকবে। কাজেই কেউই এই বিষয়ের হক আদায় করে ফেলেছেন এবং এই ধারাকে প্রান্তসীমায় পৌঁছাতে পেরেছেন বলে দাবী করতে পারবেন না । হাদীস শরীফে এসেছে,

يحمل هذا العلم عن كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانحال المبطلين وتأويل الجاهلين.

অর্থাৎ– প্রত্যেক প্রজন্মে এমন ন্যায়পরায়ণ ও আল্লাহভীরু লোক এ ইলমের ধারক-বাহক ও উত্তরাধিকারী হবেন, যিনি দ্বীন ধর্ম থেকে ঘাতক অবিশ্বাসী লোকদের রদবদল, বাতিলপন্থী লোকদের দাবী এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যাসমূহ দূর করতে থাকবে। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর সংশোধন ও সংস্কারের পরিধি স্বাভাবিকভাবেই ছিল অনেক ব্যাপক ও বহুমুখি। তাতে শিক্ষা ও চিন্তাগত রূপ ছিল অগ্রগণ্য। সুতরাং হাতে-কলমে শিক্ষাদান, লিখনী, কুরআন-হাদীসের প্রসার, যৌক্তিক ও ঐতিহ্যগত দলীল প্রমাণের মাঝে সমন্বয় সাধন, ফিকহী মাযহাবসমূহের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, শরীয়তের সূক্ষ্মতা ও উদ্দেশ্যসমূহের বিশ্লেষণ, আসন্ন বৈজ্ঞানিক যুগের গুরুত্ব দান, তরবিয়ত ও ইরশাদাত, ওয়াজ-নসীহত, ভারতে ইসলামী নেতৃত্ব-মূল্যবোধের হেফাজত, রাজনৈতিক উত্থান-পতন ও ক্রমবর্ধমান শক্তিগুলোর বাস্তবধর্মী তত্ত্বানুসন্ধান এবং তাদের মধ্যে মিল্লাতের নিরাপত্তা ও স্বকীয়তা অক্ষুণ্ন রাখার সম্ভাব্য সকল কৌশল গ্রহণ, ইসলামী জ্ঞান-বিদ্যায় মুজতাহিদসুলভ চিন্তা-গবেষণা এবং সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পরিজ্ঞাত আলেম শ্রেণীর শরণাপন্ন হওয়ার চেষ্টা-সাধনা সবই অন্তর্ভুক্ত ছিল। এজন্য এ ব্যাপারে লেখকের যথেষ্ট মুতালা'আ ও চিন্তা-গবেষণার প্রয়োজন ছিল, যা কম আলোচনায় স্থান পেয়েছিল। সেই সাথে অন্যান্য ব্যস্ততা এবং দায়িত্বভারও ছিল কাঁধে। তথাপি আল্লাহর শোকর, এ খণ্ড সম্পন্ন করতে ততটা বিলম্ব হয়নি, ইতোপূর্বে প্রথম দু'খণ্ডে যতটা হয়েছিল।

লেখক তার সেসব প্রিয় বন্ধু, শুভাকাঙ্ক্ষী ও সহযোগীদের প্রতি নিতান্তই কৃতজ্ঞ, যারা বিষয়বস্তুর সহজতা, কিছু দীর্ঘ ফারসী ও আরবী ইবারতের অনুবাদ, কিতাবের পাণ্ডুলিপি তৈরী, বিন্যাস ও প্রুফে সাহায্য করেছেন। তাছাড়া প্রকাশনা, হস্তলেখা, মুদ্রণ যাচাই-বাছাইয়েও তাদের যথেষ্ট শ্রম

রয়েছে। তাঁদের মধ্যে মাওলানা শামস তাবরীয খান -এজলিসে তাহকীকাত ও নশরিয়্যাতে ইসলাম' -এর সহকর্মী, মাওলানা মুহাম্মদ বুরহানুদ্দীন সাম্ভলী –উস্তাদ, তাফসীর ও হাদীস বিভাগ দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা আতীক আহমদ সাহেব –শিক্ষক, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা আবুল ইরফান সাহেব নদভী –শিক্ষক, দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা সাইয়িদ মুহাম্মদ মুর্তাযা সাহেব নাকরী –কর্মকর্তা কুতুবখানা নদওয়াতুল উলামা, মাওলানা মুহাম্মদ হারুন –ইনচার্য রেজিস্টার বিভাগ, কুতুবখানা নদওয়াতুল উলামা এবং আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা নেছারুল হক নদভী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য ও কৃতজ্ঞতার দাবীদার। শ্রদ্ধাস্পদ মাওলানা নূরুল হাসান রাশেদ সাহেব কান্দলভী বিশেষভাবে কৃতজ্ঞতার হকদার। তিনি শাহ সাহেব (র) এর বংশীয় অবস্থা ও বংশধরদের ব্যাপারে যথেষ্ট মূল্যবান তত্ত্ব সংগ্রহ করে দিয়েছেন। কিছু বিষয়বস্তুর রসদও যুগিয়েছেন। আমার স্নেহাস্পদ মাওলানা গুফরান নদভী এবং মাওলানা গিয়াসুদ্দীন নদভী পূর্বের মতই রচনা ও প্রকাশনায় এবং পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজে পরিপূর্ণ দায়িত্বশীলতা ও যত্নসহকারে অংশ নিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তাদের সবাইকে উত্তম প্রতিদান দান করুন।

সবশেষে লেখকের দু'আ ও আশাবাদ হচ্ছে, এ খণ্ডটি সামান্য হলেও (ঐ সুমহান ও উঁচু ব্যক্তিত্বের মর্যাদাযোগ্য হতে পারে বলার সাহস নেই, যার সম্পর্কে এই গ্রন্থনা) বিষয়বস্তু ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে উপকারী, সাহস সঞ্চারকারী, চিন্তা-চেতনা ও বোধোদায়ক, অধিক অধ্যয়ন ও গবেষণার জন্য আন্দোলন সৃষ্টিকারী এবং চেষ্টা সাধনার জন্য অনুপ্রেরণা দানকারী হবে- যাতে এই বিপ্লবের যুগে এবং বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ও ফেৎনার যুগে বিশেষভাবে দিকনির্দেশনা পাওয়া যাবে।

وما ذلك على الله بعزيز

১২ রবীউস সানী ১৪০৪ হি.	আবুল হাসান আলী নদভী
১৬ জানুয়ারী ১৯৮৪ খৃ.	৯, বে-নযীর বলঢঙ্গ
সোমবার	বাঈকেল্লাহ, বোম্বাই

প্রথম অধ্যায়
হিজরী বারো শতকের মুসলিম বিশ্ব

হিজরী বারো শতকের ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর অবস্থা ও বিপ্লবগুলোর পর্যালোচনার প্রয়োজনীয়তা

'তারীখে দাওয়াত ও আযীমাত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডের প্রারম্ভে হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র), হযরত শায়খ আহমদ সরহিন্দী (র) [৯৭১ হি.- ১০৩৪ হি.] -এর জীবন বৃত্তান্ত, তাঁদের সমকাল এবং তাঁদের মহান সংস্কারমূলক ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের সময় হিজরী দশ শতকের (যাতে হযরতের জন্ম এবং তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষার প্রসার ঘটেছিল) ইতিহাসভিত্তিক ও গভীর অধ্যবসায়ের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনার প্রসঙ্গে এসে গ্রন্থকার লিখেছিলেন, "আমাদেরকে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকেও স্মরণ রাখতে হবে যে, একটি যুগ এবং সে যুগের পৃথিবী ও মানব সমাজ একটি বহতা নদীর মত, যার প্রতিটি তরঙ্গ আরেকটি তরঙ্গের সাথে সংশ্লিষ্ট। এজন্য একটি দেশ বহির্বিশ্ব থেকে যতটাই সম্পর্কহীন ও বিচ্ছিন্ন জীবনযাপন করুক না কেন, তথাপি পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে সংঘটিত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাসমূহ, বিপ্লব, পারস্পরিক যুদ্ধ-বিগ্রহ এবং ক্ষমতাধর শক্তি ও আন্দোলন থেকে একেবারেই প্রভাব লেশহীন বিচ্ছিন্ন থাকতে পারে না; বিশেষতঃ যখন সেসব ঘটনা তাদের স্বজাতি, সমমনা এবং একই ধর্মমতের অনুসারী প্রতিবেশি রাষ্ট্রে সংঘটিত হয়। কাজেই এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় কেবল ভারতের ভূ-সীমানার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকা সমীচীন হবে না। আমাদেরকে হিজরী দশম শতকের গোটা মুসলিম বিশ্ব বিশেষতঃ পার্শ্ববর্তী মুসলিম দেশগুলোর প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে হবে। যাদের সাথে ভারতের রাজনৈতিক সম্পর্ক ছিল না বটে। কিন্তু ছিল ধর্ম, শিক্ষা, সভ্যতা ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক। সেখানে উষ্ণ-শীতল যে বাতাস প্রবাহিত হত, তার ঝাপটা বিরাট দূরত্ব থাকা সত্ত্বেও ভারত পর্যন্ত এসে পৌঁছাত।"

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) -এর জীবনবৃত্তান্ত এবং তাঁর সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের উপর কলম ধরতে এই ঐতিহাসিক বাস্তবতাকে সামনে রাখা ও এই নীতি মেনে চলার প্রয়োজনীয়তা আরও বেশি। কেননা তাঁর চিন্তাধারা ও শিক্ষা-দীক্ষায় পবিত্র হিজাযের মৌলিক প্রভাব ছিল। যেখানে তিনি (১১৪৩-

১১৪৪ হি.) এক বছরাধিককাল অবস্থান করেছেন এবং তৎকালীন সময়ের হাদীস শাস্ত্রের প্রাণপুরুষ ও শাস্ত্রীয় ইমাম শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কুরদী মাদিনী (র)-এর কাছে হাদীসের শিক্ষা সম্পন্ন করেছেন। যার হাদীসের সবকে মিসরসহ বিভিন্ন অঞ্চল থেকে হাদীসের ছাত্ররা এসে ভীড় জমাত। হারামাইনের আলেমদের সাথে (যারা ছিল বিভিন্ন মুসলিম দেশ ও আরব দেশের নাগরিক) তাঁর দীর্ঘ সাহচর্য ছিল। সে সময় হিজায ছিল উসমানিয়া খেলাফতের শাসনাধীনে। আর মক্কার সম্ভ্রান্ত অভিজাত শ্রেণী ছিল উসমান পরিবারের সুলতানদের প্রতিনিধি হিসেবে গভর্নর ও শাসনকর্তার পদে অধিষ্ঠিত। হজ্জ পালন ছাড়াও (যা প্রতি বছর মুসলিম বিশ্বের উঁচু-উত্তম মন-মানসের অধিকারী এবং হারাম শরীফের আলোপ্রিয়াসীদেরকে এক স্থানে একত্রিত করে দিত) সে যুগে হারামাইন শরীফাইন বিশেষতঃ মদীনা মুনাওয়ারা হয়ে গিয়েছিল ইলমে হাদীসের সবচেয়ে বড় ও প্রাণকেন্দ্র। যেখানে পৃথিবীর প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইলমপিপাসুরা সমবেত হত। সেখানে বসে সহজেই গোটা মুসলিম বিশ্বের আত্মিক, শিক্ষাগত, চারিত্রিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পর্যবেক্ষণ করা যেত। এসব দিক থেকে বিভিন্ন মুসলিম এবং আরব দেশগুলোর উন্নতি-অবনতি ও উত্থান-পতন অনুমান করা যেত অনায়াসে। সেখানকার বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব, মনীষী, সংস্কারমূলক আন্দোলন, দাওয়াতী কর্মকাণ্ড এবং বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী অপতৎপরতা ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে অবগতি লাভ করা যেত। এমনকি মুসলিম বিশ্বের জীবন নাড়ির গতি-স্থিতি ও ইসলামের প্রাণস্পন্দন শোনা যেত। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত সচেতন ও দরদী মানুষ, যাকে আল্লাহর অসীম কুদরত সংস্কার ও দ্বীনকে পুনর্জীবিত করার মহান কাজের জন্য তৈরী করেছিলেন, নিশ্চয়ই তিনি এতে উপকৃত ও প্রভাবিত হয়ে থাকবেন। তিনি এর থেকে নিজ চিন্তাধারার প্রসারতা, দাওয়াত ও দর্শনের শ্রেষ্ঠত্ব-উচ্চতার পুরোপুরি রসদ পেয়ে থাকবেন।

অধিকন্তু ভারত শত শত বছর ধরে মধ্য এশিয়ার তাওরানী ও আফগান বংশের তুর্কি তরুণ যুবরাজদের রেসকোর্স এবং রাজনৈতিক ও শাসনের দিক থেকে তাদের পদানত ছিল। সেখান থেকেই যে কোন সময় তার রাজত্বের প্রভাবাধীন অঙ্গরাজ্যে তেজী-সাহসী বীর শার্দুল আগমন করত এবং তার পতনোন্মুখ রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও সামরিক শক্তিতে নতুন চেতনা ও তেজোদীপ্ততা আনয়ন করত। যখন ভারতে দীর্ঘকাল ধরে শাসনকারী গোষ্ঠী বার্ধক্য ও কলুষতার স্তরে নেমে আসত, তখন খয়বর উপত্যকা কিংবা বোলান

উপত্যকার পথে এক তেজী সাহসী সামরিক শক্তি ভারতে আগমন করত এবং এই শাসন ব্যবস্থায়, যাদের ছিল এক ধর্ম ইসলাম, একই মাযহাব আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাত, একই আইন শরীয়তে মুহাম্মাদী, একই ভাষা তুর্কি ও ফার্সী এবং একই সংস্কৃতি (আরবী, ইরানী, তুর্কি ও ভারতীয় প্রভাবের সংমিশ্রণ); তাতে শক্তির একটি ইনজেকশন দিত। দান করত তাকে এক নতুন জীবনের সন্ধান।

আরও মনে রাখতে হবে, সম্রাট বাবরের দেশ অবরোধ এবং মোঘল সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার পর থেকে আফগানিস্তান ও তার গুরুত্বপূর্ণ প্রদেশ কাবুল-কান্দাহার ছিল বিশাল ভারতীয় মুসলমান সাম্রাজ্যের এক অংশ, তার বহিঃদুর্গ ও ঘাঁটি। ইরান সম্রাট নাদের শাহের ভারত আগমন ও দিল্লী আক্রমণ হয়েছিল শাহ সাহেব (র)-এর যুগে। তার যুগেই কান্দাহারের শাসক আহমদ শাহ আবদালী কয়েকবার ভারতের দিকে রওনা হয়েছেন। অবশেষে হিজরী ১১৭৪ মোতাবেক ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপতের যুদ্ধে মারাঠীদেরকে পরাজিত করে ইতিহাস ও ঘটনার গতিধারা বদলে দিয়েছেন। মোগল সাম্রাজ্যকে রক্ষা করা এবং ভারতীয় মুসলিম সমাজ ও ধনিক শ্রেণীকে নতুন ভূমিকা রাখার সুযোগ করে দিয়েছেন। যা তিনি তার নিছক যোগ্যতায় করতে পারেননি।

এসব ঘটনা কেবল তার যুগেই হয়নি বরং শেষোক্ত ঘটনায় তার দিকনির্দেশনাও ছিল। এ দুই আক্রমণকারী ইরান ও আফগানিস্তানের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। এজন্য শাহ সাহেব (র)-এর যুগ আর হিজরী বারো শতকের পর্যালোচনায় তাদের দু'জনের অবস্থা ও রাজনৈতিক বিপ্লবকে উপেক্ষা করা যায় না।

ভারতের উপর ইরানী সভ্যতা ও সংস্কৃতির প্রভাব

ভারতবর্ষ যেভাবে হিজরী পঞ্চম শতক থেকে রাজনৈতিক ও সামরিকভাবে তুর্কিস্থান ও আফগানিস্তানের কর্তৃত্বাধীন ছিল, তদ্রূপ তার শিক্ষা-সাহিত্য, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও চিন্তাগতভাবে ছিল কমবেশি ইরানের দ্বারা প্রভাবিত। সেখানকার সাহিত্য, কবিত্ব, তাসাওউফের সিলসিলা ও তরীকা এমনকি সেখানকার পাঠ্যসূচী, শিক্ষাব্যবস্থা এবং সেখানকার আলেমে দ্বীন ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণের রচনাবলি ভারতবাসীর মন-মানসে ছেয়ে যায়। বিশেষতঃ বাদশা হুমায়ূনের ইরান গমন এবং সেখানকার সাহায্যে ভারতবর্ষের পুনরুদ্ধারের পর থেকে। অধিকন্তু বাদশা আকবরের শাসনামলে আমীর ফাতহুল্লাহ শিরাজী ও হাকীম আলী গায়লানীর আগমনের পর থেকে ভারত তার পাঠ্যতালিকা, শিক্ষাব্যবস্থা, উৎকর্ষতার মান নির্ণয়, যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন

শাস্ত্রে ইরানের পুরোপুরি অনুসারী হয়ে যায়। এক্ষেত্রে মূলতঃ ভারতের উপর ইরানের সর্বোচ্চ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা হয়ে যায়। এ বাস্তবতাকে সামনে রেখে আমরা এই ঐতিহাসিক পর্যালোচনায় ইরান এবং সেখানে সংঘটিত ঘটনাপ্রবাহের প্রতি কিভাবে মনোনিবেশ না করে পারি?

উসমানিয়া রাজত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও গুরুত্ব

আফগানিস্তান ও ইরানের প্রতিবেশি রাষ্ট্রগুলো ব্যতিত আমরা সেই উসমানিয়া রাজত্ব থেকেও চোখ বন্ধ করতে পারি না, যা দশ শতকের শুরু থেকে রক্ষা করে যাচ্ছিল খেলাফতের মসনদ। যার অবস্থান ভৌগোলিকভাবে ভারত থেকে অনেক দূরে ইউরোপ ও ক্ষুদ্র এশিয়ার মাঝামাঝি ছিল। কিন্তু আরব দেশগুলো (মিসর, সিরিয়া, ইরাক, ইয়ামেন, নজদ, হিজায ও উত্তর আফ্রিকার এক বিরাট অংশ) তার শাসনাধীন ছিল। হেরেম শরীফ ও পবিত্র স্থানগুলোর তত্ত্বাবধায়ক ও মুতাওয়াল্লী ইসলামী খেলাফতের ধারক ও রক্ষক হওয়া, একটি বৃহৎ শক্তি ও রাজত্বের মর্যাদা হিসেবেও এবং পাশ্চাত্য ও ইসলামবিদ্বেষী শক্তিগুলোর দৃষ্টিতে ইসলামী শক্তির নিদর্শন, বহুবিধ ইসলামী স্বার্থ রক্ষার অতন্দ্র প্রহরী ও কর্ণধার হওয়ার কারণেও তামাম পৃথিবীর মুসলমান একে সম্মানের চোখে দেখত। সেখানকার নিত্যদিনের ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে বিশ্ববাসী নিছক আগ্রহই রাখত না বরং বিরাটভাবে প্রভাবিত হত এবং শিক্ষাগ্রহণ করত।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত উদার দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিত্ব, ইসলামের ইতিহাসে যার গভীর দৃষ্টি ছিল, তিনি উসমানিয়া রাজত্ব সম্পর্কে কেবল দৃষ্টিপাতই করতেন না বরং খেলাফতের শরঈ অবস্থান এবং রাজনৈতিক ও সামাজিক গুরুত্ব সম্পর্কেও ওয়াকিফহাল ছিলেন। দ্বীন-ধর্ম, চরিত্র, সমাজ-সংস্কার, সুস্থ সভ্যতা-সাংস্কৃতি ও অর্থনীতির জন্য স্বাধীন রাষ্ট্র এবং সুস্থধারার ডানপন্থী রাজনৈতিক শক্তিকেও তিনি জরুরী মনে করতেন। মুসলমানদেরকে না কেবল স্বদেশ বরং গোটা বিশ্বে তিনি এক প্রভাবশালী এবং সত্যের আদেশ ও মিথ্যার নিষেধকারী শক্তিরূপে দেখার আশাবাদী ছিলেন না। তিনি মুসলমানদের সর্ববৃহৎ রাজত্বের উত্থান-পতন এবং তার অভ্যন্তরীণ স্থিতিশীলতা ও বিক্ষিপ্ততায় কিভাবে চোখ বন্ধ করে রাখতে পারেন? বিশেষতঃ যখন তিনি এক বছরের বেশি সময় যাবৎ তার অতীব প্রিয়, উৎকৃষ্টতর ও সম্মানিত দেশ হিজাযে চোখ-কান খোলা রেখে, সচেতনতা ও অন্তর্দৃষ্টিসহ অবস্থান করেছিলেন এবং তার বিজিত ও শাসনাধীন রাষ্ট্রসমূহ মিসর, সিরিয়া ও ইরাক থেকে আগত লোকদের মুখে

সেসব প্রতিক্রিয়া শুনেছিলেন, যা উসমান পরিবারের সুলতান, তাদের মন্ত্রীবর্গ, শায়খুল ইসলাম ও তুর্কি আলিমদের চিন্তাধারার প্রভাবে সেসব রাষ্ট্রের শিক্ষা ও ধর্মীয় পরিবেশ ও কেন্দ্রে পড়ছিল। এজন্য আমাদেরকে হিজরী বারো (খৃস্ট আঠার) শতকের উসমানিয়া শাসনের প্রতিবেশি পশ্চিমা খৃস্টদেশগুলোর সাথে তার সম্পর্ক, জয়-পরাজয়, অপসারণ ও সমাসীন এবং রাজনৈতিক শক্তির উত্থান-পতনের উপরও একটি সংক্ষিপ্ত দৃষ্টি দিতে হবে।

মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা

আমরা এ মুহূর্তে প্রথমে মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক অবস্থা, রাজত্ব-ক্ষমতা পরিবর্তন, নানা বিপ্লব এবং গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করব। এরপর মুসলিম বিশ্বের শিক্ষাগত, ধর্মীয়, চারিত্রিক ও আধ্যাত্মিকতার পর্যালোচনা করব।

বারো শতকের উসমানিয়া শাসন

শাহ সাহেব (র) হিজরী ১১১৪ সালে জন্মগ্রহণ করেন আর ইন্তিকাল করেন হিজরী ১১৭৬ সালে। এ সময়ের (৬২ বছর) মধ্যে উসমানিয়া রাজত্বের সিংহাসনে পাঁচজন শাসক দ্বিতীয় মোস্তফা (মৃত্যু ১১১৫ হি.), তৃতীয় আহমদ (মৃত্যু ১১৪৩ হি.), প্রথম মাহমূদ (মৃত্যু ১১৬৭ হি.), তৃতীয় উসমান (মৃত্যু ১১৭১ হি.) এবং তৃতীয় মোস্তফা (১১৭১ হি.-১১৮৭ হি. মোতাবেক ১৭৫৭ খৃ.-১৭৭৪ খৃ.) আসা-যাওয়া করেছেন।

শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও সংস্কারকর্মের যুগে তৃতীয় আহমদ, প্রথম মাহমূদ, তৃতীয় উসমান এবং তৃতীয় মোস্তফা এই মোঘল রাজত্ব ও সিংহাসনের লাগাম সামলে ধরেন। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ সময়; শাহ সাহেবের জীবনের শেষ পাঁচ বছর তৃতীয় মোস্তফার শাসনামলে অতিবাহিত হয়।

তৃতীয় মোস্তফা ষোল বছর আট মাস শাসন করেন। তার যুগে উসমানিয়া রাজত্ব ও রুশদের মাঝে যুদ্ধ হয়। এ যুদ্ধে উসমানিয়া রাজত্বের (১৭৬৯ খৃ.) পরাজয় হয়। যেখানে রুশদের কোনও কৃতিত্ব ছিল না। এটা কিছু দুর্ঘটনা ও ব্যবস্থাপনার দুর্বলতার পরিণতি ছিল মাত্র। রুশ জেনারেল আলফানেস্টোন কনস্টান্টিনোপল আক্রমণেরও মনস্থ করেন। কিন্তু তাকে দমন করা হয়। মোস্তফা খান সামরিক শক্তি বৃদ্ধি এবং সংস্কারেরও পদক্ষেপ নেন। কিছুটা সামরিক সফলতাও অর্জন করেন। রুশরা সন্ধির জন্য বিভিন্ন শর্ত উপস্থাপন করে, যা ছিল লাঞ্ছনাকর। বোখারসটে ১৩ শাবান ১১৮৬ হিজরী (শাহ সাহেবের ইন্তিকালের দশ বছর পর) মোতাবেক ৯ নভেম্বর

১৭৭২ খৃস্টাব্দে একটি কনফারেন্স হয়। সেখানেও কিছু শর্ত পেশ করা হয়। উসমানিয়া শাসন সেগুলোকে প্রত্যাখ্যান করে তুর্কি সৈন্যদেরকে যুদ্ধ শুরু করার নির্দেশ দেয়। পরিণামে রুশবাহিনীর পরাজয় বরণ করতে হয়। রুশদের প্রতিক্রিয়া ছিল এমন যে, উসমানী সৈনিকগণ যখন বাজারজাক (বর্তমান নাম Tobulkhin) দিয়ে অতিক্রম করেন, তখন শহরের সকল মানুষ বাড়িঘর ছেড়ে চলে যায়। ঐতিহাসিক হোমার লিখেন, 'মুসলমানগণ আগুনে চরানো বহু হাড়ি পেয়েছে, যাতে গোশত ছিল।' ৮ যিলকদ ১১৮৭ হিজরী মোতাবেক ১৭৭৪ খৃস্টাব্দের ১২ জানুয়ারী সুলতান তৃতীয় মোস্তফা ইন্তিকাল করেন। ঐতিহাসিকগণ তার ন্যায়-ইনসাফ ও কল্যাণ কাজের আগ্রহ-উদ্যম ও প্রচেষ্টার প্রশংসা করেন। তিনি তার শাসনামলে অনেক মাদরাসা ও খানকা প্রতিষ্ঠা করেন।

শাহ সাহেব (র)-এর যৌবনকালে উসমানিয়া সাম্রাজ্যে প্রেসের প্রচলন হয়। প্রথম প্রেস প্রতিষ্ঠা হয় কনস্টান্টিনোপলে। সে যুগেই নজদ ও হিজাযে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহ্হাব (১১১৫-১২০৫ হি.)-এর আন্দোলন পত্র-পল্লবিত হয়।[১]

তৃতীয় উসমানের যুগে আলী বে (ওরফে শায়খুল বালাদ) মিসরের শাসন ও সরকার ব্যবস্থার উপর পুরোপুরি অস্থির হয়ে ওঠেন। তিনি রোম সাগরে অবস্থানরত রুশ জেনারেলের সাথে আঁতাত করেন। চুক্তি করেন, তিনি তাদেরকে রসদ ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়ে সাহায্য করবেন। যাতে মিসর স্বাধীন রাষ্ট্র হয়ে যায়। তার সাহায্যে আলী বে গায্যাহ, নাবলুস, কুদস, ইয়াকাহ ও দামেশক দখল করতে সফল হন। তিনি আনাতোলিয়ার সীমান্তের দিকে যাত্রার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে তার অধীনস্থ এক সৈনিক আবুয যাহাব নামে প্রসিদ্ধ মুহাম্মদ বে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। যার ফলে আলী বে-কে মিশরে ফিরে আসতে হয় আর সে হয় পরাজিত। এই গৃহযুদ্ধ ও বিচ্ছিন্নতার ফলে বৈরুতের উপর রুশ জাহাজগুলো অগ্নিসংযোগ করে। এতে প্রায় তিনশ ঘরবাড়ি ধ্বংস হয়ে যায়। মিসরে মহররম ১১৮৭ হিজরীতে আলী বে এবং মুহাম্মদ বে -এর সৈন্যদের মাঝে লড়াই হয়। আবুয্

---

[১] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য তারীখুত দাওলাহ আলইল্লিয়াতুল উসমানিয়া। পরবর্তীকালে সঊদ ইবনে আবদুল আযীয (১১৬৩-১২২৯ হি.) আমীরে নজদ এই দাওয়াত, মুজাহিদসুলভ চেতনা ও সামরিক শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ১২১৮ হিজরীতে হিজায ও আরব উপদ্বীপের বিরাট অংশের উপর দখল প্রতিষ্ঠা করে নেন। ১২৩৪ হিজরীতে খদিউ মুহাম্মদ আলী মিসর শাসকের প্রচেষ্টায় এ অংশের উপর পুনরায় তুর্কি রাজত্বের পূর্ণ দখল প্রতিষ্ঠিত হয়। নাজিদী আমীর আবদুল্লাহ ইবনে সঊদ ইবনে আবদুল আযীযকে কনস্টান্টিনোপল পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেখানে তাকে হত্যা করে ফেলা হয়।

যাহার ওরফে মুহাম্মদ বে বিজয় লাভ করে। আর আলী বে বন্দি হয়ে মুমূর্ষ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তার শিরোচ্ছেদ করে চারজন রুশ অফিসারসহ উসমানী গভর্নর খলীল পাশার নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। তিনি তাদেরকে কনস্টান্টিনোপল রওনা করে দেন। আর মিসর পুনরায় উসমানিয়া রাজত্বের পুরোপুরি অধীন হয়ে যায়।

হিজাযের অবস্থা

শাহ সাহেব রহ. যখন হিজায সফর করেন এবং হারামাইন শরীফাইনে দীর্ঘ অবস্থান করেন, তখন সুলতান প্রথম মাহমূদ (১১৪৩-১১৬৭ হি.)-এর রাজত্ব ও শাসনকাল ছিল।

সে সময় হিজাযে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের প্রতিনিধি ও নেতা আমীরে হিজায (ওরফে শরীফ) মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে সাঈদ ইবনে যায়েদ ইবনে মুহসিন আল-হাসানী (মৃত্যু : ১১৬৯ হি.) ছিলেন হিজাযের শাসক। যিনি আপন পিতার ইন্তিকালের পর ১১৪৩ হিজরীতে হিজাযের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন।[২]

তার যুগ ছিল গৃহযুদ্ধ ও নেতৃত্বের মোহে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর গোষ্ঠীগত টানাপোড়েনের যুগ। ১১৪৫ হিজরীতেই তার চাচা মাসউদ ইবনে সাঈদ তাকে পদচ্যুত করে হিজাযের শাসন ক্ষমতা দখল করে। কিন্তু ১১৪৬ হিজরীতে তিনি পুনরায় সে মসনদ লাভ করেন। এরপর আবার তার চাচা তাকে বরখাস্ত করেন এবং ১১৬৫ হিজরী পর্যন্ত আমরণ তিনি সে পদে অধিষ্ঠিত ও শাসনকর্তা ছিলেন। তার যুগে হিজাযে স্থিতিশীলতা ও শান্তি-নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐতিহাসিকগণ তাকে সচেতন ও রাজনৈতিক দূরদর্শী ব্যক্তিত্ব বলে মনে করেন।[৩]

হিজরী বারো শতকের মধ্যভাগে পথের নিরাপত্তাহীনতা, যাযাবরদের লুটতরাজ ও অরাজকতার বিভীষিকা ইতিহাসের বই-পুস্তক ও হজ্বের

[২] মক্কার আমীরগণের (যারা নির্বাচিত হত হাসানী বংশ থেকে এবং এ কারণে তাদেরকে 'আশরাফ' উপাধিতে ভূষিত করা হত।) ধারাবাহিকতা চতুর্থ হিজরী শতকের প্রথম তৃতীয়াংশ থেকে শুরু হয়ে গিয়েছিল। প্রথম শরীফে-মক্কা নিযুক্ত হন আব্বাসী খলীফা আল-মুতী লিল্লাহ (৩৩৪-৩৬৩ হি.) এর যুগে। সুলতান সেলিমের সিরিয়া ও মিসর দখল এবং হারামাইন শরীফাইনকে নিজের করতলে নেওয়ার সময় পর্যন্ত মক্কার শরীফগণ নিযুক্ত হতেন মিসরের অনুগত বংশের শাসকবর্গের পক্ষ থেকে। সুলতান সেলিম তৎকালীন শরীফে-মক্কা সাইয়িদ বারাকাত এবং তার পুত্র সাইয়িদ আবু নামীকে স্বপদে বহাল রাখেন। তিনি যথারীতি মক্কার আমীর থাকেন। তার পরবর্তীতে এই ধারা শরীফ হুসাইনের শাসন পর্যন্ত চালু থাকে। যিনি (জুন ১৯১৬ খৃ.) শাবান ১৩৩৪ হিজরীতে উসমানিয়াদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেন এবং জানুয়ারী ১৯২৬ খৃস্টাব্দে সুলতান ইবনে সউদের হাতে হিজাযের ক্ষমতা হারান।

[৩] আল আলাম : ৮/১১১-১১২

ভ্রমণকাহিনীতে আমভাবে পাওয়া যায়। যা রাজত্বের প্রাণকেন্দ্র (কনস্টান্টিনোপল) এর দূরত্ব, তুর্কিদের হিজাযের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে যতদূর সম্ভব হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখার কৌশল, মক্কার শরীফদের (যারা ছিলেন প্রসিদ্ধ হাসানী সাদাতের বংশধর) ব্যাপারে অতিরঞ্জিত নমনীয়তা ও উদারতা, আরবীদের ব্যাপারে সীমাতিরিক্ত শ্রদ্ধা-ভক্তি ও তাদের বাড়াবাড়ি সম্পর্কে ভ্রুক্ষেপহীনতার রাজনীতি, অধিকন্তু হিজাযের নেতৃত্বে পরিবারতান্ত্রিকতা ও একই বংশে সীমাবদ্ধ হওয়ার অলৌকিক পরিণতি ছিল। নিশ্চিতভাবে বলা যায়, শাহ সাহেব (র) এসব অরাজক-অস্থিরতাপূর্ণ অবস্থা, নেতৃত্ব ও ক্ষমতার মসনদের জন্য হিংসাত্মক ও বিদ্বেষমূলক দ্বন্দ্ব-সংঘাত এবং আইন-শৃঙ্খলার দুর্বলতাকেও তার অন্তর্দৃষ্টিতে দেখে থাকবেন। ধর্মীয় মূল্যবোধে নিবিষ্ট অন্তর দিয়েও উপলব্ধি করে থাকবেন। সুতরাং চাচা-ভাতিজার মধ্যে ক্ষমতার মসনদের জন্য যে লড়াই ১১৪৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছে, বিস্ময়ের কিছু নয় তা শাহ সাহেবের হারামাইনে অবস্থানকালেই হয়েছে। আর তিনি এর থেকে সুদূরপ্রসারী ও চারিত্রিক অবনতির সাক্ষ্য-প্রমাণ চয়ন করেছেন।

ইয়ামেন

ইয়ামেনেও প্রায় এ ধরনের শাসনব্যবস্থা চালু ছিল। সুতরাং রাজনৈতিক ও আন্তর্জাতিকভাবে উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অধীন এবং রাজত্বের পক্ষ থেকে নিযুক্ত তুর্কি গভর্নর থাকা সত্ত্বেও সেখানে নেতৃত্ব (ইমামত) ব্যবস্থা চালু ছিল। যা ইয়ামেনে তৃতীয় হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে চলে আসছিল। যাতে বংশগতভাবে সাদাত আর মাযহাব হিসেবে যায়দী[৪] ব্যক্তিবর্গ অধিষ্ঠিত ছিল। ইয়ামেনবাসী তাদের হাতে খেলাফতের বায়'আত গ্রহণ করত। তাকে বলা হত ইমাম। উক্ত পদে সমাসীন ব্যক্তির ইজতিহাদের যোগ্য মানসম্পন্ন হওয়া এবং স্বীয় মাযহাবে প্রসিদ্ধ ও বিদগ্ধ আলিম হওয়াকে অনিবার্য মনে করা হত। সম্রাট সুলাইমান কানুনী ইবনে ইয়াযুয সেলিমের শাসনামলে ইয়ামেন

---

[৪] আল্লামা মুহাম্মদ আবু যাহরা স্বরচিত 'তারীখুল মাযহাব আল ইসলামিয়া' গ্রন্থে অভিমত প্রকাশ করে লিখেন, যায়দী শী'আ সম্প্রদায়গুলোর মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অতি নিকটতর ও ভারসাম্যপূর্ণ একটি দল। তারা ইমামদেরকে নবুওয়াতের স্তরে পৌঁছায়নি; রাসূলুল্লাহ (স) এর পরে কেবল তাদের শ্রেষ্ঠত্বের দাবী করে। তারা সাহাবায়ে কিরামকে কাফির আখ্যা দেয় না। তারা মনে করে, যে ইমামের অসিয়ত নবী (স) করেছিলেন, নাম ও ব্যক্তিত্ব হিসাবে তাকে নির্ধারণ করেননি বরং গুণাবলি বর্ণনা করেছিলেন। যা হযরত আলী (রা) এর উপর প্রযোজ্য হয়। আল্লামা আবু যাহরা-এর গবেষণা মতে, এই ফিরকার মুখপাত্র ইমাম যায়েদ ইবনে ইমাম যাইনুল আবেদীন শায়খাইন (হযরত আবু বকর ও হযরত উমর (রা) এর খেলাফতের প্রবক্তা ছিলেন। তিনি তাদের খেলাফতকে সঠিক বলে মানতেন। পৃ : ৪৭-৪৯

ছিল উসমানিয়া সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত। সে সময় ইয়ামেনের ইমামগণের সন্তান ও সহচর সাইয়িদ মুতাহ্হার ইবনে ইমা শরফুদ্দীন ছিলেন (মৃত্যু ৭৮০ হি.) সেখানকার শাসক ও ইমাম। তুর্কি শাসক ও নেতা সিনান পাশা এবং তার মধ্যে যুদ্ধ হয়। অনন্তর ইয়ামেন উসমানিয়া সাম্রাজ্যের পদানত হয়ে যায়।[৫] কিন্তু তুর্কিরা হিজাযের মত এখানেও নেতৃত্ব ও শাসন ব্যবস্থা চালু রাখে এবং এক ধরনের আভ্যন্তরীণ স্বাধীনতা দিয়ে দেয়। হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র) যখন হিজাযে ছিলেন, সে সময় ইয়ামেনে ইমাম মনসুর বিল্লাহ্ হুসাইন ইবনে মুতাওয়াক্কিল আলাল্লাহু কাসিম ইবনে হুসাইন ইয়ামেনের ইমাম ছিল।

যার নেতৃত্ব ও শাসনকাল চালু ছিল ১১৩৯ হিজরী থেকে ১১৬১ হিজরী পর্যন্ত। যাইদী মতবাদের শাসন ও প্রসারতা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রজা সাধারণ ছিল সুন্নী ও শাফিঈ মতাদর্শের অনুসারী। ইয়ামেন বারো ও তের হিজরী শতকে ইলমে হাদীসের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র ছিল। যেখানে বারো শতকে জন্মগ্রহণ করেন 'সুবুলুস সালাম' রচয়িতা মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আলআমীর (মৃত্যু ১১৪২ হি.) আর তের শতকে 'নাইলুল আওতার' প্রণেতা আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আলী শাওকারী (মৃত্যু ১২৫৫ হি.)। হিজায অবস্থানকালে শাহ সাহেব (র) স্থানীয় নৈকট্য বা প্রতিবেশি এলাকা হওয়া এবং শিক্ষাগত সম্পর্কের কারণে ইয়ামেনের আলেমদের রচনাবলি ও তাদের মুহাদ্দিসসুলভ খেদমত সম্পর্কে অবশ্যই জেনে থাকবেন।

ইরান

ইরানে ছফাবী বংশের রাজত্ব চলে দু'বছর। কিন্তু এরপর কুদরতের অমোঘ বিধান অনুসারে তার উপর বার্ধক্য ও জীর্ণতার সেই যুগ এসে গিয়েছিল, যা দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদুনের ভাষায় 'আসার পরে যাওয়ার নাম নিত না।' إن الهرم اذا نزل بدولة لا يرتفع তথা কোন রাজ্যে যখন বার্ধক্য ছেয়ে যায়, তারপর আর যৌবন ফিরে আসে না। এই অবস্থাদৃষ্টে সমমানের পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তান ফায়দা লুটে নেয় এবং সেখানকার দূরদর্শী অকুতোভয় শাসক মাহমুদ খান গলযাঈর নেতৃত্বের ১১৩৪ হিজরীতে ইরান আক্রমণ করে ইস্পাহান জয় করে নেয়। হুসাইন শাহ বন্দি হন। আফগানীরা বাকী দেশও জয় করার মনস্থ করে। কিন্তু তাদের সংখ্যা এত বেশি ছিল না যে, গোটা দেশ তাদের দখলে রাখতে পারে।

---

[৫] বিস্তারিত দ্রষ্টব্য- আল্লামা কুতুবুদ্দীন নাহরোয়ানী পাটনী হানফী বিরচিত البرق اليمانى فى الفتح العثمانى।

মাহমুদ খান তিন বছর রাজত্ব করার পর ১১৩৭ হিজরী মোতাবেক ১৭২৪ খৃস্টাব্দে চিরস্থায়ী মুলুকের পথে যাত্রা করেন। তার স্থলবর্তী আশরাফ খানের যুগে দেশে অনিয়ম-বিশৃঙ্খলা ছেয়ে যায়। সে সময় রুশ শাসক পিটার প্রধান ইরানের উত্তরাঞ্চলীয় জেলাসমূহে আক্রমণ করে। সন্ধির কারণে ইরানকে তার অনেকগুলো শস্য-শ্যামল ও গুরুত্বপূর্ণ জেলা হাতছাড়া করতে হয়। ইরান সম্রাট ছিলেন বন্দি। সৌভাগ্যক্রমে যুবরাজ তুহমাসপ একজন সুযোগ্য, দৃঢ়চিত্ত ও দূরদর্শী নেতা পেয়ে যান, যিনি বংশগতভাবে নগণ্য হলেও নিজের যোগ্যতা ও দক্ষতার কারণে সেই দলভুক্ত ছিলেন, যারা নতুন রাজত্বের ভিত্তি প্রস্তর রাখতে পারে। সে ছিল নাদের শাহ আফশার।

নাদের শাহ্ আফশার

নাদের তুহমাসপকে তার পৈতৃক মসনদে বসিয়ে দেয়া হয়। তখন ছফাবী রাজত্ব ছিল পতনোন্মুখ। তার দ্বিতীয়বার উত্থানের কোনও লক্ষণ ছিল না। গোটা রাজ্যে বিক্ষিপ্ততা ও অবিশ্বাস ছাড়িয়ে পড়েছিল। নাদের এ পরিস্থিতি থেকে ফায়দা লুটে নিয়ে একটি নতুন সমরশক্তি সংঘটিত করে। তার বিচক্ষণতা ও সাহসিকতা ইরানীদের মধ্যে এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করে। অন্ধকার পানির মত উথলে উঠে এবং গোটা রাজ্যে ছেয়ে যায়। তিনি ১১৪৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৩০ খৃস্টাব্দে আফগানীদেরকে ইরান থেকে সম্পূর্ণরূপে বিতাড়িত করে দেন। আর ১১৪৬ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৩ খৃস্টাব্দে রুশবাহিনীকে কাস্পিয়ান সাগরের উপকূলে গতিরোধ করে সম্মানজনক ও সহনশীল শর্তে সন্ধি স্থাপন করেন। আরবদেরকে দেশের পশ্চিম সীমান্তে প্রতিরোধ করেন। রোম সম্রাটকে দক্ষিণাঞ্চল থেকে পিছপা হতে বাধ্য করেন এবং প্রাচীন ইরান রাজত্বের অঞ্চলগুলো ভিনদেশিদের হাত থেকে পুনরুদ্ধার করেন। হিজরী ১১৪৮ (১৭৩৫ খৃ.) ইরান সাম্রাজ্য এতটাই বিস্তৃতি লাভ করে যে, তার সীমানা প্রাচীন অবস্থায় ফিরে আসে। ১১৫০ হিজরী মোতাবেক ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে ছফাবী বংশের যবনিকাপাত ঘটে যায়। নাদের শাহ্ আফসার তখন ইরানের একজন সম্রাট ছিলেন। এনসাইক্লোপিডিয়া বিশ্ব ইতিহাস রচয়িতার বর্ণনানুসারে 'নাদের শাহ রাজত্বের সিংহাসন এ শর্তে গ্রহণ করেছিলেন যে, ইরানীরা শী'আ মতবাদ প্রত্যাখ্যান করবে। তিনি স্বয়ং তুর্কি বংশোদ্ভুত ও সুন্নী মতাবলম্বী ছিলেন। কিন্তু ইরানীদের সুন্নী মতাদর্শ গ্রহণ করাতে তিনি সফল হতে পারেননি। তার জেনারেলগণ ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে বেলুচিস্তান ও বলখ আর ১৭৩৮ খৃস্টাব্দে কান্দাহার দখল করে নেয়। সেখান থেকে ভারত অবরোধের জন্য যাত্রা করে কাবুল, পেশাওয়ার ও লাহোর অবরোধ করে। ১৭৩৯ খৃস্টাব্দে

দিল্লীর নিকটে কিরণালয়ে মোঘল সম্রাটের বিশাল বড় সৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করে নেয় এবং সেখানে নৃশংস গণহত্যা চালায়। নাদের মোঘল সম্রাট থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেয়নি। কিন্তু পঞ্চাশ কোটি ডলার ক্ষতিপূরণ আদায় করে। সে সঙ্গে সিন্ধু নদের উত্তর ও পশ্চিমাঞ্চল পুরোপুরি তাদের করতলে নিয়ে নেয়। বুখারা ও খেওয়া বা খাওয়ারিজম (১৭৪০ খৃ.) অবরোধ করে। এটা ছিল তাদের দখলকৃত অঞ্চলসমূহের প্রশস্ততার শেষ সীমা। আর এখান থেকেই তার জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন শুরু হয়। তিনি নিঃসন্দেহে অনেক বড় কমান্ডার ছিলেন। কিন্তু তিনি না আসলে কৌশল জানতেন আর না তার মধ্যে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার কোন যোগ্যতা ছিল। শী'আ মতবাদকে ধ্বংস করার জন্য তার সকল প্রচেষ্টার পরিণামে দেশের মধ্যে অস্থিরতা আরও বাড়তে লাগল। আর তিনি তা দমনের জন্য জোর-জুলুম ও শোষণমূলক কাজে অভ্যস্ত হতে থাকেন। পরিশেষে তিনি তার উচ্চাভিলাসী ট্যাক্স ও শোষণমূলক করের মাধ্যমে দেশকে ধ্বংস করে ছাড়েন। ১৭৪৭ খৃস্টাব্দে নাদের শাহ স্বগোত্রীয় জনৈক ব্যক্তির হাতে নিহত হন।

নাদের শাহের মৃত্যুর পর ইরান

নাদের শাহের মৃত্যুর পর ইরানে ব্যাপক অরাজকতা ছড়িয়ে পড়ে। চোর-ডাকাতের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। তার সেনা কমান্ডারের প্রত্যেকেই নিজ নিজ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখতে থাকে। তার মৃত্যুর পর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয় তার ভ্রাতুস্পুত্র আলীকালী আদেল শাহ (১৭৪৭-১৭৪৮ খৃ.)। সে তার বংশধরদের হত্যা করে ফেলে। কেবল যুবরাজ শাহরুখ বেঁচে থাকেন। যার বয়স ছিল তখন চৌদ্দ বছর। আদেল শাহ এক বছরের মধ্যে আপন ভাই ইবরাহীমের হাতে অপসারিত হন। অনন্তর তাকে অন্ধ করে দেওয়া হয়। কিন্তু ইবরাহীমের সৈন্যদের মধ্যে বিদ্রোহ দেখা দেয়। সামরিক অফিসারগণ তাকে পরাজিত করে প্রথমে তাকে বন্দি ও পরে হত্যা করে ফেলে। পরে আদেল শাহকেও হত্যা করা হয়। অনন্তর যানদ বংশ ইরানে জয়লাভ করে। আর করীম খান যানদ (১১৬৪-১১৯৩ হিজরী মোতাবেক ১৭৫০-১৭৭৯ খৃ.) উনিশ বছর পর্যন্ত ইরান শাসন করেন। তিনি শীরাজকে তার রাজধানী বানান। তিনি ছিলেন ইনসাফ, উদারতা ও মহানুভবতার গুণের অধিকারী। তিনি ইরানকে রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ-বিগ্রহের পর শান্তি ও স্থিতিশীলতার সুযোগ করে দেন। কাজেই তার মৃত্যুতে অনেক শোক প্রকাশ করা হয়। কয়েকজন দুর্বল স্থলাভিষিক্তের পরে লুতফ আলীর যুগে যানদ বংশের পুরোপুরি পতন হয়ে যায়। লুতফ আলী ১২০৯ হিজরী মোতাবেক ১৭৯৪

খৃস্টাব্দে নিহত হন। আর ইরানের সিংহাসন কাচার বংশের জন্য উন্মুক্ত হয়ে যায়। যেহেতু এ যুগ শাহ সাহেব (র) এর ইন্তিকালের পরের যুগ, তাই আমরা এর থেকেও বিমুখ হতে পারি না।

আফগানিস্তান ও আহমদ শাহ আবদালী

খৃস্ট আঠারো শতক থেকে বৃহত্তর আফগানিস্তানের একাংশ ইরানের অধীনে ছিল। অপর অংশ ভারতের দখলে আর তৃতীয় এক অংশে বুখারার (খান) কর্তারা শাসক ছিল। ১৭০৬ খৃস্টাব্দে কান্দাহার স্বাধীন হয়ে যায়। ১৭৩৭ খৃস্টাব্দে নাদের শাহ আফগানীদেরকে কান্দাহারের শাসন থেকে মুক্ত করে এবং আফগানিস্তান ও পশ্চিম ভারত দখল করে নেয়।

সে সময় আহমদ খান নামে জনৈক ব্যক্তিকে যুদ্ধবন্দি হিসেবে তার কাছে নিয়ে আসা হয়। নাদের শাহ তার দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রভাবিত হন এবং তাকে নিজের ব্যক্তিগত সেক্রেটারী নিযুক্ত করেন। আহমদ খান উত্তরোত্তর উন্নতি করতে থাকেন। দিনে দিনে বাদশার আরও বেশি বিশ্বস্ত হয়ে উঠেন। নাদের শাহ নিহত হওয়ার পর তিনি আফগানিস্তানের প্রদেশগুলোর শাসনক্ষমতা ধরে রাখেন। তিনি ছিলেন আবদালী বংশের দুররানী (সাদুযিঈ) শাখা গোত্রের লোক। তিনি দূররে দাওরা (যুগের মুক্ত) উপাধি ধারণ করেন আর উক্ত সম্পর্কের কারণেই তার বংশকে 'দুররানী' বলা হয়।

আহমদ শাহ দুররানী বংশের শাসন ও দুররানী রাজত্বের ভিত্তি স্থাপন করেন। তার মৃত্যুর পর আফগান রাজত্ব ছিল পূর্ব ইরান (মাশহাদ), গোটা আফগানিস্তান, পূর্ণ বেলুচিস্তান এবং পূর্ব দিকে কাশ্মীর ও পাঞ্জাব নিয়ে গঠিত। তাকে মূলতঃ আঠার শতকের মধ্যভাগের বিশাল রাজত্বের স্থপতি, অভিজ্ঞ লৌহমানব ও উচ্চ সাহসী সমরনায়ক, আল্লাহভীরু ও সৎ-ন্যায়পরায়ণ, নির্ভীক উদারপ্রাণ শাসকদের মধ্যে বিবেচনাযোগ্য আর সামগ্রিকভাবে (অবস্থা-পরিবেশ, প্রাথমিক জীবন ও সহায়-সম্বলহীনতাকে সামনে রেখে) ধীমান (GENIUS) আদর্শপুরুষদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তির দাবীদার। ১৭৪৭-১৭৬৯ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি সুলতান মাহমূদ গযনবী (র)-এর মত ভারতবর্ষকে তার তুর্কি অশ্বের মাঠ বানিয়ে রেখেছেন। তার কৌশল, সামরিক অভিজ্ঞতা, ধার্মিকতা, জ্ঞান-পিপাসা ও আত্মিক পবিত্রতার কথা তার একাধিক প্রসিদ্ধ সমসাময়িকগণ স্বীকার করেছেন। যে আফগান অঞ্চল সে সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু স্বাধীন রাষ্ট্রে বিভক্ত ছিল, তাকে তিনি বহুকাল পর একটি সুদৃঢ় সুসংহত শক্তিতে ঐক্যবদ্ধ করে বিশাল এক পরাশক্তি ক্ষমতাধর রাষ্ট্রে রূপান্তরিত করে ফেলেন।

আহমদ শাহ্ আবদালীর পরে আফগানিস্তান

আহমদ শাহ আবদালী ১১৮৬ হিজরী মোতাবেক ২৩ অক্টোবর ১৭৭২ খৃস্টাব্দে কান্দাহারে মৃত্যুবরণ করেন। আফসোস হচ্ছে, আলমগীর আযমের মত তার উত্তরসূরীও দুর্বল-অযোগ্য ছিল। (অবশ্য এই মর্মন্তুদ ঘটনা প্রায় সব রাজত্বের মহান স্থপতি, সফল বিজয়ী ও শাসকবর্গের সাথে সংঘটিত হয়েছে।) যে তৈমুর শাহ তার স্থলবর্তী এবং এই নতুন ও বিশাল রাজত্বের উত্তরাধিকারী হল, তার নিজের প্রখ্যাত ও দৃঢ়চিত্ত পিতার সাথে কোনও সম্পর্ক ছিল না। বিশ বছর দুর্বলতার সাথে রাজত্ব করার পর যখন এই যৌবনভরা রাজত্বে পতনের আলামত ফুটে উঠেছিল, এমনই মুহূর্তে ১৭৯৩ খৃস্টাব্দে তিনি ইন্তিকাল করেন। তদীয় পুত্র মাহমূদের রাজত্বকালেই রাজত্ব বারক যঈ বংশে স্থানান্তরিত হয়ে যায়। তারা আফগানিস্তানের বিপ্লব (১৯৭৫ খৃ.) পর্যন্ত আফগানিস্তানের শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত থাকে।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থা

মুসলিম বিশ্বের রাজনৈতিক ও শাসন ব্যবস্থা পর্যালোচনার পর এখন আমরা তার শিক্ষা ও ধর্মীয় অবস্থা পর্যালোচনা করছি, শাহ্ সাহেবের জীবন, তার কার্যক্রম, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, আগ্রহ-উদ্যম এবং তার সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে যার গভীর সম্পর্ক রয়েছে।

বারো শতকের মহামনীষী

মুসলমানদের শিক্ষা ও চিন্তাধারার ইতিহাস এবং তাদের রচনা ও গবেষণা কর্মের বিশাল ভাণ্ডার অধ্যয়ন করলে জানা যায়, তাদের শিক্ষা ও চিন্তাগত জীবন ও তৎপরতা তাদের রচনাবলি ও গবেষণাকর্ম রাজনৈতিক উত্থান, রাজত্বের উন্নতি ও বিজয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট ছিল না। যেমনটি অধিকাংশ অমুসলিম জাতি ও রাষ্ট্রের ইতিহাসে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের রাজনৈতিক পতন, রাজত্বের বিপ্লব এবং অনিয়ম-বিশৃঙ্খলার সাথে তাদের শিক্ষাগত পতন ও মনীষী-বুদ্ধিজীবীদের অভাবে পড়তে হয়। রাজত্বের সাহস ও শক্তিবৃদ্ধি, নেতৃত্ব এবং জাতিগুলোর মধ্যে আত্মনির্ভরতা, উচ্চ মানসিকতার অভাব, সেই সাথে তাদের মেধা-চিন্তায় সুপ্ত শুষ্কতা, প্রতিদ্বন্দ্বিতার আগ্রহে শীতলতা এবং কর্মতৎপরতায় ভাটা পড়ে যায়।

মুসলমানদের অবস্থা এর থেকে ভিন্ন। বরাবরই তাদের রাজনৈতিক পতন এবং আভ্যন্তরীণ বিশৃঙ্খলা-বিক্ষিপ্ততার মুহূর্তেও এমন সুযোগ্য ও স্বকীয়তার অধিকারী ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেছেন, যাদেরকে দেখে পতন ও অবনতির যুগে

জন্মগ্রহণকারী বলে মনে হয় না। সপ্তম শতকের শেষভাগে বাগদাদের পতন এবং তাতারীদের সেসব আক্রমণের পরে, যা পাশ্চাত্যের মুসলিম বিশ্বকে তছনছ করে দিয়েছিল; ধূলির ঝড় বয়ে গিয়েছিল সেসব রাষ্ট্রে, যেগুলো শত শত বছর ধরে ইলম ও জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলরূপে সফল ভূমিকা রেখে আসছিল। অষ্টম শতকের প্রথমভাগে শায়খুল ইসলাম তাকিউদ্দীন ইবনে দাকীক আলা-ঈদ (মৃত্যু ৭০৪ হি.)-এর মত মুহাদ্দিস, আল্লামা আলাউদ্দীন আলবাজী (মৃত্যু ৭১৪ হি.)-এর মত বিদগ্ধ উসূলবিদ ও বাগ্মী তার্কিক, শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (মৃত্যু ৭২৮ হি.)-এর মত ইমাম ও মুজতাহিদ, আল্লামা শামসুদ্দীন যাহাবী (র) (মৃত্যু ৭৪৮ হি.)-এর মত মুহাদ্দিস ও ঐতিহাসিক এবং আল্লামা আবু হাইয়ান নাহবী (র) (মৃত্যু ৭৪৫ হি.)-এর মত শাস্ত্রীয় পণ্ডিত আলেম-উলামার প্রদীপ্ত নক্ষত্ররাজি দেখা যায়। তার কারণ, দীন ও ধর্মীয় জ্ঞানে দক্ষতা সৃষ্টি করা এবং তার খেদমত ও প্রসারের কার্যক্রম-প্রেরণা এই উম্মতের ভেতরে সহজাতভাবে পাওয়া যায়। সরকারের নেতৃত্ব পৃষ্ঠপোষকতা ও মূল্যায়নে নয়। আর সে প্রেরণা ও স্পন্দন হচ্ছে, আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন, নবীগণের প্রতিনিধিত্বের সম্মান রক্ষা ও দীন সংরক্ষণের দায়িত্বানুভূতি।

কাজেই এই যুগ যদিও সামগ্রিকভাবে রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার যুগ এবং বড় বড় প্রসিদ্ধ শাসনযন্ত্র এমনকি উসমানিয়া রাজত্বের পতনের আলামত দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল; বিভিন্ন রাষ্ট্র এমনকি ইসলামের কেন্দ্রস্থল হিজাযে পর্যন্ত ক্ষমতা ও নেতৃত্ব লাভের জন্য পরস্পর টানাপোড়েন ও লড়াই চলছিল; কিন্তু মিসর, সিরিয়া, ইরাক, হিজায, ইয়ামেন, ইরান ও ভারতবর্ষে সর্বত্রই পঠন-পাঠনে ব্যস্ত, ইলমপিপাসু-শিক্ষানুরাগী, রচনা ও লেখালেখিতে তৎপর আলেম-উলামা, বিভিন্ন তরীকার মাশায়িখগণ ছিলেন আত্মশুদ্ধি ও তাযকিয়ায়ে নফসে গভীর নিমগ্ন এবং আধ্যাত্মিক যোগ্যতা ও উন্নতিতে সুসজ্জিত। তাদের মধ্যে কেউ কেউ তো এমন স্বকীয়তা সৃষ্টি করেছিলেন, তার নযীর নিকট অতীতেও দূর-দূরান্ত পর্যন্ত পাওয়া যায় না।

হাদীস শাস্ত্রের কথাই ধরুন। এক্ষেত্রে আল্লামা আবুল হাসান সিন্ধী আলকাবীর মত (মৃত্যু ১১৩৮ হি.)-এর মত মুহাদ্দিসকে পরিলক্ষিত হয়। যিনি দীর্ঘকাল হেরেম শরীফে বসে হাদীসের দরস দিয়েছেন। সিহাহ সিত্তার উপর তার রচিত টীকা 'আল-হাওয়ামিশুস্ সিত্তাহ' নামে প্রসিদ্ধ। মাওলানা মুহাম্মদ হায়াত সিন্ধীও (মৃত্যু ১১৬৩ হি.) এ যুগের গৌরব। সিরিয়ায় শায়খ ইসমাঈল আল আজলূনী ওরফে আল জারাহী ছিলেন উঁচু মাপের মুহাদ্দিস। তার রচিত كشف الخفاء ومزيل الالباس، عما اشتهر من الاحاديث على

السنة গ্রন্থখানা অত্যন্ত উপকারী ও পূর্ণাঙ্গ একটি কিতাব, যা দুর্বল ও জাল হাদীসসমূহের সম্ভবতঃ সবচেয়ে বৃহৎ সংকলন। এই গ্রন্থের মাধ্যমে তার দৃষ্টির প্রশস্ততা ও ন্যায়-নিষ্ঠার অনুমান করা যায়। তাতে দুর্বল ও জাল হাদীসগুলো ছাড়া সেসব হাদীসও রয়েছে, যেগুলো সাধারণের মাঝে প্রসিদ্ধ। অথচ এগুলোর নির্ভরযোগ্য কোনও তাখরীজ (উদ্ধৃতি) পাওয়া যায় না।

হাদীস শাস্ত্রের বড় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল হারামাইন শরীফাইন, যেখানে দরস দিতেন আবু তাহের কাওরানী আলকুর্দী ও শায়খ হাসান আল উজাইআ। ইয়ামেনে সুলাইমান ইবনে ইয়াহইয়া আল আহ্দল (মৃত্যু ১১৯৭ হি.) ইয়ামেন শহরের প্রখ্যাত মুহাদ্দিস এবং সমকালের হাদীসের বিরাট খাদেম ও বিশারদ ছিলেন। মুহাম্মদ ইবনে আহমদ ইস্ফারায়েনী (মৃত্যু ১১৮৮ হি.) ছিলেন হাদীস ও উসূল শাস্ত্রের বিজ্ঞ আলেম এবং الدر المصوعات فى الأحاديث الموضوعات এর রচয়িতা। ইয়ামেনে আমীর মুহাম্মদ ইবনে ইসমাঈল আল-হাসানী আস্-সন'আনী (মৃত্যু ১১৪২ হি.) ছিলেন প্রখ্যাত মুহাদ্দিস ও গবেষক। যার প্রমাণ তার বুলূগুল মারামের প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাগ্রন্থ 'সুবুলুস সালাম' এবং তানকীহুল আনযারের শরাহ 'তাওযীহুল আফকার'। এই শতাব্দীতেই আল্লামা মুহাম্মদ সাঈদ সুম্বুল (মৃত্যু ১১৭৫ হি.)-এর নামও দৃষ্টিগোচর হয়। যার রচিত 'আওয়ায়েলে কুতুবে হাদীস' -এর উপর হাদীস শাস্ত্রের শায়খ ও পণ্ডিতদের হাদীসের এজাযত বেশিরভাগ নির্ভরশীল। ঐতিহাসিকগণ আল্লামা মুহাম্মদ ইবনে আবুল বাকী আয্-যুরকানী (মৃত্যু ১১২২ হি.) কে মিসরের সর্বশেষ মুহাদ্দিস বলে অভিহিত করেছেন। ইলম ও জ্ঞানের গভীরতা, ব্যাপক শিক্ষাদান ও উপকারিতা এবং প্রচুর রচনা ও সংকলনের দিক থেকে শায়খ আবদুল গণী আন-নাবলূসী উস্তাদুল আযম নামে ভূষিত করা হয়। বর্ণিত আছে, তার রচনাবলির সংখ্যা দুইশত তেইশ। এ যুগেই জন্ম নিয়েছিলেন আল্লামা ইসমাইল হাক্কী (মৃত্যু ১১২৭ হি.), যিনি তাফসীরে কুরআনের উপর 'রূহুল বয়ান' -এর রচয়িতা, যা তাফসীরে হাক্কী নামেও প্রসিদ্ধ। বাগদাদের আলেমদের মধ্যে আবদুল্লাহ ইবনে হুসাইন আস্-সুদ্দী (মৃত্যু ১১৭৪ হি.) অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন।

জামি'আ আযহার মিসর, জামি'আ আয্-যাইতূনাহ তিউনিস এবং জামিআতুল কারবীন ফাস প্রভৃতি প্রাচীন মাদরাসাগুলো ছাড়াও দামেস্কের মাদরাসায়ে হাফেজিয়াহ, আল মাদরাসাতুশ শাল্লিয়াহ ও মাদরাসাতুল আযরাবিয়াহর নাম পাওয়া যায়। তরীকার মধ্যে নকশবন্দী, খিলওয়াতী, শাযলী, কাদেরী ও রিফাঈর আলোচনা বারবার উঠে আসে। এসব সিলসিলার মাশায়িখগণকে তুরস্ক থেকে নিয়ে ইন্দোনেশিয়া পর্যন্ত ছড়ানো ছিটানো দেখা যায়।

মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা-সাহিত্য ও আধ্যাত্মিকতা

এ যুগের শিক্ষিতমহলের বেশি আগ্রহ সাহিত্য, কাব্যচর্চা, শিক্ষা-সেমিনার এবং আক্রমণ ও আমোদ-প্রমোদের। এতেও বড় কোনও শ্রেষ্ঠত্ব ও অভিজাত্য মনে হয় না। ছন্দতাল ও অন্তমিলের প্রাচুর্য আর লৌকিকতা ব্যাপক। শিক্ষা ও সাহিত্য জগতে তুর্কি শাসনের প্রভাবও সুস্পষ্ট। বড় কোনও গবেষক ও দূরদর্শী লোক খুঁজেও পাওয়া যায় না। তবে মুরাদী বিরচিত 'সিলকুদ দুরার' -এর চার খণ্ড কবিতাগুচ্ছ, গজল, নানা পংক্তি ও ছন্দে ভরা। এতে আধ্যাত্মিকতা, সুধারণা, শ্রদ্ধা নিবেদন ও কারামাতের অনেক আলোচনা পাওয়া যায়। উসমানিয়া সাম্রাজ্যের কর্তৃত্বাধীন দেশসমূহের আলেমগণ এবং বিদ্বান-পণ্ডিত ব্যক্তিবর্গ রাজধানী কনস্টান্টিনোপল গমন করেন। অধিষ্ঠিত হন বিভিন্ন সরকারী পদমর্যাদায়।

গবেষণাকর্ম, গণিত, জ্যামিতি, অলংকার শাস্ত্র, ফিকহ্-হাদীসকে পাঠ্যসূচীর গুরুত্বপূর্ণ অংশ বিবেচনা তাবীয ও চিত্রকর্ম ইত্যাদির প্রচলন ছিল ব্যাপক। কোনও কোনও আলেম ফিকহের মূল গ্রন্থনা কুদূরী ইত্যাদির কাব্য রচনাও করেছেন। একাধিক আরব পণ্ডিত শিক্ষাবিদ ফার্সী ও তুর্কি ভাষাজ্ঞানও রাখতেন। রাজত্বের ভাষা হওয়ার কারণে তুর্কি ভাষার সাথে (বিশেষতঃ সিরিয়ায়) মানুষের সম্পর্ক ছিল প্রচুর। তুর্কি আলেমদের বিরাট এক অংশ সিরিয়া বাস করতেন। তারা বিশুদ্ধ আরবী বলতেন। দামেশক উমাবী বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্লাসে বসাকে অত্যন্ত গৌরবের বিষয় মনে করা হত। কিছু আলেম ও মাশায়িখ সেখানে 'ফুতুহাতে মাক্কিয়াহ' (মক্কা বিজয়সমূহ) আর কোনও কোনও শিক্ষক 'ফছূছুল হিকাম' পড়াতেন। শরহে জামী এবং মুখতাছারুল মা'আনী সিরিয়াতেও পড়ানো হত। তাসাওউফ ও আধ্যাত্মিকতার প্রতি আগ্রহ-আনন্দ ছিল সাধারণ বিষয়। এমনকি উলামায়ে কিরাম এবং মুহাদ্দিসগণের মধ্যেও শায়খ আবদুল গণী নাবলূসীসহ একাধিক উলামা-মাশায়িখ 'ওয়াহ্দাতুল উজুদ' এর প্রবক্তা ছিলেন।

ইরানে যুক্তিবিদ্যার প্রাধান্য এবং সমমনা রাষ্ট্রগুলোর ওপর তার প্রভাব

হিজরী দশ শতকের শুরু ভাগেই ইসমাঈল ছফাবী (৯০৫-৯৩০ হি.) ইরানে ছফাবী শাসন প্রতিষ্ঠা করেন। প্রথমে তিনি শী'আ মতবাদকে রাষ্ট্রধর্ম বানান আর সুন্নী মতাদর্শকে ইরান থেকে প্রায় নির্বাসিত করেন। যে ইরান ইমাম মুসলিম (র), ইমাম আবু দাউদ (র), ইমাম নাসাঈ (র) ও ইমাম ইবনে মাজাহ (র)-এর মত জগদ্বিখ্যাত শাস্ত্রীয় ইমাম এবং হাদীসের প্রাসাদের চার স্তম্ভ, অপরদিকে উচ্চস্তরের ফকীহ ও জ্ঞানসমুদ্র বিদগ্ধ আলেম আল্লামা আবু ইসহাক সীরাজী, ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আবদুল

মালেক এবং হুজ্জাতুল ইসলাম আবু হামেদ মুহাম্মদ আল-গাযালী (র)-এর মত যুগশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্ব জন্ম দিয়েছে, প্রায় সোয়া দু'শত বছর শোষণ-তোষণের রাজত্বে হাদীস, ফিকাহ ও উপকারী-ফলপ্রসূ জ্ঞান-বিদ্যা থেকে সেই ইরানের সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়। ইরান সম্রাটদের বেশি আকর্ষণ ছিল দর্শন শাস্ত্রের প্রতি। কাজেই শী'আ মতবাদের শুরু থেকেই মুতাযেলী মতাদর্শ, যুক্তিবিদ্যা, বৈষয়িক জ্ঞান ও দর্শনের সাথে সম্পর্ক ছিল। 'শরহে ইশারাতে ইবনে সীনা বা 'ইবনে সীনার সূত্রাবলির ব্যাখ্যা' -এর রচয়িতা প্রসিদ্ধ দার্শনিক ও গণিতবিদ খাজা নাসীরুদ্দীন তূসী (মৃত্যু ৬৭২ হি.) স্বয়ং শী'আ ও মুতাযিলী ছিলেন এবং হালাকু খানের বিশেষ উপদেষ্টা ও ঘনিষ্ঠ ছিলেন। এই রাজকীয় ঘনিষ্ঠতা ও বিশ্বস্ততার কারণে গোটা তাতারী রাজত্বে (যাতে তুর্কিস্তান, ইরান, ইরাক অন্তর্ভুক্ত ছিল) দর্শন, গণিত ও জ্যোতিষ শাস্ত্র প্রাধান্য বিস্তার করে। ছফাবী শাসনের দ্বিতীয় শাসক তোহমাসফ (মৃত্যু ৯৮৪ হি.) এর আমলেই মীর গিয়াসুদ্দীন মানসূর (মৃত্যু ৯৮৪ হি.)-এর ভাগ্যরবি চমকাতে থাকে, যিনি ছিলেন একজন জ্যোতির্বিজ্ঞানী ও দার্শনিক এবং শীরাজের মাদরাসায়ে মানসূরিয়ার প্রতিষ্ঠাতা, শাহ তোহমাসফ ছফাবীর যুগে দীর্ঘ সময় পর্যন্ত সভাপতিত্বের আসনে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিত্ব। ভারতবর্ষ পর্যন্ত তার ছাত্র-শিষ্য এবং শিষ্যের শিষ্য ছড়িয়ে পড়েছে। তারই শিষ্য আমীর ফাতহুল্লাহ শীরাজী (মৃত্যু ৯৯৭ হি.) দশম শতকের শেষ দিকে ভারতবর্ষে আগমন করেন। আকবর তাকে সভাপতির পদমর্যাদা দেন। তিনি ভারতের পাঠ্যপুস্তক ও শিক্ষা ব্যবস্থায় বৈষয়িক জ্ঞানের এমন ছাপ লগিয়ে দেন, যা তের হিজরী শতক পর্যন্ত বহাল থাকে। মাওলানা আযাদ বলগারামীর বর্ণনামতে ছদরুদ্দীন শীরাজী, মীর গিয়াসুদ্দীন মানসূর ও ফাযেল মির্জা জান (মৃত্যু ৯৪৪ হি.) এর রচনাবলি তিনিই ভারতে নিয়ে আসেন এবং সেগুলো পাঠ্যভুক্ত করেন।

এগার হিজরী শতকের মধ্যভাগে মীর বাকের (মৃত্যু ১০৪১ হি.)-এর ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। যিনি ইরান থেকে নিয়ে ভারতবর্ষ পর্যন্ত জ্ঞান ও শিক্ষার আসরে নিজের বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা, যৌক্তিকতা ও সাহিত্যের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করেন। শাহ আব্বাস ছফাবী (মৃত্যু ১০৩৭ হি.)-এর দরবারে তাকে অত্যন্ত সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখা হত। তার রচিত 'উফুকুল মুবীন' গ্রন্থটিকে দরসী শিক্ষাব্যবস্থায় উচ্চমানের রচনা মনে করা হয়। তার পরবর্তীতেই আল্লামা ছদরুদ্দীন শীরাজী (মৃত্যু ১০৫০ হি.)-এর ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয়, যিনি ছিলেন বিশিষ্ট গণিতবিদ ও স্বাধীনচেতা দার্শনিক। তার রচিত 'আল আসফারুল আরবিআহ' এবং 'শরহু হিদায়াতুল হিকমাহ' গ্রন্থ দু'টি জ্ঞানীমহল ও বিশ্বময় বিখ্যাত। ইরানের বংশগত যে আগ্রহ শত শত বছর থেকে এক প্রকার

'সরিষার পাহাড়' ও 'কথার দেবালয়' বানাতে অভ্যস্ত ছিল, তা এই যুক্তিবিদ্যাকে পুরোপুরি সাহায্য করে। শাব্দিক সূক্ষ্মদৃষ্টি এবং কৃত্রিম ও কাল্পনিক বিষয়ের ভুলভ্রান্তি ইরানের পশ্চিম সীমান্ত থেকে নিয়ে ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়, যা ছাই ও খড়ের পাহাড় বানাবার শামিল। দশম শতকের অনারব থেকে বারো শতকের আরব পর্যন্ত শিক্ষা ও লেখালেখির ময়দানে আধিপত্য ছিল দর্শন শাস্ত্রের। সেসব লেখকের ভাষা বুঝা ও সেগুলোর টীকা-টিপ্পনী ব্যতিত যোগ্যতার বহিঃপ্রকাশ বরং আপন প্রতিভা ও মেধার পরিচয় দেওয়ার কোনও উপায় ছিল না। সেসবের উপকারিতা নিয়ে সামান্য প্রশ্নও নিজের মেধাহীনতা ও অজ্ঞতাকেই প্রমাণ করত।

ইরানের প্রভাব কুদরতিভাবে আফগানিস্তান এবং আফগানিস্তানের পশ্চিমাঞ্চলীয় শহর হেরাতের উপর পড়ে। এ শহরের একজন আলেম ক্বারী মুহাম্মদ আসলাম হারবী কাবুলী (মৃত্যু ১০৬১ হি.) ছিলেন যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রে ইরানী শিক্ষকবৃন্দ ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিতদের রাষ্ট্রদূত। তার পুত্র যাহেদ ওরফে ক্বারী মুহাম্মদ যাহেদ (মৃত্যু ১১০১ হি.) এই যোগ্যতায় আরও গুণীজন হয়ে ওঠে। তিনি তার জীবনের সিংহভাগ অতিবাহিত করেন ভারতবর্ষে। 'শরহে মাওয়াকিক', 'শরহে তাহযীব' ও 'রিসালায়ে কুতবিয়্যাহ' -এর উপর তার রচিত 'যাওয়াহেদে ছালাছাহ' নামে প্রসিদ্ধ তিনটি টীকা ভারতবর্ষের শিক্ষাঙ্গণে বিরাট গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। দর্শন ও যুক্তিবিদ্যায় এই দক্ষতা সত্ত্বেও ফিকাহ, হাদীস এবং অন্যান্য ধর্মীয় শাস্ত্রে তাদের তেমন গভীরতা ছিল না। এমনকি শরহে বেকায়ার মত মধ্যস্তরের ফিকাহগ্রন্থ পঠনেও তাদের পুরোপুরি আত্মবিশ্বাস ছিল না। শাহ আবদুল আযীয (র)-এর মালফুযাতে (রচনাবলিতে) রয়েছে,

امیرے شرح وقایہ می خواند بے حضور جد بزرگوار سبق نمی فرمود

'জনৈক আমীর মীর যাহেদের নিকট শরহে বেকায়া পাঠ করতেন। (কিন্তু ফিকাহ শাস্ত্রে নিজের উপর আস্থা না থাকার কারণে) তিনি ততক্ষণ পর্যন্ত সবক (পাঠ্য) পড়াতেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তার মুহতারাম দাদা (শাহ আবদুর রহীম সাহেব, যিনি মা'কূলাতে স্বয়ং তার শিষ্য) না আসতেন।'

পক্ষান্তরে মা'কুলী (বৈষয়িক জ্ঞানে) এমন আগ্রহ ছিল যে, তিনি বলেন,

تقریر مرزا جان جان من است۔ ☆ وتقریر اخوند جان جان من است۔

'মীযা জানের লেকচার বা বক্তৃতা তো আমার প্রাণ,
আর ইখওয়ান্দের বক্তৃতা আমার প্রাণের প্রাণ।'

ইরানের এই প্রভাব কেবল আফগানিস্তান ও ভারতবর্ষেই নয় বরং সিরিয়া-ইরাক পর্যন্ত গিয়ে পড়ে। সেখানেও মা'কূলাতের আলেমদেরকে ইজ্জত ও সম্মানের চোখে দেখা হত। এসব শাস্ত্রের বিরাট প্রভাব ছিল মেধা-মননে। এ জাতীয় বই-পুস্তক সহজেই পাঠ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত হয়ে যেত।

সাধারণ চারিত্রিক, সামাজিক ও আকীদাগত অবস্থা

ইলম ও জ্ঞানের ব্যস্ততা, বহু সংখ্যক সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব, বিভিন্ন সিলসিলা ও তরীকার গ্রহণযোগ্যতা, হাদীসে নববীর সাথে সহানুভূতি, অনেক শাসকের ধার্মিকতা এবং সেসব প্রসিদ্ধ শাসনযন্ত্র থাকা সত্ত্বেও যার আকীদা-বিশ্বাস ছিল ইসলামের উপর আর ব্যবহারিক জীবনের অনেক ক্ষেত্রে, পারিবারিক ও গোষ্ঠীগত আইন-কানুনে আস্থা ছিল শরীয়তের ওপর, সেখানে অনেক মসজিদ-মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত ছিল। জনসাধারণ ছিল ইসলামপ্রিয়, ধর্মানুরাগী, আলেমদের মূল্যায়নকারী, মাশায়িখ ও বুযুর্গদের প্রতি আত্মবিশ্বাসী এবং দীনের স্তম্ভ ও অনিবার্য পালনীয় ফরযসমূহের উপর আমলকারী। তাদের মন-মানস ইসলামী মূল্যবোধ থেকেও খালি ছিল না।

মুসলিম বিশ্বে সাধারণতঃ উত্থান-পতন লক্ষ্য করা যেত। চরিত্র ও সমাজের বিপর্যয় এসেছিল। এতে ধ্বস নেমেছিল বেশ। অনারব-অমুসলিমদের অনেক প্রথা-প্রচলন, তাদের অভ্যাস ও রীতিনীতি মুসলমানদের মধ্যে স্থান করে নিয়েছিল। শাসকদের মধ্যে নেতৃত্ব মোহ, আত্মম্ভরিতা এবং রাজত্বগুলোতে অরাজকতা ছড়িয়ে পড়েছিল। আমীর ও ধনিক শ্রেণী ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যের কুপ্রভাবে প্রভাবিত আর কোথাও কোথাও বিজাতিদের আদর্শ ও চিন্তাধারা গ্রহণ করে নিয়েছিল। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীতে অলসতা, উদাসীনতা, বেকারত্ব, সরকারী দরবারের সাথে ঘনিষ্ঠতা, উঠা-বসা ও খোশামোদের অভ্যাস প্রকট হয়ে গিয়েছিল। অনেক ক্ষেত্রে ছিল সন্দেহপ্রবণতার ক্ষীপ্র জোয়ার। সঠিক একত্ববাদের সীমাতিক্রম, আউলিয়ায়ে কিরামের স্তুতি ও সীমাতিরিক্ত সম্মান প্রদর্শন, কবর পূজা এবং কোথাও কোথাও জঘন্য শিরকের চিত্রও পরিলক্ষিত হত। আমেরিকান লেখক ডা. লুফারোপ স্টাডোর্ড তার জগদ্বিখ্যাত 'নিউ ওয়ার্ল্ড অফ ইসলাম (New World of Islam) বা আধুনিক মুসলিম বিশ্ব গ্রন্থে আঠারো খৃস্ট শতকের মুসলিম বিশ্বের চিত্র অঙ্কন করেছেন। যাতে কোথাও কোথাও অতিরঞ্জন ও অমিল পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সামগ্রিকভাবে গ্রন্থখানি তৎকালীন মুসলিম বিশ্বের একেবারে ভুল প্রতিচ্ছবি নয়। তাতে সে সময়কার এমন বহু চিত্র উঠে এসেছে, যা সেখানে অবস্থানরত ও সর্বক্ষণ প্রত্যক্ষকারীদেরও প্রায়ই

দৃষ্টিগোচর হয় না। আর নবাগত ও প্রথমবার প্রত্যক্ষকারীদের নিজের দিকে আকৃষ্ট করে ফেলে। সে গ্রন্থের বিশুদ্ধতার পুরোপুরি দায়িত্ব গ্রহণ ব্যতিত এখানে তার উদ্ধৃতি টানাও স্থান অনুপযোগী হবে না। তিনি লিখেন, 'আঠারো শতকে মুসলিম বিশ্ব তার দুর্বলতার চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। সঠিক শক্তির প্রভাব কোথাও দৃষ্টিগোচর হত না। সর্বত্রই স্পষ্ট ছিল অধঃপতন ও স্থবিরতা। সভ্যতা-ভদ্রতা ও চরিত্র ছিল ঘৃণ্য, হতাশাজনক। আরব সভ্যতার শেষ প্রভাবটুকু হারিয়ে এক ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী বন্য সভ্যতায় এবং জনসাধারণ পৈশাচিক লাঞ্ছনায় জীবন-যাপন করছিল। শিক্ষা হয়ে গিয়েছিল মৃতবৎ। আর মুষ্টিমেয় যে ক'টি শিক্ষালয় এমন বিভীষিকাময় পতনেও টিকে ছিল, সেগুলো দীনতা ও নিঃস্বতার কারণে ছিল যায় যায় প্রাণ। রাজ্যসমূহ ছিল লাগামহীন। সেখানে সর্বত্রই ছিল অনিয়ম, দূর্নীতি ও খুন-খারাবীর রমরমা অবস্থা। স্থানে স্থানে বড় কোনও স্বাধীন যেমন তুর্কি শাসক কিংবা ভারতবর্ষের মোঘল সম্রাটগণ কিছু রাজকীয় আড়ম্বরতা তৈরী করেছিল। যদিও প্রাদেশিক শাসকবর্গ তাদের প্রভুদের মত জুলুম-শোষণ ও জোর-জবরদস্তির উপর নির্ভরশীল স্বাধীন রাজত্ব কায়েম করতে খুবই সচেষ্ট ছিল। অনুরূপভাবে আমীর-উমারাগণ (শাসকবর্গ) যথারীতি দাম্ভিক-অহংকারী, স্থানীয় নেতৃবৃন্দ ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী ডাকাতদলের বিরুদ্ধে ছিল মাথার উপর বর্ষার ফলা। এই বিভীষিকাময় ও বিপর্যস্ত শাসন ব্যবস্থায় প্রজা সাধারণ হত্যা-লুটতরাজ, জুলুম-শোষণে ছিল জর্জরিত। গ্রাম্য ও শহরবাসীদের মধ্যে মেহনত ও পরিশ্রমের চেতনা মুছে গিয়েছিল। কাজেই ব্যবসা ও কৃষি দুটিই এত হ্রাস পেয়েছিল যে, নিছক পেট বাঁচানোর জন্য যৎসামান্যই করা হত।

ধর্মও অন্যান্য বিষয়ের মত অধঃপতিত ছিল। তাসাওউফের শিশুসুলভ ধারণাগুলোর প্রাচুর্য খালেস ইসলামী তাওহীদকে ঢেকে দিয়েছিল। জনসাধারণ ও মূর্খ লোকজন তাবীজ-তুমার, চুড়ি-পৈতা পরিধান ইত্যাদিতে আক্রান্ত হয়ে নষ্ট-ভ্রষ্ট ফকীর-দরবেশ ও পাগলদের প্রতি বিশ্বাসী ছিল। বুযুর্গদের মাজার যিয়ারতে গমন করত। ধারণা ছিল, আল্লাহ তা'আলা এমনই বড় যে, তারা তার আনুগত্য ও ইবাদত ভায়া বা মাধ্যম ছাড়া করতে পারে না। কুরআনে কারীমের চারিত্রিক ও নৈতিক শিক্ষাকে কেবল পশ্চাতেই ফেলে রাখা হয়নি বরং এর বিরুদ্ধাচরণও করা হত। আফিম ও শরাব (মদ) পান ব্যাপক হয়ে গিয়েছিল। সর্বত্র চলছিল ব্যভিচারীদের দৌরাত্ম্য। নিকৃষ্টতর জঘন্য কাজকর্মও করা হত প্রকাশ্যে, নির্লজ্জভাবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ভারতবর্ষ

রাজনৈতিক অবস্থা

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর জন্ম হয় সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (মৃত্যু ১১১৮ হি.)-এর মৃত্যুর চার বছর পূর্বে হিজরী ১১১৪ সালে। সম্রাট আলমগীর এই উপমহাদেশের আমাদের জানামতে এবং সংরক্ষিত ইতিহাসের আলোকে অশোকের পরে (যদি তার রাজত্বের প্রশস্ততা ও শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কিত বর্ণনাগুলো বিশুদ্ধ ও গ্রহণযোগ্য হয়) ভারতবর্ষের সবচেয়ে বড় শাসক। তার রাজত্ব ভারতবর্ষের সকল সম্রাটের রাজত্ব অপেক্ষা সর্বাধিক বিস্তৃত ছিল। ক্যামব্রিজ হিস্ট্রোরী রচয়িতা লিখেন– 'তার শাসন গযনী থেকে চট্টগ্রাম পর্যন্ত এবং কাশ্মীর থেকে কিরনাটক পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।'

অপর ঐতিহাসিক লিখেন, 'প্রাচীন যুগ থেকে ইংরেজ আমল পর্যন্ত ভারতবর্ষের এত দীর্ঘ ও বিস্তৃত শাসন কখনও প্রতিষ্ঠিত হয়নি।'

তার যুগেই এবং তারই ইংগিতে মীর জুমলাহ শত শত বছর পরে প্রথমবার আসাম (ভাষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, ধর্ম-মত ও বংশে ভারতবর্ষ থেকে পৃথক একটি স্বাধীন ভূ-খন্ড) কে জয় করে মোঘল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করে নেন। সকল পশ্চিমা ও অমুসলিম ভারতীয় ঐতিহাসিকগণের সেসব সমালোচনা ও বিতর্কিত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, যার উৎস-প্রেরণা মূলতঃ আওরঙ্গজেব আলমগীরের আত্মসম্ভ্রমবোধ ও ইসলামের সাহায্য-সহযোগিতা: তা সত্ত্বেও তাঁর অতুলনীয় ইচ্ছাশক্তি, দৃঢ়চিত্ততা, ব্যবস্থাপনা যোগ্যতা, সাধাসিধে বরং দুনিয়াবিমুখ জীবন, বীরত্ব, সাহসিকতা একটি প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক বাস্তবতা।

আওরঙ্গজেব আলমগীর

সম্রাট আওরঙ্গজেব রাজত্বের লাগাম হাতে নেওয়ার পর পূর্ণ মনোযোগিতার সাথে সম্রাট আকবর-যুগের ইসলামবিরোধী নিদর্শনগুলো নিশ্চিহ্ন করা, শী'আ মতবাদের প্রভাব হ্রাস করা (যার প্রাণকেন্দ্র ছিল দক্ষিণাত্য এবং যে কারণে তিনি তার জীবন ও শক্তির বিরাট অংশ দাক্ষিণাত্য অবরোধে ব্যয় করেছেন)। ইরানের সেসব অগ্নিপূজাসুলভ সাংস্কৃতিক প্রভাব, যা আকবরী যুগে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল এবং যা ইরানী পঞ্জিকা ও নববর্ষ উৎসবরূপে পাওয়া যেত, সেসব বিষয় বিলুপ্ত

করার পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। হিসাবরক্ষক-পরিদর্শকের শরঈ পদ কায়েম করেন। যেন তারা সৃষ্টিজীবকে নিষিদ্ধ ও হারাম বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখেন। তিনি সরকারের বহু শরীয়ত পরিপন্থী আয়ের উৎস বন্ধ করেন। গোটা রাজত্বে শরঈ আইন-কানুন জারি করতঃ বিচারকদের সহায়তার জন্য ফিকহী মাসায়েল সংকলন ও সুবিন্যস্তকরণের কষ্ট স্বীকার করেন। সুতরাং 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' নামে একটি বিশাল সংকলন তৈরী হয়, যা মিসর-তুরস্কেও (ফাতাওয়ায়ে হিন্দিয়াহ নামে) ইসলামী আইনের একটি বিশাল ও নির্ভরযোগ্য উৎস মনে করা হয়। কুর্নিশ ও অভিবাদনের অনৈসলামিক ও একত্ববাদবিরোধী প্রথা বিলুপ্ত করেন। তদস্থলে ইসলামী অভিবাদন সালামের সুন্নত চালু করেন। সংক্ষেপে আল্লামা ইকবালের ভাষায়-

شعلۂ توحید را پروانہ بود۔ ☆ چو براہیم اندریں بت خانہ بود۔

'একত্ববাদের দ্বীপশিখা জ্বলছে লেলিহান
যখন ইবরাহীম ছিলেন মুর্তিঘরে।'

এসব সংস্কার ও বৈপ্লবিক কর্মকাণ্ড ব্যতিত তিনি যেসব ধর্মীয় মূল্যবোধ ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন, তন্মধ্যে সবচেয়ে দ্বীপ্তিমান গুণ হচ্ছে, তার সচেতনতা, দৃঢ়চিত্ততা, কর্তব্যপরায়ণতা এবং রাজত্বের খুঁটিনাটি বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আইন-শৃঙ্খলার উপর পুরোপুরি চলার প্রচেষ্টা, যা এই আল্লাহ প্রদত্ত বিশাল রাজত্বের অধিপতির জন্য প্রথম শর্ত। তিনি আপন পিতা সম্রাট শাহজাহানকে এক পত্রে লিখেছিলেন আর ইতিহাসও এর সাক্ষী; তিনি লিখেন, 'আমার বিরুদ্ধে আলস্য, আরামপ্রিয়তা ও বিলাসিতার অভিযোগ উঠতে পারে না।' জনৈক আমীর একবার তাকে পরামর্শ দিয়েছিল, জাহাপনা! রাজ্যের কাজে অতিরিক্ত কষ্ট স্বীকার করবেন না। এতে স্বাস্থ্যের উপর বিরূপ প্রভাব পড়তে পারে। শরীর খারাপ করতে পারে। তার জবাবে তিনি বলেছিলেন, 'আমাকে আল্লাহ তা'আলা অন্যের তরে পরিশ্রম করার জন্যই প্রেরণ করেছেন।' সাথে শায়খ সাদী (র)-এর নিম্নোক্ত ছন্দ আবৃত্তি করেন,

الا تا بغفلت نہ خسپی کہ نوم۔ ☆ حرام است بر چشم سالار قوم۔

রাজত্বের এই প্রশস্ততা সত্ত্বেও এর আইন-শৃঙ্খলা সম্পর্কে স্বয়ং অবগত ও পেরেশান হওয়া এমন ব্যক্তিত্বেরই কাজ, যিনি দৃঢ় সংকল্প, ইস্পাতকঠিন দেহ-সৌষ্ঠব, সীমাহীন দায়িত্ব জ্ঞান ও আল্লাহভীতির অধিকারী। বিস্ময়ের ব্যাপার হল রাষ্ট্রীয় মৌলিক বিষয় ও রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজনাদির প্রতি তার দৃষ্টি

যতখানি নিবদ্ধ ছিল, ততখানিই ছিল ছোট-খাট বিষয়েও। তিনি দক্ষিণে থাকতেন, কিন্তু উত্তর, পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চল সব দিকেরই খবর রাখতেন। নিজের ব্যক্তিগত তত্ত্বানুসন্ধান ও রিপোর্টারদের সাহায্যে আইন-শৃঙ্খলা সংক্রান্ত সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিবরণ যাচাই করতেন। যার ফলে রাষ্ট্রের কর্মকর্তা-কর্মচারীগণ যেখানেই অবস্থান করত, সচেতন ও তৎপর থাকত। তিনি ছোট ছোট লিখিত প্রতিবেদন স্বয়ং পাঠ করতেন। তার স্বরচিত নিম্নোক্ত ছন্দই তার মনের আকুতিগুলোর সঠিক ব্যাখ্যা। তার দায়িত্ববোধ ও এর পরিণামে তার বিভিন্ন কষ্ট-যাতনার বাস্তব চিত্র। তিনি প্রায়ই স্বরচিত নিম্নোক্ত পংক্তিটি আবৃত্তি করতেন।

غم عالم فراواں است و من یک غنچہ دل رارم-
چساں در شیشہ ساعت کنم ریگ بہاماں را؟

কখনও কখনও আবৃত্তি করতেন নিম্নোক্ত কবিতা। এর উপর তার আমলও ছিল।

من نمی گویم زیاں کن یا بفکر سود باش-
اے ز فرصت بے خبر ادر ہر چہ باشی زود باش-

আওরঙ্গজেবের দুর্বল স্থলাভিষিক্ত

কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের পর এই বিশাল বিস্তৃত ও গৌরবময় সিংহাসনে (যা দীন বিনাশকারী হওয়ার পরিবর্তে দীনের সাহায্যকারী এবং জাতি ধ্বংসকারী হওয়ার পরিবর্তে জাতির সেবক হয়ে গিয়েছিল) তার বংশধরদের মধ্যে এমন লোক আসে, –মনে হয় যেন তারা শপথ করেছিল, সম্রাট আলমগীরের দ্বারা ইসলামের সাহায্য, রক্ষণাবেক্ষণ, দীনের পুনর্জীবন দান ও সুন্নত চালুর যে 'ভুল' (!) হয়েছিল, তারা এর ক্ষতিপূরণ করবেন। সেই সাথে আলমগীর আযম এই রাজত্বের সীমানায় যে প্রশস্ততা এনেছিলেন, ভারতবর্ষের আইন-শৃঙ্খলাকে নিজের বিচক্ষণতা, সচেতনতা, দৃঢ়চিত্ততা, দক্ষতা ও কর্তব্যপরায়ণতার মাধ্যমে যে স্থিতিশীলতা ও দৃঢ়তা এনে দিয়েছিলেন, জনসাধারণ ও দাঙ্গাবাজ-কুচক্রীদের উপর যে প্রভাব বিস্তার করেছিলেন, তা নিজেদের বিলাসপ্রিয়তা, আলস্য-উদাসীনতা ও অযোগ্যতা, গৃহবিবাদ, আভ্যন্তরীণ কোন্দল ও টানাপোড়েন, স্বার্থপর ও ক্ষমতালিপ্সু রাজন্যবর্গ ও মন্ত্রীদের উপর পূর্ণ আস্থা এবং রাষ্ট্রীয় বিষয়ে উদাসীনতা প্রদর্শনের মাধ্যমে ধারাবাহিকভাবে সেই পাপের (!) কাফফারা আদায় করতে থাকবেন। সুতরাং এই মোঘল সাম্রাজ্যই নয়, মুসলিম উম্মাহই নয় বরং গোটা ভারতবর্ষের

দুর্ভাগ্যক্রমে তার সিংহাসনে একের পর এক দুর্বল ও অযোগ্য শাসক সমাসীন হতে থাকে। ইতিহাসের চরম বিস্ময় এবং আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষিতা ও বড়ত্বের বহিঃপ্রকাশ হিসেবে দেখা গেল, তার প্রথম উত্তরাধিকারী প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহ ছিল নিজের স্বনামধন্য পিতার সম্পূর্ণ বিপরীত। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর যুগে (১১১৪-১১৭৬ হি.) আওরঙ্গজেবের পরে পর্যায়ক্রমে এগারজন মোঘল সম্রাট সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন।

(১) মুহাম্মদ মু'আযযম বাহাদুর শাহ ওরফে শাহ আলম বাহাদুর শাহ প্রথম, (২) মুইয্‌যুদ্দীন জাহাঁদার শাহ, (৩) ফুররাখ সিয়ার ইবনে আযীমুশ্‌শান (৪) নেকুসিয়ার, (৫) রফীউদ্দারাজাত ইবনে রফীউল কাদর, (৬) রফীউদ্দৌলাহ ইবনে রফীউল কাদর, (৭) মুহাম্মদ শাহ ইবনে জাহান শাহ, (৮) আহমদ শাহ ইবনে মুহাম্মদ শাহ, (৯) আযীযুদ্দীন আলমগীর ইবনে জাহাঁদার শাহ, (১০) মহিউস সুন্নাহ ইবনে কামবখশ ইবনে আলমগীর, (১১) শাহ আলম ইবনে আযীযুদ্দীন।

অর্ধশতকের অন্তবর্তী সময়ে এগারজন সম্রাট সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন। তন্মধ্যে কারও কারও শাসনকাল মাত্র দশ মাস, কারও চার মাস অপেক্ষাও কম, কারও রাজত্ব ছিল নামমাত্র, আবার কারও মাত্র কয়েক দিনের। আমরা এখানে তার প্রথম উত্তরাধিকারী শাহ আলম বাহাদুর শাহ, ফুররাখ সিয়ার ইবনে আযীমুশশান, মুহাম্মাদ শাহ ও শাহ আলমের শাসনামল এবং সেসব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি ও ট্রাজেডি সম্পর্কে পর্যালোচনা করব, যেগুলো ভারতবর্ষের ইতিহাস ও মুসলমানদের ভাগ্য গঠনে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে।

প্রথম শাহ আলম বাহাদুর শাহ

তিনি ছিলেন বাদশা আলমগীরের বড় ছেলে, যে অপর সন্তান মুহাম্মদ আযম শাহকে পরাজিত করে সিংহাসনে আরোহন করেন। আলমগীরের মানসিকতা ও মতাদর্শের সাথে তার বিরোধের সবচেয়ে বড় ও প্রথম প্রমাণ হচ্ছে, তিনি শী'আ মতাদর্শ গ্রহণ করেন, যা শুধু আলমগীরের আকীদা-বিশ্বাস, মানসিকতা ও চেতনার পরিপন্থীই ছিল না বরং পুরো তৈমুরী ধারার রাষ্ট্রপরিচালকদের আকীদা-বিশাস, ধর্ম-পথ ও মতাদর্শের পরিপন্থী ছিল, এই সাম্রাজ্যের কল্যাণ এবং স্বার্থগুলোর বিপরীত ছিল। (যেখানে মুসলিম জনবসতির শতকরা নব্বই-পচানব্বই জন লোক ভারতবর্ষের পূর্ব সীমান্ত বাংলা মুলুক থেকে নিয়ে রাজত্বের পশ্চিম সীমানা কাবুল-কান্দাহার পর্যন্ত সুন্নী মতাদর্শ ও হানাফী মাযহাবের অনুসারী ছিল) ভারতবর্ষে যার সাফল্য ও গ্রহণযোগ্যতার কোনও সম্ভাবনাই ছিল না।

সিয়ারুল মুতাআখ্খিরীন (পরবর্তীদের আদর্শ) গ্রন্থ প্রণেতা গোলাম হুসাইন তবাতবাঈর বর্ণনা মতে (যিনি স্বয়ং ইছনা আশারী মতবাদের বিশ্বাসী ছিলেন এবং যার শী'আ হওয়ার কথা ঐতিহাসিক আলামত দ্বারা প্রমাণিত) বাহাদুর শাহের শী'আ মতাদর্শ গ্রহণ, এ বিষয়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আলিমদের সাথে তর্ক-বিতর্কে লিপ্ত হওয়া, ভাষণ-বক্তৃতায় علی ولی الله وصی رسول الله (আলী আল্লাহর ওয়ালী, রাসূলুল্লাহ প্রতিনিধি) বাক্য সংযোজনের নির্দেশ দানের ফলে বাদশার আবাসভূমি লাহোরে হৈ চৈ পড়ে যায়। বিশৃঙ্খলা শুরু হয়। উক্ত লেখক স্বয়ং তার প্রথা গ্রহণ না করার কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেন, 'সম্রাট এ ব্যাপারে বরাবরই বাড়াবাড়ি করতে থাকেন। শী'আ মতবাদের প্রসার ও শক্তি বৃদ্ধিতে সদা সচেষ্ট ও তৎপর থাকেন। দীর্ঘ সময় পর্যন্ত আলেমদের সাথে বিতর্কের দ্বার খুলে রাখেন। কিন্তু এতে কোনও লাভ হয়নি।'

এই পরিবর্তনের পরিণাম জনসাধারণ ও সামরিক বাহিনীর মাঝে ভগ্ন হৃদয়, মন কষাকষি বরং কুধারণারূপে প্রকাশ পায়। তাদের মধ্যে সেই ধর্মীয় চেতনা বাকি থাকেনি, যা ছিল বিগত মোগল সম্রাটদের যুগে এক বিরাট শক্তিশালী প্রেরণা। এই বাস্তবতাকে কতিপয় অমুসলিম ঐতিহাসিকও উপলব্ধি করেছেন। ডা. সতীশ চন্দ্র লিখেন, 'রাজত্বের নিয়ম-শৃঙ্খলায় ধর্মের প্রভাব হ্রাস পেয়ে যায়।'

মাওলানা যাকাউল্লাহ সাহেব ভারতবর্ষের ইতিহাসে লিখেন, 'আলমগীরের মৃত্যুর পর রাজত্বের কর্মকাণ্ডে বিরাট ধরনের পরিবর্তন সৃষ্টি সূচিত হয়ে গিয়েছিল। বদলে গিয়েছিল সকল সম্পর্কের চিত্র। মারাঠীদের সাথে তৈমুরিয়া রাজত্বের যে সম্পর্ক ছিল, সম্পূর্ণরূপে তা পাল্টে হয়ে গিয়েছিল। মোঘল সাম্রাজ্য দুর্বল হতে হতে মুমূর্ষপ্রায় হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু মৃত্যুশয্যায়ও নিজের দম্ভ-অহংকার ও জাঁকজমক থেকে হস্ত সংকোচন করেননি।'

সেই আলমগীর যিনি আওরঙ্গবাদে থাকলে দিল্লী তো ভাল, বিহার এবং বাংলা মুলুকেও সরকারী কর্মকর্তা-কর্মচারীদের উপর তার প্রভাব বিরাজ করত। তিনি রাজত্বের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ব্যাপার সম্পর্কেও সজাগ থাকতেন এবং যথাসময় উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ ও যথাযোগ্য নির্দেশ জারি করতে এতটুকু কালবিলম্ব করতেন না। আর তার উত্তরাধিকারীর একি দূরাবস্থা! ভারতবর্ষের ঐতিহাসিক লিখেন, 'আইনত ও বেআইনীভাবে কার্যক্রম চালুর ব্যাপারে তৎক্ষণাৎ মতানৈক্য হয়। বাদশার দস্তখতের কোনও মূল্য নেই। বাদশা তার সেক্রেটারীকে বলেন, সকল কর্মচারী পরস্পর ঐকমত্য হয়ে গেছে। যা ভাল মনে করে তাই করে। আমাদের কেবল প্রতিমূর্তি আছে। প্রজাসাধারণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ বা স্বার্থরক্ষা ছাড়া আমাদের কোন গত্যন্তর নেই।'

তিনি আরও লিখেন, 'কৌতুক সম্রাট লোফার চরিত্র তার ইতিহাস 'উদাসীন সম্রাট' এর আকর বলেছেন। রাত্রিবেলায় জাগ্রত থাকে। দিনের বেলা দুপুর পর্যন্ত ঘুমিয়ে কাটায়, যার কারণে সফরের দিন সৃষ্টিজীবের কষ্ট হয়। তারা আপন তাবুসমূহের দৃষ্টান্ত খুঁজে পায় না।' তৃতীয়তঃ সে নিজের আইন পরিপন্থী আলেমদের উপর ভর্ৎসনা ও অপবাদের কালিমা লেপন করেছে। স্থানে স্থানে তাদের বন্দি করেছে। অধিকন্তু মন-মানসে হিংস্রতা ও পাগলামী এতটাই প্রবল হয়েছে যে, রাজধানী লাহোরে ৯ মুহররম ১১২৪ হিজরীতে এ নশ্বর পৃথিবী ত্যাগ করে।'

তবাতবাঈও উল্লেখ করেছেন– শাহ আলম বাহাদুর শাহের শেষ জীবনে মস্তিষ্ক বিকৃতি, কুকুরকে মেরে ফেলার নির্দেশ জারি এবং যাদুর ভয় ছিল।

এভাবে আলমগীরের প্রথম উত্তরাধিকারীর যুগেই এবং মাত্র ছয় বছরের রাজত্বকালেই বিশাল মোঘল সাম্রাজ্যের প্রাসাদ হেলে পড়ে। তার সেই বৈশিষ্ট্য ও প্রভাব বিলীন হয়ে যায়, যা বিরোধী শক্তিসমূহ, কুচক্রীমহল এবং বিশেষ অবিশেষ সর্বশ্রেণীর মানুষের মন-মানসে সম্রাট বাবরের যুগ থেকে বদ্ধমূল হয়েছিল।

ফুররাখ সিয়ার

ফুররাখ সিয়ার (১১২৫-১১৩১ হি.)-এর যুগে হুসাইন আলী খান, আবদুল্লাহ খান (তন্মধ্যে প্রথমজনকে আমীরুল উমারা আর দ্বিতীয়জনকে কুতুবুল মালিক উপাধিতে ভূষিত করা হয়েছিল)-এর কর্তৃত্ব স্বয়ং সম্রাট এবং সমগ্র রাজত্বে প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। ফুররাখ সিয়ার তাদের হাতের খেলনায় পরিণত হয়েছিল। অবশেষে তারা ফুররাখ সিয়ারকে বন্দি করে। অনন্তর তাকে জীবনের বন্দিত্ব থেকেও মুক্ত করে দেয়। 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচয়িতা লিখেন, মুহাম্মাদ সিয়ার যদিও বিশাল চরিত্র, প্রশস্ত মন ও মূল্যায়নকারী ছিলেন, প্রত্যেকের সেবা ও সংশয়ের জবাবে চাইতেন যথাসম্ভব পদমর্যাদা ও উত্তম সেবা প্রদান করে সমপর্যায়ের লোকদের সম্মান করতে। কিন্তু সে ক্ষমতা তার ছিল না। আর না তিনি বিচক্ষণ যুবক ছিলেন। রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ড সম্পর্কে উদাসীন, শৈশবকাল থেকে বাংলা মুলুকে বাপ-দাদা থেকে দূরে বেড়ে উঠেছেন। দৃঢ়চিত্ততা ও সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের যোগ্যও ছিলেন না; অন্যের মতামতের উপর চলতেন। সৌভাগ্যক্রমে রাজমুকুট ও রাজত্ব পেয়েছিলেন বটে। কিন্তু তৈমুর বংশে যে বীরত্বের রত্ন ছিল, তিনি তার বিপরীত সহজাত কাপুরুষতায় হীনমন্য ছিলেন। স্বার্থপর লোকের কথার গভীরে পৌঁছতে পারতেন না। প্রথম থেকেই আপন রাজত্বের পতন ও বিপর্যয়ের উৎস নিজেই হয়ে গিয়েছিলেন।'

বাদশার দরবারে রাজা রতন সিংহ (দেওয়ানে সাইয়িদ আবদুল্লাহ খান) সকল কর্মচারীর কাজকর্মে হস্তক্ষেপ করত। কারও মৌলিক অধিকার ও সম্মান সে বাকী রাখেনি। বিশেষতঃ ধন-সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাগুলোতে বাদশার বিলাসিতা, নির্জনাবাস ছাড়াও বোকামী, নিবুর্দ্ধিতা বেড়ে গিয়েছিল অনেক। বন্ধ হয়ে গিয়েছিল আল্লাহর সৃষ্টিজীবের সেবামূলক কাজ।

অবশেষে দুই ভাই (কুতবুল মালিক ও আমীরুল উমারা) মিলে ফুররাখ সিয়ারের চোখে শলাকা ঢুকিয়ে দেয় এবং দুর্গের ভেতর কবর আকৃতির জেলখানায় বাদশাকে বন্দি করে। ছয় বছর চার মাস শাসন করে তিনি এই পৃথিবী থেকে বিদায় নেন। এসব ঘটনা গোটা সাম্রাজ্যের মোঘল সিংহাসনের উত্তরাধিকারীদের অপমান-লাঞ্ছনা এবং রাজত্বের মূল্যহীনতা উপমা সৃষ্টি করে।

মুহাম্মদ শাহ্ বাদশা

মুহাম্মদ শাহ্ উনত্রিশ বছর ছয় মাস রাজত্ব করেন। তার শাসনামল নানা ঘটনাবলি ও ট্রাজেডিতে ভরা। তার শাসনামলেই নাদের শাহ্ কর্তৃক দিল্লীর উপর ঐতিহাসিক আক্রমণ হয়। কিন্তু সে সময় রাজত্বের উপর প্রভাবশালী ও তার ভালমন্দের মালিক ছিলেন এই দুই সাইয়িদ বংশধর কুতবুল মালিক আবদুল্লাহ খান এবং আমীরুল উমারা হুসাইন। সে সময় দরবারী লোকদের প্রভাব এতই খর্ব হয়ে গিয়েছিল যে, তাদের দু'জনের চাপের কারণে বাদশা জুম'আর নামায ব্যতিত কোনও বিধান বা নির্দেশ জারী করতে সক্ষম ছিলেন না। এ দুই ভাই ইরান-তুরানের সকল বংশের বেইজ্জতি ও সম্মানহানীতে কোমর বেঁধে নামে। পদত্যাগ ও নির্জনাবাসেও মুক্তি নেই। সকল উত্তরাধিকারী বংশধর এবং কাছের ও দূরের নিবেদিতপ্রাণ নওকরদের মন এই ভেবে অত্যন্ত বিচলিত হচ্ছিল যে, সিংহাসন ও মুকুটের উত্তরাধিকারীগণ আজ অসহায়-পরাধীন। তারা জুম'আর নামায ও শরঈ আহকাম বাস্তবায়নে সক্ষম নন। আগ্রার নিকট থেকে শূর নদীর উপকূল পর্যন্ত হিন্দুরা মন্দির তৈরী করছে। গো হত্যাকে নিষেধ করছে।'

অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সকল বিষয়ে রতন চান্দের স্বেচ্ছাচারিতায় –যে সাইয়িদ বংশধর ও কৃষক-ব্যবসায়ী গোষ্ঠী ব্যতিত কারও প্রতি দয়া করত না, ছোটবড় সকলেই বিতৃষ্ণ ছিল। প্রত্যেক অঞ্চলের অভিজাত সম্ভ্রান্তরা লাঞ্ছনা-গঞ্জনায় কালাতিপাত করত।

সিয়ারুল মুতাআখখিরিন রচয়িতা তবাতবাঈ লিখেন, 'বাদশা যেহেতু হীনমন্য কাপুরুষ একজন যুবক ছিলেন, ভোগ-বিলাসে মত্ত হয়ে কেবল সে কাজেই মনোযোগ দিতেন, যা একান্ত আবশ্যক হত। এ কারণে একটু একটু

করে প্রত্যেক সম্প্রদায়ের আমীর-উমারা ও নেতৃবৃন্দ এবং জনসাধারণের মন-মানস থেকে তার ভয়-ভীতি উঠে যায়। প্রত্যেকেই তার মন-মস্তিষ্কে একটি দৃঢ় ইচ্ছা নিয়ে স্বস্থানে বসে। তারা নিজের স্বাধীনতা ও স্বাধিকারের শ্বাস গ্রহণ করত।'

সে সময় দরবার ও রাজন্যবর্গের মধ্যে নিযামুল মুলক আসিফ জাহেরই এমন ব্যক্তিত্ব ছিলেন, যিনি দৃঢ়চিত্ত ও উচ্চ সাহসী হওয়ার সাথে সাথে ক্ষমতাসীন বাদশার বাধ্যগত, কৃতজ্ঞ, একনিষ্ঠ ও হিতাকাঙ্ক্ষী ছিলেন। কিন্তু সাইয়িদ ও ইরানী শক্তি কিছুতেই তার কথা ও নির্দেশ বাস্তবায়িত হতে দিত না। তিনি যখন দেখলেন, তার কৃতজ্ঞতা ও একনিষ্ঠতার কোনও মূল্য নেই। এখানে থাকা মানে সময় নষ্ট করা এবং সর্বদা নিজেকে বিপদাক্রান্ত রাখার নামান্তর, তখন তিনি দক্ষিণাত্যের পথ ধরেন। ফলে দিল্লীর মাঠ স্বার্থপরদের জন্য খালি হয়ে যায়।

এরপর মুহাম্মদ শাহের উপর বিলাসিতা এতই প্রাধান্য পায় যে, তিনি তার পূর্ববর্তী বিলাসপ্রিয়দেরকে ডিঙিয়ে যান এবং তাদের ঘটনাবলিকেও ম্লান করে দেন। ভারতবর্ষের ইতিহাস রচয়িতাগণ লিখেন,

'সম্রাট মুহাম্মাদ শাহ ধর্ম তো পরিবর্তন করেননি, কিন্তু পানি পানের স্থান বা মতাদর্শ বদলে ফেলেন। কালো মেঘ তার ঘোষক সাব্যস্ত হয়। সাধারণ নির্দেশ ছিল, এদিকে হিমালয়ের পাদদেশ থেকে সুর উঠবে। মেঘ গর্জন করবে, আমার তাবু মরুপ্রান্তরে রওনা হবে।'

অবশেষে সাইয়িদ বংশধর আমীরুল উমারা সাইয়িদ হুসাইন এবং কুতবুল মালিক নবাব আবদুল্লাহ খান (হাসান আলী খান) -এর নেতৃত্বের পরিসমাপ্তি এবং ভবলীলা সাঙ্গ হয়। কিন্তু এতেও মোঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্য বদলায়নি। কারণ, বাদশা শাসনকার্যের যাবতীয় যোগ্যতা ও বিপদ-বিপর্যয় উপলব্ধির ন্যূনতম জ্ঞান থেকেও বঞ্চিত ছিলেন।

সাইয়িদ হাশেমী ফরিদাবাদী 'তারীখে হিন্দ' গ্রন্থে লিখেন, 'বাদশার নিয়ন্ত্রক সাইয়িদ বংশের যবনিকাপাত আর মুহাম্মদ শাহের শক্তি ও স্বাধিকার লাভের ফলে গোটা রাজ্যে ব্যাপকভাবে আনন্দ-উল্লাস করা হয়। কিন্তু এই আনন্দ বাদশা পূজার আগ্রহে ছিল না বরং ভবিষ্যতে আইন-শৃঙ্খলার উন্নতি এবং রাষ্ট্রীয় সুখ-শান্তি ও জনকল্যাণের প্রত্যাশার উপর নির্ভরশীল ছিল। তবে এর বাস্তব পরিণতিও দুঃখ ও হতাশা ছাড়া আর কিছুই ছিল না। কারণ, আকবর ও আওরঙ্গজেবের নতুন উত্তরাধিকারীগণ মূলতঃ তাদের গৌরবময় ও সৌভাগ্যবান পূর্বপুরুষদের বাদশাসুলভ গুণাবলি শূন্য ছিল। ব্যক্তিগত ভোগ-বিলাসের উন্মত্ততার মাঝে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে মনোনিবেশের অবকাশই ছিল না

তাদের। রাজত্বের অবস্থা সম্পর্কে সে রাজমহলের বেগমদের থেকেও অধিক উদাসীন এবং রাজ্যের অনিষ্টতার প্রতি ভ্রুক্ষেপহীন ছিল। এমনকি তার দাদি (শাহ আলম বাহাদুর শাহের রাজরাণী মেহের পরওয়ার) সম্পর্কে জানা যায়, তিনিও তার জ্ঞানশূন্য মাতাল নাতিকে বারবার এই আলস্য ও উদাসনিদ্রা থেকে জাগানোর চেষ্টা করতেন, যার সুস্পষ্ট পরিণতি ছিল পতন ও লাঞ্ছনা।

এখানে আমাদেরকে যদুনাথ সরকারের সেই ভাষ্য লক্ষ্য রাখতে হবে, যা তিনি মুহাম্মদ শাহের দুর্বলতাগুলোর পর্যালোচনায় লিখেছেন। তিনি লিখেন, "মুহাম্মদ শাহ যদিও সম্মান পাওয়ার উপযুক্ত নন, তবে দয়া পাওয়ার দাবীদার। পরিস্থিতি তাকে এমন পর্যায়ে এনে দাঁড় করিয়েছিল, যেখানে প্রয়োজন ছিল একজন ধীমান ব্যক্তিত্বের। কিন্তু তিনি ছিলেন একজন সাধারণ মানুষ। ঐতিহাসিকগণ তাকে অভিযুক্ত করে বলেন, তিনি রাষ্ট্রীয় কাজকর্ম আঞ্জাম দেওয়ার পরিবর্তে বিলাসিতায় নিজের সময় ব্যয় করেছেন। কিন্তু অবস্থা এতটাই শোচনীয় ছিল যে, তার মত মানুষ যদি রাষ্ট্রীয় কাজকর্মে পুরোপুরি মনোযোগও দিতেন, তথাপি তিনি অবস্থার উন্নতি বা পরিস্থিতির মোড় ঘুরাতে পারতেন না। রফীউদ্দারাজাত ও রফীউদ্দৌলাহ্র ন্যায় মানুষ কাঠের পুতুলের মত নিজের ব্যক্তিত্বেও অনুভূতিশূন্য ছিলেন। কিন্তু মুহাম্মদ শাহের মধ্যে সকল দূরাবস্থা এবং সেসব সংশোধনে নিজের অসহায়ত্ব দুটিরই উপলব্ধি ছিল।"

মোটকথা, যেই রাজত্ব সম্রাট বাবরের বিশ্বজয়ের সংকল্প এবং তার দৃঢ়তা ও পরিশ্রমের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যাকে তার যোগ্য উত্তরসূরীগণ বাদশা আওরঙ্গজেব পর্যন্ত তার বীরত্বের রত্ন ও তৈমুরী মূল্যবোধের সাথে কায়েম রেখেছিলেন, তা এমন চরম ভোগ-বিলাস, উদাসীনতা ও আত্মবিস্মৃতির স্তরে নেমে আসে, যা উত্তরাধিকার লব্ধ ও লাগামহীন রাজত্বের ইতিহাস বরং ভাগ্য হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইকবাল যথার্থই বলেছেন,

میں تجھ کو بتاتا ہوں تقدیر امم کیا ہے۔

شمشیر وسناں اول طاؤس ورباب آخر۔

'আমি জাতির ভাগ্যের কথা তোমাকে কি শোনাব!

পূর্বপুরুষের বর্শা-তরবারী, পরবর্তীদের ময়ূর-বেহালা।'

অবশেষে পরিণতি তা-ই হয়েছে, যা স্বয়ং মুহাম্মদ শাহ شامت اعمال ما صورت نادر گرفت (পাপের পরিণতি নাদেররূপে পাকড়াও করেছে) বাগ্মীতাপূর্ণ বাক্যে ব্যক্ত করেছেন। হিজরী ১১৫১ সালে নাদের শাহ দিল্লী যাত্রা করেন। তিনি এর পূর্বে মুহাম্মদ শাহকে একাধিক পত্র লিখেছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিকের বর্ণনামতে, 'এখানে সেদিনগুলোতে চলছিল ভোগ-বিলাসের

তোড়জোর উন্মাদনা। মুহাম্মদ শাহ ছিলেন অধিপতি। আরাম-আয়েশ ছাড়া তার কাজের কাজ কিছুই ছিল না। সর্বক্ষণ হাতে ছিল মদ আর বগলের নিচে কুহকিনী। তখন কারই-বা মস্তিষ্ক ছিল চিঠির জবাব লেখার মত!

নাদের শাহের দিল্লী আক্রমণের বিস্তারিত বিবরণ ভারতবর্ষের ইতিহাস গ্রন্থাবলিতে পড়তে পারেন। তবে তার আক্রমণের পর দিল্লীর যে দুরাবস্থা হয়েছে, (উল্লেখ্য যে, সে সময় হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) -এর বয়স ছিল ৩৭ বছর এবং তিনি হিজায সফর থেকে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন) তার প্রতিচ্ছবি 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' রচয়িতার ভাষায় শুনুন-

'নাদের শাহের প্রস্থানের পর গোটা শহর ছিল মরদেহে ভরা আর জীবন্তদের থেকে খালি। ঘর-বাড়িগুলোতে বিরাজ করত ভূতুড়ে পরিবেশ। জনশূন্যতায় খাঁ-খাঁ করত চারদিক। মহল্লার পর মহল্লা ও গ্রামের পর গ্রাম জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে গিয়েছিল। দুর্গন্ধ বের হত লাশের স্তূপ থেকে। না কেউ ছিল কাউকে কাফন দেওয়ার আর না ছিল কেউ দাফন করার। মরে-পঁচে হিন্দু-মুসলমান একাকার হয়ে যায়। স্তূপে স্তূপে আসবাবপত্র জ্বলে পুড়ে চারিদিক হয়েছে ধূলিমলিন। এ তো ছিল শহরের অবস্থা। দরবারের অবস্থা ছিল আরও শোচনীয়, কিছুদিন তারা গভীর নিদ্রাবিভোর থাকে। আর যখন জেগে ওঠে, তখন তাদের চক্ষুযুগলে এত বেশি কেতুর লেগেছিল যে, দেখলে ঘৃণা হত।

ধনাগারে ছোলা বাদাম পর্যন্ত ছিল না। ট্যাক্স ও করের কোনও খবর ছিল না। ধ্বংস, বিরান ও বিভীষিকাময় অবস্থা ছিল সর্বস্থানে। তাছাড়া মারাঠীদের আতঙ্কও একেবারে দূর হয়নি। যেসব প্রদেশ তাদের দখলে চলে গিয়েছিল, সেগুলো তাদের হাতে ধ্বংস হয়েছিল। এসব বিপদ-আপদেও দরবারীদের বিবাদ মিটেনি। সেখানেই এক গ্রুপ ছিল তাওরানী আমীরদের, যাদের প্রধান ছিল আসিফ জাহ আর কমরুদ্দীন খান ছিল মন্ত্রী। দ্বিতীয় গ্রুপ ছিল সেসব আমীরদের, যারা তাদেরকে বহিষ্কার করতে চাইত। তাদের মধ্যে বাদশাও একজন ছিলেন। মধ্যখানে যদি মারাঠীদের বিবাদ বাঁধা হয়ে না দাঁড়াত, তাহলে সেসব আমীর রাজত্বকে খণ্ড-বিখণ্ড করে কবেই নিজেদের মধ্যে ভাগ-বণ্টন করে নিত! তৈমুর বংশের নাম-চিহ্ন পর্যন্ত মুছে ফেলত ধরাপৃষ্ঠ হতে।"

নাদের শাহ ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়ার পর তার প্রথম ধাক্কায় দিল্লীর রাজত্ব থেকে তিনটি সবুজ শ্যামল প্রদেশ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা পৃথক হয়ে যায় এবং সেসব অঞ্চলে আলীবর্দী খানের পৃথক এক রাজত্ব কায়েম হয়ে যায়।

২৬ রবিউস সানী ১১৬১ হিজরী (মোতাবেক এপ্রিল ১৭৪৮ খৃ.) সালে মুহাম্মদ শাহ ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। 'ভারতবর্ষের

ইতিহাস' রচয়িতার ভাষ্যমতে– তিনি ত্রিশ বছর রাজত্ব করে তৈমুর বংশকেই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়ে যান।

দ্বিতীয় শাহ আলম

মুহাম্মদ শাহের শাসনামলেই মোঘল শাসনের চারিত্রিক, নৈতিক ও ব্যবস্থাপনার দিক থেকে পতন হয়ে গিয়েছিল। ভারতীয় সমাজ ও আমীর ধনিক শ্রেণীর মানসিকতা الناس على دين ملوكهم (মানুষ তাদের রাষ্ট্রীয় ধর্মানুসারী হয়) মূলনীতি অনুযায়ী ভোগ-বিলাস, আরামপ্রিয়তা ও কৌতুক-বিনোদনের দিকে দ্রুত ঝুঁকে পড়ে। আর দ্বিতীয় শাহ আলমের শাসনামলে যিনি ১১৭৩ হিজরীতে (১৭৫৯ খৃ.) সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন, রাজনৈতিকভাবে এ রাজত্ব পতনের শেষ সীমায় পৌঁছে যায়। তিনি তার ৪৭ বছরের শাসনামলে অন্যের হাতের পুতুল হয়ে থাকেন। বক্সারের যুদ্ধে উদের নবাব শুজাউদ্দৌলার মন্ত্রী এবং মীর কাসেম ইংরেজদের হাতে পরাজিত হওয়ার পর ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে শাহ আলম ইংরেজদের আনুগত্য স্বীকার করে নেন এবং একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করে ফেলেন। যার ভিত্তিতে তিনি ইংরেজদের বেতনভোগী হয়ে যান। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দে তিনি ইংরেজদের সাথে আরও একটি চুক্তি করেন। ফলে বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার অর্থ মন্ত্রণালয়ের রাজস্ব আদায়ের অধিকারসমূহ ও ব্যবস্থাপনা ইস্ট-ইন্ডিয়া কোম্পানীর হাতে চলে আসে। শাহ আলম নিজেকে মারাঠীদের আশ্রয়ে সমর্পণ করেন। আর এলাহাবাদ ও আযমগড় জেলাসমূহ তাদের কাছে হস্তান্তর করে দেন।

দ্বিতীয় শাহ আলমের অনেক পূর্ব হতেই গোটা দেশ মারাঠী, শিখ আর দিল্লী, আগ্রা ও রাজপুত জাঠদের দয়া-করুণায় টিকে ছিল। যারা প্লাবনের মত আসত এবং গোটা এলাকা লুটতরাজ করে চলে যেত। দেশে কোন শক্তিই শান্তি ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষায় সক্ষম ছিল না। আহমদ শাহ আবদালী ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপতের ময়দানে মারাঠীদের পরাজিত করে দেশকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করেন। তিনি শাহ আলমকে দিল্লী ডেকে আনার আপ্রাণ চেষ্টা করেছেন। তার কাছে নিজের লোক পাঠিয়েছেন। বাধ্য হয়ে তার মা নবাব যিনাতমহলকে দিয়েও পত্র লিখিয়েছেন। যদি মোঘল সাম্রাজ্যে সামান্যও প্রাণ আর শাহ আলমের মধ্যে রাজত্ব করার ন্যূনতম যোগ্যতাও থাকত, তাহলে তিনি পানিপতের যুদ্ধ থেকে ফায়দা লুটে ভারতবর্ষে নিজের নেতৃত্ব সুসংহত করে নিতেন। কিন্তু মোঘল রাজত্ব নিষ্প্রাণ তো ছিলই আর বাদশা কেবল ভীরু-কাপুরুষই নয়, আত্মসম্ভ্রম ও আত্মমর্যাদাবোধ থেকেও শূন্য ছিল। আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

حمیت نام ہے جس کا، گئی تیمور کے گھر سے۔

'আত্মসম্ভ্রম যাকে বলে, তৈমুর বংশ থেকে তা বিদায় নিয়েছিল।'

বাদশা পূর্ণ দশ বছর পর (১৭৭১ খৃ.) এলাহাবাদ, দিল্লী ফিরে আসেন। সময় পেরিয়ে গিয়েছিল। কাজেই তিনি পানিপতের এত বড় বিজয় ও মারাঠীদের পরাজয়ে কোনও ফায়দা লাভ করতে পারেননি। এখানে এসে তিনি আরও নতুন নতুন সমস্যা-সংকট, আমীরদের দৌরাত্ম্য, রোহিঙ্গাদের নতুন শক্তি এবং শিখদের আক্রমণে জর্জরিত হয়ে পড়েন। অবশেষে নাজীবুদ্দৌলার নাতি গোলাম কাদের রোহিঙ্গা ১৭৮৮ খৃস্টাব্দে দিল্লী দখল করে নেয়। লুট করে নেয় রাজমহল। রাজকন্যাদের বেত্রাঘাত করে এবং তৈমুরী সাম্রাজ্যের উত্তরসূরী মোঘল সম্রাটের চক্ষু বর্শা-ছুরির মাথা দিয়ে খুঁচিয়ে উপড়ে ফেলে। মোঘল সাম্রাজ্য ও এর উত্তরাধিকারীদের এরূপ বেইজ্জতী ও অসম্মান ইতোপূর্বে আর কখনও হয়নি।

১৭৮৯ খৃস্টাব্দে সিন্ধীয়াহ গোলাম কাদেরকে বড় নৃশংস ও নির্মমভাবে হত্যা করে এবং শাহ আলমকে পুনরায় সিংহাসনে বসায়। তার উপর নয় লাখ রুপি বাৎসরিক ট্যাক্স নির্ধারণ করে। একাধিক যুদ্ধ-বিগ্রহের পর ১৮০৩ খৃস্টাব্দে লর্ড লেক ইংরেজ সৈন্যসহ দিল্লী প্রবেশ করে। বিতাড়িত করে মারাঠীদের। আর বাৎসরিক এক লাখ রুপি বাদশাহর ভাতা নির্ধারণ করে দেয়। শাহ আলম ৪৫ বছর সিংহাসনে আসীন আর ১৮ বছর অন্ধ অবস্থায় কাটিয়ে ১৮০৬ খৃস্টাব্দে অনন্ত পথের যাত্রী হন।

শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতার অবস্থা

রাজনৈতিক বিক্ষিপ্ততা, সামাজিক বিশৃঙ্খলা-বিপর্যয় ও অধঃপতন সত্ত্বেও এ যুগ ছিল ব্যক্তিগতভাবে শিক্ষাগত যোগ্যতা, দক্ষতা, সাহিত্য ও কাব্যচর্চা, আধ্যাত্মিক ধ্যান-তন্ময়তা, আত্মিক উন্নতি ও আত্মশুদ্ধির যুগ। তখন এমন বহু সুযোগ্য ও স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব জন্ম নিয়েছেন, যাদের এই বিপর্যস্ত যুগের সাথে কোনও সম্পৃক্ততা ছিল না। যাদের উপর অবস্থা-পরিস্থিতির কারণে হতাশা ও ভীতির কোন ছাপ পরিলক্ষিত হত না। কথিত আছে, শিক্ষা ও সাহিত্য জগতের অসংখ্য অশ্বারোহী এসব ব্যক্তিত্বের সফল চেষ্টা-সাধনার ফসল, যারা ছিল কোন পুরনো রোগে আক্রান্ত কিংবা দুর্বলতা, অসহায়ত্ব ও ভেতরগত মনোকষ্টের শিকার। মনস্তাত্ত্বিকগণ এর ব্যাখ্যায় বলেন, এমতাবস্থায় প্রতিরোধ ক্ষমতা ও এই অসহায়ত্বের প্রতিকারের সংকল্প জেগে উঠে আর মানুষ তখন এমন কাজ করে ফেলে, যা সাধারণ অবস্থায় সম্ভব হয় না। ভারতবর্ষের এ যুগের শিক্ষা ও

আধ্যাত্মিকতা এবং এই বিপর্যস্ত যুগে এমন জ্ঞানী-গুণী ব্যক্তিবর্গের বহিঃপ্রকাশ একটি রুগ্ন ও পতনোন্মুখ সমাজের অভ্যন্তরীণ প্রতিরোধ শক্তির স্বাক্ষর এবং ইসলামের মানুষ গড়ার যোগ্যতার প্রমাণ। জ্ঞানের গভীরতা, বুদ্ধিমত্তা, অধ্যাপনা শক্তি ও চমৎকার লিখনীর দিক থেকে আমরা সে যুগে মাওলানা আহমদ ইবনে আবু সাঈদ ওরফে মোল্লা জুয়ূন আমীঠবী (১০৪৭ হি.-১১৩৫ হি.) নূরুল আনওয়ার ও তাফসীরে আহমদী রচয়িতা মোল্লা হামিদুল্লাহ সিন্ধীলবী (মৃত্যু ১১৬০ হি.), শরহে সুল্লাম রচয়িতা ওরফে হামিদুল্লাহ, সুল্লাম রচয়িতা মাওলানা মুহাম্মদ হাসান ওরফে মোল্লা হাসান (মৃত্যু ১৯৯৯ হি.), মাওলানা রুস্তম আলী কনূজী (মৃত্যু ১১৭৮ হি.), শায়খ সিফাতুল্লাহ খায়রাবাদী (মৃত্যু ১১৫৭ হি.), শায়খ আলী আসগর কনূজী (মৃত্যু ১১৪০ হি.) মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলগারামী (১১১০ হি.-১২০০ হি.), মাওলানা গোলাম নকশবন্দী লাখনৌবী (মৃত্যু ১১২৬ হি.) কারী মুহিব্বুল্লাহ বিহারী (মৃত্যু ১১১৯ হি.), সুল্লামুল উলূম ও মুসাল্লামুস সুবূত রচয়িতা (যিনি প্রায় এক শতক পর্যন্ত ভারতবর্ষের আলেম-উলামা ও অধ্যাপকদেরকে এ দু'টি গ্রন্থের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ও টীকা-টিপ্পনীতে ব্যস্ত রেখেছেন এবং যার রচিত গ্রন্থাবলি মিসরীয় আলেম ও আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মনোযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু হয়ে রয়েছে) কাযি মুবারক গোপামবী (মৃত্যু ১১৬২ হি.), শরহে সুল্লাম রচয়িতা ওরফে কাযি মাওলানা মুহাম্মদ আলা থানবী, কাশ্শাফে ইস্তিলাহাতে কুনূন (শাস্ত্রীয় পরিভাষাসমূহের বিশ্লেষণ) -এর রচয়িতা (যেটি সংশ্লিষ্ট বিষয়বস্তুর উপর উপমাহীন রচনা) এবং সর্বপ্রথম ও সর্বশেষ মোল্লা নিযামুদ্দীন লাখনৌবী (মৃত্যু ১১৬১ হি.)। যার নির্বাচিত শিক্ষাক্রম ও শিক্ষাব্যবস্থা ভারতবর্ষ থেকে বুখারা-সমরকন্দ পর্যন্ত চালু ছিল। যাকে 'নুযহাতুল খাওয়াতির' রচয়িতা غيث الأفادة الهتون، العلم بالربع المسكون، استاذ الاساتذة وامام الجهابذة . উপাধিতে ভূষিত করেন। তাদের মত নির্মোহ, বিচক্ষণ, দূরদর্শী, দেশের গৌরব ও যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, অধ্যাপক, লেখক-গবেষক, যথার্থ শিক্ষাগত চেতনা, শিক্ষকতা ও দীক্ষাদানের ময়দানের ত্রাণকর্তা এই শতকেরই মনীষী ও মহাপুরুষদের মধ্যে ছিলেন।

সুলূক ও তরীকত তথা আধ্যাত্মিকতার ময়দানে লক্ষ্য করলে এই শতকে হযরত মির্যা জাঁনে জানা (১১৯১-১১৯৫ হি.) সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার মত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। যার সম্পর্কে স্বয়ং শাহওয়ালীউল্লাহ (র) সাক্ষ্য দিয়ে বলেন, 'সব যুগে এ ধরনের মহান বুযুর্গ খুব একটা পাওয়া যায় না। আর এমন ফিৎনা-ফাসাদ ও বিপর্যয়ের যুগে পাবে কোথায়?'

কাদেরিয়া সিলসিলার প্রসিদ্ধ বুযুর্গ এবং দরসে নেযামীর প্রতিষ্ঠাতা মোল্লা নিযামুদ্দীন -এর মুর্শিদ হযরত সাইয়িদ আবদুর রায্যাক বাঁসবী (মৃত্যু ১১৩৬ হি.), সিলসিলায়ে চিশতিয়ায়ে নিযামিয়াহর মুজাদ্দিস শাহ কালীমুল্লাহ জাহানাবাদী (মৃত্যু ১১৪০ হি.) এবং এই সিলসিলারই প্রকাশক ও ইমাম শাহ ফখরুদ্দীন ওরফে শাহ ফখরে দিল্লী (মৃত্যু ১১৯৯ হি.), সিলসিলায়ে কাদেরিয়ার প্রসিদ্ধ শায়খ শাহ মুহাম্মদ গাউস কাদেরী লাহোরী (মৃত্যু ১১৫৪ হি.), নকশেবন্দিয়াহ সিলসিলার কামিল শায়খ মুহাম্মদ আবিদ সান্নামী (মৃত্যু ১১৬০ হি.), খাজা মুহাম্মদ নাসির আন্দালিব খাজা মীর দরদ-এর পিতা (মৃত্যু ১১৭২ হি.), শাহ মনীবুল্লাহ বালাপুরী এবং হযরত শাহ নূর মুহাম্মদ বাদায়ূনী (মৃত্যু ১১৩৫ হি.) এ যুগে নির্ভরযোগ্য ব্যক্তিত্ব ও ত্রাতা। মোটকথা, এ যুগ ছিল তিন সিলসিলা তথা কাদেরিয়া, চিশতিয়া ও নকশেবন্দিয়ার প্রচার-প্রসারের যুগ। তিন সিলসিলারই বহু কামিল শায়খ বিদ্যমান ছিল সে সময়। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর ভাষ্য হচ্ছে,

'সম্রাট মুহাম্মদ শাহের শাসনামলে বিভিন্ন সিলসিলার পীর-মুর্শিদগণের সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী দিল্লীতে বাইশজন মহান বুযুর্গ বিদ্যমান ছিলেন। সাধারণতঃ এমন ঘটনা বিরল।'

চারিত্রিক ও সামাজিক অধঃপতন

কিন্তু এসব বিখ্যাত সুযোগ্য ব্যক্তিত্ব এবং রূহানী চিকিৎসক, কামিল শায়খগণের উপস্থিতি সত্ত্বেও ভারতবর্ষের মুসলিম সমাজ, বিশেষতঃ রাজত্বের আমীর শ্রেণীর প্রভাব, রাজনৈতিক পতন, সম্পদের প্রাচুর্য এবং ইরানী সভ্যতার প্রভাবে চারিত্রিক অধঃপতন চরম সীমায় পৌঁছে গিয়েছিল। এ কারণে সে শ্রেণী ঐ দায়িত্ব পালনে অক্ষম ছিল, প্রত্যেক যুগে রাজত্বের বিপ্লবের সময় আমীর শ্রেণী যা পালন করেছে। এ শ্রেণী থেকেই সেসব ব্যক্তিবর্গ আবির্ভূত হয়েছেন, যারা রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনার ময়দানে সৃষ্ট ঘাটতি ও শূন্যতাগুলো পূরণ করেছেন। সাইয়িদ হাশমী ফরিদাবাদী যথার্থই লিখেছেন, 'ভারতবর্ষের ধন-সম্পদের প্রাচুর্য স্বয়ং এই আমীর শ্রেণীকে অত্যাধিক বিলাসপ্রিয় ও আরামপ্রিয় বানিয়ে দিয়েছিল। আমরা সেসব আমীরের সকল চেষ্টা ও যোগ্যতা সামান্য স্বার্থের জন্য ষড়যন্ত্র ও শত্রুতায় ক্ষয় হতে দেখতে পাই। রাজত্বের বিপ্লব আর রাজত্ব লাভ তো দূরের ব্যাপার। কোন মুসলমান আমীরের স্ব স্ব স্থানে প্রকাশ্যে স্বাধিকারের ঘোষণা করারও সাহস হত না। আর এ যুগে একদিকে তো আইন-শৃঙ্খলার ভিতরগত ত্রুটি বেড়েই চলেছে। অপরদিকে শাসক শ্রেণীর লোকজন থেকে রাষ্ট্র পরিচালনা এবং সামাজিক কাজের যোগ্যতাই দিন দিন হ্রাস পাচ্ছে।

শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, 'নবাব কামরুদ্দীন খানের ঘরে মহিলারা শেষরাতের গোসল করত গোলাপ পানি দ্বারা। অপর নবাবদের ঘরে প্রতিরাতে তিনশ রুপির ফুল ও পান খরচ হত মহিলাদের জন্য।'

মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলগারামী 'মায়াছারুল কিরাম' গ্রন্থে লিখেছেন, আওরঙ্গবাদের লোকজন সকলেই একবাক্যে বর্ণনা করেন, আমীরুল উমারা (হুসাইন আলী খান)-এর শাসনামলে শহরের অধিকাংশ মানুষ নিজের ঘরে খাবার রান্না করত না। আমীরুল উমারার সরকারী বাবুর্চি তার অংশ বিক্রি করে দিত। আয়েসি পোলাওয়ের এক খাঞ্চা কয়েক পয়সায় মানুষ পেয়ে যেত।

আকীদাগত দুর্বলতা, শিরক-বিদ'আতের জোয়ার

এই সামাজিক ও চারিত্রিক অবক্ষয় থেকে অধিক ভয়াবহ, আল্লাহর নুসরাত থেকে বঞ্চিত এবং প্রকৃত শক্তি থেকে রিক্তকারী ক্রুটি হল, আকীদা-বিশ্বাসগত দুর্বলতা কুরআনে কারীমের ঘোষণা الا لله الدين الخالص অধিকাংশ মানুষের এর বিপরীত জীবন, মুসলিম সমাজে বিদ'আতের জোয়ার, হিন্দু ও শী'আদের নানা রুসম-রেওয়াজ ও অভ্যাসের অনুকরণ চলছিল। সুস্পষ্ট ও প্রকাশ্য শিরকের এমন একাধিক রূপরেখা বিভিন্ন স্থান ও শ্রেণীমহলে পাওয়া যেত, যেগুলোর বুদ্ধিদীপ্ত বা জ্ঞানগত কোনও ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। প্রকাশ্য কবরপূজা, মাশায়িখের জন্য সম্মানের সিজদা, বিভিন্ন মাজার ও তার আশপাশকে হারামাইনের মত সম্মান প্রদর্শন, কবরের উপর চাদর চড়ানো, মান্নত মানা, বুযুর্গদের নামের উপর কুরবানী করা, মাজার তাওয়াফ করা, সেখানে মেলার আসর বসানো, উৎসবের দিন ধার্য করা, নৃত্য-গীত করা আর সংক্ষিপ্ত কথায় এগুলোকে কিবলা কা'বা এবং শেষ আশ্রয় ও ঠিকানা মনে করা ইত্যাদিসহ এমন কোনও ঘটনা ও দৃশ্য ছিল না, যা দেখার জন্য অনেক দূরে যাওয়া ও দীর্ঘ অপেক্ষার প্রয়োজন হত। শায়খ সাদ্দূর বকরী, সাইয়্যেদ আহমদ কবীরের গাভী, গাজী মিয়ার ঝাণ্ডা ও লাঠি, মহররমের তাযিয়া, অনৈসলামিক অনুষ্ঠানগুলো জাঁকজমকের সাথে আয়োজন করা, রোগ-ব্যাধি দূর করার লক্ষ্যে পাপাত্মা ও দেও-দানবের সন্তুষ্টি কামনা ও ভয়, বসন্ত রোগের প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নেককার আউলিয়াদের জন্য মান্নত মানা ও কুরবানী করা, ওলী ও নেককার রমনীদের নামে রোযার নিয়ত করা এবং তাদের সাথে নিজের প্রয়োজন ও উদ্দেশ্য পূরণের বিষয়কে জুড়ে দেওয়া; এ ব্যাপারে বিশেষ দিন, বিশেষ খাবার (স্ত্রীর ছেহনাক, মাখদুম সাহেবের পথখরচ ইত্যাদি) এবং তাতে বিশেষ আদবের প্রতি যত্নবান থাকা।

এছাড়া এমনই আরও অনেক বিষয় রয়েছে, যার আওতায় নানা অলীক ধ্যান-ধারণা, ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, জাহেলী যুগের রুসম-রেওয়াজ এবং নানা বাধ্য-বাধকতা ও আবশ্যকীয়তার এক দীর্ঘ তালিকা রয়েছে। আলী বখশ, হুসাইন বখশ, পীর বখশ, মাদার বখশ নামগুলো ব্যাপক প্রচলিত ছিল।

এক বিশাল অঞ্চলে একত্ববাদের বিশ্বাস এ অর্থে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়েছিল যে, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তা'আলাই আকাশ-যমীন ও গোটা বিশ্বজগতের আসল সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনিই প্রকৃত উপাস্য। বড় বড় কাজ তিনিই আঞ্জাম দেন। কিন্তু তিনি জগতের বাদশাদের মত আপন রাজত্বের অনেক শাখা-প্রশাখা ও বিভাগীয় দায়িত্বভার তার গ্রহণযোগ্য বান্দাদেরকে অর্পণ করেছেন। যারা সেসবের মালিক ও স্বাধীন কর্তা। তারা তার ভাল-মন্দ দেখাশোনা করেন। এখন তাকে সন্তুষ্ট করা এবং তার সাথে সম্পর্ক কায়েম করা ব্যতিত এক্ষেত্রে কোনও সফলতা আসতে পারে না। আর শিরক মানে কেবল আল্লাহ ছাড়া অপর কোনও সত্তাকে এই দুনিয়ার সৃষ্টিকর্তা, রক্ষাকর্তা ও প্রকৃত মালিক মনে করা। তাদেরকে সরাসরি ইবাদত ও সিজদার (মাধ্যম ও শাফা'আতকারী হিসেবে নয়) উপযুক্ত মনে করা।

মোটকথা, বার শতকের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, আইন-শৃঙ্খলা, চারিত্রিক ও আকীদাগত দিক থেকে চরম অধঃপতন ও বিপর্যয়ের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল, যা ছিল ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর পতন এবং মুসলিম সমাজের অধঃপতনের ভয়াবহ ও বিভৎস চিত্র। মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী (র) এই সামগ্রিক অবস্থাচিত্র তার এক প্রবন্ধে অত্যন্ত সারগর্ভ ও উচ্চাঙ্গের ভাষায় তুলে ধরে লিখেন,

'মোঘল সাম্রাজ্যের সূর্য ছিল অস্তাগত। মুসলমানদের মধ্যে রুসম-রেওয়াজ ও বিদ'আতের জোয়ার বইছিল। ভণ্ড-প্রতারক ফকীর-দরবেশ ও মাশায়িখগণ তাদের বুযুর্গদের খানকাগুলোতে আসন পেতেছিল। প্রদীপ জ্বালিয়ে বসেছিল নিজ নিজ পীরদের মাজারে। মাদরাসাগুলোর কোণায় কোণায় যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনের হাঙ্গামায় হুলস্থুল কাণ্ড ঘটত। ফিকাহ ও ফাতওয়ার বাহ্যিক অর্চনা প্রত্যেক মুফতীরই অভীষ্ট ছিল। ফিকহী মাসায়েল গবেষণা ও মাযহাবের তত্ত্বানুসন্ধান সবচেয়ে ছিল বড় অপরাধ। আওয়াম তো আওয়ামই, বিশিষ্ট লোকজন পর্যন্ত কুরআনে কারীমের অর্থ-মর্ম এবং হাদীসের বিধি-বিধান ও ইংগিতসমূহ এবং ফিকহের সূক্ষ্মতা ও উপকারিতা সম্পর্কে ছিল বেখবর।'

তৃতীয় অধ্যায়

শাহ্ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষ ও সম্মানিত পিতা

শাহ্ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষ

শাহ সাহেব (র)-এর পূর্বপুরুষগণের যুগ (যারা শায়খ শামসুদ্দীন মুফতীর যুগ থেকে রুহিতক শহরে অবস্থানরত) ভারতবর্ষের শিক্ষা ও লিখনী-সাহিত্যে ইতিহাসের সেই যুগ, যখন এখানে স্মারক রচনা, জীবনী লেখা ও ভাষান্তরের যুগ ব্যাপকভাবে শুরু হয়নি। অধিকাংশই ছিল বিখ্যাত মাশায়িখে তরীকতের ব্যক্তিগত স্মারক। তন্মধ্যে মাহবুবে এলাহী সুলতানুল মাশায়িখ খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়ার স্মারক আমীর খোর্দ রচিত 'সিয়ারে আউলিয়া' বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ। নতুবা ছিল সমসাময়িক সালেহীন ও মাশায়িখে কিরামের মিশ্রিত সংকলন। তন্মধ্যে দুটি গ্রন্থ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। একটি শাহ মুহাম্মদ ইবনে হাসান গাউসী মান্দবীর 'গোলজারে আবরার', যাতে বেশিরভাগ আলোচনা রয়েছে তরমাণ্ড ও মালোহ এলাকার সালেহীন ও মাশায়িখদের। দ্বিতীয়তঃ হযরত শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর 'আখবারুল আখইয়ার'। এমন সুযোগ্য ও প্রসিদ্ধ ব্যক্তিবর্গের স্মারক গ্রন্থের অভাব ছিল, যাতে থাকবে বিভিন্ন বংশের বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ কিংবা কোনও অঞ্চলের বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের পরিচিতি ও আলোচনা (যারা কোন সিলসিলার প্রতিষ্ঠাতা বা তার গুরুত্বপূর্ণ কোনও ব্যক্তি ছিলেন না)। এসব স্মারকেও অলৌকিকভাবে কেন্দ্রীয় বা আঞ্চলিক রাজধানী ও তার আশপাশ এবং ভারতবর্ষের কেন্দ্রীয় ও ঐতিহাসিক শহরগুলোর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিত্বের আলোচনা বেশি রয়েছে। যাদের অবস্থাবলি ও যোগ্যতা সম্পর্কে জানা সহজলভ্য ছিল। শাহ সাহেবের বংশ শায়খ শামসুদ্দীন মুফতীর সময় থেকে বুযুর্গ দাদা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন পর্যন্ত রুহিতক বসবাস করেন। যার এই কেন্দ্রীয়তা ও গুরুত্ব ছিল না। এজন্য সেসব স্মারক ও জীবনীগ্রন্থে তাদের অবস্থা ও ঘটনাবলি ব্যাপক আকারে পাওয়া যায় না।

এ অধ্যায় সম্পূর্ণ তৃষ্ণার্ত এবং শাহ সাহেব (র)-এর জীবনী লেখক কিংবা তার বংশের ইতিহাস রচয়িতাদের কঠিন সমস্যায় পড়তে হত, যদি স্বয়ং শাহ সাহেব তার পূর্বপুরুষগণের জীবন সম্পর্কে 'ইমদাদ ফী মা'আছারিল আজদাদ' নামে একটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা রচনা না করতেন। তাতেও প্রবীণ পূর্বপুরুষদের আলোচনা ও জীবনী অত্যন্ত সংক্ষিপ্ততার সাথে এবং পিতামহ শায়খ

ওয়াজীহুদ্দীনের (সময়ের নিকটবর্তিতা ও মাধ্যম স্বল্পতার দরুণ) আলোচনা অপেক্ষাকৃত ব্যাখ্যা করেছেন। সেসব ইশারা-ইংগিতকে সামনে রেখে 'হায়াতে ওয়ালী' -এর লেখক মাওলানা হাফিজ মুহাম্মদ রহীম বখশ দেহলভী স্বকীয় রচনাশৈলীতে তার দক্ষ হাতে অনেক বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যা গ্রন্থটির ১১৩ পৃষ্ঠাব্যাপী বর্ণিত হয়েছে। তিনি শাহ সাহেবের এই মৌলিক জীবনালেখ্য (যা সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য ও আস্থাপূর্ণ উৎস) অন্যান্য সমকালীন ইতিহাস ও বইপুস্তক থেকে যেসব বিষয়বস্তু বৃদ্ধি করেছেন, সেখানে পৃষ্ঠাগুলো ছিল ভিন্ন; কিতাব এবং রচয়িতার নামও কোথাও ছিল না। এজন্য আমরা কেবল 'মা'আছারুল আজদাদ' এর উপরই নির্ভর করব।

বংশ পরিক্রমা

শাহ সাহেব ছিলেন ফারুকী বংশের। উক্ত পুস্তিকার শুরুতে তিনি তার বংশ পরিক্রমাকে হযরত উমর (রা) পর্যন্ত লিখেছেন। শামসুদ্দীন মুফতী এই বংশের মধ্যে সর্বপ্রথম রুহিতক এসে বসতি স্থাপন করেন। তার এক ভাই ছিল সালার (সৈনিক) হিসামুদ্দীন। তার সন্তানদের মধ্যে শাহ আরযানী বাদায়ূনী নামে একজন বুযুর্গ ছিলেন। তার বংশতালিকা থেকেও এর সত্যতা পাওয়া যায়। এখানে সেই বংশপরিক্রমা হুবহু লিখা হচ্ছে–

শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইবনে শায়খ আবদুর রহীম ইবনে শহীদ ওয়াজীহুদ্দীন ইবনে মু'আযযম ইবনে মানসুর ইবনে আহমদ ইবনে মাহমূদ ইবনে কিওয়ামুদ্দীন ওরফে কাযী কাযিন ইবনে কাযী কাসেম ইবনে কাযী কবীর ওরফে কাযী বুদ্দাহ ইবনে আবদুল মালিক ইবনে কুতুবুদ্দীন ইবনে কামালুদ্দীন ইবনে শামসুদ্দীন মুফতী ইবনে শের মালিক ইবনে মুহাম্মাদ আতা মালিক ইবনে আবুল ফাতাহ মালিক ইবনে উমর হাকিম মালিক ইবনে আদিল মালিক ইবনে ফারুক ইবনে জারজীস ইবনে আহমদ ইবনে মুহাম্মদ শাহরিয়ার ইবনে উসমান ইবনে মাহান ইবনে হুমায়ূন ইবনে কুরাইশ ইবনে সুলাইমান ইবনে আফফান ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে আবদুল্লাহ ইবনে উমর ইবনুল খাত্তাব (রা)।

এই বংশ তালিকায় কারও নামের সাথে 'মালিক' উপাধি এসেছে। শাহ সাহেব লিখেন, প্রাচীন যুগে এটি সম্মানসূচক উপাধি ছিল। যেমন আমাদের যুগে 'খান'।

এ বংশের ভারতবর্ষ আগমন

শাহ সাহেবের বর্ণনা মতে তার বংশের প্রথম যে বুযুর্গ ব্যক্তি রুহিতক এসে বসতি স্থান করেছেন, (আর সম্ভবতঃ তিনিই ভারতবর্ষে প্রথম আগমন

করেছেন) তিনি শামসুদ্দীন মুফতী। এসব মাধ্যম ও অধঃস্তন পুরুষের সংখ্যা এবং তাদের জন্মগত ও আনুমানিক বয়সের হিসাব থেকে বুঝা যায়, শায়খ শামসুদ্দীন মুফতী সপ্তম হিজরী শতকের শেষে অষ্টম শতকের প্রথমভাগে ভারতবর্ষে আগমন করে, যখন তাতারীদের আক্রমণে মুসলিম বিশ্বের পূর্বাঞ্চল তছনছ, বংশ-পরিবারগুলোর ইজ্জত-সম্মান ভূলুণ্ঠিত, তাদের শিক্ষাগত অর্জন লুটপাট এবং ইরান ও তুর্কিস্থানের বিখ্যাত শহর লুটতরাজ ও দেউলিয়া হচ্ছিল।

তারীখে ফিরোজ শাহী এবং অন্যান্য ইতিহাস থেকে জানা যায়, এ যুগেই ইরাক-ইরান ও তুর্কিস্থানের অভিজাত-সম্ভ্রান্ত পরিবার এবং জ্ঞানী-গুণী সম্প্রদায়গুলো ব্যাপক হারে ভারতবর্ষে আগমন করে। যেখানে ছিল তুর্কি বংশোদ্ভূত মুসলিম সম্প্রদায়ের শাসন। যারা হিংস্র তাতারীদেরকে 'তুর্কির সাথে তুর্কি জবাব' দিয়ে ভারতবর্ষের সীমান্ত থেকে পিছপা হতে বাধ্য করেন। তারা এই দেশকে না শুধু তাদের লুটতরাজ থেকে রক্ষা করেছেন বরং নিজের ধর্ম পরিপালন ও জ্ঞানের পৃষ্ঠপোষকতার জন্য দারুল উলূম ও একটি বিশ্বমানের প্রশস্ত মাদরাসা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। সেখানে আরো ছিল স্থানে স্থানে শিক্ষানিকেতন, আল্লাহর স্মরণ ও আত্মশুদ্ধির কেন্দ্র এবং কলম সৈনিক ও গবেষকদের জন্য স্বস্তি ও প্রশান্তির সাথে কাজ করার পর্যাপ্ত সুযোগ।

রুহিতক অবস্থান

ধারণা করা হয় এবং শাহ সাহেবের বর্ণনা দ্বারাও এটা প্রকাশ পায় যে, রুহিতক সে সময়কার নতুন ইসলামী রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর এবং পশ্চিমা দেশ থেকে দিল্লী আগমনকারী ইসলামী সেনাবাহিনী, মুজাহিদ, ইসলামের দাঈগণ, মাশায়িখ ও উলামায়ে কিরামের দিল্লীর পথে গুরুত্বপূর্ণ একটি মনযিল ও বিশ্রামস্থল ছিল।

শাহ সাহেব (র) বলেন, কুরাইশ বংশোদ্ভূত যে ব্যক্তিত্ব ও মহান বুযুর্গ প্রথম এই শহরে আগমন করেন এবং যার কারণে ইসলামী নিদর্শনের বিজয় আর কুফর ও বর্বরতার পতন হয়, তিনি ছিলেন শায়খ শামসুদ্দীন মুফতী। শাহ সাহেব তার কিছু কারামতের কথাও বর্ণনা করেছেন, যা তাঁর বুযুর্গী ও সে যুগের অবস্থা-প্রেক্ষিতে বিস্ময়ের কিছু ছিল না। সে যুগে যেসব জ্ঞানী-গুণী ও ব্যক্তিত্ববান মুসলমান এ শহরে বসবাস করতেন, তাদের কাঁধে বিচার ও হিসাবরক্ষণের পদ এবং শহরের আইন-শৃঙ্খলার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হত। কিন্তু সে যুগে তাদেরকে বিচারক এবং হিসাবরক্ষক বলে ডাকা হত না।

শায়খ শামসুদ্দীন থেকে শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন

শায়খ শামসুদ্দীন মুফতীর ইন্তিকালের পর তার সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বুযুর্গ ব্যক্তি ছিলেন কামালুদ্দীন মুফতী। তারপরে তার পুত্র কুতুবুদ্দীন, তার পরে তদীয় পুত্র আবদুল মালিক সেসব মর্যাদার আসনে সমাসীন হন এবং সেসব দায়িত্বভার পূর্ণ করে যান। এসব হযরতের পরে এ বংশেই বিচারক নিয়োগ হতে থাকে। শায়খ আবদুল মালিকের পুত্র কাযী বুদ্দাহ স্বীয় বংশের এই ধারাবাহিকতা ও পদমর্যাদা বজায় রাখেন। তার দুই সন্তান থেকে তার বংশধারা চালু থাকে। এ বংশের বিবাহ হয় রুহিতকের সিদ্দীক এবং সোনাপতের সাইয়িদ বংশে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) -এর পঞ্চম পূর্বপুরুষ এবং বিচারকের পদে থেকে রাজত্বের মসনদ রক্ষাকারী শায়খ মাহমূদের বিয়ে হয় সোনাপতের সাইয়িদ বংশে। যার ঘরে জন্ম নেয় এক পুত্র শায়খ আহমদ। তিনি শৈশবকালেই রুহিতক ত্যাগ করেন এবং শায়খ আবদুল গণী ইবনে শায়খ আবদুল হাকীমের সঙ্গে সোনাপতে বসবাস করতে থাকেন। শায়খ আবদুল গণী (র) তার সঙ্গে নিজ কন্যাকে বিয়ে দিয়ে দেন এবং দীর্ঘদিন পর্যন্ত তাদের লালন-পালন করেন। এরপর তিনি রুহিতক প্রত্যাবর্তন করেন। ঘর তৈরী করেন দূর্গের বাইরে। সমবেত করেন শুভাকাঙ্ক্ষী প্রিয়জনদের। তার পুত্র শায়খ মানসুর ছিলেন বীরত্বের মর্যাদা ও শাসকের গুণের অধিকারী। তার প্রথম বিয়ে হয় শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে শায়খ আবদুল গণী (র)-এর কন্যার সাথে। তার পুত্র শায়খ মু'আযযম ছিলেন বিখ্যাত, প্রভাবশালী ও সম্মানিত বুযুর্গ। বীরত্বের মহান রত্নের অধিকারী। তার থেকে অনেক বিস্ময়কর ঘটনা প্রকাশ পেয়েছে।

শাহ সাহেব (র) স্বীয় পিতা শাহ আবদুর রহীম (র)-এর ভাষ্য বর্ণনা করে লিখেন, জনৈক রাজার সঙ্গে শায়খ মানসূরের যুদ্ধ হয়। সৈন্যবাহিনীর ডান অংশ শায়খ মু'আযযমের নেতৃত্বে অর্পণ করা হয়। সে সময় তার বয়স ছিল বার বছর। কঠিন যুদ্ধ হয়। উভয়পক্ষের অনেক লোক মৃত্যুবরণ করে। ইত্যবসরে শায়খ মু'আযযমের কাছে এসে কেউ একজন বলেন, তার পিতা শায়খ মানসুরপুরী শাহাদাতের অমীয় সুধা পান করেছেন এবং ইসলামী সৈন্যবাহিনী পরাজিত হয়েছে। এ কথা শুনে তার ইসলামী মূল্যবোধ এবং ফারুকী চেতনায় নাড়া দিয়ে ওঠে। তিনি নির্ভীকভাবে শত্রুসেনাদের ভিতরে ঢুকে পড়েন। কাতারের পর কাতার তছনছ করে অত্যন্ত কষ্টের পরে রাজার হাতি পর্যন্ত পৌঁছে যান। একজন শক্তিধর শত্রু সেনাপতি সম্মুখে এগিয়ে আসে। তিনি তরবারীর এক আঘাতে তাকে দ্বিখণ্ডিত করে ফেলেন। তার

সঙ্গীরা শায়খ মু'আযযমকে তার ঘোড়া থেকে নিচে নামিয়ে ফেলে। লোকজন ঘিরে ফেলে তাকে। রাজা সবাইকে ধমকান এবং নিবৃত করেন। বলেন, এমন একজন তরুণ এত বড় বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখালো, এতো যুগের মহাবিস্ময়! রাজা তাঁর দু'হাত টেনে চুমু খান এবং অত্যন্ত সম্মানের সাথে ছেড়ে দেন। জানতে চান, এত রাগ কেন? তিনি জবাব দিলেন, আমি জানতে পেরেছি আমার মুহতারাম পিতা শহীদ হয়ে গেছেন। আমি মনস্থ করেছি, আক্রমণ করব এবং শত্রুপক্ষের সেনাপতিকে বধ না করা পর্যন্ত নিঃশ্বাস ফেলব না। আমি শপথ করেছিলাম, হয়ত হত্যা করব, না হয় শাহাদাত বরণ করব। রাজা বললেন, যে তোমাকে এই সংবাদ দিয়েছে, সে মিথ্যা বলেছে। তোমার পিতা জীবিত আছেন। ঐ তো তার ঝাণ্ডা দেখা যাচ্ছে। তখন রাজা কাউকে শায়খ মানসুরের কাছে বলে পাঠাল, আমরা এই ছেলের খাতিরে সন্ধি করব। সুতরাং যা কিছু প্রস্তাব করা হয়, সবই তারা মেনে নেয় এবং ফিরে যায়।

শাহ সাহেব (র) তার মুহতারাম পিতার উদ্ধৃত শেকওয়াপুর (যেখানে শায়খ মু'আযযম (র) -এর আত্মীয়তা ছিল)-এর একটি জীবন্ত ঘটনাও বর্ণনা করেছেন। একবার ত্রিশজন ডাকাত এ গ্রামের বকরীর পাল লুট করে নিয়ে যায়। তখন সেখানে শায়খ মু'আযযম একা ছিলেন। তার আত্মীয়-স্বজন ও সন্তানদের কেউ সেখানে ছিল না। তিনি যখন এ ঘটনা জানতে পারেন, তখন সামনে বিছানো ছিল দস্তরখানা। খাবারও দেওয়া হয়েছিল। তিনি কোনও প্রকার তাড়াহুড়ো ও অস্থিরতা প্রকাশ করেননি। পুরোপুরি স্বস্তির সাথে যথারীতি খাবার খেয়ে শেষ করে হাত ধুয়ে নেন। এরপর বলেন, আমার হাতিয়ার ও ঘোড়া নিয়ে এসো। যখন অশ্বারোহণ করেন, তখন জামিনদারদের কেউ কেউ অস্ত্রসজ্জিত হয়ে সঙ্গে যেতে চাইলেন। তিনি সকলকে বাঁধা দিয়ে বলেন, আমি এত দ্রুততার সাথে যাব, তোমার আমার ঘোড়ার আশপাশেও যেতে পারবে না। অবশ্য এই ঘটনার বর্ণনাকারী, যিনি দৌঁড়ানোয় ঘোড়ার সমতূল্য ছিলেন, তাকে সঙ্গে নিয়ে যান। যেন তিনি ঘটনার বিবরণ দিতে পারেন। এরপর দ্রুত ঘোড়া হাঁকিয়ে সেসব ডাকাতকে ঘেরাও করেন, তারা কয়েক মনযিল অতিক্রম করে গিয়েছিল। তাদের উত্তেজিত করে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ করেন এবং তীর নিক্ষেপ শুরু করেন। তার নিক্ষেপণ শক্তি ও তীর নিক্ষেপণ দেখে ঐ ডাকাতদলের উপর আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। ডাকাতদল আবেদন করে, আমরা তাওবা করছি। আমাদেরকে ক্ষমা করে দিন। শায়খ বলেন, তোমাদের তাওবা হচ্ছে, তোমরা তোমাদের অস্ত্র ত্যাগ কর। প্রত্যেকেই একে অন্যের হাত ধর। এভাবেই বকরী পাল, অস্ত্রশস্ত্র ও হাতকড়া পরিহিত অবস্থায় ডাকাতদেরকে ঐ গ্রাম পর্যন্ত নিয়ে আসেন।

তাদের ধর্মানুসারে তাদের থেকে শপথ নেন– এ গ্রামের প্রতি কখনও দৃষ্টিপাত করবে না। তারা এ শর্ত পুরোপুরি রক্ষা করে।

শায়খ মু'আযযমের ঘরে সাইয়িদ নূরুল জাব্বার সোনাপতির কন্যা থেকে তিন পুত্র জন্ম নেয়। শায়খ জামাল, শায়খ ফিরুজ ও শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন, যিনি শাহ সাহেবের প্রকৃত দাদা ছিলেন।

শাহ্ সাহেবের দাদা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন শহীদ

শাহ সাহেব তার আপন দাদা শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন শহীদ (র)-এর অবস্থা কিছুটা বিশদভাবে লিখেছেন। তিনি বলেন, তার মধ্যে তাকওয়া ও বীরত্ব উভয় গুণই বিদ্যমান ছিল। মুহতারাম পিতা (শাহ আবদুর রহীম) বলেছেন, আমার পিতা (শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন) রাতদিনে কুরআনে কারীমের দুই পারা পড়ার ওযীফা নির্ধারণ করে নিয়েছিলেন। সফরে-বাড়িতে (ঘরে-বাইরে) এবং চৈতন্য-ক্লান্তি সর্বাবস্থায় তা পূর্ণ করতেন; কখনই পরিত্যাগ করতেন না। যখন বয়স বেড়ে যায় এবং দৃষ্টিশক্তি দুর্বল হয়ে যায়, তখন বড় ছাপার একটি কুরআনে কারীম সঙ্গে রাখতেন। সফরেও সেটি নিজের কাছ থেকে পৃথক করতেন না। তিনি আরও বলেন, তিনি কখনও নিজের ঘোড়াকে অন্যের খেত-খামারে প্রবেশ করতে দিতেন না। চাই সকল সৈন্য ফসলের ক্ষেতে ঘোড়া দৌড়াক। অনেক সময় এ কারণে সচরাচর রাস্তা ছেড়ে কষ্ট করে চলতেন।

তিনি আরও বলেন, কোনও যুদ্ধে যদি রসদপত্র কম হয়ে যেত এবং পানাহার সামগ্রীর ব্যবস্থা না হত, তাহলে সঙ্গীরা গ্রামের বকরী পাল জোর করে ধরে তার দ্বারা নিজের খাবারের ব্যবস্থা করত। কিন্তু তিনি এ কাজ থেকে বেঁচে থাকতেন। যখন দু'তিন দিন অনাহারে কেটে যেত এবং আহার্যের প্রার্থনা করা হত, তখন প্রকৃত রাযযাক রিযিকের ব্যবস্থা করে দিতেন। অনেক সময় তিনি চিন্তামগ্ন থাকতেন। মাটিতে বেত্রাঘাত করতেন। সেখান থেকে কিছু খাবার বেরিয়ে আসত। তিনি তা ধুয়ে মুছে পবিত্র করে ভিজিয়ে আহার করতেন। শাহ আব্দুর রহীম বলতেন, আমার পিতা তার সহকর্মী এবং ভূষিবিক্রেতার সাথেও এমন নম্র-ভদ্র ও ন্যায়নিষ্ঠ আচরণ করতেন, বড় বড় মুত্তাকীদের মধ্যেও এরূপ কম দেখা গেছে। তিনি আরও বলতেন, এক সফরে তিনি কতিপয় আছারে বেলায়েত তথা অলীত্বের নিদর্শন প্রদর্শন করেছেন, বায়'আত করেছেন এবং ওয়ালীসুলভ ব্যস্ততায় নিমগ্ন ছিলেন। কম কথা বলা ও কম ঘুমানোকে (যা বিশিষ্ট সুফীদের নিদর্শন) নিজের আদর্শ বানিয়ে নেন এবং তা এমনভাবে মেনে চলেন, যা তৎকালীন সুফীদের মাঝেও কম পাওয়া যায়।

শাহ্ সাহেব বলেন, আব্বাজান তার বীরত্বের কথা প্রায়ই বলতেন। এ স্থানে শাহ সাহেব তার আব্বাজানের উদ্ধৃতি দিয়ে তার উজ্জ্বল বীরত্ব ও নির্ভীকতার একাধিক ঘটনা লিখেছেন। অনেক সময় তিনি একাই পুরো শত্রুদলের মোকাবেলা করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় সৈনিক হিসেবে মালূহ পর্যন্ত চলে যেতেন। তিনি সমকালের ভালো ভালো অশ্বারোহী ও রক্তখেকোদের মোকাবেলা করেছেন। অনেক সময় নিজের সঙ্গীসাথী ও অফিসারদের, যারা শত্রুকবলিত হয়ে পড়ত, তাদেরকে সম্মুখ বিপদ বা সাক্ষাৎ মৃত্যু থেকে বাঁচিয়েছেন। একবার তিনি তিন যুদ্ধবাজ বেপরোয়া জঙ্গীকে পদদলিত করেন। তিনি সমর কৌশল ও নেতৃত্ব প্রদানের দায়িত্বে স্বকীয়তার অধিকারী ছিলেন।

সমরসঙ্গী হিসেবে তিনি বাদশাহ আলমগীরের সহচর ছিলেন। যখন শাহ সুজা বাংলা আগমন করেন, তখন তিনি আলমগীরের সৈন্য ছিলেন। তিনি তখন বিরাট কৃতিত্বের স্বাক্ষর রাখেন। অনুগ্রহকারীর সাথে পুরোপুরি কৃতজ্ঞ ও দৃঢ়তার প্রমাণ দেন। তার বীরত্বে উক্ত যুদ্ধে আলমগীরের বিজয় হয়। বাদশা এই জয়লাভের পর তার পদোন্নতি দানের মনস্থ করেন। তিনি অমুখাপেক্ষিতার দৃষ্টিতে তা গ্রহণ করেননি। মাঝে মধ্যে তিনি তার খাস শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু ও প্রিয়জনদের সঙ্গে নিঃস্বার্থ বন্ধুত্ব ও হৃদ্যতার দাবী পূরণ করতেন। স্বয়ং দুঃখ-যাতনা নিয়ে তাদের সাহায্য করতেন। শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র) তার আত্মিক শক্তি, উচ্চ সাহস, কষ্ট সহিষ্ণুতা ও ত্যাগ-তিতিক্ষার বহু ঘটনা বর্ণনা করেছেন। সেই সাথে তার মহানুভবতা, উদারতা, মনজয় এবং দুঃস্থ-অসহায়দের পৃষ্ঠপোষকতার ঘটনাও লিখেছেন।

শায়খ ওয়াজীহুদ্দীনের বিয়ে হয় শায়খ রফীউদ্দীন মুহাম্মদের বোন নেক আখতারের সঙ্গে। শায়খ রফীউদ্দীন ছিলেন কুতুবুল আলমের সন্তান। তিনি হলেন শায়খ আবদুল আযীয শোকরবারের সন্তান। (যিনি ছিলেন প্রবীণ মাশায়িখে চিশতিয়ার একজন। শায়খ কাযী খান যাফর আবাদী ও শায়খ তাজ মাহমূদ জৈনপুরী থেকে চিশতিয়া তরীকার অনুমতিপ্রাপ্ত। বিনয়-নম্রতার আদর্শ প্রতীক। উচ্চ গুণাবলি ও উন্নত চরিত্রের অধিকারী। ওহদাতুল উজুদের রহস্যবৃত্তা। চিঠিপত্রে নিজের নামের সঙ্গে 'যাররায়ে নাচীজ' বা তুচ্ছ অনু লিখতেন।) তার ঔরষে তিন পুত্রের জন্ম হয়। শায়খ আবুর রযা মুহাম্মদ, শায়খ আবদুর রহীম এবং শায়খ আবদুল হাকীম।

শায়খ আবদুর রহীম সাহেব বলেন, আমার আব্বাজান (শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন) এক রাতে তাহাজ্জুদ নামায পড়ছিলেন। এক সিজদায় এত দীর্ঘসময় কপাল মাটিতে লুটিয়ে রাখেন যে, মনে হল হয়ত তার প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেছে। এরপর যখন তিনি মাথা উঠালেন, তখন তার কাছে এত

দীর্ঘসময় নিশ্চুপ সিজদাবনত হয়ে পড়ে থাকার ব্যাপারে আমি জিজ্ঞাসা করলাম। বললেন, গাইবূবাত (অদৃশ্যতা)-এর অবস্থা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। তাতে শহীদের মর্যাদা ও প্রতিদানের অবস্থা জেনেছি। আমি মহান আল্লাহর কাছে শাহাদাতের আকাঙ্ক্ষা করেছি। এ ব্যাপারে এত অনুনয়-বিনয়ের সাথে প্রার্থনা করেছি যে, তা কবুল হওয়ার সুস্পষ্ট আভাস পেয়েছি। দক্ষিণ দিক থেকে ইরশাদ হয়েছে, সেটিই হবে শাহাদাতের স্থান।

মুহতারাম আব্বাজান বলেন, এই ঘটনার পর যদিও তিনি সৈনিকের চাকুরী ছেড়ে দিয়েছিলেন এবং এই পেশার সাথে মানসিক বিতৃষ্ণা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, তথাপি তিনি নতুন করে সফরের আয়োজন করেন। তিনি ঘোড়া ক্রয় করেন এবং দক্ষিণের পথে যাত্রা করেন। তার ধারণা ছিল, এ ঘটনা সেওয়ারায় সংঘটিত হবে, যা তৎকালীন ইসলামী রাজত্বের সীমানার বাইরে ছিল। সেখানকার শাসক মুসলমানদের বিচারকের সাথে নেহায়েতই দুর্ব্যবহার করে। কিন্তু বোরহানপুর পৌঁছে বুঝতে পারলেন, শাহাদাতের স্থান পিছনে ফেলে এসেছেন। সেখান থেকেই ফিরে আসতে চাইলেন। পথিমধ্যে কিছু বণিক সহযাত্রী হয়, তাদেরকে দেখে নেককার আল্লাহভীরু মনে হচ্ছিল। ক্ষুদ্র শহর হিণ্ডিয়া থেকে ভারতে ফিরে আসতে চাচ্ছিলেন তিনি। একদিন বর্ষিয়ান এক ব্যক্তিকে আছড়ে পড়ে পালিয়ে যেতে দেখলেন। তার অবস্থাদৃষ্টে আমার আব্বাজানের মনে দয়া হল। তিনি তাকে এর কারণ জিজ্ঞাসা করলেন। সে বলল, আমি দিল্লী যেতে চাই। সে আরও বলল, দৈনিক তিন পয়সায় আমাকে কর্মচারী হিসেবে নিয়ে নিন। ঐ বৃদ্ধ আসলে কাফিরদের গুপ্তচর ছিল। যখন নওবাযিয়ার সরাইখানায় পৌঁছেন, তখন সেই গুপ্তচর তার দোসরদের খবর দেয় বণিকদের কাফেলা সেখানে অবস্থান করছে। বড় একদল ডাকাত উক্ত সরাইখানায় আসে। শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন সে সময় কুরআন তিলাওয়াতে মগ্ন ছিলেন। তাদের মধ্য থেকে দু'তিনজন লোক এগিয়ে এসে বলে, ওয়াজীহুদ্দীন কে? তিনি বলেন, আমি। তারা বলল, তোমাকে দিয়ে আমাদের কোনও কাজ নেই। আমরা জানি, তোমার কাছে কোনও ধন-রত্ন নেই। তাছাড়া আমাদের দলের একজনের উপর তোমার নিমকের হকও আছে। কিন্তু এসব বণিককে আমরা ছাড়ব না। তাদের কাছে ধন-সম্পদ আছে। যেহেতু আব্বাজানের মুখ্য উদ্দেশ্যই ছিল এ সফর দ্বারা শাহাদাত লাভ করা, তাই তিনি তাদের সঙ্গ ছাড়তে রাজি হলেন না। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ালেন। তিনি বাইশটি আঘাত খান। শেষ আঘাতে দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। এ অবস্থায় দীর্ঘক্ষণ পর্যন্ত মুখে তাকবীর চলতে থাকে। কিছু সময় কাফিরদের ধাওয়াও করেন। অবশেষে

এক স্থানে গিয়ে নিথর হয়ে পড়ে যান এবং প্রাণবায়ু উড়ে যায়। সমাহিত হন সেখানেই। আল্লাহ তা'আলা শাহ আবদুর রহীম সাহেবকে এই ঘটনা প্রত্যক্ষ করান। তিনি দেখলেন, শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন তার ক্ষতস্থান দেখাচ্ছেন। শাহ সাহেব পবিত্র দেহকে স্থানান্তরিত করার মনস্থও করেন। কিন্তু অদৃশ্য ইংগিত তাদের এ কাজ থেকে বিরত রাখে।

শাহ্ সাহেবের নানা শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী

শাহ সাহেবের নানা ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (র)। তার বংশের প্রথম বাসস্থান ছিল সাদধূর। সুলতান সিকান্দার লোদীর শাসনামলে এই বংশ ফুলত-এ স্থানান্তরিত হয়। তার মুহতারাম পিতার নাম শায়খ মুহাম্মদ আকেল। তিনি শৈশব থেকে ছিলেন অত্যন্ত নেককার এবং সম-সাময়িক বুযুর্গানে দীন ও সুহৃদ ব্যক্তিদের দৃষ্টিনন্দিত। হযরত সাইয়িদ আদম বানূরীর খলীফা শায়খ জালাল তার শুভজন্মের প্রেক্ষিতে তার উচ্চমর্যাদার সুসংবাদ দিয়েছিলেন। তিনি প্রথমে শিক্ষাগ্রহণ করেন শাহ সাহেবের চাচা শায়খ আবুর রযা মুহাম্মদ ইবনে শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন থেকে। তারপর শায়খ আবদুর রহীম সাহেবের কাছে গমন করেন। তার সাথে তার বিরাট সাদৃশ্যতা মনে হয়েছে। সেখান থেকে ইলম অর্জন করে পুনরায় ফুলত-এ ফিরে আসেন। খরচ ও বদান্যতা, আত্মত্যাগ ও দুনিয়া বিমুখতায় ছিলেন তিনি উচ্চপর্যায়ে। তীক্ষ্ম প্রভাব ও ইরশাদের অধিকারী ছিলেন। শাহ সাহেব তার আপন পিতা ও উস্তাদ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের সঙ্গে তার আনুগত্য, আস্থা-বিশ্বাস, অগাধ ভক্তি-শ্রদ্ধা এবং আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টির একাধিক ঘটনা লিখেছেন। তিনি শাহ সাহেব থেকে ইযাযতও পেয়েছেন। তার পুত্র ছিলেন শায়খ উবায়দুল্লাহ। যিনি শাহ সাহেবের মামা ও শ্বশুর এবং শাহ্ সাহেবের শীর্ষ খলিফা হযরত শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)-এর সম্মানিত পিতা। শাহ সাহেব হযরত শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (র)-এর তাছীর ও প্রভাবশক্তি, উপকারিতা, ফয়েয-বরকতের বহু ঘটনা লিখেছেন। শায়খ মুহাম্মদ (র)-এর ইন্তিকাল হয় ৮ জমাদিউস সানী ১১২৫ হিজরী সালে।

শাহ্ সাহেবের সম্মানিত চাচা শায়খ আবুর রযা মুহাম্মাদ

হযরত শায়খ আবুর রযা মুহাম্মাদ হযরত শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (র)-এর বড় ছেলে ও শাহ্ সাহেবের বড় চাচা। শাহ সাহেব 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে স্বীয় মুহতারাম পিতার পরে তার পৃথক আলোচনা করেছেন। ভূষিত করেছেন তাকে 'ইমামুত তরীকত ওয়াল হাকীকত' -এর মত উচ্চাঙ্গের উপাধিতে। (যদিও তিনি সমসাময়িক উস্তাদদের থেকে শিক্ষা লাভ

করেছিলেন তথাপি) শাহ্ সাহেবের মতে তার সিংহভাগ জ্ঞান-বিদ্যা ছিল আল্লাহ্ প্রদত্ত। তিনি আপন পিতার অনুমতি ও ইংগিত পেয়ে এক আমীরের দরবারে যাতায়াত শুরু করেছিলেন। হঠাৎ আল্লাহর অনুগ্রহের সূক্ষ্মশক্তি তাকে এ কাজ হতে বিরত রাখে। তিনি তাজরীদে তাম (পুরোপুরি দুনিয়াবিমুখতা)' পূর্ণাঙ্গ তাওয়াক্কুল এবং সুন্নাতের অনুসরণকে নিজের আদর্শ বানিয়ে নেন। পুণ্যবতী স্ত্রীকেও إن كنتم تردن الحيوة الدنيا وزينتها এর আমল করতঃ স্বাধিকার দেন যে, যদি অভাব-অনটন সইতে পার, তবে আমার সাথে থাক। নতুবা বাপের বাড়ি চলে যেতে পার। তিনিও (অর্থাৎ তার স্ত্রীও) পুণ্যবতী রমণী উম্মাহাতুল মুমিনীনের সুন্নাতের উপর আমল করতঃ দারিদ্র ও দৈন্যতাকেই প্রাধান্য দেন। ত্যাগ করেননি বুযুর্গ স্বামীর সাহচর্য। অনাহারে তাদের প্রায়ই কেটে যেত দু'তিনদিন। সাইয়িদুনা আবদুল কাদের জিলানী (র)-এর সাথে ছিল তার বিশেষ সম্পর্ক। সাইয়িদুনা আলী মুর্তাযা (রা)-এর প্রতি ছিল অকৃত্রিম মহব্বত ও বিশেষ হৃদ্যতা। বাদশা আলমগীর একাধিকবার তার যিয়ারতের মনস্থ করেন। কিন্তু তিনি অনুমতি দেননি। ধনিক শ্রেণী ও রাজন্যবর্গের প্রতি মোটেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না তার। তবে মুচি, জুতা প্রস্তুতকারক, পেষণকারী এবং এ জাতীয় পেশাজীবীদের প্রতি বেশ লক্ষ্য রাখতেন। তাদের কেউ যদি চার-পাঁচ রুপিয়া হাদিয়া হিসাবে দিত, তা অত্যন্ত সানন্দে গ্রহণ করতেন।

শাহ সাহেব তার পরিচিতিতে قوى العلم، فصيح اللسان، عظيم الورع وسيع المعرفة তথা বিজ্ঞ জ্ঞানী, প্রাঞ্জলভাষী, বাগ্মী, বিরাট সংযমী ও সুবিখ্যাত প্রভৃতি শব্দ চয়ন করেছেন। তিনি ছিলেন সুদর্শন, দীর্ঘকায়, বাদামী রঙের, হালকা শ্মশ্রুমণ্ডিত ও মিষ্টভাষী। সাধারণতঃ জুমু'আর নামাযের পর ওয়াজ-নসীহত করতেন। তিনটি মৌলিক হাদীস শোনাতেন। এরপর ফার্সীতে আর তারপর হিন্দীতে সেগুলোর তরজমা করতেন। হাদীসগুলোর মর্মার্থ নিয়ে আলোচনা করতেন। তবে মিতাচার ও সংক্ষিপ্ততার সাথে। প্রথমে সকল শাস্ত্রের একটি করে কিতাব পড়াতেন। তার আলোচনা শোনার জন্য অনেক মানুষ সমবেত হয়ে যেত। সবশেষে দু'টি পাঠ সম্পন্ন হতো। একটি বাইযাবী শরীফের; অপরটি মেশকাত শরীফের। তিনি ছিলেন ওয়াহদাতুল উজূদের প্রবক্তা এবং এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ। সূফীদের সম্পর্কিত মালফূযাতের চমৎকার ব্যাখ্যা দিতেন। মুস্তাজাবুদ দাওয়াহ ছিলেন। তার যে কোন দু'আ কবুল হত। শাহ্ সাহেব তার খোদাপ্রেম ও স্বকীয়তার অনেক ঘটনা বর্ণনা করেছেন। অত্যধিক যত্নবান ছিলেন সুন্নাত পরিপালনে। আরেফসুলভ বা

এশকের দু'টি হিন্দি কবিতা মাঝে মধ্যেই পড়তেন। শাহ সাহেব তার কাশ্‌ফ ও কারামতের একাধিক ঘটনাও লিখেছেন। তার 'মালফূযাত' বর্ণনা করেছেন অত্যন্ত বিশদভাবে। যেগুলো বুঝা এবং তা থেকে উপকৃত হওয়াও এ যুগে কঠিন কাজ। এজন্য সেগুলো বর্জন করা হয়েছে। শেষ সময়ে তার বয়স হয়েছিল পঞ্চাশ-ষাটের মাঝামাঝি। ১৭ মহররম ১১০১ হিজরী সালে আসর নামাযের পর তিনি পরপারে যাত্রা করেন।

সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব তাঁর সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের অবস্থা, যোগ্যতা-পূর্ণতা ও কারামত সম্পর্কে একটি দীর্ঘ গ্রন্থ রচনা করেছেন। যার আরবী নাম 'বাওয়ারিকুর ওলাইয়াহ' আর প্রসিদ্ধ নাম 'আনফাসুল আরেফীন'। একজন সুযোগ্য পুত্রের কলমে আরেক সুযোগ্য পিতার জীবন-চরিত নিয়ে ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ এবং দায়িত্বশীলতার সাথে পৃথক একটি গ্রন্থ রচনার খুব একটা দৃষ্টান্ত ইসলামের শিক্ষা-ইতিহাসে পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে আল্লামা তাজুদ্দীন সুবকী (র) স্বরচিত বিখ্যাত গ্রন্থ 'তবাকাতুশ শাফি'আতিল কুরবা'তে আপন মুহতারাম পিতা আল্লামা শায়খ তাকীউদ্দীন সুবকী (র)-এর বিশদ জীবন-চরিত আর পরবর্তীদের গৌরব আবুল হাসান মাওলানা আবদুল হাই সাহেব ফিরিঙ্গী মহল্লী বিরচিত তার সম্মানিত পিতা মাওলানা আবদুল হালীম লাখনৌবীর অবস্থা সম্পর্কে স্বতন্ত্র পুস্তিকা 'হাছরাতুল আলম বি-ওফাতি মারজাইল আলেম' কে উদাহরণস্বরূপ উপস্থাপন করা যায়।

এ গ্রন্থে বেশিরভাগ সেসব অবস্থা ও ঘটনাবলি চয়ন করা হয়, যাতে তার ব্যক্তিত্ব ফুটে ওঠে। যেগুলোর দ্বারা তার শিক্ষাগত, ধর্মীয় ও আধ্যাত্মিক উচ্চতার কিছুটা অনুমান করা যায়। স্বয়ং শাহ সাহেবের জীবন, দৃষ্টিভঙ্গি, মানসিকতা ও রুচি গঠনে তিনি যে মৌলিক কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন, সে সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। কাশফ-কারামত, আধ্যাত্মিক বিজ্ঞতা ও উন্নতির (যার সাথে সেই খাছ যুগ এবং স্মারক রচয়িতার বিশেষ সম্পর্ক ছিল) তত বেশি আলোচনা করা হবে না। কেননা সেসব বুঝা ও অনুধাবন করা এ যুগের মানুষের জন্য কষ্টসাধ্য। এর জন্য মূলগ্রন্থের শরণাপন্ন হওয়া উচিত। এখানে কেবলমাত্র সংক্ষেপে এতটুকু লিখা জরুরী যে, শাহ সাহেবের জীবন-চরিত এক সুউচ্চ আধ্যাত্মিক শক্তি এবং জন্মগত ও বাতেনি যোগ্যতা প্রমাণ করে। স্মরণ করিয়ে দেয় প্রবীণ ওয়ালীআল্লাহগণের কথা– যাদের যোগ্যতা অত্যন্ত শক্তিশালী, সময় খুবই সহায়ক আর পরিবেশ শুধু মনোহারীই নয় বরং তা ছিল আগ্রহ-উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টিকারী;

كل يوم هو فى شان

আয়াতে কারীমা অনুযায়ী এ ময়দানের আল্লাহ তা'আলার কুদরত, তার শিক্ষাদীক্ষা ও তার তাজাল্লীর বহিঃপ্রকাশ এবং

كلا نمد هؤلاء من عطاء ربك، وما كان عطاء ربك محظورا

(এদের ও তাদের সকলকে তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহদানে পরিপূর্ণ করে দেই। আর তোমার প্রতিপালকের অনুগ্রহ-দান কারও উপর থেকে অবরুদ্ধ নয়) এর ব্যাখ্যা।

শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নানা (যিনি স্বয়ং উচ্চ স্তরের বুযুর্গ ছিলেন) শায়খ রফীউদ্দীন (র) তাঁর জীবনের শেষ দিনগুলোতে নিজের ধন-সম্পদ আপন ওয়ারিছদের মাঝে বণ্টন করে দেন। নিজের সন্তানদের মধ্যে প্রত্যেককে তার অবস্থা অনুযায়ী সম্পদ দেন। শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর আম্মা ছিলেন তার সর্বকনিষ্ঠা সন্তান। তার পালা এলে তাকে তরীকতের ফাওয়ায়েদ, অযীফা ও মাশায়িখদের শাজারা (বংশতালিকা) দান করলেন। শাহ রফীউদ্দীন সাহেবের মুহতারামা সহধর্মিনী বলেন, তখনও এই কিশোরীর বিয়ে হয়নি। তাকে জাহীয (উপহার) এর দ্রব্যসামগ্রী দেওয়ার প্রয়োজন ছিল; এসব কাগজপত্র নয়। তিনি বলেন, এসব কাগজপত্র আমি আমার বড়দের থেকে মিরাছ হিসেবে পেয়েছি। এই কিশোরীর একটি পুত্র সন্তান হবে, যে আমাদের এই বাতেনী ও আধ্যাত্মিক মিরাছের উপযুক্ত প্রমাণিত হবে। আর জাহীয ও বিবাহ সামগ্রীর ব্যাপার? আল্লাহ তা'আলাই এসবের ব্যবস্থা করবেন। এ নিয়ে আমার ভাবনা নেই। শাহ আবদুর রহীম সাহেব বলেন, আমি জন্মগ্রহণের পর যখন কিছুটা সেয়ানা হলাম, তখন আমার নানী এই সম্পদ আমাকে হস্তান্তর করেছিলেন। আমি এর দ্বারা উপকৃত হয়েছি। শাহ আবদুর রহীম সাহেবের জন্ম সন সুস্পষ্টভাবে কোথাও পাওয়া যায় না। তবে যেহেতু তিনি ১১৩১ হি. সনে ইন্তিকাল করেছেন এবং বয়স ৭৭ বছর হয়েছিল, তাই বুঝা যায় তার জন্ম সন ১০৫৪ হিজরীই হবে। শাহ আবদুর রহীম সাহেবরা ছিলেন তিন ভাই। শায়খ আবদুর রযা মুহাম্মদ, শায়খ আবদুল হাকীম এবং শাহ আবদুর রহীম। তিনি বলেন, আমি শৈশবকালেই মাথায় পাগড়ি বেঁধে নম্রভাবে বসতাম। আমার মামা শায়খ আবদুল হাই, যিনি স্বয়ং বুযুর্গ মানুষ ছিলেন, তিনি এটা দেখে খুশি হতেন এবং বলতেন, তাকে দেখে সত্যি মনে হয়, পূর্বপুরুষের এই রত্ন আমাদের বংশে অটুট থাকবে। পৌত্ররা না পেল তাতে কি? দৌহিত্র তো তার ধারক ও রক্ষক হবে।

শাহ আবদুর রহীম সাহেবের মন-মানসিকতা শৈশব থেকেই দীনের প্রতি আকৃষ্ট এবং দুনিয়ার ধন-সম্পদ ও সম্মান থেকে বিমুখ ছিল। যদি কোন বুযুর্গ এমন কোন অযীফা বলে দিতে চাইতেন, যার দ্বারা দুনিয়ার কোনও উদ্দেশ্য অর্জিত হয়, সেদিকে তিনি কর্ণপাত করতেন না। বলতেন, আমার এসবের প্রয়োজন নেই। নকশেবন্দি এক বুযুর্গ খাজা হাশেম। তিনি বুখারা থেকে এসে শাহ সাহেবের এলাকায় বসবাস করতেন। তিনি তার এই মানসিকতা দেখে তাকে ইস্তিকতাবের তরীকা তালকীন করেন (অর্থাৎ মাশায়িখগণ হৃদয়-মানসপটে আল্লাহর নাম অঙ্কিত করার জন্য কাগজের উপর ইসমে যাত আল্লাহ শব্দটি প্রচুর পরিমাণে লেখাতেন। যেন তা মস্তিষ্কে গেঁথে যায়। এটি আল্লাহ তা'আলার স্মরণের জন্য একটি চিকিৎসা পদ্ধতি)। শাহ সাহেব বলেন, আমার উপর এটি এতই প্রভাব বিস্তার করে যে, আমি মোল্লা আবদুল হাকীম রচিত (শরহে আকয়েদ সম্পর্কিত) হাশিয়ার অনুলিপি তৈরী শুরু করেছিলাম। পূর্ণ এক খণ্ডে ইসমে যাত লিখে ফেলেছি। অথচ আমার কোনও খেয়ালই হয়নি।

শাহ সাহেব হযরত বাকী বিল্লাহর পুত্র শায়খ আবদুল্লাহ ওরফে খাজা খোর্দ -এর খেদমতে হাজির হতেন। তিনি অনেক বড় আরেফ ছিলেন। কতিপয় অদৃশ্য ইংগিত এবং আধ্যাত্মিক সুসংবাদের ভিত্তিতে তিনি তার কাছে বায়'আতের দরখাস্ত করেন। তিনি হিতাকাঙ্ক্ষীসুলভ পরামর্শ দিলেন, সাইয়িদ আদম বিনূরী (র)-এর খলীফাদের মধ্য হতে কোনও শায়খ, যিনি শরীয়ত পরিপালন, দুনিয়াবিমুখতা ও আত্মশুদ্ধিতে দৃঢ়পদ রয়েছেন, তার হাতে বায়'আত হয়ে যাও। আমি বললাম, আমাদের পাশেই হযরতের খলীফাদের মধ্যে হাফিয সাইয়িদ আবদুল্লাহ তাশরীফ রাখেন। তিনি বললেন, বিরাট গণিমত! শীঘ্রই তার কাছে বায়'আত হয়ে যাও। আমি তার খেদমতে হাজির হলাম। অবশ্য তখন তার উপর আত্মহারা, আত্মবিস্মৃতি ও গোপনীয়তার অবস্থা প্রাধান্য ছিল। তিনি প্রথম আবেদনেই বায়'আত করে নেন। আমি খাজা খোর্দ এবং সাইয়িদ আবদুল্লাহ -এর খেদমতে হাজির হতে থাকি। তার সংশ্রবের বরকতে উপকৃত হই। হাফিয সাইয়িদ আবদুল্লাহ (র)-এর দৃষ্টি ও আল্লাহর অদৃশ্য ইংগিত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের প্রতি ছিল। একবার তিনি বলেন, তুমি বাচ্চা শিশু ছিলে আর শিশুদের সাথেই খেলা করছিলে। আমার মন তোমার প্রতি নিবিষ্ট হয়। আমি দু'আ করলাম, 'হে আল্লাহ! তুমি এই শিশুকে ওয়ালীদের অন্তর্ভুক্ত করো। তার কামাল ও পূর্ণতা আমার হাতে যেন প্রকাশ পায়।' আলহামদুলিল্লাহ! সেই দু'আর সুফল প্রকাশ পেয়েছে।

শিক্ষা

শাহ আবদুর রহীম সাহেব ছোট বই-পুস্তক থেকে নিয়ে শরহে আকাইদ ও হাশিয়া খিয়ালী পর্যন্ত আপন বড় ভাই আবুর রযা মুহাম্মদের কাছে পড়েছেন। বাকী কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন মির্যা যাহেদ হারবী ওরফে মির্যা যাহেদের কাছে। তিনি বলতেন, আমি 'শরহে মাওয়াকিফ' এবং উসূলের সকল কিতাব মির্যা যাহেদের কাছে পড়েছি। আমার প্রতি তার বিশেষ দৃষ্টি ছিল। এমনকি আমি যদি বলতাম, আজ আমি মুতালা'আ করিনি। তখন বলতেন, দু'এক লাইন পড়ে নাও। যেন বাদ না যায়। হাশিয়া খিয়ালী ইত্যাদির কঠিন স্থানগুলোতে খাজা খোর্দের শরণাপন্ন হয়েছি এবং ভালভাবে তা হৃদয়াঙ্গম হয়েছে। অনেক সময় এমন হয়েছে, কোন কিতাবের প্রথমাংশ পড়েছেন আর শেষ পর্যন্ত তার দরস দিয়েছেন। খাজা খোর্দ ছিলেন শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নানা শায়খ রফীউদ্দীন (র)-এর শিষ্য। খাজা খোর্দ তার থেকে শিক্ষা ও আধ্যাত্মিকতা উভয় ধরনের উপকারিতা লাভ করেছেন। তাই তিনি তার সাথে বিশেষ সম্মানজনক আচরণ করতেন।

হাফিয সাইয়িদ আবদুল্লাহ্ ইন্তিকালের পর শাহ আবদুর রহীম সাহেব 'আবুল আলাইয়্যাহ ইহরাবিয়্যাহ' সিলসিলার এক সুউচ্চ বুযুর্গ খলীফা শায়খ আবুল কাসেম আকবরাবাদীর শরণাপন্ন হন। আমীর নূর আল আলার কাছ থেকেও উপকৃত হন। খলীফা আবুল কাসিম শাহ সাহেবকে এজাযতও দেন। খলীফা সাহেব শাহ আবদুর রহীম সাহেবের সম্মান এবং তার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন আরেকটি কারণেও। তা হল, শাহ আবদুর রহীম সাহেবের নানা শায়খ আবদুল আযীয শোকরাবাদীর সাথেও তার বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

শাহ সাহেব 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে শাহ আবদুর রহীম সাহেবের সমকালের মাশায়িখ, আউলিয়া ও আত্মহারাদের সাথে সাক্ষাৎ, তাদের খাস দৃষ্টির অনেক ঘটনা লিখেছেন। সে যুগ যেন আত্মবিস্মৃতি, আধ্যাত্মিকতা, সূলুক, আল্লাহর তলব, আল্লাহ প্রেম ও দরবেশীর বসন্তকাল ছিল। এমন সব মহান ব্যক্তিত্বের প্রাচুর্য ছিল, যারা ছিলেন তজ্জন্য অধীর আগ্রহী; আত্মিক ও বাতেনী কামালাতে (পূর্ণাঙ্গতায়) সুশোভিত। তিনি শাহ সাহেবের উপর খাছ দৃষ্টি দেন। তার সাথে ছিল শাহ সাহেবের সুসম্পর্ক। শাহ সাহেব হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবের 'কাশফে আরওয়াহ' (রূহ উন্মোচন) ইত্যাদির বহু ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন। যার দ্বারা তার বাতেনী শক্তির অনুমান করা যায়। তদ্রূপভাবে তার সম্মান ও কারামতের ঘটনাবলিও লিখেছেন। অনন্তর তার মালফূযাতের অনেক দীর্ঘ আলোচনা করেছেন। এতে তার অন্তদৃষ্টি, অসাধারণ বুদ্ধিমত্তা ও শিক্ষাগত উচ্চ যোগ্যতা অনুমিত হয়।

শাহ সাহেব বলেন, মুহতারাম আব্বাজানের আমল অধিকাংশ বিষয়ে হানাফী মাযহাব অনুযায়ী ছিল। তবে কোনও কোনও বিষয়ে হাদীস অনুসারে কিংবা নিজের লব্ধ জ্ঞান (উইজদান) থেকে অন্য কোন ফিকহী মাযহাবকেও প্রাধান্য দিতেন। এসব স্বকীয়তা বা ব্যতিক্রমের মধ্যে ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ, জানাযার নামাযেও সূরা ফাতিহা পাঠের বিষয়টি রয়েছে।

অল্প বয়স থেকে খাজা খোর্দ সাহেবের দরবারে হাযির হওয়া, তার থেকে আত্মিক ও শিক্ষাগত উপকার লাভ, তার ব্যক্তিত্ব ও বাতেনী কামালাতে (যোগ্যতায়) প্রভাবিত হওয়া এবং খাজা আবুল কাসেম আকবরাবাদী থেকেও আধ্যাত্মিক দীক্ষা লাভ ইত্যাদি (বলাবাহুল্য যে, খাজা আবুল কাসেম ছিলেন 'আবুল আলাইয়্যাহ' সিলসিলার ইযাজতপ্রাপ্ত বুযুর্গ। যিনি হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী এবং হযরত খাজা বাকীবিল্লাহ (র) -এর মাধ্যম ছাড়াই খাজা উবাইদুল্লাহ আহরার ও নকশেবন্দী সিলসিলার প্রবীণ মাশায়িখদের মধ্যে গণ্য হতেন)। তাছাড়া তিনি আমীর নূরুল আলা ইবনে আমীর আবুল আলা আকবরাবাদী থেকেও উপকৃত হয়েছিলেন। এসব কারণে শাহ সাহেবের উপর 'ওয়াহদাতুশ্ শুহূদ' মতাদর্শে দৃঢ়পদ হযরত সাইয়িদ আদম বিন্নুরীর একান্ত নিসবত (সম্পর্ক) অপেক্ষা হযরত খাজা বাকীবিঁল্লাহ (র)-এর নিসবত প্রবল ছিল, যিনি দীর্ঘকাল পর্যন্ত 'তাওহীদে উজূদী' মতাদর্শের প্রবক্তা ছিলেন। আর একথা বলা মুশকিল যে, কার্যতঃ তার (সাইয়িদ আদম) থেকে একেবারে বিচ্ছিন্নতা ছিল। একথাও ভোলা যাবে না যে, তার নিকটতম মাতৃকুলের মধ্যে হযরত শায়খ আবদুল আযীয শোকরাবারও (মৃত্যু ৯৭৫ হি.) এসেছিলেন, যার উপর 'তাওহীদে উজূদী' এর প্রাধান্য ছিল।

এসব পৈত্রিক, বংশানুক্রমিক ও দীক্ষামূলক কারণে হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব 'তাওহীদে উজূদ' -এর আগ্রহ এবং শায়খ আকবরের প্রতি শ্রদ্ধা-অনুরাগ আর তার জ্ঞান-গবেষণার ব্যাপারে এমন আকর্ষণ ও আকাঙ্ক্ষা রাখতেন, যা শরীয়তের সীমা ও ইলমের গণ্ডি অতিক্রম করতে পারত না।

শাহ সাহেব লিখেন, আব্বাজান শায়খ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (র)-এর নাম অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে নিতেন। বলতেন, আমি চাইলে 'ফসূসুল হিকাম'-এর মিম্বরে চড়ে বয়ান করতে পারি, এর সকল মাসআলাই আয়াতে কারীমা এবং হাদীস শরীফের প্রমাণ দ্বারা শক্তিশালী করতে পারি এবং এমনভাবে বয়ান করতে পারি, যাতে আর কারও সন্দেহ থাকবে না। কিন্তু আমি ওয়াহদাতুল উজুদ (বা অবিনশ্বরবাদ) এর সুস্পষ্ট বর্ণনা দিতে অক্ষম। কেননা এ যুগে অধিকাংশ মানুষই তা বুঝতে পারবে না; নাস্তিকতা ও খোদাদ্রোহিতার খাদে পড়ে যাবে।

শাহ আবদুর রহীম সাহেব 'ফাতাওয়ায়ে আলমগীরী' সংকলক আলেমদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যারা ছিলেন দেশের বিশিষ্ট হানাফী ফিকহের আলিম, বাগ্মী, তর্কবিদ ও ফিকহের অধ্যাপক। এ দলের দিকনির্দেশক ও প্রধান ছিলেন শায়খ নিযামুদ্দীন বোরহানপুরী। সম্রাট আওরঙ্গজেব এ প্রকল্পে দু'লাখ রুপিয়া ব্যয় করেছেন। 'আছ্-ছাকাফাতুল ইসলামিয়্যাহ ফিল হিন্দু' রচয়িতা গভীর তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার পর এসব সংকলকের নাম লিপিবদ্ধ করেছেন। তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় একুশ জনে। হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেবও ছিলেন এ জামাতের অন্যতম সদস্য।

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে লিখেন, সে সময় বাদশা আলমগীর উক্ত কিতাব সংকলন ও বিন্যাসে খুবই যত্নবান ছিলেন। মোল্লা নিযাম (সংকলন বোর্ডের চেয়ারম্যান) প্রতিদিন এক পৃষ্ঠা বাদশার সম্মুখে পড়ে শোনাতেন। একদিন তিনি সে অংশে পড়ে শোনান, যা মোল্লা হামিদের দায়িত্বে ছিল। তিনি একই বিষয়ে দুই কিতাবের পৃথক দুটি বিবরণ উদ্ধৃত করে বিষয়টি পেঁচিয়ে ফেলেন। তার বন্ধু শাহ আবদুর রহীম সাহেবের দৃষ্টি যখন সংশ্লিষ্ট স্থানে পড়ল, তখন বিষয়টি ধরা পড়ল। দেখলেন, মৌল্লা হামিদ দুই কিতাবের পৃথক অর্থের বিবরণ একত্রিত করে দিয়েছেন। সুতরাং তিনি পাণ্ডুলিপির টীকায় আরবীতে লিখে দিলেন,

من لم يتفقه فى الدين قد خلط فيه هذا غلط وصوابه كذا

"অর্থাৎ দীন সম্পর্কে গভীর জ্ঞান না থাকার ফলে লেখক থেকে আলোচ্য বিষয়টি এলোমেলো হয়ে গেছে। সঠিক হচ্ছে এরূপ।" মোল্লা নিযাম মূল পাঠের সঙ্গে আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর সংযোজিত টীকাও পড়ে ফেলেন। তিনি তো দ্রুত পড়ছিলেন কিন্তু বাদশা শুনছিলেন গভীর মনোযোগ সহকারে। এখানে এসে বাদশার খটকা লেগে গেল। জিজ্ঞাসা করলেন, এই বাক্য কিসের? মোল্লা নিযাম ঘাবড়ে গেলেন। তিনি লেখাটি মুতালা'আ (পূর্বে পাঠ) করেননি। অনন্তর নিজেকে সামলে নিলে বললেন, আমি এ স্থানটি মুতালা'আ করিনি। আগামী দিন বিস্তারিতভাবে এর মর্ম-ব্যাখ্যা পেশ করব। ঘরে এসে মোল্লা হামিদকে অভিযোগ করে বলেন, আমি বিষয়টি আপনার ভরসায় ছেড়ে দিয়েছিলাম। আপনার কারণে আজ আমাকে বাদশার সামনে লজ্জিত হতে হল। মোল্লা হামিদ তাৎক্ষণিক কিছু বললেন না। পরে শাহ সাহেবের কাছে এর অভিযোগ করেন। শাহ সাহেব কিতাব খুলে তাকে দেখালেন, বাক্য চয়নে এলোমেলো ও বিক্ষিপ্ততার সৃষ্টি হয়ে গেছে। এতে কোন কোন সমসাময়িক ও বন্ধুদের ভেতর হিংসা জন্মে। শাহ সাহেব কিছুদিন এ কাজে অংশ নেওয়ার পর সেখান থেকে সরে পড়েন।

চরিত্র, গুণাবলি ও আমলের নিয়মতান্ত্রিকতা

শাহ সাহেব লিখেন, তিনি ছিলেন প্রশংসিত চরিত্র মাধুরী ও উত্তম গুণাবলির আধার। তার মধ্যে বীরত্ব, সাহসিকতা, অন্তর্দৃষ্টি ও আত্মমর্যাদাবোধ ছিল উচ্চ ধরনের। পরকালীন জ্ঞানের মত ইহকালীন জ্ঞানও ছিল পূর্ণাঙ্গরূপে। প্রত্যেক কাজে মিতাচার ও ন্যায়ানুগতা পছন্দ করতেন। দুনিয়াবিমুখতা ও ইবাদত-বন্দেগীতে এত নিমগ্ন ছিলেন না, যা সন্ন্যাসবাদ বা বৈরাগ্যতার পর্যায়ে চলে যায়, আবার না এত বেশি উদাসীনতা ও শৈথিল্য ছিল, যা খামখেয়ালী ও আলস্য পর্যন্ত নেমে যায়। পোশাক-আশাকে ছিল না লৌকিকতা। নরম-শক্ত (মোটা-চিকন) যে কাপড়ই পেতেন, ব্যবহার করতেন। তবে এটি ভিন্ন কথা যে, আল্লাহ তা'আলা তাকে সব সময় উন্নত-উৎকৃষ্ট পোশাকের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলা তার সকল প্রয়োজন পূরণ করে দিতেন। বাজারে গিয়ে কোনও কিছু ক্রয়ের সুযোগ পাওয়াই ছিল কঠিন।

আমীর-উমারা ও ধনাঢ্যদের ঘরে যেতেন না। এ দরজা তিনি একেবারে বন্ধ করে রেখেছিলেন। তবে যদি এ শ্রেণীর কেউ স্বয়ং সাক্ষাৎ করতে আসত, তাহলে তিনি তার সাথে অত্যন্ত হাস্যোজ্জ্বল ও উদারতার সাথে মিলিত হতেন। তাদের যিনি বেশি সম্মানী হতেন, তাকে তদ্রূপ সম্মানই প্রদর্শন করতেন। তারা কেউ উপদেশ শোনার আগ্রহ করলে অত্যন্ত নম্রভাবে উপদেশ দিতেন। 'সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ'-এর গুরুদায়িত্ব আঞ্জাম দিতেন। সর্বদা ইলম ও উলামায়ে কিরামের সম্মান করতেন। মূর্খতা ও মূর্খদের থেকে দূরে থাকতেন।

সর্বাবস্থায় সুন্নাতে নববীর অনুসরণ করতেন। সুখের কথা হচ্ছে, গোটা জীবনে সমস্যা ছাড়া অকারণে কখনও জামাতে নামায ছুটেনি। শৈশব-কৈশোর ও যৌবনে কখনও নিষিদ্ধ বিষয়ের প্রতি ধাবিত হননি। প্রয়োজনীয় ব্যাপার থেকে দূরে থাকতেন না। আধুনিক আলেমদের লৌকিকতাপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠানের অনুকরণ করতেন না। স্বাধীন ফকীর-দরবেশ ও সূফীদের যেন তেন পোশাক পরতেন না। অনাড়ম্বর জীবন-যাপন করতেন। অকারণে ও অপ্রয়োজনে ঋণ নিতে পছন্দ করতেন না। যারা আড়ম্বরতা ও বিলাসিতার জন্য ঋণ নিত, তাদের অপছন্দ করতেন। ভর্ৎসনা করতেন। প্রয়োজনীয় চিকিৎসা গ্রহণেও তিনি আগ্রহী ছিলেন।

প্রতিদিন এক হাজার বার দরূদ শরীফ, এক হাজার বার নফী-ইছবাতের যিকির– কিছু উচ্চস্বরে আর কিছু ক্ষীণস্বরে, বার হাজার বার ইসমে যাত (আল্লাহ) পাঠের নিয়মিত আমল ছিল। আপন ভাই আবুর রযা মুহাম্মদ -এর

ইন্তিকালের পর মিশকাত, তাম্বীহুল গাফেলীন, গুনিয়াতুত তালেবীন সামনে রেখে ওয়ায-নসীহত করতেন। শেষ জীবনে তাফসীরের ধারাবাহিক আলোচনা শুরু করেছিলেন। তখন মাত্র সূরা বাকারা ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীর শেষ করেছিলেন। ইতোমধ্যে শারীরিক দুর্বলতা প্রবল হয়ে যায় এবং এই ধারাবাহিকতা স্থগিত হয়ে যায়।

ইসলামী মূল্যবোধ

হযরত শাহ আবদুর রহীম (র)-এর মধ্যেও তার বংশীয় দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী এবং মুহতারাম পিতা শহীদ শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (র)-এর উত্তরাধিকার সূত্রে মুজাহিদসুলভ অকুতোভয় প্রেরণা প্রজন্মের পর প্রজন্ম জিহাদ ও সাফল্যের ধারাবাহিকতা কখনও বিচ্ছিন্ন হয়নি। আত্মমর্যাদাবোধ ও সাহসিকতা তিনি নিজের বংশীয় উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছিলেন। যদিও ব্যক্তিগতভাবে ও সশরীরে কোনও জিহাদে তার অংশগ্রহণের বর্ণনা পাওয়া যায় না। কিন্তু 'আনফাসুল আরেফীন' গ্রন্থে উদ্ধৃত ঘটনাবলি থেকে তার উচ্চ সাহসিকতা, কার্যতঃ দৃঢ়তা ও ধর্মীয় মূল্যবোধ প্রকাশ পায়। আর এই অমূল্য সম্পদই তার সন্তানদের মধ্যে স্থানান্তরিত হয়।

দাম্পত্য জীবন

শাহ আবদুর রহীম সাহেবের প্রথম বিবাহ হয়েছিল আপন পিতার জীবদ্দশায়। যার গর্ভে তার এক পুত্র সালাহুদ্দীনের জন্ম হয়। তিনি একটু বড় হয়ে ওপারে চলে যান। (বর্ণনান্তরে যৌবনকালে তার ইন্তিকাল হয়।) এ স্ত্রী দীর্ঘকাল বেঁচে ছিলেন এবং শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র)-এর বিবাহের পর ১১২৮/২৯ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেন। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন পৌঢ় বয়সে অদৃশ্য ইংগিত ও সুসংবাদের ভিত্তিতে শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী সিদ্দিকীর কন্যাকে। তার গর্ভে দুই পুত্রের জন্ম হয়। শাহ ওয়ালীউল্লাহ এবং শাহ আহলুল্লাহ।

ইন্তিকাল

৭৭ বছর বয়সে তিনি শেষবারের মত রমযানের রোযা রাখেন। এরপর শাওয়াল মাসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ক্রমেই তাঁর বাঁচার আশা ক্ষীণ হয়ে যায়। কিন্তু এরপর আবার সুস্থ হয়ে ওঠেন। সফর মাসের শুরুতে পুনরায় অসুস্থতা বেড়ে যায়। সুবহে সাদিকের পূর্বে প্রকাশ পায় মৃত্যুর আলামত। তখন তার পূর্ণ মনোযোগ ছিল, ফজর নামায যেন ছুটে না যায়। এই মুমূর্ষ অবস্থায় কয়েকবার জিজ্ঞাসা করেন, সকাল হয়েছে কি না? উপস্থিত লোকজন বলেন, না। এখনো হয়নি। যখন অন্তিম সময় একেবারে সন্নিকটে

চলে আসে, তখন সেসব জবাবদাতাকে কঠোর ভাষায় প্রতিবাদ করে বলেন, তোমাদের নামাযের সময় না হলেও আমার নামাযের সময় হয়ে গেছে। পরক্ষণেই বললেন, আমাকে কিবলামুখী করে দাও। তখন তিনি ইশারায় নামায আদায় করেন। অথচ সময় নিয়ে তখনো সংশয় ছিল। এরপর ইসমে যাতের যিকিরে মশগুল হয়ে পড়েন এবং জীবনদাতাকে ক্ষণিকের এ জীবন সঁপে দেন। এই ঘটনা বৃহস্পতিবার ১২ সফর ১১৩১ হিজরীর। তখন ছিল সম্রাট ফুররাখ সিয়ারের শাসনামলের শেষ সময়। তার ইন্তিকালের পর ফুররাখ সিয়ার পঞ্চাশ দিন বন্দি অবস্থায় কাটান। শহরে চরম বিশৃঙ্খলা ও দুরাবস্থা দেখা দেয়। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল ৭৭ বছর।

শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে শাহ আবদুর রহীম

হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর শিক্ষা ও জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পায় এমন কোন গুরুত্বপূর্ণ রচনা (একটি পুস্তিকা ব্যতিত) অবশ্য পাওয়া যায় না। তার খ্যাতির বেশিরভাগই তার সুযোগ্য ও মহান সন্তানের মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছে। তিনিই তার পরিচয় 'আনফাসুল আরেফীন'-এর মাধ্যমে করিয়েছেন। যতদূর জানা যায়, তার জীবনকর্ম সম্পর্কে তার আর কোনও নির্ভরযোগ্য কিতাব নেই। তবে শাহ সাহেব (র)-এর রচনাবলি, বিশেষতঃ 'আনফাসুল আরেফীন' থেকে জানা যায়– তিনি তাঁর উচ্চ মর্যাদা, আধ্যাত্মিক শক্তি, আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্যতা এবং ইলম-জ্ঞান ও আধ্যাত্মিকতায় তার উঁচু স্থানের প্রতি আন্তরিকভাবে তদপেক্ষা বেশি শ্রদ্ধাশীল ও প্রভাবিত ছিলেন, যতখানি এক সৌভাগ্যশীল সন্তান আমভাবে নিজের সুযোগ্য পিতার যোগ্যতা, কামালত ও অনুগ্রহ দানের স্বীকৃতিদাতা ও প্রশংসাকারী হয়ে থাকে। শাহ সাহেবের কাছে তার আধ্যাত্মিক ও শিক্ষাগত যোগ্যতা সম্পর্কে অকাট্য বিশ্বাস, জ্ঞানগত অবস্থা এবং তার জীবনকর্মে এক ধরনের উন্মত্ততা ও ব্যাকুলতা অনুভূত হয়। মনে হয় যেন শাহ সাহেবের শিক্ষা-দীক্ষা, জ্ঞান ও বাতেনী যোগ্যতা লাভ, ইলম ও আধ্যাত্মিকতায় নেতৃত্ব এবং ইজতিহাদের মর্যাদা পর্যন্ত পৌঁছতে মুহতারাম পিতার বাতেনী সম্পর্ক, প্রতিক্রিয়া শক্তি, স্নেহ-প্রীতি ও অফুরন্ত দু'আর বিরাট দখল রয়েছে।

ভারতের আরব বংশোদ্ভূত গোত্র ও তাদের বৈশিষ্ট্য

বক্ষমান গ্রন্থে শাহ সাহেবের মহান পূর্বপুরুষদের যে সংক্ষিপ্ত পরিচিতি পেশ করা হয়েছে, তাতে অনুমিত হয় যে, তাদের মাঝে সাধারণতঃ তিনটি গুণ সমানভাবে পাওয়া যেত।

প্রথমতঃ ইলম ও দীন, তাকওয়া-পরহেযগারী, বিচার ও ফাতওয়ার সাথে ব্যাপক সম্পৃক্ততা, যা ইলম ও দীনের সাথে বংশগত সম্পর্ক, দৃঢ়চিত্ততা ও উচ্চ সাহসিকতার ভিত্তিতে (যাতে বংশীয় বৃত্তান্ত, ধারাবাহিকতা, ঘটনাবলি, একনিষ্ঠ ও সাহসী নেতৃত্ব এবং মুরব্বীদের শিক্ষা-দীক্ষার খোরাক যোগাত।) অযৌক্তিক কিছু নয়। পূর্বপুরুষদের কৃতিত্ব, তাদের যোগ্যতা, বুযুর্গী ও আল্লাহভীরুতার কারণে আল্লাহ তা'আলা অনেক বংশকে রক্ষা করেছেন এবং দীনের দৌলত সংরক্ষণের ব্যবস্থা তাদের মধ্যে এমনভাবে করেছেন– যেভাবে ঐ দুই ইয়াতীম শিশুর দেয়াল তার এক মাকবূল বান্দার মাধ্যমে ধ্বসে পড়া থেকে রক্ষা এবং সুদৃঢ় করেছেন, যাদের পিতা ছিল বুযুর্গ ও দীনদার। কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে, وكان ابوهما صالحا (তাদের দু'জনার পিতা ছিল সৎকর্মশীল)। ভারতবর্ষের বিশটি গোত্রের ইতিহাস এই ধারাবাহিকতা, রক্ষণাবেক্ষণ ও আল্লাহর সাহায্যের সাক্ষ্য দেয়। যাদের মধ্যে শত শত বছর পর্যন্ত ইলম ও দীন, বিচার ও ফাতওয়া, শিক্ষাদান ও রচনা এবং ইরশাদ ও হেদায়াতের ক্রমধারা চালু থেকেছে।

দ্বিতীয়তঃ বংশ সংরক্ষণ, বংশতালিকা বিন্যাস, তত্ত্বাবধায়ন ও অভিভাবকত্বের সেই স্বকীয়তা ও গুরুত্ব, আরব দেশ এবং প্রাচীন ইসলামী রাষ্ট্রগুলোতেও যা ছিল না। সম্ভবতঃ এর কারণ অনারব ভূখণ্ডে নিজের এই বংশ সংরক্ষণের প্রেরণা (যা এই বংশ আরব দেশ থেকে নিয়ে এসেছিল) এবং স্বয়ং ভারতবর্ষের শ্রেণীগত আইন-কানুন এবং বংশগত গৌরবের প্রভাবও এর কারণ ছিল। অথচ শরীয়ত এই গুরুত্বারোপের নির্দেশ করেনি। এতে পরবর্তী শতাব্দী ও অনারব দেশগুলোতে ত্রুটির সৃষ্টির হয়। তবে সেই সাথে এর উল্লেখযোগ্য সুফল অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে, শত শত বছর পর্যন্ত এসব গোত্রে বংশীয় বৈশিষ্ট্যগুলো বিদ্যমান ছিল। অনারব ও অমুসলিম সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতিতে একাকার হয়ে যায়নি।

তৃতীয়তঃ মাহাত্ম্য ও বীরত্বের গুণ আর নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য। আরবীতে যাকে 'অশ্বারোহন ও পৌরুষ' (فروسية ও فتوة) শব্দে ব্যক্ত করা হয়, যা আরব জাতি ও কুরাইশ গোত্রের বংশগত ও পৈত্রিক বৈশিষ্ট্য, যার দৃষ্টান্ত শায়খ মু'আযযম ও শায়খ ওয়াজীহুদ্দীন (র)-এর জীবনকর্মে সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টিগোচর হয়েছে। আর এর পূর্ণাঙ্গ বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে স্বয়ং শাহ সাহেবের পৌত্র মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাইল শহীদ (র)-এর জীবনে।

এসব সমুজ্জ্বল গুণাবলির বহিঃপ্রকাশ ও বংশানুক্রমিকতার মনস্তাত্ত্বিক এবং যৌক্তিক কারণও আছে। যেসব আরব বংশোদ্ভূত গোত্র ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে

হিজায, ইরাক, ইরান ও তুর্কিস্থান থেকে ভারতবর্ষে আগমন করেছে, তাদের অধিকাংশেরই হিযরত এবং ভারতবর্ষে বসবাসের কারণ ছিল হয়ত নিজ দীন ও ঈমান সংরক্ষণ কিংবা ইজ্জত-সম্মান বাঁচানোর আঁকুতি। কেননা তারা তাতারীদের আক্রমণের আশঙ্কায় পড়ে গিয়েছিল। এই বিষয়টি পরবর্তী কয়েক প্রজন্মের লোকদের স্মরণ ছিল। তাদেরও এ লজ্জা ছিল। আল্লাহ তা'আলাও এর বরকতে তাদের দীনী অবস্থার উন্নতি দান করেছেন। তারা ছিলেন

فالذين هاجروا واخرجوا من ديارهم واوذوا فى سبيلى وقاتلوا.

(সূরা আলে ইমরান - ১৮৫) আয়াতে কারীমা-এর উজ্জ্বল নমুনা।

অথবা ছিল আল্লাহর রাহে জিহাদ এবং আল্লাহর পথে দাওয়াতের আগ্রহ। সে সময় (সপ্তম হিজরী শতকের পৃথিবীতে) যার সবচেয়ে বড় কার্যক্ষেত্র ছিল ভারতবর্ষ। এই বিশাল রাজ্যে যাকে উপমহাদেশ বলাই যথার্থ, অনেক অঞ্চল তখনও ইসলামী সাম্রাজ্যের পদানত হয়নি। সেখানে কোথাও কোথাও চলছিল বিভিন্ন শাসক ও রাজাদের শাসন। কখনও কখনও শরীয়তের হুকুম পালন এবং ইসলামী আদর্শ-নিদর্শন প্রকাশেও বাঁধার সৃষ্টি হত। তাদের কেউ কেউ সময় সময় বিদ্রোহও করে বসত। সব জায়গায় রাষ্ট্রীয় সৈন্য পৌঁছাও ছিল কঠিন ব্যাপার। ভারতে বহিরাগত সেসব অভিজাত, সম্ভ্রান্ত, সচেতন, সাহসী এবং যুদ্ধ-জিহাদ পিয়াসী আরবী বংশোদ্ভূত গোত্রগুলো এবং তাদের নেতৃত্বাধীন লোকদের জন্য সেসব অঞ্চল জয় করে কেন্দ্রীয় রাজত্বে সমর্পণ করা তাঁদের চেতনা ও সাহসিকতা উপশমের খোরাকও ছিল। ধর্মীয় চেতনায় পরিতৃপ্তির মাধ্যম এবং পার্থিব সম্মান ও নেতৃত্ব লাভের উপায়ও ছিল বটে। তাদের সেসব অঞ্চলে ক্ষমতাসীন করে দেওয়া হত। তাদের লোকজনকে বিচারক ও নবাবীর পদে অধিষ্ঠিত করা হত। সুতরাং সেসব আরবী-ইরানী বংশোদ্ভূত গোত্রগুলোর ইতিহাসে অনেক এরূপ ঘটনা পাওয়া যায়, তাদের নেতৃবর্গ ভারতবর্ষের এমন অনেক দূরাঞ্চল এবং অপরিচিত ও গুরুত্বহীন জনপদ জয় করেছেন, যেগুলো সাধারণভাবে সংরক্ষিত রাষ্ট্রসমূহে অন্তর্ভুক্ত হতে পারত না।[৬]

---

[৬] এর একটি উপমা প্রধান আমীর সাইয়্যিদ কুতুবুদ্দীন মুহাম্মদ আল নাদানী (মৃত্যু ৬৭৭ হি.)। যিনি উধ বংশ কুতবী হাসানী গোত্রের স্থপতি এবং সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র) এর সম্মানিত পিতামত। তিনি গজনী থেকে সপ্তম হিজরী শতকের শুরুতে শুভাকাঙ্ক্ষী, প্রিয়জন, পরিবারবর্গ এবং গজনীর অভিজাত সম্রান্ত নেতৃবৃন্দ ও মুজাহিদদের বিশাল এক জামাত নিয়ে দিল্লী শুভাগমন করেন। দিল্লী থেকে ইউরোপ যাওয়ার মনস্থ করেন। প্রথমে কুনূজ এরপর মাঙ্গপুর ও কাড়হ (যা তৎকালীন সময়ে পৃথক একটি রাষ্ট্রের কেন্দ্রস্থল ছিল) আক্রমণ করেন এবং তার সমস্ত অঞ্চল জয় করে ইসলামী রাজত্বে অন্তর্ভুক্ত করে নেন।

সেসব গোত্র উপলব্ধি করত, আমরা এক মহান উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতবর্ষে আগমন করেছিলাম। আমাদের দীন-ধর্ম, আমাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি ও আমাদের সৌভাগ্যের উৎসমূল ইসলামের কেন্দ্রস্থল আরব উপদ্বীপ এবং পবিত্র হিজায। আমাদের সেই মহান উৎসসমূহ থেকেও কখনও বিচ্ছিন্ন না হওয়া উচিত। আমাদের বংশীয়, ধর্মীয়, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ও চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ যে কোনও মূল্যে অক্ষুণ্ন রাখতে হবে। তবেই আমরা পৃথিবীর এই ক্রান্তিলগ্নে অপরিচিত এক সভ্যতা ও পরিবেশে, যার সত্ত্বায় নিবিষ্ট আছে এমন পৃথকীকরণ শক্তি ও এক ধরনের এসিড, যা বহিরাগত জাতি ও বংশগুলোকে নিজের মধ্যে পুরোপুরি আকর্ষিত এবং তাদের স্বকীয়তাকে বিলীন ও জ্বালিয়ে দিয়েছে, সেখানে নিরাপদ ও সসম্মানে থাকতে পারি। এই অনুভূতি তাদের মধ্যে ধর্মীয় ও বংশীয় সম্ভ্রমবোধ এবং বহির্শক্তির প্রভাবের বিপরীতে অসাধারণ প্রতিরোধ শক্তি জন্ম দেয়। ফলে তাদের ব্যক্তিগত স্বকীয়তা, ভাবমর্যাদা বহুলাংশে নিরাপদ এবং তাদের বৈশিষ্ট্যাবলি শত শত বছর পর্যন্ত প্রজন্মের পর প্রজন্মে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

এই বাস্তবতা বিরাটভাবে প্রকাশ পেয়েছে স্বয়ং হযরত শাহ সাহেব (র)-এর অসীয়তনামায়, যা তিনি المقالة الوضيه فى النصيحة والوصية নামে গ্রন্থনা করেছেন। যাতে সর্বপ্রথম তিনি তার বংশের লোকদেরকে সম্বোধন করেছেন। এরপর সম্বোধন করেছেন সকল শুভাকাঙ্ক্ষী, বন্ধু ও ভারতীয় মুসলিম উম্মাহকে। শাহ সাহেব (র) লিখেন, 'আমাদের ভুলে গেলে চলবে না যে, আমরা পরদেশী লোক। আমাদের পূর্বপুরুষগণ ভারতে হিজরত করেছেন। বংশ ও ভাষায় আরবী হওয়া আমাদের জন্য দু'টি গর্বের বিষয়। এটাই আমাদেরকে সর্বোত্তম দিশারী, সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, জগৎ সৃষ্টির গৌরব মুহাম্মদ (স)-এর নিকটতর করে দেয়। এই মহান নেয়ামতের শোকরিয়ার দাবী হচ্ছে, আমরা যেন যথাসম্ভব সেসব প্রবীণ আরবদের অভ্যাস-আদর্শ ও রীতিনীতি থেকে একেবারে সরে না যাই, যার মধ্যে রাসূলে কারীম (স)-এর লালন-পালন ও বিকাশ হয়েছিল। আর যেন অনারবদের রুসম-রেওয়াজ, আচার-অনুষ্ঠান, অপসংস্কৃতি ও হিন্দুদের রীতিনীতিকে নিজেদের মধ্যে বিস্তার ঘটতে না দেই।'

অনন্তর তিনি আরো লিখেন, 'আমাদের মধ্যে ভাগ্যবান সে-ই, আরবী ভাষায় যার কিছুটা দখল আছে। নাহু-ছরফ ও আদবে (আরবী সাহিত্যে) অভিজ্ঞতা আছে এবং কুরআন-হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান রাখে। আমাদেরকে হারামাইন শরীফাইনেও (মক্কা-মদীনা) হাজিরা দিতে হবে। তার সাথে থাকতে হবে আন্তরিক ভালবাসা। এতেই রয়েছে আমাদের সৌভাগ্যের রহস্য। আর এর থেকে বিতৃষ্ণা ও বিমুখতায় রয়েছে দুর্ভাগ্য ও বঞ্চনা।'

আরব বংশোদ্ভূত ও অভিজাত বংশ হওয়া ছাড়াও এই বংশের ফারূকী হওয়ার গৌরব ছিল। অনারব বিশ্বে এই বংশের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা বহুবার দীনের হেফাজত, ইসলামের শি'আর ও নিদর্শনের সমুন্নতি এবং ইসলামের শত্রুদের বিরুদ্ধে বীরত্বপূর্ণ কাজ নিয়েছেন। যেখানে ফারুকী আত্মমর্যাদাবোধও দাখিল ছিল। আবার এখানে হযত ফারুকে আযম (রা)-এর সাথে বংশীয় সম্পৃক্ততার অনুভূতি এবং গৌরবও কাজ করেছে– যা ছিল এক শক্তিশালী আত্মিক চেতনা। দশম হিজরী শতকে এই বংশেরই ভূতপূর্ব ব্যক্তিত্ব আকবরী ফিৎনার মূলোৎপাটন করেন। ভারতবর্ষকে কুফর-শিরক, বহু ধর্মের সংমিশ্রণে এক অলীক ধর্ম আবিষ্কারের ফিৎনা, নতুন যুগ, নতুন আইন, নতুন সহস্রাব্দ, নতুন নেতৃত্ব ইত্যাদির ভয়াবহ ষড়যন্ত্রের ছোবল থেকে রক্ষা করেন। হযরত শায়খ আহমদ ফারুকী (মুজাদ্দিদে আলফেসানী)-এর এই বংশসম্পর্ক নিয়ে গৌরব ছিল। তিনি এই ধর্মীয় মূল্যবোধকে এর দাবী ও কুদরতী ফসল মনে করতেন। বৃহত্তর আহলে সুন্নত ওয়াল জামাত ও ইসলামী আকীদার বিরুদ্ধে জনৈক প্রসিদ্ধ আরেফ ও শাইখের একটি গবেষণা শুনে তার কলম থেকে অনিচ্ছায় নিম্নোক্ত বাক্য বেরিয়ে আসে, 'আমার বন্ধুগণ! এই অধমের এরূপ কথাবার্তা শোনার শক্তি নেই। অনিচ্ছায় আমার ফারুকী ধমনী শিহরিয়ে উঠে।'

অনুরূপভাবে সামানাহ প্রদেশে একবার জনৈক খতীব জুম'আর খুতবায় ইচ্ছাকৃত খোলাফায়ে রাশেদীনের আলোচনা ছেড়ে দেয়। তিনি বলেন, 'যখন এই লোমহর্ষক সংবাদ শুনে মন-মানসে ক্ষতের সৃষ্টি হয়েছে এবং আমার ফারুকী ধমনীকে নাড়া দিয়েছে, তখন এই কয়েকটি শব্দ আমার কলম থেকে বেরিয়ে গেল।'

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সংস্কার আন্দোলন এবং দ্বীন পুনর্জীবিত করার ব্যাপক ও বহুমুখী কর্মকাণ্ডে (যেমন, আকীদা-বিশ্বাস সংশোধন, শিরক-বিদ'আত দমন, কুরআন-সুন্নাহর প্রসার, হাদীস শাস্ত্রের প্রচলন, খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফত প্রমাণিতকরণ এবং রাফেযী ও শী'আ মতবাদ প্রত্যাখ্যান প্রভৃতিতে) নিশ্চিতভাবে এই বংশ সম্পর্ক, তার মর্যাদা ও দায়িত্বানুভূতিরও দখল ছিল। যা মনস্তত্ত্ব, জীবন জ্ঞান, বংশীয় নিয়মনীতি ও অভিজ্ঞতার আলোকে সব দিক থেকে যুক্তিযুক্ত ও বুদ্ধিদীপ্ত (যার দৃষ্টান্ত প্রজন্ম ও বংশধরদের ইতিহাসে অধিক পরিমাণে পাওয়া যায়)। হাদীস শরীফে এসেছে,

الناس معاد كمعادن الذهب والفضة، خيارهم فى الجاهلية خيارهم فى الاسلام إذا فقهوا.

'মানুষ স্বর্ণ-রৌপ্যের খনির মত। তাদের মধ্যে অজ্ঞতার যুগের উত্তম ব্যক্তি ইসলামের যুগেও উত্তম, যদি তারা জ্ঞান লাভ করে।'

চতুর্থ অধ্যায়

সংক্ষিপ্ত জীবন চরিত

জন্ম

শাহ সাহেব (র)-এর জন্ম হয়েছে ৪ শাওয়াল ১১১৪ হিজরী সালে সূর্যোদয়ের সময় আপন নানীবাড়ি ছোট গ্রাম ফুলতে (বর্তমান মুযাফফর নগরে)। জন্ম তারিখ আযীমুদ্দীন (আল-জুযউল লাতীফ : ২) থেকে চয়িত। শাহ সাহেবের জন্মের সময় তার সম্মানিত পিতা হযরত শাহ আবদুর রহীম সাহেব (র)-এর বয়স হয়েছিল ষাট বছর। শাহ আবদুর রহীম সাহেবের অনেক শুভসংবাদ লাভ হয়েছিল তাঁর এই পূণ্যবান সন্তান জন্মের পূর্বে। শাহ আবদুর রহীম সাহেব ষাট বছর বয়সে প্রথম সহধর্মিনী শায়খ সালাউদ্দীনের মাতার উপস্থিতিতে দ্বিতীয় বিয়ের মনস্থ করেন। এতে অনেক অদৃশ্য ইংগিত ও সুসংবাদ অন্তর্নিহিত ছিল। যখন শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী বিষয়টি অবগত হলেন, তখন নিজ কন্যাকে তার সাথে বিবাহ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। হিজরী ১১১৪ এর শুরুতে এই পুণ্যময় আকদ সম্পন্ন হয়।

'আল-কাওলুল জামীল' গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তার সম্মানিত মায়ের নাম ছিল ফখরুননিসা। তিনি ধর্মীয় জ্ঞানে এত গভীরতার অধিকারী ছিলেন, যার সুযোগ-সৌভাগ্য ও গৌরব খুব কম নারীরই হয়ে থাকে। উক্ত গ্রন্থকার শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী, যিনি তার সহোদর ভ্রাতুষ্পুত্র। আর ঘরের মালিক ঘরের মধ্যকার বিষয় সম্পর্কে অধিক জ্ঞাত। সুতরাং তিনি লিখেন, 'শাহ সাহেবের আম্মা তাফসীর-হাদীসের মত শরঈ ইলম ও জ্ঞানের বিদগ্ধ আলিমা, তরীকতের নিয়ম-শৃঙ্খলার সুদীক্ষাপ্রাপ্ত, হাকীকতের রহস্য জ্ঞানের অধিকারী প্রভৃতি সব কারণে বাস্তবেই নারী জাতির জন্য গৌরবের কারণ ও স্বনামে স্বার্থক ছিলেন।

জন্মের পূর্বে তার পিতা শাহ আবদুর রহীম স্বপ্নযোগে খাজা কুতুবুদ্দীন বখতিয়ার কাকী (র)-এর যিয়ারত লাভ করেন। তিনি তাকে পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দেন এবং বলেন, তার নাম আমার নামে কুতুবুদ্দীন আহমদ রাখবেন। শাহ সাহেব বলেন, আমার জন্মের পর আব্বাজানের একথা স্মরণ ছিল না। তিনি আমার নাম রাখেন ওয়ালীউল্লাহ। কিছুদিন পর উক্ত ঘটনা স্মরণ হলে আমার দ্বিতীয় নাম রাখেন কুতুবুদ্দীন আহমদ।

শাহ্ সাহেবের বয়স যখন সাত বছর, পিতামাতার সঙ্গে তাহাজ্জুদ নামাযে শরীক হোন। আর দু'আ করার মুহূর্তে নিজের হাত তাদের দু'জনার হাতে রাখেন। এভাবে সে স্বপ্ন পূর্ণ হয়, যা তার সম্মানিত পিতা তার জন্মের পূর্বে দেখেছিলেন।

শিক্ষা

শাহ্ সাহেবের বয়স যখন পাঁচ বছর, তখন তাঁকে মক্তবে ভর্তি করা হয়। সাত বছর বয়সে সুন্নাতে ইবরাহীমী তথা খতনা সম্পন্ন করা হয়। সে বয়স থেকেই তার নামায আদায়ের অভ্যাস গড়ে তোলা হয়। এ বছর শেষে তিনি কুরআনে কারীমের হিফজ শেষ করেন। এরপর তিনি ফার্সী কিতাবাদি ও আরবীর ছোট ছোট কিতাবাদি পড়তে শুরু করেন। সেই সাথে কাফিয়াও সমাপ্ত করেন। দশ বছর বয়সে শরহে জামী শুরু করেন। তিনি স্বয়ং বলেন, আমার মধ্যে সামগ্রিকভাবে মুতালা'আর যোগ্যতা তৈরী হয়ে গিয়েছিল। চৌদ্দ বছর বয়সে বায়যাবী শরীফের একাংশ পড়েন। পনের বছর বয়সে ভারতবর্ষে প্রচলিত শিক্ষাকোর্স সম্পন্ন করেন। মুহতারাম পিতা এ উপলক্ষে বিশাল অনুষ্ঠানের আয়োজন করেন এবং আড়ম্বরপূর্ণ ভোজের ব্যবস্থা করেন। সেখানে আম-খাছ সকলেই শরীক ছিল।

পনের বছর বয়সে তিনি সম্মানিত পিতার কাছে মিশকাত শরীফের সবক নেন। যার মাত্র কিছু অংশ (কিতাবুল বুয়ূ থেকে আদাব পর্যন্ত) বাকী ছিল। কিতাবের ইবারত পড়তেন তার অপর এক সাথী। অবশিষ্ট অংশেরও অনুমতি পেয়েছিলেন পিতার কাছ থেকে। পিতার কাছেই সহীহ্ বুখারীর কিতাবুত তাহারাত পর্যন্ত, শামায়েলে তিরমিযী পূর্ণ, তাফসীরে মাদারেক ও বায়যাবীর কিছু অংশ পড়েছেন। তিনি বলেন, 'আল্লাহ্র বিরাট এক নেয়ামত হল, মুহতারাম আব্বাজানের কুরআনের সবকে কয়েকবার শরীক হয়েছি। যাতে কুরআনিক মর্মের অপার এক দরজা খুলে গিয়েছে।'

শাহ্ সাহেবের পঠিত পাঠ্যসূচী

শাহ্ সাহেব 'আল-জযউল লাতীফ' গ্রন্থে তার পঠিত পাঠ্যসূচীর বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। ফিকহ্ শাস্ত্রে শরহে বেকায়া ও হেদায়া (কিছু অংশ বাদে), উসূলে ফিকহ্ শাস্ত্রে হুসামী এবং তাওযী ও তালওয়ীহের বিরাট এক অংশ, মানতিক শাস্ত্রে 'শরহে শামসিয়া' পূর্ণ, 'শরতে মাতালে'-এর এক অংশ, শরহে মাওয়াকিফের কিছু অংশ পড়েছেন। আত্মশুদ্ধি সম্পর্কে 'আওয়ারিফ ও রসায়েলে নকশেবন্দিয়া ইত্যাদির একাংশ, হাকীকত প্রসঙ্গে মাওলানা জামীর শরহে রুবাঈয়্যাত ও লাওয়াইহ্, মুকাদ্দামায়ে শরহে লাম'আত, মুকাদ্দামায়ে

নক্‌দুল নসূছ, খাওয়াছে আসমা ও আয়াত সম্পর্কে সে রচনাসমগ্র, যা এ বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট এবং আল ফাওয়ায়িদুল মিয়াহ ইত্যাদি। মুহতারাম আব্বাজান কয়েকবার এসব খাওয়াছ ও ফাওয়ায়েদের অনুমতি দেন।

চিকিৎসা শাস্ত্রে মুজিয, দর্শন শাস্ত্রে শরহে হিদায়াতুল হিকমাহ প্রভৃতি, মা'আনী শাস্ত্রে মুতাওয়ালের সিংহভাগ, মুখতাছারুল মা'আনীর মোল্লা যাদাহ রচিত টীকা সংযুক্ত অংশ। আর গণিত শাস্ত্রে কিছু ক্ষুদ্র পুস্তিকা।

শাহ সাহেবের এসব পাঠ্যসূচীতে তার সম্মানিত পিতা ও প্রকৃত উস্তাদ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের ইজতিহাদ এবং নির্বাচনেরও দখল ছিল। সপ্তম হিজরী থেকে ভারতবর্ষে সে পাঠ্যসূচী প্রচলিত ছিল, যার মধ্যে নবম হিজরী শতকের শেষভাগে শায়খ আবদুল্লাহ ও শায়খ আযীযুল্লাহ মুলতান থেকে দিল্লী আগমনের প্রেক্ষিতে ইলমে কালাম, বালাগাত ও মাকূলাতের কিছু কিতাবাদি বৃদ্ধি করা হয়। এরপর দশম হিজরী শতকে আমীর ফাতহুল্লাহর ভারত আগমনের প্রেক্ষাপটে ইরানের অনুজ উলামায়ে কিরাম, উদ্ভ্রান্ত গবেষক মীর ছদরুদ্দীন সিরাজী, গিয়াসুদ্দীন মানসূর ও মির্যা জানের রচনাবলি পাঠ্যভুক্ত করা হয়।

সম্ভবতঃ শাহ আবদুর রহীম সাহেবের বাস্তবপ্রিয়তা এবং নিজের সন্তানের মেধা-মনন অনুপাতে তন্মধ্য থেকে কিছু কিতাবাদি (যার মধ্যে অধিকাংশই বিষয়বস্তুর পুনরাবৃত্তি ছিল) পরিত্যাগ করা হয়। যেমন– নাহব শাস্ত্রে মিসবাহ, লুব্বুল আলবাব (কাযী বায়যাবী বিরচিত)। কাযী শিহাবুদ্দীন দৌলতাবাদীর 'ইরশাদ' এর স্থলে ছরফে কাফিয়া ও শরহে জামী পড়ানো হয়। উসূলে ফিকাহ শাস্ত্রে মানার ও তার শরাহ এবং উসূলে বাযদবীর পরিবর্তে হুসামী, তাওযীহ ও তালবীহের কিছু অংশ, তাফসীর শাস্ত্রে কাশশাফ পরিত্যাগ করা হয়। হাদীস শাস্ত্রে 'মাশারিকুল আনওয়ার' অন্তর্ভুক্ত ছিল না। আরবী সাহিত্যে মাকামাতে হারীরীর ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোনও কোনও বুযুর্গের মুখস্থ করার কথাও পাওয়া যায়। কিন্তু শাহ সাহেবের পাঠ্যসূচীতে তা পরিলক্ষিত হয় না। সম্ভবতঃ তন্মধ্যে অনেক কিতাবাদিই বারো শতকের শুরু পর্যন্ত অনেক শিক্ষাকেন্দ্রে পরিত্যক্ত হয়ে গেছে।

বলাবাহুল্য যে, বারো হিজরী শতকে উস্তাদুল উলামা মোল্লা নিযামুদ্দীন সিহালবী ফিরিঙ্গী মহল্লী, যিনি ছিলেন শাহ সাহেবের বয়োজ্যেষ্ঠ, সমসাময়িক এবং যিনি শাহ সাহেবের পনের বছর পূর্বে ইন্তিকাল করেছেন –এই পাঠ্যসূচীতে অনেক বড় পরিবর্তন আনেন। বিশেষতঃ ছরফ, নাহব, তর্কবিদ্যা, দর্শন, গণিত, বালাগাত এবং কালাম শাস্ত্রে বহু সংখ্যক কিতাবাদি বৃদ্ধি করেন। যাতে আরও কিছু পরিবর্ধনের পর (যা তার ছাত্র এবং ছাত্রের ছাত্রদের

যুগে কোনও প্রকার পরিকল্পনা ছাড়াই হয়েছে) এই পাঠ্যসূচী দরসে নেযামীর সেই শেষরূপ ধারণ করে, যা অধ্যবধি প্রাচীন মাদরাসাগুলোতে চালু আছে।

শাহ্ সাহেবের বর্ণিত পাঠ্যসূচীতে আরবী সাহিত্যের কোনও কিতাব দৃষ্টিগোচর হয় না। অথচ শাহ সাহেবের আরবী রচনাবলি বিশেষতঃ 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' সাক্ষ্য দেয় যে, তাঁর আরবী ভাষা এবং আরবীতে লিখনী ও রচনার শুধু প্রতিভূ ক্ষমতাই ছিল না বরং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তিনি এক্ষেত্রে এমন এক ধারা ও রচনাশৈলীর উদ্ভাবক, যা শিক্ষামূলক প্রতিপাদ্য ও উদ্দেশ্য বর্ণনার জন্য অতীব ভারসাম্যপূর্ণ পদ্ধতি, যেখানে আল্লামা ইবনে খালদুনের পরে তার সমতূল্য ও সমপর্যায়ের দ্বিতীয় কাউকে দেখা যায় না। এতে বুঝা যায়, শাহ সাহেব নিজ হাতেই আরবী সাহিত্য ও গদ্য-পদ্যের সেসব প্রাচীন উচ্চাঙ্গের কিতাবাদি অধ্যয়ন করেছেন। যা ছিল বাগ্মীতা ও মধুরতার নমুনা, অনারব আরবী শব্দ থেকে অনেকটাই সংরক্ষিত। হিজায অবস্থানকালে তিনি বিশেষভাবে আরবীতে এই বিশাল লিখনী কাজের প্রস্তুতি গ্রহণ করেন, যা আল্লাহ্র কৌশল-প্রজ্ঞা শাহ সাহেবের জন্যই নির্ধারিত করে রেখেছিল। মাকামাতে হারীরীর উল্লেখ যদি ভুলক্রমে ছুটে গিয়ে না থাকে, তাহলে এই কিতাব শাহ সাহেবের পাঠ্যসূচীতে অন্তর্ভুক্ত না থাকার কারণে ক্ষতির স্থলে উপকারই হয়ে থাকবে। কেননা পরবর্তীগণ আমভাবে এর আঘাত খেয়েছেন। আর এর কারণে ছন্দ ও অন্তর্মিলের এমন অনুবর্তী লোক, যে অনায়াসে অকপটে মর্মকথা ও মনের ভাব ব্যক্ত করতে সাধারণতঃ অক্ষম দেখা যায়। হারীরীর পরে যে লেখকই কোনও বিষয়ে কলম ধরেছেন হারীরীর কলম দ্বারাই লিখেছেন, যার নিব পুরোনো হয়ে গিয়েছিল। চিঠিপত্র, কিতাবাদির অভিমত এমনকি ফাতওয়ার দীর্ঘ বিবরণও হারীরীর এই প্রভাব থেকে মুক্ত নয়।

শাহ্ সাহেব বলেন, শিক্ষাজীবনেই উচ্চাঙ্গের বিষয়বস্তু মাথায় আসত। যাতে বরাবরই অগ্রগতি অনুভূত হত। মুহতারাম আব্বাজানের ইন্তিকালের পর ১২ বছর পর্যন্ত ধর্মীয় কিতাবাদি যৌক্তিক জ্ঞান-বিদ্যার বই-পুস্তক পড়ানোর পাবন্দী করেছি এবং তখনই প্রত্যেক বিষয় ও শাস্ত্রে চিন্তা-গবেষণা ও মনোনিবেশের সুযোগ হয়েছে।

পিতার স্নেহ, প্রশিক্ষণ, অনুমতি ও খেলাফত

শাহ সাহেব বলেন, সম্মানিত পিতার স্নেহ আমার উপর এমনই ছিল যে, তা খুব কমই হয় কোন পিতার আপন সন্তানের প্রতি, কোন উস্তাদের শাগরেদের প্রতি এবং কোন শায়খের তার মুরীদের প্রতি। হযরত শাহ আবদুর

রহীম সাহেবের তরবিয়ত, দীক্ষাদান ও প্রশিক্ষণের ধরনও ছিল বড় প্রজ্ঞাপূর্ণ। শাহ সাহেব বলেন, শৈশবে একবার বন্ধু ও প্রিয়জনদের এক জামাতের সাথে একটি বাগান ভ্রমণে চলে গেলাম। ফিলে এলে আব্বাজান বললেন, ওয়ালীউল্লাহ! তুমি এই দিনরাত্রিতে তা কি অর্জন করেছ, যা বাকী থাকছে? আমি এই সময়ের মধ্যে এতবার দরূদ পড়েছি। শাহ সাহেব বলেন, একথা শুনে বাগানবিলাস ও আনন্দভ্রমণ থেকে আমার মন একেবারে উঠে গেল। এরপর আর কখনও সে আগ্রহ জাগেনি। শাহ সাহেব বলেন, আব্বাজন আমাকে কর্মকৌশল, মজলিসের শিষ্টাচার, সভ্যতা-ভদ্রতা ও বিচক্ষণতার অনেক বিষয়ই শেখাতেন। প্রায়ই নিম্নোক্ত পংক্তি আবৃত্তি করতেন,

آسائش دو گیتی تفسیر ایں دو حرف است۔
با دوستاں تلطف با دشمناں مدارا۔

বলতেন- আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যারা মর্যাদায় ছোট, তাদের সাথে সর্বদা সালামের ব্যাপারে অগ্রসর থাকবে। তাদের সঙ্গে সবসময় উত্তমভাবে মিলিত হবে। তাদের ভালমন্দ ও কুশলাদি জিজ্ঞাসা করবে আর তাদেরকে সাধারণ বা তুচ্ছ বিষয় বুঝাবে না।

صد ملک دل بہ نیم نگہ می تواں خرید۔
خوباں دریں معاملہ تقصیر می کنند۔

আরও বলতেন, কেউ কেউ বিশেষ কোনও পোশাক কিংবা অভ্যাসের অনুবর্তী হয়ে যায়। কেউ কোনও তাকিয়ে কালাম (কথার ফাঁকে ফাঁকে একই কথা বারবার বলে দম নেওয়া) নির্ধারণ করে নেয়। কেউ কোনও খাবারের ব্যাপারে এতই বিতৃষ্ণ-নিরাসক্ত হয়ে যায় যে, তার কাছে সেটি ঘৃণিত হয়ে যায়। এসব বিষয় থেকে বেঁচে থাকতে হবে। নিজের কোনও ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে যেন নিছক স্বাদ আস্বাদন উদ্দেশ্য না হয়। এতে কোন প্রয়োজন পূরণ, কোনও মর্যাদা লাভ কিংবা সুন্নাত আদায়ের উদ্দেশ্য থাকা উচিৎ। চাল-চলন, উঠাবসায় কোনওভাবেই যেন দুর্বলতা কিংবা আলস্য প্রকাশ না পায়। শাহ সাহেবের বর্ণনা মতে শাহ আবদুর রহীম সাহেব বীরত্ব, সাহসিকতা, বুদ্ধিমত্তা, সুব্যবস্থাপনা ও আত্মসম্ভ্রমবোধ ইত্যাদি উচ্চ গুণাবলির অধিকারী ছিলেন। জাগতিক জ্ঞানেও ছিলেন পারলৌকিক জ্ঞানের মত সুদক্ষ ও পূর্ণাঙ্গ। সকল বিষয়ে মিতাচারকে পছন্দ করতেন। শাহ সাহেবের জীবন-চরিতের মাঝে সেসব বিষয় ছিল পর্যাপ্ত।

শাহ সাহেব তাঁর মুহতারাম পিতার কাছেই চৌদ্দ বছর বয়সে বায়'আত হন এবং আধ্যাত্মিকতায় আত্মনিয়োগ করেন। বিশেষতঃ নকশেবন্দিয়া মাশায়িখের তরীকায় অর্জন করেন তাওয়াজ্জুহ ও তালকীন। পিতাই তাঁকে আদাবে তরীকতের একাংশ শিক্ষা দেন এবং বুযুর্গির খিরকা (বিশেষ পোশাক) পরিধান করান। শাহ সাহেবের বয়স যখন সতের বছর, তখন হযরত আবদুর রহীম সাহেব এই দুনিয়া থেকে বিদায় নেন। তিনি মৃত্যুশয্যায় তাকে বায়'আত ও ইরশাদের অনুমতি দেন। বারবার বলেন, يده كيدى 'তার হাত আমার হাতেরই মত'।

বিবাহ

শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) এর বয়স তখন চৌদ্দ বছর। তার সম্মানিত পিতা তার বিবাহ পড়িয়ে দেন তার মামা শায়খ উবাইদুল্লাহ সিদ্দিকী ফুলতীর কন্যার সঙ্গে। শ্বশুরবাড়ির লোকজন সুযোগ চাইলে শাহ আবদুর রহীম সাহেব অপারগতা প্রকাশ করে বলেন, এতেই মঙ্গল আছে। আর পরবর্তীকালের একের পর এক বংশীয় ঘটনাপ্রবাহ প্রমাণ করে দিয়েছে যে, সে সময় যদি বিয়ে সম্পন্ন না হত, তাহলে এই বিয়ে দীর্ঘদিনের জন্য স্থগিত রাখতে হত। এই স্ত্রীর গর্ভেই তাঁর বড় ছেলে শায়খ মুহাম্মদ জন্মগ্রহণ করেন। যিনি স্বয়ং তার কাছে শিক্ষা লাভ করেন। শাহ সাহেব তার জন্য একটি প্রাথমিক পুস্তিকাও রচনা করেছিলেন। শায়খ মুহাম্মদ ছিলেন কারী এবং শামায়েলে তিরমিযীর সবকে শাহ আবদুল আযীয (র)-এর সহপাঠী।

শাহ সাহেবের মৃত্যুর পর তিনি বড়হানা গ্রামে স্থানান্তরিত হয়ে যান। দীর্ঘদিন সেখানেই অবস্থান করে ১২০৮ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তাকে গ্রামের জামে মসজিদের বারান্দায় দাফন করা হয়। শাহ সাহেবকে আবু মুহাম্মদ উপনামে ডাকা হত এ কারণেই। শায়খ মুহাম্মদের দুই পুত্রের বর্ণনা মাকালাতে তরীকতের আলোচনায় পাওয়া যায়, যারা তার সঙ্গেই সমাহিত হয়েছেন। কিন্তু বই-পুস্তকে তাদেরকে منقطع العقب (নিঃসন্তান) লেখা হয়েছে। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) হযরত শাহ আবু সাঈদ রায়বেরেলীর নামে তিনটি পত্রে বুযুর্গ ভাই শায়খ মুহাম্মদ ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) কে সালাম জানিয়েছেন। তাতে কোথাও 'বুযুর্গ ভাই শায়খ মুহাম্মদ সাহেব' আবার কোন চিঠিতে 'শায়খে কাবীর মুহাম্মদ' নামে সালাম জানিয়েছেন। এসব চিঠিতে ভাইদের পরস্পর হৃদ্যতা ও সুসম্পর্কের অনুমান করা যায়।

দ্বিতীয় বিবাহ

শাহ সাহেবের দ্বিতীয় বিয়ে হয় প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সাইয়িদ সানাউল্লাহ সোনাপতীর কন্যা বিবি ইরাদতের সঙ্গে। যিনি ছিলেন সোনাপতের বাসিন্দা সাইয়িদ নাসিরুদ্দীন শহীদ সোনাপতীর বংশধর। এই স্ত্রীর উদরে শাহ সাহেবের খ্যাতিমান চার পুত্র হযরত শাহ আবদুল আযীয (র), শাহ রফীউদ্দীন (র), শাহ আবদুল কাদির (র) ও শাহ আবদুল গণী (র) জন্মগ্রহণ করেন। যারা ছিলেন ভারতবর্ষে দীন-ধর্মের পুনর্জাগরণের 'চার সদস্য'। আমাতুল আযীয নামে এক কন্যাও জন্মগ্রহণ করেন। তার বিয়ে হয় মাওলানা মুহাম্মদ ফাইক ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ আশেক ফুলতীর সঙ্গে। তিনি ছিলেন কয়েক সন্তানের জনক। তার থেকে বংশধারা চালু থাকে।

হজ্জে গমন

শাহ সাহেবের জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা, চিন্তা-চেতনা, দাওয়াতী ও সংস্কারমূলক জীবনে পবিত্র হিজাযের সফর ও অবস্থান এক ঐতিহাসিক ঘটনা এবং তার জীবন গ্রন্থের এক নতুন অধ্যায় ও প্রভেদ সীমা। হিজাযের এই এক বছরাধিক সময় অবস্থানকালে তার চিন্তাগত ও শিক্ষামূলক শক্তি উন্নতির সেসব আসন অতিক্রম করে, যা বাহ্যতঃ ভারতে সম্ভব ছিল না। তজ্জন্য প্রয়োজন ছিল হারামাইন শরীফাইনের মত কেন্দ্রীয় বিশ্বময় স্থানই। এ সফরেই তিনি ইলমে হাদীসের ব্যাপক ও গভীর মুতালা'আ করেছেন। হাদীস শাস্ত্রের যেসব কামিল শায়খগণ বিভিন্ন শহর-নগর থেকে এসে সেখানে সমবেত হয়েছিলেন, তাদের কাছে এই পবিত্র শাস্ত্রের অধ্যয়ন সম্পন্ন করেছেন, যা ছিল তার সংস্কার-সংশোধনের সুউচ্চ প্রাসাদে মুক্তার পাথর সমতূল্য। যার মাধ্যমে তিনি জ্ঞান-গবেষণা ও ইজহিতাদের সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হয়েছেন, যেখানে এই শেষ শতকগুলোতে খুব কম লোক (এবং যতদূর শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও রহস্যভেদ এবং ফিকাহ ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্যতা বিধানের সম্পর্ক রয়েছে) পৌঁছুতে পেরেছে।

হজ্জের সফরকালে শাহ সাহেবের বয়স ছিল ত্রিশ বছর। সে সময়কার রাজনৈতিক অবস্থা, পথঘাটের নিরাপত্তা পরিস্থিতি, কিছু বিদেশী শক্তির আগ্রাসন, স্থল ও সমুদ্রপথের নানা বিপদাশঙ্কা ও লুটতরাজ-ডাকাতির পরিপ্রেক্ষিতে এই সফর তার উচ্চ সাহস, ইলম পিপাসা এবং হারামাইন শরীফাইনের সাথে তার ঐকান্তিক হৃদ্যতারই জ্বলন্ত প্রমাণ। সেই সাথে তার ইসলামী মূল্যবোধ, দূরদর্শীতা, উঁচু দৃষ্টিভঙ্গিও প্রমাণ করে। কেননা, ভারতবর্ষে দীনের হেফাযত এবং ভারতীয় মুসলমানদের উন্নতি ও স্বকীয়তার

জন্য তাঁর দৃষ্টি কেবল ভারতের অবস্থা-পরিস্থিতি অনুধাবন এবং সেখানেই তার সংস্কার প্রচেষ্টা ও প্রতিকার অনুসন্ধানে সীমাবদ্ধ ছিল না। তিনি কুরআনে কারীমের বালাগাতপূর্ণ ইংগিত يشهدوا منافع لهم এর উপর আমল করে এই প্রাণ (নবুওয়াতী জ্ঞানের) কেন্দ্রস্থল এবং বিশ্বের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে আগত ইসলামের প্রতিনিধিদল আর আল্লাহর মেহমানদের ইলম ও মা'আরিফ, জ্ঞান-বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা-গবেষণা ও চেষ্টা দ্বারা উপকৃত হতে চাইতেন।

সে সময় সূর্ত ছিল ভারতের বন্দর ও মক্কার দরজা। পথের স্থানগুলো বিশেষতঃ মালূহ ও গুজরাট ছিল মারাঠীদের লুটতরাজ ও দস্যুতার কেন্দ্রস্থল। উত্তর ভারত থেকে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত এই দীর্ঘপথ সে সময় যানবাহন, অশ্বারোহণ, এক্কাগাড়ি ইত্যাদির মাধ্যমে অতিক্রম করা সহজ ব্যাপার ছিল না। ভারত সাগর এবং ভারত মহাসাগরের আরব-আফ্রিকার মধ্যবর্তী অংশের গোটা উপকূল তখন পর্তুগীজ ও নেদারল্যান্ডের দস্যুদল এবং ফ্রান্স ও বৃটেনের আধিপত্যবাদীদের সামুদ্রিক আক্রমণের আশঙ্কা থেকেও নিরাপদ ছিল না। হাজীদের এসব বিপদাপদ ও দুর্ঘটনাসমূহের বিবরণ সে সময়কার ভ্রমণকাহিনীগুলোতে (যা খুব কমই লিখিত ও সংরক্ষিত রয়েছে) দেখা যেতে পারে। স্বয়ং ভারতের পথঘাটের অবস্থা ছিল এমন যে, রাতে যদি কোনও ব্যক্তি কোন গ্রামে বা জনবসতিতে হারিয়ে যেত, তবে শাহ সাহেব কিংবা বদীউল আজায়েব বা মহান সৃষ্টিকর্তার ওযীফা পাঠ শুরু করে দিত।

তিনি সূর্ত থেকে জিদ্দা পৌঁছেন ৪৫ দিনে। ১৫ যিলকদ মক্কা শরীফে প্রবেশ করেন। উলামায়ে কিরাম ও তালেবে ইলমদের আবেদনের প্রেক্ষিতে মসজিদে হারামে মুসাল্লায়ে হানফীর পাশে দরস শুরু করেন। যেখানে অনেক ভীড় জমে যায়।

শাহ সাহেব 'আল-জুযউল লাতীফ' গ্রন্থে লিখেন, ১১৪৩ হিজরীতে হারামাইন শরীফাইন যিয়ারতের আগ্রহ প্রবল হয়ে যায়। ১১৪৩ হিজরীর শেষ দিকে (যিলহজ্জ মাসে) হজ্জ পালনের সৌভাগ্য হয়। ১১৪৪ হিজরী পর্যন্ত তিনি বাইতুল্লাহর নৈকট্য লাভ করেন। অনন্তর মদীনা শরীফ যিয়ারতে ধন্য হন। শায়খ আবু তাহের মাদানী এবং অন্যান্য মাশায়িখে হারামাইন থেকে হাদীস বর্ণনা করেন। উলামায়ে হারামাইনের সঙ্গে উঠাবসা করেন। শায়খ আবু তাহের খিরকা পরিধান করান, যা ছিল প্রায় সূফীগণের সকল খিরকার সমন্বয়ে। এ বছর শেষে ১১৪৪ হিজরীতে পুনরায় তিনি হজ্জব্রত পালন করেন। ১১৪৫ হিজরীর প্রথম দিকে ভারত রওয়ানা হন এবং ১০ রজব ১১৪৫ হিজরী শুক্রবার সুস্থ ও নিরাপদে নিজের আবাসস্থল দিল্লীতে প্রত্যাবর্তন করেন।

শাহ্ সাহেবের হারামাইন শরীফের উস্তাদ ও মাশায়িখ

শাহ্ সাহেব হারামাইন শরীফের মাশায়িখ ও উস্তাদগণের পরিচিতি ও জীবনী সম্পর্কে পৃথক একটি পুস্তিকা 'ইনসানুল আইন ফী মাশায়িখিল হারামাইন' নামে রচনা করেন। উক্ত পুস্তিকায় তিনি তার খাছ্ শায়খ, ভ্রাতা ও প্রিয় উস্তাদ শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম আল-কুর্দী আল মাদানীর বিস্তারিত পরিচিতি তুলে ধরেছেন। খাছ্ উস্তাদ ও মাশায়িখদের উচ্চ যোগ্যতায় যেহেতু ছাত্র-শিষ্যের উপর গভীর ছোঁয়া লাগে এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, চিন্তা-চেতনা ও গবেষণার বৈপ্লবিক প্রভাব পড়ে, এজন্য তাঁদের আলোচনা কিছুটা বিশদভাবেই করা উচিৎ।

শাহ সাহেব লিখেন, শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম ইলমে হাদীস অর্জন করেছেন তাঁর পিতা শায়খ ইবরাহীম আল-কুর্দী থেকে। এরপর শায়খ হাসান উজাইমা থেকে বেশিরভাগ ফায়দা লাভ করেছেন। এরপর আহমদ নাখলী, শায়খ আবদুল্লাহ বাছারীর নিকট দুই মাসের কম সময়ে শামায়েলে নববী (স), মুসনাদে ইমাম আহমদ পড়েছেন। এ সময়ে তিনি হারামাইন শরীফে আগত উলামায়ে কিরাম থেকে উপকৃত হতে থাকেন। শায়খ আবদুল্লাহ লাহোরী থেকে আবদুল হাকীম শিয়ালকুটী ও শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভীর কিতাবাদি রিওয়ায়াত করার অনুমতি লাভ করেন। শায়খ সাঈদ কোকানীর কাছে কিছু আরবী কিতাব এবং ফাতহুল বারীর একাংশ পড়েন।

'اليانع الجنى' গ্রন্থে আল্লামা মহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারাহ্ লিখেছেন, শায়খ আবু তাহের বলতেন, শায়খ ওয়ালীউল্লাহ আমার থেকে শব্দের সনদ গ্রহণ করেন আর আমি তার থেকে হাদীসের মর্মার্থ অনুধাবনে লাভবান হই। এরূপই লিখেছেন তার অনুমতিপত্রেও।

শায়খ আবু তাহের বড় মাপের মুহাদ্দিস হওয়ার সাথে সাথে সূফীগণের প্রতি বড় শ্রদ্ধাশীল এবং তাদের সমালোচনা করা থেকে বিরত ছিলেন। শাহ সাহেব বলতেন, আমি শায়খ আবু তাহেরের কাছে বিদায় নিতে গেলে তিনি নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন–

نسيت كل طريق كنت أعرفه # الاطريقا يؤينى لربعكم

'আমি ভুলে গিয়েছি সব পথ একটি পথ বিনে,
যে পথ আমায় নিয়ে যায় তোমার দুয়ারে টেনে।

এ জবাবই ছিল শাহ সাহেবেরও। শাহ্ আবদুল আযীয সাহেব বলেন, আমার আব্বাজান মদীনা থেকে প্রত্যাবর্তনকালে স্বীয় উস্তাদের কাছে এ

বিষয়টি আরয করলে তিনি একথা শুনে বিরাট খুশি হলেন যে, আমি ইলমে দীন ও হাদীস ছাড়া যা কিছু পড়েছি সব ভুলে গিয়েছি।

শাহ সাহেবের পরবর্তী জীবন ও কর্মকাণ্ডে (যার বিশদ বিবরণ অত্যাসন্ন) এর পূর্ণ সত্যায়ন করে। তিনি যা কিছু বলেছিলেন, তা বাস্তবায়িত করে দেখিয়ে দিয়েছেন।

من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. (سورة احزاب : ٢٣)

১১৪৫ হিজরী রমযান মাসে শায়খ আবু তাহের এই নশ্বর পৃথিবী ছেড়ে পরপারে পাড়ি জমান। সম্ভবতঃ শাহ সাহেবের মদীনা শরীফ থেকে প্রস্থান এবং তার দিল্লী পৌঁছার দেড়-দুই মাস পর তার ইন্তিকাল হয়েছে। আর শাহ সাহেবের ভারত প্রত্যাবর্তনের পর তার ইফাদাহ ও তরবিয়ত লাভের খুব কম সময় পেয়েছেন। وذلك تقدير العزيز العليم.

তার জীবনের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, তার সম্মানিত পিতা শায়খ ইবরাহীম কাওরানী ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর পক্ষ থেকে জবাব দিতেন। আল্লামা সাইয়িদ নুমান খয়রুদ্দীন আলূসী বাগদাদী তার বিখ্যাত গ্রন্থ 'জালাউল আইনাইন ফী মুহাকামাতিল আহমদাইন' -এর মধ্যে লিখেছেন, তিনি ছিলেন প্রবীণদের আকীদায় বিশ্বাসী। শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়ার পক্ষ থেকে জবাব দিতেন। অনুরূপভাবে সূফীদের সেসব শব্দের ব্যাখ্যা দিতেন, যার দ্বারা বাহ্যিকভাবে অনুপ্রবেশ, একতা কিংবা আইনিয়ত (স্বাধিষ্ঠতা) প্রকাশ পেত।

সুতরাং এ সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া যায় যে, শায়খুল ইসলামের কিতাবাদি থেকে পরিচয়, তার সাহায্য ও প্রতিরক্ষা বা জবাবদানের যে বর্ণনা শাহ সাহেবের রচনাবলিতে পাওয়া যায়, তাছাড়া শাহ সাহেবের বংশগত ধারাবাহিকতা ও উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এই সামঞ্জস্যপূর্ণ চিন্তাধারায় শায়খ আবু তাহেরের কথাবার্তারও প্রভাব ও দখল থাকতে পারে, যার আগ্রহ-ঝোঁক তিনি তার সম্মানিত পিতা ইবরাহীম কাওরানী থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকবেন।

শাহ সাহেবের দ্বিতীয় শায়খ, যার থেকে তিনি ইজাযত (অনুমতি) পেয়েছিলেন, তিনি হলেন শায়খ তাজুদ্দীন কলঈ হানফী মুফতীয়ে মক্কা। হাদীস শাস্ত্রে সিংহভাগ শিক্ষা লাভ করেন শায়খ আবদুল্লাহ ইবনে সালেম মিসরীর কাছে। সহীহাইন পড়েছেন শায়খ উজাইমির নিকট। তার থেকে নিঃশর্ত ইজাযতও লাভ করেন। তার শায়খ আহমদ নাখলী থেকেও ইজাযত রয়েছে। শাহ সাহেব তিনদিন তার বুখারীর সবকে অংশগ্রহণ করেছেন। সিহাহ সিত্তাহর বিভিন্ন অংশ, মুয়াত্তার একাংশ, মুসনাদে দারেমী, ইমাম

মুহাম্মদ (র)-এর 'কিতাবুল আছার' ও মুয়াত্তা তার থেকে শ্রবণ করেন। শায়খ এসব কিতাবের সবকে উপস্থিত সকলকে ইজাযত দেন। শাহ সাহেবও এতে শরীক ছিলেন। শাহ সাহেব হাদীসে মুসালসাল বিল আউয়্যালিয়্যাহও তার কাছ থেকে শ্রবণ করেন।

শাহ সাহেব হাফিযে হাদীস, বহুমুখী প্রতিভা ও যোগ্যতার অধিকারী শায়খ মুহাম্মদ বিনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান আল-মাগরিবী (যিনি ছিলেন নুসখায়ে বানূনিয়াহর সত্ত্বাধিকারী। তিনি এটি হারামাইন শরীফে নিয়ে এসেছিলেন এবং তিনি ছিলেন হারামাইনের লোকদের উস্তাদ) -এর পুত্র শায়খ মুহাম্মদ ওফদুল্লাহ থেকে আপন পিতার সকল বর্ণনার ইজাযত লাভ করেন। এছাড়া তার কাছে মুয়াত্তায়ে ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া পুরোটাই পড়েন ও ইজাযত নেন।

শাহ সাহেব তার শিক্ষাজীবনে ভারতে হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন ইমাম শায়খ মুহাম্মদ আফযাল শিয়ালকুটীর সবকেও অংশ নিয়েছিলেন। যিনি হাদীসের সনদ হাসিল করেছিলেন শায়খ সালেম ইবনে আবদুল্লাহ বসরী থেকে এবং তার কাছে হাদীস পড়েছিলেন। তিনি শায়খ আবদুল আহাদ ইবনে খাজা মুহাম্মদ সাঈদ সরহিন্দীরও শাগরেদ। তিনি হাদীসের দরস দিতেন দিল্লীর গাজী আদ-দীন খানের মাদরাসা। হযরত মির্যা জানে জানাঁ রহ. হাদীস ও সুলূকে তার থেকে উপকৃত হন।

এই সফরে শাহ সাহেবের মামা উবাইদুল্লাহ বারাহবী ও তার মামাতো ভাই শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতীও (القول الجلى রচয়িতা) সঙ্গে ছিলেন। শাহ সাহেব তার সম্মানিত পিতার মৃত্যু সংবাদ এই সফর থেকে প্রস্থানকালে মক্কা শরীফে শুনেছেন।

শাহ সাহেবের জন্য হাদীস শাস্ত্রের বিশেষ আগ্রহ-আকর্ষণ, হারামাইন শরীফে এর পাঠদান ও প্রসারের সহজ সুযোগ, সেখানে বসে বিভিন্ন দেশ থেকে আগত তালেবে ইলম ও উলামায়ে কিরামকে উপকৃত করার অবকাশ, অধিকন্তু বাইতুল্লাহর সান্নিধ্য, নবীজীর নৈকট্যের বরকত ও সৌভাগ্য, ভারতবর্ষের অনিশ্চিত অবস্থা-পরিস্থিতি, ইসলামী রাজত্ব ধ্বংসের পদক্ষেপ এবং বহির্শক্তির ক্রমবর্ধমান আগ্রসানের উপলব্ধি হিজাযে স্বকীয় অবস্থান ও হিজরতের ইচ্ছাকে শক্তিশালী করার কারণ ও প্রেরণা ছিল। আর না তা কেবল তার বৈধতার দলীল-প্রমাণ বরং ধর্মীয় ও শিক্ষাগত কল্যাণের সমর্থনও যোগাত। কিন্তু তিনি ভারত প্রত্যাবর্তনের সেই যুগান্তকারী সিদ্ধান্ত নিলেন, যার মধ্যে মহান আল্লাহ তা'আলা এমন সব কল্যাণ অন্তর্নিহিত

রেখেছিলেন, তার সংস্কার, ইজতিহাদ ও গবেষণামূলক কর্মকাণ্ডে যার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। বাস্তবায়িত হয়েছে সেই নববী সুসংবাদ, যা তিনি মদীনা তাইয়িবায় অবস্থানকালে লাভ করেছিলেন।

إن مراد الحق فيك ان يجمع شملا من شمل الأمة المرحومة بك.

'আল্লাহর ইচ্ছা হল, তোমার দ্বারা মৃতপ্রায় জাতির বিশেষ এক ঐক্য-সংহতির কাজ নিবেন।'

শাহ্ সাহেবের নিছক নিজের ব্যাপারেই নয় বরং তার ঘনিষ্ঠ সঙ্গী-সাথীদের ব্যাপারেও চিন্তা-ভাবনা ছিল, তারা ভারতকে আপন কর্মতৎপরতা এবং শিক্ষামূলক ও ধর্মীয় খেদমতের কেন্দ্রস্থল বানাবেন। যে দেশে তাদের পূর্বপুরুষগণ নিজেদের উত্তমতর শিক্ষা ও ধর্মীয় যোগ্যতা-দক্ষতাগুলো ব্যয় করেছেন। যা প্রত্যেক যুগেই তৈরী করেছে গবেষক, পণ্ডিত ও আরেফ বিল্লাহ। এই ভারত অদূর ভবিষ্যতে ইলমে হাদীস এবং অন্যান্য জ্ঞানের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হওয়ার ফায়সালা ছিল। সুতরাং তাঁর এক খাছ শাগরেদ মঈনুদ্দীন সিন্ধী হিজায গিয়ে যখন সেখানেই থেকে যাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, তখন শাহ্ সাহেব তাকে এ থেকে বারণ করে পত্র লিখেন– স্বদেশে না ফেরার ইচ্ছা তোমার যতদূর, তাতে এখনই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং এ নিয়ে পীড়াপীড়ি করো না, যাবৎ না আল্লাহ্ তা'আলা তোমাকে কিংবা তোমার ঘনিষ্ঠ কাউকে আশ্বস্ত করেন।

শাহ্ সাহেবের হাদীসের দরস

শাহ্ সাহেব হিজায থেকে ফিরে আসার পর স্বীয় পিতার মাদরাসায়ে রহীমিয়ায় শিক্ষকতা শুরু করেন, যা সে সময় পুরোনো দিল্লীতে সেই মহল্লায় অবস্থিত ছিল (বর্তমান যা বিলীন হয়ে গেছে)। কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে দিক-দিগন্ত থেকে তালিবে ইলমগণ দলে দলে আসতে থাকে। তখন সেখানে স্থান সংকুলান হচ্ছিল না। আল্লাহ্ তা'আলা এই সৌভাগ্য (অনেক দুর্বলতা ও অসহায়ত্বসহ) সম্রাট মুহাম্মদ শাহের ভাগ্যে লিখেছিলেন। তিনি শাহ্ সাহেবকে শহরে এক বিশাল ভবন দিয়ে তাকে শহরে নিয়ে আসেন। তিনি সেখানে দরসদান শুরু করেন। মৌলভী বশীরুদ্দীন লিখেন, কোন এককালে এই ভবন অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় ও আলীশান ছিল। বড় শিক্ষাকেন্দ্র ও দারুল উলূম মনে করা হত। বিদ্রোহ পর্যন্ত এই মাদরাসা তার আসল অবস্থায় বহাল ছিল। বিদ্রোহের মধ্যে ভবনগুলো লুটতরাজ করা হয়। কাঠ-কড়া পর্যন্ত মানুষ লুট করে নিয়ে যায়।

মাওলানা আরও লিখেন- আজ বিভিন্ন লোকের ঘর-দুয়ার এখানে তৈরী হয়েছে। কিন্তু মহল্লাকে আজও শাহ আবদুল আযীয (র)-এর মাদরাসার নামে ডাকা হয়।

শাহ আবদুল আযীয সাহেবের মালফূযাতের এক স্থানে এই মাদরাসা-মসজিদের কথা উল্লেখ আছে। শাহ সাহেব বলেন, '(আমার জন্মের সময়) অনেক বুযুর্গ-ওয়ালীআল্লাহ, যারা আব্বাজানের প্রিয়ভাজন ও ঘনিষ্ঠদের অন্তর্ভুক্ত ছিলেন, যেমন- মুহাম্মাদ আশেক ও মাওলানা নূর মুহাম্মদ প্রমুখ এই মসজিদে অবস্থান করতেন।'

'নুযহাতুল খাওয়াতির' রচয়িতা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই সাহেব (১৩১২ হি./১৮৯৪ খৃ.) দিল্লী ও তার আশপাশ সফর করেন। ২৬ রজবের কর্ম-তালিকায় তিনি লিখেন, 'মিয়া সাইয়িদ নযীর হুসাইন সাহেবের দরসে থেকে আসার পর আমি মনস্থ করলাম, হযরত মাওলানা ও সকলের অভিভাবক, বিজ্ঞমহলের নেতা শাহ আবদুল আযীয রূহুল্লাহর মাদরাসা যিয়ারত করব, যেখানে আমাদের বুযুর্গগণ একের পর এক উপকার লাভ করেছেন। গৌরব ও সৌভাগ্যময় মনে করেছেন যার পুণ্যভূমিকে। সেখান থেকে জামে মসজিদ ও তার সম্মুখে বিচিত্র রঙের কবর পর্যন্ত গেলেন। এই কবর থেকে দু'টি পথ চলে গেছে। একটি ডান পাশে সোজা (শাহ গোলাম আলীর) খানকার দিকে। অপরটি বাম দিকে। এ পথ ধরে তিনি অনেক দূর চলে গেলেন। সামনে এগিয়ে বাম দিকে ফূলাদ খান মহল্লার সড়ক। সেটি সোজা চলে গেছে কুলামহল পর্যন্ত। কুলামহলে আছে আমাদের শায়খুল মাশায়িখ মাওলানা ও আমাদের অনুসৃত মুর্শিদের মাদরাসা। এর অবস্থাদৃষ্টে স্মরণ হয়ে যায় আল্লাহর বাণী-

خاوية على عروشها. قال انى يحى هذه الله بعد موتها

আল্লাহু আকবার। মহান আল্লাহর অপার কুদরতের কি বিস্ময়কর কারিশমা। একদিন আরব-অনারবের লোকজন এ মাদরাসায় তনুমনে পড়ে থাকত এবং ফায়দা হাসিল করত। আর আজ তা পড়ে আছে বিরান-পরিত্যক্ত। থাকার কেউ নেই এখানে।'

অনন্তর এ বংশেরই এক স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব মাওলানা সাইয়িদ যহীরুদ্দীন আহমদ সাহেবের বর্ণনা থেকে উদ্ধৃত করেন, যে মুনহাদীউতে এসব হযরতের মাজার রয়েছে, সেখানে মাদরাসাও ছিল। শাহ আবদুর রহীম সাহেবের পরে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) নতুন শহরে আসেন। এই মাদরাসা তাকে দেওয়া হয়। তিনি সেখানেই থেকে যান।

হযরত আবদুল আযীয (র) -এর ভাষায় শাহ সাহেবের কিছু বৈশিষ্ট্য

আক্ষেপ! শত আক্ষেপ! সমকালীন কোনও স্মারক, ভ্রমণকাহিনী কিংবা রোজনামচা সম্মুখে নেই, যার দ্বারা শাহ সাহেবের গুণাবলি, বৈশিষ্ট্য, কর্মকাণ্ড-মামুলাত, সময়ানুবর্তিতা ও উঠা-বসার অবস্থা বিস্তারিতভাবে জানা যায়। হযরত আবদুল আযীয (র)-এর মালফুযাতে (ফার্সীতে) কোথাও কোথাও কিছু ইংগিত এসেছে।

তিনি বলেন, আমি আমার আব্বাজানের মত প্রখর ধীমান স্মরণশক্তির অধিকারী কাউকে দেখিনি। শোনার কথা তো অস্বীকার করতে পারি না, তবে চাক্ষুষ আমি দেখিনি। জ্ঞান-বিদ্যা ও নানামুখী যোগ্যতা ছাড়া সময়ানুবর্তিতায়ও তার তুলনা ছিল না। ইশরাকের পর যেভাবে বসতেন, দুপুর পর্যন্ত না পা বদলাতেন; না চুলকাতেন আর না থুথু ফেলতেন। প্রত্যেক শাস্ত্রে একেকজন লোক তৈরী করে দিয়েছিলেন। সে শাস্ত্রের ছাত্রদেরকে তার হাতেই ন্যস্ত করতেন। আর স্বয়ং তিনি হাকীকত-মারেফত বর্ণনা এবং সেসব সংকলন রচনায় ব্যস্ত থাকতেন। হাদীস মুতালা'আ ও দরস দিতেন। যে বিষয় বিকশিত হয়ে যেত, তা লিখে নিতেন। অসুস্থ হতেন খুব কম। মহান দাদা ও মুহতারাম চাচা (যিনি চিকিৎসক ছিলেন) মানুষের চিকিৎসা করতেন। আব্বাজান এই পেশাকে স্থগিত রাখেন। তবে চিকিৎসা সম্পর্কিত বই-পুস্তক মুতালা'আ করতেন। শৈশব থেকেই মন-মানসে স্বচ্ছতা, পরিচ্ছন্নতা ও নমনীয়তা ছিল। সূফী ধরনের ছন্দ-কবিতা কম পড়তেন। তবে মাঝে মধ্যে কোনও কোনও কবিতা পড়তেন।

ইন্তিকাল

অবশেষে এই অমূল্য বরকতময় জীবনের– যার এক একটি মুহূর্ত ছিল অতি মূল্যবান, ইসলাম ও মুসলিম উম্মাহর কল্যাণে নিবেদিত, সুন্নাতে রাসূলের পুনর্জীবন দান, কুরআন-হাদীসের প্রচার-প্রসার, তালীম-তরবিয়ত, আল্লাহর স্মরণ ও ইলায়ে কালিমাতিল্লাহর চিন্তায় বিভোর, তার শুভ সমাপ্তির দিন এসে পড়ে। যার ছোবল থেকে كل نفس ذائقة الموت (প্রত্যেক প্রাণীই মরণশীল) -এর ঘোষণা ও প্রতিশ্রুতি অনুসারে না কোনও নবী-রাসূল মুক্ত, না কোনও ওয়ালীআল্লাহ, না কোন মুজাদ্দিদ, না কোনও মুজাহিদ। ১১৭৬ হিজরীর শুরু লগ্ন। মুহররমের শেষ দিন, সেই প্রতিশ্রুত সময় এসে পড়ে।

হযরত শাহ সাহেব সাময়িক অসুস্থতার পর ষাট বছর বয়সে এই নশ্বর পৃথিবীকে বিদায় জানান এবং নিজের প্রাণকে তার স্রষ্টার কুদরতে সমর্পণ করেন।

چیست ازیں خوب تر در ہمہ آفاق کار۔

دوست رسد نزد دوست یار بہ نزدیک یار۔

কোনও স্মারক গ্রন্থে তাঁর এ অসুস্থতা ও মৃত্যুর ঘটনার বিশদ বিবরণ পাওয়া যায় না। অধম লেখকের জন্য বড় গৌরব ও কৃতজ্ঞের বিষয় হল, এ ব্যাপারে যতখানি ধারণা ও বিবরণ পাওয়া যায়, তার একমাত্র মাধ্যম রায়বেরেলীর সাদাত হাসানী কুতবী এবং আলামুল্লাহ বংশেরই এক বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব সাইয়িদ মুহাম্মদ নুমান হাসানীর রচনাবলি, যা এ বংশেরই অপর এক বুযুর্গ ও বিখ্যাত ব্যক্তিত্ব হযরত শাহ সাইয়িদ আবু সাঈদ (র)-এর নামে শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পরপরই দিল্লী থেকে লিখেছিলেন। লেখক হযরত সাইয়িদ নুমান ছিলেন মহান মুজাহিদ হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)-এর আপন চাচা। যার উদ্দেশ্যে লেখা, তিনি (হযরত শাহ সাইয়িদ আবু সাইদ (র)) ছিলেন হযরত সাইয়িদ সাহেবের আপন নানা। আর হযরত শাহ আবু সাঈদ (র) ছিলেন শাহ সাহেবের খাছ সঙ্গী ও মুরীদগণের একজন। যার নামে স্বয়ং শাহ সাহেবের একাধিক চিঠিপত্র রয়েছে। উক্ত চিঠিপত্র হুবহু পত্রসমগ্র 'মাকতুবুল মা'আরিফ' থেকে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

'বিসমিহী সুবহানাহু তা'আলা!

সকল প্রশংসা আল্লাহর, তার অফুরন্ত নেয়ামতরাজি ও নিয়তির উপর সন্তুষ্ট থাকার এবং সকল বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণের তাওফীক লাভের ওপর। অসংখ্য দরূদ-সালাম বর্ষিত হোক শোকরগুযারদের সরদার, অনন্য সন্তুষ্ট চিত্ত, ধৈর্যশীলদের দিশারী, পাপীদের সুপারিশকারী এবং উভয় জগতের রহমত মুহাম্মদ রাসূলুল্লাহ (স) এবং তার পুতঃপবিত্র সঙ্গী-সাথীদের প্রতি আর তার উত্তরাধিকারী মজবুত উলামায়ে কিরাম ও মুর্শিদ ওয়ালীআল্লাহর উপর কিয়ামত পর্যন্ত।

পরকথা আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের ইমাম, কারামাতওয়ালাদের অনুসৃত নেতা, সমকালীন আরিফদের পথপ্রদর্শক, বিশ্ব আউলিয়াদের শিরোমণি, যুগশ্রেষ্ঠ কুতুব, বিজ্ঞজনদের প্রিয়পাত্র, আমাদের সরদার ও মুর্শিদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ ফারুকী বারো শতকের মুজাদ্দিদ (রা)-এর অন্তিম যাত্রার বিবরণ যদি যুগের ডায়েরীতে মুদ্রিত হয়, তাহলে আমরা নিঃস্ব অসহায়দের মত হয়ে যাব।

[illegible] ☆ [illegible]

আক্ষেপ! আল্লাহ পাকের কি বিস্ময়কর অমুখাপেক্ষীতা! এমন অনুসৃত দিশারীর আত্মাকে মাত্র বাষট্টি বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে ارجعى إلى ربك راضية مرضية (সূরা ফাজর : ২৮)-এর আহবান শুনিয়ে দেওয়া হল। বিদ'আতী ও গোমরাহ-পথভ্রষ্টদেরকে খুশি আর দীনদার-ধর্মপ্রাণদেরকে ব্যথিত করা হল অর্থাৎ মুহররমের শেষ দিন ১১৭৬ হিজরী শনিবার দ্বিপ্রহরের সময় আল্লাহ্ পাকের হুকুমে হযরতের পুণ্যময় আত্মা মাটির দেহ ছেড়ে জান্নাতের উচ্চাসনে নিজের বাসস্থান বানিয়ে নিয়েছে।

সকল সঙ্গী-সাথী ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের অবস্থা হযরতের বিদায়-বিরহে এতটাই বিধ্বস্ত ও ক্ষত-বিক্ষত ছিল যে, তা ভাষায় ব্যক্ত করা অসম্ভব। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। তার উপর এবং তার সহযোগীদের উপর আল্লাহর রহমত বর্ষিত হোক। লেখার উদ্দেশ্য হচ্ছে, আল্লাহ তা'আলার অপার অনুগ্রহ এবং রাসূলে কারীম (স)-এর দয়ায় স্বয়ং হযরতের চেষ্টা-সংগ্রাম নিজের প্রতি আকৃষ্ট করেছে। যিলকদ মাসে বড়হান গিয়ে হস্তচুম্বনের সৌভাগ্য লাভ করেছি। ধন্য হয়েছি মহান এই বুযুর্গের সাহচর্য লাভে। নিজের অবস্থায় প্রভূত উন্নতি লক্ষ্য করেছি হযরতের তাওয়াজ্জুহ ও অন্তর্দৃষ্টিতে। সেখান থেকে হযরত চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ৯ যিলহজ্জ দিল্লীতে বাবা ফযলুল্লাহর বাড়িতে রওশন দৌলাহ মসজিদের আঙ্গিনায় (যা সাদুল্লাহ খান চত্ত্বরে অবস্থিত) তাশরীফ রাখেন। সুযোগ্য পুত্রদের মধ্য থেকে মিয়াঁ মুহাম্মদ সাহেব, মিয়াঁ আবদুল আযীয ও মিয়া রফীউদ্দীন আর মুরীদ ও শুভাকাঙ্ক্ষীদের মধ্যে মিয়াঁ মুহাম্মদ আশেক, মিয়াঁ মুহাম্মদ ফায়েক, মিয়াঁ মুহাম্মদ জাওয়াদ এবং খাজা মুহাম্মদ আমীন প্রমুখ ঘনিষ্ঠজন খেদমতে উপস্থিত ছিলেন। এই খাদেম এবং মীর মুহাম্মদ আতীক ও মীর কাসেম আলী (যারা হযরতের কাছে তার জীবন সায়াহ্নে বায়'আত হওয়ার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন) প্রতিদিন হাজিরা দেওয়া ও খেদমত করার খোশনসীব অর্জন করেছিল। আমার স্নেহাস্পদ! এই শেষ মজলিস ছিল অত্যন্ত বরকতপূর্ণ ও কল্যাণকর। ফিরিশতা ও পুণ্যাত্মাদের অবতরণ বরাবরই অনুভূত হত। বৃষ্টির মত বর্ষিত হত তাঁর ভালবাসা ও রহমতের নিঃশ্বাস আর কল্যাণ ও বরকতের বারিধারা। প্রায় আহলে নিসবত শুভাকাঙ্ক্ষীগণ তাদের সঠিক জ্ঞান দিয়ে তা উপলব্ধি করতেন।

বড় আক্ষেপ! আহলুল্লাহ ও আরেফ বিল্লাহ্ তো সর্বকালেই হয়ে থাকে। কিন্তু আল্লাহর এমন খাঁটি প্রিয় বান্দা, যিনি ছিলেন একদিকে বহু প্রশংসিত গুণাবলির অধিকারী; অপরদিকে কুরআন-সুন্নাহর ইলম-জ্ঞানে মুজতাহিদে

মুতলাক-এর মর্যাদায় অধিষ্ঠিত, হাকায়েক ও মা'আরিফের উত্তাল সমুদ্র এবং অন্যান্য জ্ঞানের খরস্রোতা সাগর কোন্ শতকে জন্ম নিয়েছেন?

[illegible]

[illegible]

বন্ধুদের উচিৎ সবর ও ধৈর্যশীলতা অবলম্বন করা, শায়খের সাহচর্যকে পুরোপুরি সাহসিকতার সাথে অনুভবে রেখে নির্দিষ্ট মুরাকাবায় নিমগ্ন হওয়া। ইনশাআল্লাহ সাহচর্য ও সংশ্রবের কল্যাণের ধারা জারি থাকবে। যেমনটি জানা যায় হযরতের কোনও কোনও পুস্তিকা থেকে।

আলহামদুলিল্লাহ! আপনার প্রতি হযরতের সন্তুষ্টি এবং আপনার প্রতি হযরতের উচ্চ অন্তর্দৃষ্টি বর্ণনার উর্ধ্বে পেয়েছি। প্রায় সময় আপনার অবস্থা জিজ্ঞাসা করতেন। আউলিয়ায়ে কিরামের যুদ্ধ এবং আপনার রণাঙ্গণের কেন্দ্রস্থলে পৌঁছা আর ফিৎনার আগুন থেকে আপনার পবিত্র কদম মুক্ত হয়ে যাওয়ার ঘটনা চমৎকার ভাষায় বর্ণনা করতেন। সম্ভবঃ হযরতের অন্তরে আপনার সাথে শেষ সাক্ষাতের বাসনা ছিল। কেননা, একবার বলেছিলেন, 'মীর আবু সাঈদ সাক্ষাতে আসার ইচ্ছা পোষণ করে। শীঘ্রই এলে ভাল হত।'

বন্ধু! হযরতের প্রকাশ্য সংস্পর্শ থেকে তো আজ বঞ্চিত। তবে হযরতের রচনাবলির সংখ্যা নব্বই বরং তদপেক্ষাও বেশি। ধর্মীয় জ্ঞান অর্থাৎ তাফসীর ও উসূল, ফিকাহ ও কালাম এবং হাদীস সম্পর্কে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ, আসরারে ফিকাহ, মানসূর (উদ্দেশ্য অজ্ঞাত একটি কিতাব), ইযালাতুল খফা আন খেলাফাতিল খুলাফা ও তরজমায়ে কুরআন -তন্মধ্যে প্রত্যেকটিরই কলেবর আশি/নব্বই খণ্ড হবে। হাকায়েক ও মা'আরেফ সম্পর্কে অন্যান্য পুস্তিকা যেমন– আলতাফুল কুদস, হামআতু ফুয়ুযিল হারামাইন, আনফাসুল আরেফীন প্রভৃতি, যেগুলো হযরতের সাহচর্য ও বরকতের ইংগিত করে। এসবের ব্যাপারে আপনি সাহস সঞ্চয় করুন যে, এগুলোকে লিখে ছাপিয়ে প্রচার করবেন। এ কাজ সামান্য মনোযোগিতার দ্বারাই বাস্তবায়িত হয়ে যাবে। আল্লাহ তা'আলাই ভাল জানেন, ইসলামের ইতিহাসে এরূপ কিতাবাদি রচিত হয়েছে কি না? যেমনটি অভিজ্ঞ মহল স্বীকার করেন। হযরত যে বিষয়েই কলম ধরেছেন, তা মূলনীতির মর্যাদা রাখে।

এ অধম, শায়খ পুত্রগণ এবং হযরতের প্রিয়ভাজনদের (হযরতের সাথে আপনার অশেষ সম্পর্কদৃষ্টে) বিশ্বাস যে, আপনি এই প্রলয়ঙ্করী দুর্ঘটনার সংবাদ শোনামাত্র ফাতিহা পাঠ ও পবিত্র কবর যিয়ারতের লক্ষ্যে দিল্লীর পথে

রওয়ানা হয়ে যাবেন। এজন্য অপেক্ষায় থাকব। যদি শীঘ্রই আসেন, তবে মনিবের মহান সাক্ষাতে আমিও তাৎক্ষণিক খুশী হব। যদি আসতে বিলম্ব হয়, তবে অবহিত করবেন। কারণ, আমি অধমও স্বদেশে ফেরার ইচ্ছা করছি।

দ্বিতীয় কথা হল, মিয়াঁ মুহাম্মদ আশেক সাহেব সালামান্তে বলেন, মীর আবু সাঈদকে লিখে দিন, আপনার নামে হযরতের যতগুলো পত্র আছে, তার প্রতিলিপি অবশ্যই পাঠাবেন। যাতে করে সেগুলোকে 'পত্র সমগ্রে' সন্নিবেশিত করা যায়। হযরত মিয়াঁ আহলুল্লাহ সাহেব অন্যান্য বন্ধু-আহবাব, শুভাকাঙ্ক্ষী ও পুত্রদের পক্ষ থেকে নাম ধরে সালাম পৌঁছাবেন। ভাই মুহাম্মদ মঈনের অন্তিম যাত্রা বিয়োগান্ত অবস্থা আমি হযরতের খেদমতে বড়হানায় আরয করেছিলাম। হযরত তার মাগফিরাত কামনায় সওয়াব রেছানী করেছিলেন এবং শোক প্রকাশ করেছিলেন।'

শাহ সাহেবের ইন্তিকাল হয়েছে ২৯ মহররম ১১৭৬ হিজরী শনিবার দিন দ্বিপ্রহরের সময় (২১ আগস্ট ১৭৬২ খৃ.)। যেমনটা উল্লেখিত পত্র থেকে জানা গেছে। শাহ আবদুল আযীয সাহেব (র) এর মালফূযে রয়েছে,

'(শাহ সাহেব) ২৯ মহররম ইন্তিকাল করেছেন। তাঁর মৃত্যু তারিখ 'উ-বুদ ইমাম আযমে দীন' এবং 'হায় দিলে রোযেগারে রফত' থেকে বের হয়। ২৯ মহররম দ্বিপ্রহরে তার মৃত্যুদিবস ও সময় ছিল।

দাফন

তাকে দাফন করা হয়েছে দিল্লী তোরণের বামদিকে সেই স্থানে, যাকে মুনহাদিয়া বলা হত। যেখানে এই কবরস্থান অবস্থিত, সেখানে কোন এক সময় হযরত শাহ আবদুর রহীম (র)-এর নানা শায়খ আবদুল আযীয শোকরবারের খানকাহ ছিল। আজও তার কেন্দ্রস্থল অনতিদূরেই রয়েছে। পরবর্তীতে শায়খ রফীউদ্দীন সাহেব এখানেই অবস্থান নেন। ওয়ালীউল্লাহ বংশের বাসস্থানও ছিল এখানেই। শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব এখানে বসবাস ছেড়ে দিয়ে শাহজাহানাবাদে গিয়ে বসবাস শুরু করেন। এই মুনহাদীর কবরস্থানেই শাহ সাহেবের চার পুত্র স্বয়ং শাহ সাহেবের সম্মানিত পিতা শাহ আবদুর রহীম সাহেবের কবর অবস্থিত, যার উপর শিলালিপি স্থাপিত আছে। তাতে লিখা আছে তাদের মৃত্যুর সন-তারিখ। সেখানে এসব হযরত ছাড়াও তাদের বংশের অন্যান্য লোকজন ও নারী-পুরুষের কবর রয়েছে। পাশেই মসজিদ। যার আশপাশে ছড়িয়ে আছে অনেক উলামায়ে কিরাম, নেককার বুযুর্গ এবং ওয়ালীউল্লাহ বংশের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষের বহু কবর। দিন দিন তা বেড়েই চলেছে।

পঞ্চম অধ্যায়

শাহ্ সাহেবের সংস্কার কর্ম

আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত

শাহ্ সাহেবের সংস্কারকর্মের প্রশস্ততা

শাহ্ সাহেবের দ্বারা আল্লাহ্ তা'আলা সংস্কার ও জাতির সংশোধন, দীনের সঠিক জ্ঞানের পুনর্জীবন, নববী জ্ঞানের প্রচার-প্রসার এবং তৎকালীন সময় ও জাতির চিন্তাধারায় এক নবজীবন ও সজীবতা সৃষ্টির যে মহান কাজ নিয়েছেন, তার পরিধি এত ব্যাপক-বিস্তৃত, তার শাখা-প্রশাখা এত ব্যাপৃত, যার নযীর কেবল সমকালই নয় বরং পূর্বকালের প্রবীণ উলামায়ে কিরাম ও লেখকদের মধ্যেও কম দেখা যায়। এর কারণ অবশ্য (আল্লাহ্ তা'আলার তাওফীক ও অদৃশ্য সিদ্ধান্ত ব্যতিত) এই যুগের অবস্থা-পরিস্থিতির চাহিদাও হতে পারে, যা শাহ্ সাহেবের সময়কালে দেখা দিয়েছে সেই স্বয়ংসম্পূর্ণতা, উচ্চ সাহস ও বিশেষ শিক্ষা-দীক্ষাও হতে পারে, যা ছিল শাহ্ সাহেবের খোদাপ্রদত্ত স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য। এসব কারণে শাহ্ সাহেব ইলম-আমলের এতগুলো ময়দানে সংস্কার ও সংশোধনমূলক কার্যক্রম আঞ্জাম দিয়েছেন যে, তার জীবনী রচয়িতা এবং ইসলামের দাওয়াত ও সংহতির ইতিহাসের উপর যারা কলম ধরেছেন, তাদের জন্য সেসব পরিবেষ্টন ও সেসবের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণমূলক পর্যালোচনা চালানো বিরাট কঠিন অনুভূত হয়েছে। আর যে এরূপ ইচ্ছা করবে, তার অনিচ্ছায়, অজান্তে নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতার সাথে অনুযোগই উচ্চকিত হবে–

কবি বলেন,

[illegible]

[illegible]

আমরা যদি সেগুলোকে পৃথক পৃথক শিরোনামে বর্ণনা করি, তাহলে নিম্নরূপ হবে।

১. আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত।

২. হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার। ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের প্রয়াস।

৩. ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও স্বপ্রমাণ বিশ্লেষণ। হাদীস ও সুন্নাতের তত্ত্ব-রহস্য ও উদ্দেশ্যের পর্দাচ্ছেদ।
৪. ইসলামে খেলাফতের আসনের ব্যাখ্যা। খেলাফতে রাশেদার বৈশিষ্ট্যাবলি ও তার প্রমাণ। বিদ'আত প্রতিরোধ।
৫. রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও মোঘল শাসনামলে শাহ সাহেবের মুজাহিদ ও নেতাসুলভ কৃতিত্ব।
৬. উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং তাদেরকে সংস্কার-সংশোধন ও বিপ্লবের দাওয়াত প্রদান।
৭. বিদগ্ধ উলামায়ে কিরাম ও সিংহপুরুষদের শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রশিক্ষণ দান, যারা তার পরবর্তীতে জাতির সংশোধন ও দীন প্রচারের কাজ চালু রাখবে।

আমরা সর্বপ্রথম 'আকীদা সংশোধন ও কুরআনের পথে দাওয়াত' শিরোনামটি আলোচনায় নিচ্ছি। কেননা দীন সংরক্ষণ ও সংস্কার এবং উম্মতের সংশোধনের কাজ যে যুগে আর যে দেশেই শুরু করা হোক, তা প্রথম স্তরের প্রয়োজন বলে স্বীকৃত হবে। অন্যথায় একে বাদ দিয়ে দীন-ধর্ম ও জাতির পুনর্জাগরণের যে কোন প্রচেষ্টাই চালানো হবে, সবই জলছবি ও ভিত্তিহীন প্রাসাদ গণ্য হবে। কুরআন মজীদ আম্বিয়ায়ে কিরামের ঘটনাবলি ও কথোপকথন দ্বারা এবং নির্ভরযোগ্য ইতিহাস নবী-রাসূলগণের প্রতিনিধি ও হক্কানী উলামায়ে কিরামের শিক্ষা-দীক্ষা কার্যক্রম ও কর্মকৌশল দ্বারা একথাই প্রমাণ করেছে। আর তা কিয়ামত পর্যন্ত সেসব সংস্কার ও সংশোধনমূলক কর্মকাণ্ডের অনুসৃত আদর্শ (কর্মনীতি) হয়ে থাকবে, যার চেতনা হবে নববী আর নেযাম (ব্যবস্থাপনা) হবে কুরআনী।

আকাইদের গুরুত্ব

গ্রন্থকার এ প্রসঙ্গে তার পুরোনো একটি রচনার সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করে ক্ষ্যান্ত হবেন।

'এই ধর্মের সর্বপ্রথম বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশ্য নিদর্শন হল, আকীদার উপর জোর ও কড়াকড়ি আরোপ আর সর্বপ্রথম এ বিষয়টি অনুধাবন ও বুঝে নেওয়ার তাগিদ আছে। হযরত আদম আ. থেকে নিয়ে সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স) পর্যন্ত সকল নবী-রাসূল (ওহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত) একটি সুনির্দিষ্ট আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি দাওয়াত দিতেন এবং এর দাবী করতেন। এর বিরোধিতায় কোন প্রকার পশ্চাদগামিতা ও ছাড়দানে প্রস্তুত হননি। তাদের নিকট উত্তম থেকে উত্তমতর আদর্শ জীবন এবং উন্নত থেকে উন্নততর ইসলামী কৃতিত্বের

ধারক, সৎকাজ, কল্যাণ, নিরাপত্তা ও যৌক্তিকতার জীবন্ত ছবি ও আদর্শ মানব– চাই তার দ্বারা কোনও উন্নত রাজত্ব প্রতিষ্ঠা, কোনও আদর্শ সমাজ বিনির্মাণ ও কোনও ফলপ্রসূ বিপ্লব সংঘটিত হয়ে থাক– ততক্ষণ পর্যন্ত তার কোনও মর্যাদা ও মূল্য নেই, যাবৎ না তার আনীত আকীদাগুলো মেনে চলবে, যার দাওয়াত তার জীবনের মুখ্য বিষয়। তদ্রুপ যাবৎ না তার এ সকল চেষ্টা-সংগ্রাম কেবল সেই আকীদার ভিত্তিতেই হবে। এটাই সেই পার্থক্যকারী সীমানা, সুস্পষ্ট ও উজ্জ্বল দাগ-খতিয়ান, যা আম্বিয়ায়ে কিরামের দাওয়াত এবং জাতীয় দিক-নির্দেশক, রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, বিপ্লবী নেতা আর প্রত্যেক ঐ ব্যক্তির মাঝে টেনে দেওয়া হয়েছে, যার চিন্তাধারা ও জ্ঞান-গবেষণার উৎস আম্বিয়ায়ে কিরামের শিক্ষা ও তাদের জীবনাদর্শের বদলে অন্য কিছু হবে।'

বস্তুতঃ আম্বিয়ায়ে কিরামের মাধ্যমে যে ইলম-জ্ঞান ও মা'আরিফ মানবজাতির কাছে পৌঁছেছে, তন্মধ্যে সবচেয়ে উঁচু, জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ ইলম হচ্ছে আল্লাহ তা'আলার যাত, সিফাত (সত্ত্বা ও গুণাবলি), তার কাজকর্মের জ্ঞান এবং সেই বিশেষ সম্পর্ক নির্ণয় করা, যা এক স্রষ্টা ও সৃষ্টি আর এক বান্দা ও উপাস্য মাবুদের মাঝে থাকতে হয়। এই ইলম সবচেয়ে বড় ও উৎকৃষ্টতর। কেননা এর উপর মানব জাতির সৌভাগ্য, পার্থিব কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নির্ভরশীল। এটাই আকাইদ, আমলসমূহ, চরিত্র ও সভ্যতার ভিত্তি। এর মাধ্যমেই মানুষ তার বাস্তবতা উপলব্ধি করতে পারে। বিশ্বজগতের ব্যাপৃতি ও জীবনের রহস্য বুঝে। এর দ্বারাই মানুষ এ জগতে নিজের অবস্থান নির্ণয় করে। এরই ভিত্তিতে নিজের স্বজাতি ও সমমনাদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলে। আপন জীবনের গন্তব্য ও মতাদর্শের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং পূর্ণ আস্থা-বিশ্বাস, দূরদর্শিতা ও বিশ্লেষণের সাথে নিজের লক্ষ্য স্থির করে। (দস্তুরে হায়াত -৬০ গ্রন্থে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে দলীল প্রমাণ দেওয়া হয়েছে।)

বিশেষতঃ এই উম্মতের সাথে মহান আল্লাহ তা'আলার যে বিশেষ সম্পর্ক, সমর্থন, সাহায্য, সন্তুষ্টি, ভালবাসা, বিজয় ও ইজ্জতের গুরুত্বপূর্ণ প্রতিশ্রুতি রয়েছে, তা কেবল সঠিক আকীদা-বিশ্বাস, ঈমানী চেতনা ও গুণাবলি বিশেষভাবে খালেছ ও নিষ্কলুষ আকীদায়ে তাওহীদ (একত্ববাদের বিশ্বাস)-এর উপর ভিত্তিশীল। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

ولا تهنوا ولا تحزنوا وانتم الأعلون إن كنتم مؤمنين.

'আর তোমরা নিরাশ হয়ো না, কোন চিন্তাও করো না। তোমরাই বিজয়ী হবে যদি (খাঁটি) মুমিন হও।' (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

সেই সাথে সুস্পষ্ট ভাষায় বলা হয়েছে,

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم من بعد خوفهم امنا يعبدوننى لا يشركون فى شيئا. ومن كفر بعد ذلك فالئك هم الفاسقون.

'তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনয়ন করবে এবং সৎকর্ম করবে, আল্লাহ তা'আলা তাদের সঙ্গে অঙ্গীকার করেছেন যে, তাদেরকে ধরাপৃষ্ঠে রাষ্ট্রশাসক বানাবেন, যেমন বানিয়েছিলেন তাদের পূর্ববর্তী লোকদের। আর তাদের দীনকে করবেন সুদৃঢ়-মজবুত, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন। ভয়-ভীতির পর তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার উপাসনা করবে; আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করবে না। অনন্তর যারা কুফরী করবে, তারাই হবে পাপাচারী-ফাসিক।' (সূরা আন-নূর : ৫৫)

আম্বিয়ায়ে কিরামের সত্যবাদী নায়েব ও প্রতিনিধি এবং হক্কানী আলেমগণ, যারা আল্লাহর দীনের স্বভাব-চাহিদা সর্ম্পকে জ্ঞাত থাকেন, তারা একে কোথাও প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে প্রথমে সেখানকার মাটিকে সম্পূর্ণরূপে পরিচ্ছন্ন ও সমতল করেন। তারা শিরক ও অজ্ঞতার শেকড় ও মূলগুলো (চাই প্রাচীন পৌত্তলিকতার নতুন সংস্করণ হোক কিংবা জাতীয় ও স্থানীয় প্রভাবের পরিণতিই হোক) খুঁজে খুঁজে বের করেন এবং তার এক একটি খুঁড়ে খুঁড়ে উপড়ে ফেলেন। সেই সাথে মাটিকে সম্পূর্ণরূপে ওলটপালট করে দেন। এ কাজে তাদের যতই বিলম্ব হোক এবং যত কষ্ট-যাতনা ভোগ করতে হোক না কেন। তারা সে ফসল ঘরে তুলতে কখনও তড়িঘড়ি ও অধৈর্যের সঙ্গে কাজ করেন না।

শিরক (নানা রূপে) মানব জাতির সবচেয়ে ভয়াবহ ও পুরনো রোগ। তা আল্লাহর কুদরতের আত্মমর্যাদাবোধ এবং ক্রোধানল প্রজ্জ্বলিত করা ছাড়াও বান্দাদের আত্মিক, চারিত্রিক, সভ্যতা-সাংস্কৃতিক উন্নতির পথে বিরাট বড় অন্তরায়। এই শিরক মানুষের শক্তি-ক্ষমতার গলা টিপে ধরে। তাদের যোগ্যতাসমূহকে খুন করে। একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ তা'আলার উপর তার আস্থা, আত্মবিশ্বাস ও আত্মপরিচয়ের যবনিকাপাত ঘটায়। সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা, সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ, সর্বোত্তম দয়ালু ও দাতা, মার্জনাকারী ও মহব্বতকারী আল্লাহর নিরাপদ ও কঠোর নিরাপত্তা ও নিশ্চিন্ত আশ্রয় থেকে বের করে দেয়। তার অফুরন্ত গুণাবলি, অবিনশ্বর ধনভাণ্ডারের কল্যাণ থেকে বঞ্চিত করে। আশ্রয় গ্রহণে বাধ্য করে দুর্বল-অক্ষম, নিঃস্ব-অসহায়, দৈন্য-নগণ্য সৃষ্টিজীবের ছায়াতলে। যাদের ঝোলায় কিছুই নেই।

নতুন করে তাওহীদের দাওয়াত ও প্রচারের প্রয়োজনীয়তা

গ্রন্থকার শায়খুল ইসলাম হাফিয ইবনে তাইমিয়া রহ. সম্পর্কে রচিত তারীখে দাওয়াত ও আযীমতের দ্বিতীয় খণ্ডে "ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর যুগে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও রুসম-রেওয়াজ" শিরোনামে নিম্নোক্ত আলোচনা উদ্ধৃত করেছেন।

'অমুসলিম ও অনারব জাতিসমূহের সংমিশ্রণ, ইসমাঈলী এবং বাতেনী রাজত্ব বিস্তার ও প্রভাব, পাশাপাশি জাহেল, মূর্খ ও গোমরাহ সূফীদের শিক্ষা-দীক্ষা ও আমলের দ্বারা সাধারণ মুসলমানদের মাঝে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস, ধ্যান-ধারণা ও রীতিনীতির প্রচলন বেড়ে চলছিল। অনেক মুসলমান তাদের ধর্মীয় দিশারী, পথপ্রদর্শক, তরীকতের মাশায়িখ, আউলিয়ায়ে কিরাম ও বুযুর্গানে দীনের ব্যাপারে এমন ধরনের উচ্চ পর্যায়ের আর শিরকী ধ্যান-ধারণা ও আকীদা পোষণ করছিল, যেমনটি ইয়াহুদী-খৃস্টানরা হযরত ঈসা আ., হযরত উযায়ের আ. এবং পোপ-পাদ্রীদের ব্যাপারে বিশ্বাস রাখত। বুযুর্গানে দীনের মাজারে যেসব অপকর্ম চলত, তা ছিল সেসব রুসম-রেওয়াজের এক স্বার্থক প্রতিফলন, যা চলত অমুসলিমদের উপাসনালয়ে এবং পুণ্যবান ব্যক্তিবর্গের কবরে। কবরবাসীদের কাছে প্রকাশ্যে সরাসরি সাহায্য-প্রার্থনার কাজ চলত। তাদের কাছে নানা আবেদন-নিবেদন, ফরিয়াদ, তাদের দেখা দেওয়া, মনোবাঞ্ছা পূরণের আরাধনার প্রচলন হয়ে গিয়েছিল। তাদের কবরের উপর বড় বড় মসজিদ নির্মাণ, তাদের কবরকে সিজদার স্থান বানানো, সেখানে প্রতিবছর মেলার আয়োজন করা এবং দূর-দূরান্ত থেকে সফর করে সেখানে আগমনের প্রথা চালু হয়েছিল। প্রকাশ্যে কবর পূজা, আল্লাহর প্রতি অভয় আর মাজারওয়ালার প্রতি ভয়ভীতি, আল্লাহ এবং খোদায়ী নিদর্শনের সঙ্গে ঠাট্টা-বিদ্রুপ, ভ্রুক্ষেপহীনতা, দাম্ভিকতা, বুযুর্গদের প্রতি প্রভুত্বের পর্যায়ে বিশ্বাস, বিভিন্ন মাজারে হজ্ব পালন, আবার মাঝে মধ্যে একে বাইতুল্লাহর হজ্জের উপর প্রাধান্য দান, কোথাও কোথাও মসজিদসমূহের বিলুপ্তি, ব্যক্তি পূজা, দরগাহ ও মাজারের সাজ-সজ্জার প্রতি গুরুত্ব দান ইত্যাদি এই যুগের (নব্য) জাহেলী জীবনের সেই রূপরেখা ছিল, যা দেখার জন্য অনেক দূরে যাওয়া এবং খুব বেশি চিন্তা-ভাবনার সাথে কাজ করার প্রয়োজন হত না।'

এ ছিল মিসর, সিরিয়া ও ইরাকের মত দেশগুলোর অবস্থা, যা সাহাবায়ে কিরাম (রা) তাদের বরকতময় হাতে জয় করেছিলেন, যা ছিল ইসলামের কেন্দ্র, অহী অবতরণস্থল এবং রাসূলে কারীম (স)-এর বাসস্থানের সন্নিকটে ও সম্পৃক্ত। যেখানের ভাষা ছিল আরবী। যেখানে কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে।

যেখানে এক দিনের জন্যও কুরআন-হাদীসের পাঠদান স্থগিত হয়নি, যেখানে রচিত হয়েছে উলূমে হাদীস ও শরহে হাদীসের বিশাল বিশাল গ্রন্থাবলি।

পক্ষান্তরে সেই (বারো হিজরী শতকের) ভারতবর্ষের অনুমান করাও কঠিন নয়, যেখানে শাশ্বত ইসলাম এসে পৌঁছেছে তুর্কিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তানের সীমানা পেরিয়ে এবং নিজের বিরাট সজীবতা ও শক্তিক্ষমতা হারিয়ে সেসব লোকের মাধ্যমে, যারা সরাসরি নবুওয়াতের আলোকরশ্মি ও বরকতে উপকৃত হয়নি। যাদের অনেকেই তার বংশগত ও সাম্প্রদায়িক প্রভাব থেকে পুরোপুরি মুক্ত হতে পারেনি। তাছাড়া ভারতবর্ষে হাজার বছর ধরে এমন এক ধর্মমত, দর্শন ও সভ্যতা রাজত্ব করছিল, যাদের রন্ধ্রে রন্ধ্রে সক্রিয় বিরাজমান ছিল পৌত্তলিকতা ও শিরক। যারা এই শেষ শতকগুলোতে হয়ে গিয়েছিল পৌত্তলিকতার সবচেয়ে বড় নেতা, প্রাচীন বর্বরতার রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক। সেখানে ভারতবর্ষের মুসলিম জনবসতির বিরাট এক অংশ বারহামানিয়া মতাদর্শ ও অন্যান্য মুশরিকসুলভ পরিবেশ থেকে বের হয়ে ইসলামের ছায়াতলে দীক্ষিত হয়েছিল। অধিকন্তু মনে রাখতে হবে, (সুদীর্ঘ সময় ধরে) কুরআন-হাদীসের সাথে সরাসরি সেই সম্পৃক্ততা ছিল না এদেশের, যা ছিল ইরানের প্রভাবে হিকমত ও ইউনানী দর্শনের সাথে। ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যায় যদি তার শিক্ষামূলক ও আক্ষরিকভাবে সম্পৃক্ততা থেকেও থাকে, তথাপি ফিকহ্, উসূলে ফিকহ্ ও ইলমে কালামের সাথে, যার বিষয়বস্তু ও আলোচনার ক্ষেত্র মাসাইল ও জুযিয়্যাত এবং মাসাইল উদ্ভাবনের মূলনীতি ও আকাঈদের উপর দার্শনিক আলোচনার সাথে আকীদা সংশোধন ও একত্ববাদের প্রাথমিক দাওয়াত নেই।

ভারতবর্ষের ধর্মমত, দর্শন এবং এখানকার রুসম-রেওয়াজ ও স্বভাব-রীতির যে প্রভাব পড়েছিল দশ হিজরী শতকে মুসলিম সমাজের ওপর, তার অনুমান করা যায় হযরত মুজাদ্দিসে আলফেসানী (র)-এর পত্র থেকে, যা তিনি এক পুণ্যবতী মহিয়সী নারীর নামে লিখেছেন। যার দ্বারা শিরকী রুসম-রেওয়াজের সম্মান, গাইরুল্লাহর কাছে সাহায্য প্রার্থনা ও প্রয়োজন পূরণের প্রত্যাশা, কাফিরদের উৎসবের দিনের সম্মান ও তাদের রীতিনীতির অনুকরণ, বুযুর্গদের উদ্দেশ্যে জীবজন্তু মান্নত ও যবাহকরণ, পীর ও তার বিবিদের উদ্দেশ্যে রোযা রাখা, বসন্ত রোগকে ভয় ও তার সম্মান প্রদর্শন (যাকে বসন্ত রোগের দায়িত্বশীল দেবতা মনে করা হত) এর হিন্দুয়ানা মানসিকতা ও সন্দেহ প্রবণতার ধারণা হয়। যা প্রবিষ্ট হয়ে গিয়েছিল মুসলমানদের ঘরে ঘরে। এ যুগে এবং শত বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পর, কুরআন-হাদীসের সাথে সরাসরি মজবুত ও ব্যাপক সম্পর্ক তৈরী না হওয়ার কারণে ঈমান-

আকীদার যে ত্রুটি এবং অনৈসলামিক বরং ইসলামবিদ্বেষী, আকীদা-বিশ্বাস ও কর্মকাণ্ডের যে প্রভাব ভাল ভাল পরিবারের উপর পড়েছে, তার অনুমান করা তেমন কঠিন নয়।

শাহ সাহেবের যুগে অমুসলিমদের প্রভাব, কুরআন-হাদীস সম্পর্কে অজ্ঞতা, দূরত্ব ও পরিণতি, ভয়াবহতা এবং জনসাধারণের পছন্দ-অপছন্দ থেকে চোখ বন্ধ করে প্রভাবময় চেষ্টা-সংগ্রামের দীর্ঘ শূন্যতা ভারতে যে অবস্থা-পরিস্থিতির সৃষ্টি করেছিল এবং পবিত্র ধর্মের (যাতে শিরকের কোন সংমিশ্রণের অবকাশ ছিল না) সমান্তরাল যে আকীদার ব্যবস্থা আর মুসলিম সমাজের জীবনযাত্রায় জাহিলিয়াত ও অজ্ঞতার যে মনগড়া নীলকণ্ঠ জন্ম নিয়েছিল, তার খানিকটা ধারণা স্বয়ং শাহ সাহেবের রচিত গ্রন্থাবলির উদ্ধৃতি থেকে হতে পারে। শাহ সাহেব 'তাফহীমাত' -এর এক স্থানে লিখেছেন–

'রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীসে আছে, তোমরা মুসলমানগণও অবশেষে তোমাদের পূর্ববর্তী উম্মতদের মতাদর্শ গ্রহণ করে নিবে। যেখানে যেখানে তারা পা রেখেছে, তোমরাও সেখানে সেখানে পা রাখবে (পদস্খলিত হবে)। এমনকি কেউ যদি গুইসাপের গর্তে ঢুকে থাকে, তবে তোমরাও তাদের পিছু নেবে, পদাঙ্ক অনুসরণ করবে। সাহাবায়ে কিরাম (রা) জিজ্ঞাসা করলেন, হে আল্লাহর রাসূল, পূর্ববর্তী উম্মত বলে কি আপনার উদ্দেশ্য ইয়াহুদী খৃস্টান? রাসূলে কারীম (স) বললেন, 'নতুবা আর কে?' এই হাদীসখানা ইমাম বুখারী ও মুসলিম (র) রিওয়ায়াত করেছেন।

সত্যই বলেছেন আল্লাহর রাসূল (স)। আমরা স্বচক্ষে সেসব দুর্বল ঈমানের মুসলমান দেখেছি, যারা নেককার-সৎকর্মশীলদেরকে 'আরবাবে মিন দূনিল্লাহ' তথা খোদাদ্রোহী বানিয়ে দিয়েছে। ইয়াহুদী-খৃস্টানদের মত স্বীয় আউলিয়ায়ে কিরামের কবরগুলোকে সিজদাস্থল (উপসনালয়) বানিয়ে রেখেছে। আমরা এমন লোকও দেখেছি, যারা শরীয়ত প্রণেতার কথায় রদবদল করে। রাসূলে কারীম (স)-এর সাথে সম্পৃক্ত করে বলে, 'নেককার লোক আল্লাহর জন্য আর গুনাহগার আমার জন্য'। এটা সে ধরনের উদ্ভট উক্তি, যেমন ইয়াহুদীরা বলত, لن تمسنا النار إلا أياما معدودة তথা আমরা জাহান্নামে গেলেও মাত্র কয়েকদিনের জন্য যাব। (সূরা বাকারা ৪০) সত্য বলতে গেলে আজ প্রত্যেক দলের মধ্যে দীন-ধর্মের বিকৃতি ছড়িয়ে আছে। সূফীদের দিকে লক্ষ্য করলে দেখবে, তাদের মধ্যে এমন সব কথা মুখে মুখে প্রচলিত, কুরআন-হাদীসের সাথে যার কোনও মিল নেই। বিশেষতঃ তাওহীদের বিষয়ে মনে হয় যেন তাদের মোটেও শরীয়তের তোয়াক্কা নেই।'

আর জগদ্বিখ্যাত 'আল-ফাওযুল কাবীর' গ্রন্থে লিখেছেন, 'আপনাদের যদি (জাহেলী যুগের) মুশরিকদের আকীদা ও কর্মকাণ্ডের প্রাগুক্ত বিবরণের সত্যতা মেনে নিতে সংশয় থাকে, তাহলে এ যুগের তাহ্‌রীফকারীদের (দীন বিকৃতিকারী) বিশেষতঃ যারা মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলের দিক-দিগন্তে বসবাস করে, তাদের দেখুন। তারা বেলায়েত (অলীত্ব) সম্পর্কে কী ধারা নিয়ে বসেছে! যদিও তারা পূর্বযুগের অলীদের বেলায়েত স্বীকার করে, তথাপি এ যুগে আউলিয়ায়ে কিরামের অস্তিত্বকে একেবারে অসম্ভব মনে করে। ঘুরে বেড়ায় কবরস্থান ও আস্তানায়। নানা ধরনের শিরক-বিদ'আতে তারা লিপ্ত। তাহ্‌রীফ ও তাশবীহ (বিকৃত ও সাদৃশ্য) তাদের মধ্যে এমনভাবে চালু রয়েছে যে, বিশুদ্ধ হাদীস لتتبعن سنن من كان قبلكم (তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে) এর আলোকে এমন কোন বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা নেই, যাতে আজ মুসলিম উম্মাহ্‌র কোনও না কোনও দল আক্রান্ত এবং তদানুরূপ কোনও বিষয়ে বিশ্বাসী নয়। আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে এসব থেকে হেফাযত করুন।

রোগের চিকিৎসা ও অবস্থা সংশোধনের কার্যকর পন্থা

কুরআনের প্রচার-প্রসার

শাহ সাহেব এই রোগ বরং গণবিপদের চিকিৎসার জন্য কুরআন মাজীদ মুতালা'আ, গবেষণা ও এর বুঝ-জ্ঞানকে সবচেয়ে কার্যকরী চিকিৎসা মনে করেছেন। আর এ বিষয়টি নিছক চিন্তাধারা, অধ্যয়ন শক্তি ও যৌক্তিকতার উপরই নির্ভরশীল ছিল না বরং এমন একটি সুস্পষ্ট বাস্তবতা ছিল, যার উপর স্বয়ং কুরআনে কারীম সাক্ষ্য। আর না কেবল আবির্ভাবের সময়কার ইতিহাস বরং ইসলামের পূর্ণ তারীখে দাওয়াত (দাওয়াতের ইতিহাস) এবং সংস্কার ও শুদ্ধি তৎপরতা সাক্ষ্য। বিশেষতঃ তাওহীদের নিগূঢ়তা আর শিরকের বাস্তবতা প্রকাশের জন্য এর চেয়ে বেশি সুস্পষ্ট, এর চেয়ে শক্তিশালী ও হৃদয়গ্রাহী মাধ্যম কল্পনা করা যায় না। কুরআনের অনুবাদক শাহ আবদুল কাদির সাহেব (র) রচিত موضح القران-এর ভূমিকায় যতখানি সহজ-প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী ভাষায় এই বাস্তবতাকে তুলে ধরেছেন, তার চেয়ে বেশি বলা মুশকিল। তিনি লিখেন, 'যে যত উত্তম বলবে, যেমন আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে স্বয়ং বলেছেন, তদ্রূপ আর কেউ বলতে পারে না। আর আল্লাহর বাণীতে যেমন প্রভাব ও পথনির্দেশনা রয়েছে, তদ্রূপ কারও কথায় নেই।'

পবিত্র হিজাযে অবস্থানকালে শাহ সাহেবের ভারতের এই ধর্মীয় অবস্থাচিত্র, এখানকার মানুষের কুরআন ও ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরত্ব ও

বৈরিতার উপলব্ধি আরও প্রবলভাবে সৃষ্টি হয়। আর সেখানের আলোকময়, আধ্যাত্মিক ও কুরআনী পরিবেশে যেখান থেকে তাওহীদের সুরতরঙ্গ প্রথমবার উচ্চকিত হয়েছিল, শাহ্ সাহেবের সদা জাগ্রত সচেতন অন্তকরণে তার এ আহবান তথা ভারতের বুকে কুরআনে কারীমের দৌলতকে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেয়ার আকাঙ্খা এমন সুস্পষ্ট ও তীব্রভাবেই হয়ত জন্মেছে, যাকে সেই ইলহাম ও অদৃশ্য ইংগিত নামে ব্যাখ্যা করা যায়, যা প্রত্যেক যুগে কোনও পুণ্যাত্মার উপর কোনও জরুরী ধর্মীয় প্রয়োজন ও কার্যক্রম পূর্ণতা দানের জন্য অবতীর্ণ হয়ে থাকে। যার প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও যার উপর জয়লাভ করা অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়। কাজেই আমরা দেখি, শাহ সাহেব কুরআন মাজীদের ফার্সী অনুবাদের কাজ শুরু করেছেন হিজায থেকে প্রত্যাবর্তনের পর, যা 'ফাতহুর রহমান' নামে পূর্ণতা লাভ করেছে।

সে সময় ভারত ছিল প্রায় অনারব রাষ্ট্র, তুর্কিস্তান, ইরান ও আফগানিস্তান ছিল যার নিকটতম প্রতিবেশি দেশ এবং সেসব দেশের চিন্তাধারা, দৃষ্টিভঙ্গি, পেশা, রীতিনীতি, আগ্রহ-উদ্যম আর চিরাচরিত বাস্তবতার ছায়া ভারতের শিক্ষা ও ধর্মীয় অঙ্গণে পতিত হত, সেখানে ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, কুরআনে কারীম একান্ত বিশেষ শ্রেণীর মুতালা'আ, চিন্তা-গবেষণা ও বুঝা-বুঝানোর কিতাব, যার জ্ঞান এক ডজন বিদ্যার উপর নির্ভরশীল –একে সাধারণ মানুষের মধ্যে নিয়ে আসা, আম মানুষকে সোজাসুজি এর মর্মার্থ সম্পর্কে অবহিত করা এবং এর থেকে হিদায়াত ও আলোকরশ্মি অর্জনের দাওয়াত দেওয়া ছিল মারাত্মক ভয়ঙ্কর, এক বিরাট গোমরাহী ও ফিৎনার পথ উন্মোচনের নামান্তর। সেই সঙ্গে জনসাধারণের মানসিক ও চিন্তাগত বিক্ষিপ্ততা, স্বেচ্ছাচারিতা ও উলামায়ে কিরামের প্রতি অমুখাপেক্ষিতা বরং বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার আহবান। এ ধরনের চিন্তাধারা ও দলীল-প্রমাণকে সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা 'তুহফাতুল মুওয়াহহিদীন'-এর মধ্যে অত্যন্ত চমৎকার ভঙ্গিতে তুলে ধরা হয়েছে।

'কিছু লোক বলে থাকে– কুরআনে কারীম ও হাদীস শরীফ কেবল সেই অনুধাবন করতে পারে, যে অনেক শাস্ত্র ও বই-পুস্তক পড়েছে এবং সমকালের আল্লামা (গভীর জ্ঞানী) হবে। তাদের জবাবে মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন,

هو الذى بعث فى الأميين رسولا منهم يتلوا عليهم أيته ويزكيهم

ويعلمهم الكتب والحكمة وإن كانوا من قبل لفى ضلل مبين.

তিনিই আল্লাহ, যিনি নিরক্ষরদের মাঝে তাদেরই মধ্য হতে একজন রাসূল প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের পড়ে শোনান আল্লাহর আয়াতসমূহ। আর তাদের পাপের কালিমা পবিত্র করেন এবং তাদেরকে কিতাব ও প্রজ্ঞা শিখান। ..... (সূরা জুমু'আ : ২)

অর্থাৎ রাসূলে কারীম (স) স্বয়ং এবং তার মহান সঙ্গীসাথীগণও নিরক্ষর ছিলেন। কিন্তু যখন রাসূলুল্লাহ (স) তার সাহাবাদের সামনে কুরআনে কারীমের আয়াত তিলাওয়াত করেছেন, তখন তারা সে আয়াত শ্রবণ করে যাবতীয় পাপ-পঙ্কিলতা ও অন্যায়-অপরাধ থেকে পবিত্র হয়ে গেছেণ। সুতরাং অশিক্ষিত বা না পড়া লোকজন যদি কুরআন হাদীস না বুঝত এবং তা বুঝার যোগ্যতা না রাখত, তাহলে সাহাবায়ে কিরাম মন্দতা ও দোষ-ত্রুটি থেকে কিভাবে পবিত্র হয়ে গেলেন।

এ জাতির উপর বড় আক্ষেপ! যারা صدره (ছদরাহ্) বুঝা এবং কামূস (শব্দ ভাণ্ডার) জানার দাবী করে। কিন্তু কুরআন হাদীস বুঝার বেলায় স্বয়ং নিজেকে একান্ত অজ্ঞ প্রকাশ করে। আবার কেউ কেউ বলে– আমরা শেষকালের লোক। রাসূলে কারীম (স)-এর যুগের বরকত এবং সাহাবায়ে কিরামের মনের শক্তি-নিরাপত্তা কোত্থেকে আনব, যাতে কুরআন-হাদীসের অর্থ-মর্ম উত্তমরূপে বুঝতে পারি? তাদের জবাবে (সূরা জুমু'আ-৩)

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

واخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم

অর্থাৎ পরবর্তী লোকজন শিক্ষিত হোক কিংবা অশিক্ষিত, কিন্তু যখন সে মুসলমান হবে এবং সাহাবায়ে কিরামের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলার ইচ্ছা করবে আর কুরআন-হাদীস শ্রবণ করবে, তখন তাদেরকেও পবিত্র করার জন্য এই কুরআন-হাদীসই যথেষ্ট হতে পারে।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন,

ولقد يسرنا القران لكذكر فهل من مدكر

অবশ্য আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের উদ্দেশ্যে সহজ করে দিয়েছি। সুতরাং উপদেশগ্রহণকারী কেউ আছে কি? (সূরা কমার-২২)

এটা কি করে সহজ হতে পারে যে, 'কাফিয়া' পড়ুয়া ও 'শাফিয়া' জানা লোক এর (কুরআনের) অর্থ-মর্ম বুঝার ব্যাপারে অক্ষমতা প্রকাশ করবে আর আরবের বেদুঈন-জংলী লোকজন এর হাকীকত ও গভীরতা সম্পর্কে উদ্যমী হয়ে যায়। এছাড়া আল্লাহ তাআলা অন্যত্র ইরশাদ করেন,

أفلا يتدبرون القران

কেন তোমরা কুরআনের উপর চিন্তা-গবেষণা কর না! (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

সুতরাং কুরআন যদি সহজ না হয় তবে তাতে চিন্তা-গবেষণা কিভাবে করা যাবে!

أم على قلوب اقفالها

না কি তাদের অন্তকরণে তালা লাগানো! (সূরা মুহাম্মদ : ২৪)

অর্থাৎ অন্তরে তালা ঝুলানো না থাকা সত্ত্বেও। সুতরাং কত বড় গোমরাহী! এতদসত্ত্বেও কুরআনে কারীমের চিন্তা-গবেষণায় জোর দেওয়া হয় না।' কিন্তু কবির ভাষায়–

[illegible]

[illegible]

শাহ সাহেব এই নিরাসক্তি, অসহায়ত্ব ও বিপদাশঙ্কা দেখে, যার সীমানা

ويصدون عن سبيل الله

যারা আল্লাহর পথে বাঁধার সৃষ্টি করে ..।' (সূরা আরাফ : ১৪৫)

-এর সাথে মিলে যায়, তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন, কুরআনে কারীমের অনুবাদ করবেন এমন শুদ্ধ ফার্সীতে, যা ছিল ভারতবর্ষে ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রের দাপ্তরিক, শিক্ষা, লিখনী এবং চিঠিপত্রের ভাষা। আর প্রত্যেক শিক্ষিত ও লেখাপড়া জানা মুসলমান যদিও এ ভাষায় লিখতে বলতে পারত না, তথাপি সকলে বুঝত নিশ্চিত। ভারতে ফার্সী ভাষায় এই দীর্ঘ কার্যক্রমে, যার মেয়াদ প্রায় সাত শতাব্দীর কম ছিল না, যদি কুরআনে কারীমের ফার্সী তরজমা এক ডজনও হত, তবু বিস্ময়ের কিছু ছিল না। কিন্তু হাসান ইবনে মুহাম্মদ আলকমা ওরফে নিযাম নিশাপুরী অনন্তর দৌলতাবাদীর তরজমার পূর্বে (যিনি ছিলেন অষ্টম হিজরী শতকের উলামায়ে কিরামের একজন) কোনও ফার্সী তরজমা কুরআনের খোঁজ পাওয়া যায় না। নীশাপুরীর এই ফার্সী তরজমা তার আরবী তাফসীর গারাইবুল কুরআনে অন্তর্ভুক্ত।

ভারতে শায়খ সাদী (র)-এর নামে একটি তরজমা প্রসিদ্ধ ছিল। অবশ্য সেটি শায়খের বিশ্ব নন্দিত রচনা গুলিস্তা ও বুস্তার মত প্রচলিত ও সমাদৃত ছিল না। তথাপি কোথাও কোথাও এটি পাওয়া যেত। তবে বিশুদ্ধ তথ্যমতে একে শায়খ সাদীর সাথে সম্পৃক্ত করা ঠিক নয়। বস্তুতঃ উক্ত তরজমাখানা আল্লামা সাইয়িদ শরীফ আল জুরজানী (মৃত্যু ৮১৬ হি.) কর্তৃক রচিত হতে

পারে। তাফসীরে হাক্কানী সংকলক মাওলানা আবদুল হক হাক্কানীর প্রত্যক্ষ বিবরণ হচ্ছে, আজকাল অজ্ঞ লোকজন যাকে সাদীর তরজমা বলে থাকে, সেটি মূলতঃ সাইয়িদ শরীফের তরজমা। প্রকাশক আমার সামনে তরজমাটি প্রসারের উদ্দেশ্যে সাদীর সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন।'

মোটকথা, শাহ সাহেব হিজায সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পাঁচ বছর পর (সম্ভবতঃ আকীদা সংশোধনের সেসব চেষ্টা-সংগ্রামের ফলাফল লক্ষ্য করে, যা বিশেষ পঠন-পাঠন, রচনা ও ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে হচ্ছিল) সিদ্ধান্ত নিলেন– ব্যাপক হিদায়াত, আকীদা সংরক্ষণ ও সংশোধন এবং আল্লাহ পাকের সঙ্গে মজবুত সম্পর্ক স্থাপনের জন্য কুরআনে কারীমের পথনির্দেশনা, হেদায়াত ও শিক্ষাকে সরাসরি প্রচার-প্রসার করার চেয়ে ফলপ্রসূ কোন পথ-প্রক্রিয়া হতে পারে না। আর তার পন্থা একটিই। সেটি হচ্ছে, কুরআনে কারীমের ফার্সী অনুবাদ ও তার প্রচার-প্রসার। স্বয়ং শাহ সাহেবের ভাষায় এর অনুপ্রেরণা, কারণসমূহ এবং এই পদক্ষেপের ইতিহাস শুনে নিন। তার তাফসীর গ্রন্থ 'ফাতহুর রহমান'-এর মুখবন্ধে তিনি লিখেন–

'এই যে যুগে আমরা বিদ্যমান এবং এই যে দেশে আমরা বাস করছি। এখন এদেশে মুসলমানদের হিতাকাঙ্খার দাবী হচ্ছে, তরজমা কুরআন সহজ-শুদ্ধ ও ফার্সী পরিভাষায় ভাষার উৎকর্ষতা ও সূক্ষ্মতা প্রকাশ এবং সংশ্লিষ্ট ঘটনাবলি ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ উল্লেখ ছাড়া করা, যাতে আম-খাছ নির্বিশেষে সকলেই সমান বুঝে। ছোট-বড় সকলেই কুরআনের মর্মার্থ অনুধাবন করতে পারে। কাজেই এ কাজের গুরুত্ব এই অধমের অন্তরে ঢেলে দেওয়া হয়েছে এবং সেজন্য বাধ্য করা হয়েছে।

প্রথমে বিভিন্ন তরজমার উপর চিন্তা-ভাবনা করা হয়েছে। যাতে করে যে তরজমা উদ্দেশ্য মাফিক পাওয়া যাবে, তার প্রসার করা যায়। আর যেন এই তরজমা যথাসম্ভব সমকালীন মানুষের আগ্রহ ও চাহিদা অনুযায়ী হয়। কিন্তু সেসব তরজমায় দেখলাম, হয়ত সীমাহীন দীর্ঘতা রয়েছে কিংবা সমস্যাপূর্ণ সংক্ষিপ্ততা ও সংকোচন রয়েছে। ইতোমধ্যে সূরা বাকারা ও নিসার তরজমা হয়ে যাওয়ার পর হারামাইন সফরের সুযোগ হয়ে গেলে সেই ধারাবাহিকতা বন্ধ হয়ে যায়। কয়েক বছর পর জনৈক স্নেহভাজন তরজমা কুরআন পড়তে লাগলেন। আর তা পূর্বের মনোবাসনার প্রেরণা হয়ে গেল। সিদ্ধান্ত নিলাম, সবকের পরিমাণ তরজমা লিখে নেব। যখন এক-তৃতীয়াংশ কুরআনে কারীম তরজমা হয়ে গেল, তখন উক্ত স্নেহভাজনের আকস্মিক সফর এসে যাওয়ায় এই কার্যক্রম পুনরায় স্থগিত হয়ে যায়। দীর্ঘদিন পর একটি সুযোগ সৃষ্টি হয় এবং পুনরায় সেই পুরোনো মনোবাসনা জেগে ওঠে। আর দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত তরজমা হয়ে যায়।

এরপর কতিপয় বন্ধুকে পাণ্ডুলিপি সাজানোর করার জন্য বলা হয়। সেই সাথে কুরআনের মূল পাঠও লিখে দিতে বলা হয়। যেন স্বতন্ত্র সংস্করণ তৈরী হয়ে যায়। সেসব ভাগ্যবান বন্ধুগণ পবিত্র ঈদুল আযহা ১১৫০ হিজরী থেকে কাজ শুরু করেন। এরপর পুনরায় সে ইচ্ছা সংকল্প আন্দোলিত হয়। অবশেষে তরজমার কাজ সুসম্পন্ন হয়। পাণ্ডুলিপি তৈরীর কাজ শেষ হয় শাবান মাসের শুরুর দিকে। ১১৫১ হিজরীতে পাণ্ডুলিপির সম্পাদনাও হয়ে যায়। আর ১১৫৬ হিজরীতে দীনী ভাই সুপ্রিয় খাজা মুহাম্মদ আলীম (আল্লাহ তাকে সম্মানিত করুন)-এর সক্রিয় প্রচেষ্টায় এই গ্রন্থখানা প্রকাশিত হয় এবং এর দরস শুরু হয়। পর্যায়ক্রমে তৈরী হয় এর একাধিক অনুলিপি। সমসাময়িকগণ এর প্রতি মনোযোগী হন।

[illegible]

[illegible]

শাহ সাহেব কুরআন তরজমা ও তাফসীর 'ফাতহুর রহমান' ছাড়া উসূলে তরজমার উপর একটি ভূমিকাও লিখেছেন, যা সংক্ষিপ্ত হওয়া সত্ত্বেও অত্যন্ত দূরদর্শীতাসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাপূর্ণ। সূচনাতে লিখেন, 'এ অধম ওয়ালীউল্লাহ্ ইবনে আবদুর রহীম দয়াময় আল্লাহর দরবারে আরয করছে যে, এ পুস্তিকাটি তরজমার মূলনীতি প্রসঙ্গে, যার নাম المقدمة فى قوانين الترجمة রেখেছি। অর্থাৎ যে নীতির উপর তরজমা কুরআন রচনার সময় যথারীতি কলম চলেছে।'

মনে হয় যেন, তরজমা ও কুরআনে কারীমের ব্যাপক প্রচার-প্রসারের পথে বিস্তীর্ণ মরুচর জেগে উঠেছিল। শাহ সাহেবের মত ক্ষুরধার কলম শক্তিধর ব্যক্তিত্বের (যার জ্ঞানের সমুদ্রোপম গভীরতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা, আধ্যাত্মিক মর্যাদা ও ইখলাস সম্পর্কে সমকালের সুস্থ চিন্তাবিদ ও বিজ্ঞ মহলের বিস্ময়ের অন্ত ছিল না।) এই পদক্ষেপে উক্ত মরুময় শূন্যতা দূরীভূত হয়ে যায়। পরিস্কার হয়ে যায় বন্ধুর পথ। ইসলামের ইতিহাসে বরাবরই কোন সর্বজন শ্রদ্ধেবরেণ্য ও উঁচু ব্যক্তিত্বের কোনও কাজ সূচনা করার দ্বারা ভুল বুঝাবুঝি ও কুধারণার মেঘ কেটে গেছে। খুলে গেছে উন্মুক্ত বিশ্বরোড। আবুল হাসান আশ'আরীর বাগ্মীতাপূর্ণ বিতর্কে অংশগ্রহণ ও যৌক্তিক দলিল-প্রমাণ দিয়ে কাজ আঞ্জাম দেওয়া, হুজ্জাতুল ইসলাম ইমাম গাযালী (র)-এর দর্শন পাঠ, তার খণ্ডন ও জবাব দানসহ তার যুগ-সময়ের প্রয়োজন অনুযায়ী ইসলামের সুরক্ষা কিংবা প্রতিরোধমূলকভাবে গৃহিত এমন সব অগ্রণী ভূমিকা তারই নানা উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

শাহ্ সাহেবের পরে উর্দু অনুবাদ

শাহ সাহেবের ফার্সী তরজমার পরে অনেক দ্রুত উর্দু ভাষায় কুরআনের তরজমার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি হয়। বারো হিজরী শতকের শেষ দিকেই ফার্সীর স্থান উর্দু দখল করতে শুরু করেছিল। শুরু হয়ে গিয়েছিল উর্দুতে রচনা ও সংকলনের কাজ। এই প্রয়োজনীয়তা ও পট-পরিবর্তনকে সর্বপ্রথম স্বয়ং শাহ সাহেবের সুযোগ্য পুত্র হযরত শাহ আবদুল কাদির সাহেব দেহলভী (র) (মৃত্যু ১২৩০ হি.) অনুভব করেন এবং ১২০৪-০৫ হিজরীতে শাহ সাহেবের তরজমার প্রায় পঞ্চাশ বছর পর তিনি উর্দু ভাষায় এর এমন এক অনুবাদ রচনা করেন, যার সম্পর্কে বলা যায়, কুরআনে কারীমের এমন সফল ও প্রস্ফূটিত তরজমা, যাতে কোনও অনারবী ভাষায় প্রচুর কুরআনিক শব্দের প্রাণ এসেছে– আজও জানা মতে দ্বিতীয়টি নেই। শাহ সাহেব তার তরজমার ভূমিকায় লিখেছেন,

'এই দুর্বল বান্দা আবদুল কাদিরের মনে খেয়াল হল, আমাদের আব্বাজান যেভাবে বিরাট বড় মনীষী শাহ ওয়ালীউল্লাহ আবদুর রহীম (র)-এর সুযোগ্য পুত্র, সকল হাদীস সম্পর্কে পরিজ্ঞাত, ভারতের অধিবাসী চাইতেন, কুরআনের অর্থ সহজ করে ফার্সী ভাষায় লিখবেন, আলহামদুলিল্লাহ এই প্রত্যাশা ১২০৫ হিজরী মোতাবেক ১৭৯০ খৃস্টাব্দে পূরণ হয়েছে।'

শাহ আবদুল কাদির (র)-এর পরে তাঁরই বড় ভাই শাহ রফীউদ্দীন (মৃত্যু ১২৩৩ হি.) কুরআনে কারীমের শব্দে শব্দে তরজমা করেছেন। যা তার সতর্কতা এবং লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও ইখলাসের কারণে খুবই সমাদৃত হয়েছে। কোনও কোনও শিক্ষিতমহলে শাহ আবদুল কাদির (র)-এর পারিভাষিক তরজমা আর কোথাও কোথাও শাহ রফীউদ্দীন (র)-এর শব্দে শব্দে তরজমা প্রচলিত ও প্রাধান্যযোগ্য স্বীকৃত হয়েছে।

এতদুভয় তরজমাই মুসলমানদের ঘরে ঘরে এমন ব্যাপকতা এবং কুরআনে কারীম তিলাওয়াতের সাথে সাথে তা পাঠ করার এমন প্রচলন হয়েছে, যার নযীর অন্য কোনও ধর্মীয় বই-পুস্তকের ক্ষেত্রে পাওয়া যায় না। আকীদা সংশোধন ও তাওহীদের বিশ্বাসের প্রসারতা সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে উক্ত তরজমা দু'টি থেকে উপকৃত লোকদের কোনও সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না, হয়ত তার সংখ্যা লক্ষকে অতিক্রম করবে। বস্তুতঃ কোনও ইসলামী রাজত্ব বা সরকারও তার উপায়-উপকরণসহ দাওয়াত ও সংস্কারের এত বড় কাজ আঞ্জাম দিতে পারত না, যা আঞ্জাম দিয়েছে উক্ত তরজমা তিনটি, যা একই বৃক্ষের পুণ্যময় শাখা।

وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء

এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে খুশি তা দান করেন।

এর পর দু'টি তরজমায়ে কুরআনের এক বিপ্লব অনুষ্ঠিত হয়। যার ব্যাপকতা নির্ণয় করা এক দুরূহ কাজ এবং পৃথক গবেষণার দাবীদার।

দরসে কুরআন

কুরআনে কারীমের উক্ত উর্দু অনুবাদ ছিল এই সম্ভ্রান্ত বংশের দুই মহামনীষী হযরত শাহ আবদুল কাদির দেহলভী (র) ও হযরত শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী (র)-এর অনূদিত। ভারতের যেখানে যেখানে উর্দুতে কথা বলা হত, সেখানে ঘরে ঘরে তা পাঠ করা হত। এছাড়া কুরআনে কারীমের মাধ্যমে আকীদার পরিচ্ছন্নতা এবং আমল ও চরিত্র সংশোধনের সবচেয়ে দীর্ঘ, বিচক্ষণ ও গভীর, ফলপ্রসূ ও সূক্ষ্ম প্রচেষ্টা হয়েছে। ওয়ালীউল্লাহী বংশের সবচেয়ে প্রবীণ ব্যক্তিত্ব এবং হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেবের কর্মকাণ্ডের পূর্ণতা ও ব্যাপকতা দানের সৌভাগ্য অর্জনকারী মহাপুরুষ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) (মৃত্যু ১২৩৯ হি.)-এর মাধ্যমে। তিনি প্রায় ৬২/৬৩ বছর পর্যন্ত দিল্লীর মত কেন্দ্রীয় শহরে এবং হিজরী তের শতকের মত গুরুত্বপূর্ণ যুগে দরসে কুরআনের কার্যক্রম চালু রাখেন। জনসাধারণ ও বিশেষ ব্যক্তিবর্গের মাঝে এর যে গ্রহণযোগ্যতা ও সাড়া পড়েছে এবং এর দ্বারা আকীদা সংশোধনের যে বিশাল কাজ সম্পাদিত হয়েছে, আমাদের জানা মতে এর কোনও তুলনা নেই।

আল ফাওযুল কাবীর

কুরআনের দাওয়াত, বিশেষ ও জ্ঞানী মহলে কুরআনের চিন্তা-গবেষণার যোগ্যতা সৃষ্টি করা এবং এর মাধ্যমে উম্মতের আত্মশুদ্ধি ও সংশোধনের আগ্রহ-প্রেরণা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে শাহ সাহেবের অনন্য একটি সংস্কার কর্ম ও বৈপ্লবিক খেদমত 'আল ফাওযুল কাবীর'। যা তার বিষয়বস্তুর বিচারে (আমাদের জানা মতে গোটা ইলমী গ্রন্থাগারে) অদ্বিতীয় একটি গ্রন্থনা।

উসূলে তাফসীর সম্পর্কে ব্যাপকভাবে কিছু পাওয়া যায় না। কেবল তাফসীর গ্রন্থের ভূমিকায় নগণ্য কয়েকটি মূলনীতি কিংবা নিজের রচনাপদ্ধতি বর্ণনার লক্ষ্যে কোনও লেখক কয়েক লাইন লিখে দেন। অবশ্য শাহ সাহেবের 'আল-ফাওযুল কাবীর' পুস্তিকাটিও সংক্ষিপ্ত। কিন্তু পূর্ণ পুস্তিকাই সরাসরি তত্ত্ব ও মূলনীতিতে ভরা। বস্তুতঃ এটি কুরআনিক জ্ঞানের সমস্যাগুলোর জ্ঞানগত অভিজ্ঞতাসম্পন্ন একজন বিশিষ্ট আলেমের এক অমূল্য ও বিরল উপহার।

এর মূল্য সে ব্যক্তিই উপলব্ধি করতে পারে, যাকে সেসব সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। কিছু কিছু মূলনীতি স্বয়ং শাহ সাহেব নিজস্ব চিন্তা, গবেষণা ও কুরআনিক জ্ঞানের ভিত্তিতে লিখেছেন। অন্যান্য কিতাবাদির হাজার হাজার পৃষ্ঠা মুতালা'আর দ্বারাও সেগুলো পাওয়া যাবে না। এ পুস্তিকার ভূমিকায় শাহ সাহেব যথার্থই লিখেছেন–

'দীন ওয়ালীউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম (আল্লাহ্ পাক তার সঙ্গে অপার দয়া ও করুণার ব্যবহার করুন) বলছে, যখন আল্লাহ তা'আলা এই অধমের প্রতি কিতাবুল্লাহর জ্ঞানের দুয়ার খুলে দিলেন, তখন কিছু উপকারী তত্ত্বকণিকা (যার দ্বারা মানুষ কুরআনের জ্ঞান-গবেষণায় উপকৃত হবে) সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকায় লিখে দেওয়ার আগ্রহ হল। আল্লাহর অফুরন্ত রহমতের ভাণ্ডারে আশা রাখি যে, ছাত্রদের জন্য এসব মূলনীতি জানার পর কুরআনিক মর্ম অনুধাবনের এমন প্রশস্ত পথ খুলে যাবে যে, যদি অসংখ্য তাফসীর গ্রন্থ অধ্যয়ন এবং মুফাসসিরীনে কিরামের (বর্তমানে যাদের সংখ্যা খুবই কম) সংশ্রব ও শরণাপন্ন হয়ে একটি জীবনও কেটে যায়, তবু কুরআনিক জ্ঞানের সঙ্গে এরূপ সম্পর্ক ও নিবিড়তা সৃষ্টি করতে পারবে না।'

কুরআনের বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্য, এর বাচনভঙ্গি ও বর্ণনাশৈলীর বিশেষত্ব এবং মানবীয় রচনাবলি বিশেষতঃ পূর্ববর্তী পাঠ্যপুস্তক থেকে এর মতদ্বৈততা, স্বকীয়তা ও শানে নুযূল সম্পর্কে কয়েক শব্দে যা কিছু লিখেছেন, আজ তাতে কোনও স্বল্পতা-অপূর্ণতা অনুভূত না হওয়া সম্ভব। কিন্তু বারো হিজরী শতকে এটা ছিল সম্পূর্ণ নতুন চিন্তা। আর আজও কত মহলে সে চিন্তাধারা অচেনা-অপরিচিত! শানে নুযূলের বিবরণের আধিক্য ও এর গুরুত্বের প্রতি বেশি জোর দেওয়ার কারণে (যা শেষ যুগের অভ্যাস-রীতি হয়ে গিয়েছিল) বস্তুতঃ কুরআনে কারীমের বিষয়বস্তু, ঘটনাবলি, উপদেশ ও শিক্ষা দ্বারা প্রত্যেক যুগে যে উপকারিতা লাভ এবং স্ব-স্ব যুগ ও অবস্থা প্রেক্ষিতের উপর যেভাবে প্রযোজ্য হওয়া উচিত, তাতে বিরাট পার্থক্য সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। শাহ সাহেবের এই গবেষণা ও পর্যালোচনা দ্বারা সেই পর্দা দূরীভূত এবং কুরআনে কারীমের বিশ্বনন্দন সৌন্দর্য প্রস্ফুটিত হয়ে ওঠে। আল-ফাওযুল কাবীর-এর প্রথম পাঠে শাহ সাহেব লিখেন,

'সাধারণ মুফাস্‌সিরগণ প্রত্যেক আয়াতে কারীমাকে চাই সেটি মাসাইল সম্পর্কিত হোক কিংবা হুকুম-আহকাম সম্পর্কিত; একটি ঘটনার সাথে সম্পৃক্ত করে দিয়েছেন। আর সেই ঘটনাকে উক্ত আয়াতে কারীমার 'অবতীর্ণের কারণ' হিসেবে ধরে নিয়েছেন। কিন্তু সঠিক কথা হচ্ছে, কুরআন

অবতীর্ণের প্রকৃত উদ্দেশ্য মূলতঃ মানব সত্তার সভ্যতা-শৃঙ্খলা এবং তার ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস ও ন্যাক্কারজনক গর্হিত কাজগুলো প্রত্যাখ্যান করা। কাজেই প্রশ্নোত্তর বা বিতর্কের আয়াতে কারীমাগুলো অবতরণের জন্য মুতাকাল্লিমদের মাঝে ভ্রান্ত আকীদার অস্তিত্ব আর আহকাম সম্পর্কিত আয়াতে কারীমার জন্য তাদের মধ্যে পাপাচার ও অন্যায়-অপরাধের ব্যাপকতা এবং যিকির-আযকার সম্পর্কিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণের জন্য তাদের আল্লাহর নিদর্শন, আল্লাহর দিবসের স্মরণ এবং মৃত্যু ও মৃত্যুর পরবর্তী ঘটনাবলি প্রকাশিত না হওয়া- প্রকৃত কারণ হয়েছে। যেসব বিশেষ ঘটনা উদ্ধৃতকরণের কষ্ট সাধারণ মুফাসসিরগণ স্বীকার করেছেন, শানে নুযূলের ক্ষেত্রে সেসবের ন্যূনতম দখলও নেই। অবশ্য তন্মধ্যে কিছু আয়াতে কারীমায় এমন কোনও বিশেষ ঘটনার প্রতি ইংগিত করা হয়েছে, যা রাসূলে কারীম (স)-এর যুগে কিংবা তার অনেক পূর্বে সংঘটিত হয়েছে।

কুরআনে কারীম যেসব দল ও গোষ্ঠীকে প্রত্যাখ্যান করেছে, তাদের মূল চিন্তাধারা, আকীদা-বিশ্বাস এবং দুর্বলতাগুলোর বিবরণ, তাদের গোমরাহী-পথভ্রষ্টতা ও ভুল বুঝাবুঝির প্রকৃত কারণ এবং তার ইতিহাস, নেফাকী ও কপটতার ব্যাখ্যা, মুসলিম উম্মাহর কোনও সম্প্রদায় ও দলের উপর সেসবের প্রয়োগে কুরআনিক জ্ঞানের ভিত্তি, যা সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও এমন সুস্পষ্টতার সাথে কোনও বড় থেকে বড় তাফসীর গ্রন্থে পাওয়া যাবে না।

কোনও আয়াত নসখ বা রহিতকরণে পূর্ববর্তী ও পরবর্তীদের মধ্যকার পারিভাষিক পার্থক্যের ব্যাখ্যা, রহিত ও রহিতকারী আয়াতে কারীমার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনদের তাফসীরমূলক মতভেদগুলোর সমাধানে এটি শাহ সাহেবের অনন্য গবেষণাকর্ম।

কোনও কোনও আয়াতে কারীমার সাথে নাহু শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ ও প্রকাশ্য মূলনীতির বাহ্যিক অমিলের যে ব্যাখ্যা শাহ সাহেব (র) দিয়েছেন, এর মূল্যায়ন তারাই করতে পারে, যারা নাহব সংকলনের ইতিহাস সম্পর্কে ওয়াকিফহাল এবং বসরা ও কুফার মাদরাসার মতবিরোধগুলোর প্রতি দৃষ্টি রাখেন। উক্ত পুস্তিকার বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এটি পাঠ করে প্রাচীন ধর্মমত, ভ্রান্ত সম্প্রদায় এবং জাতি ও গোষ্ঠীসমূহের পুরোনো রোগ ও দুর্বলতাগুলো চিহ্নিত হয়, কুরআনের আয়নায় মুসলমান প্রজন্মগুলোর এবং স্ব স্ব যুগের মুসলিম সমাজ ও জাতির বিভিন্ন শ্রেণীর আপন চেহারা দেখার তাওফীক হয়। সেই সাথে চিন্তা-ফিকির করা যায় যেন ধর্ম-মাযহাব ও সম্প্রদায়ের পুরোনো রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতাগুলো অবশেষে তাদের ভেতর প্রবিষ্ট না হয়ে যায়।

لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم، افلا يعقلون.

'আমি তোমাদের নিকট এমন কিতাব অবতীর্ণ করেছি, যাতে তোমাদের বৃত্তান্ত রয়েছে। তোমরা কি বোঝ না?' (সূরা আম্বিয়া : ১০)

তাওহীদের উপর জ্ঞানগত তত্ত্ব-গবেষণা

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) আকীদা সংশোধন ও খাঁটি তাওহীদের দাওয়াতের ধারাবাহিকতায় কুরআনে কারীমের তরজমা ও দরসে কুরআন (কুরআনের অনুবাদ ও পাঠদান) পর্যন্তই থেমে থাকেননি বরং একজন আলেম গবেষকের মত এর নিগুঢ় তত্ত্বানুসন্ধান ও পর্যালোচনা করেছেন। তাওহীদে বিশ্বাস স্থাপন মিল্লাতে ইবরাহীমীর সবচেয়ে বড় নিদর্শন। হযরত ইবরাহীম (আ) এর দাওয়াত ও চেষ্টা-সংগ্রামের সবচেয়ে বৃহৎ উদ্দেশ্য আর সর্বশেষ নবী মুহাম্মদ (স)-এর দাওয়াতের ভিত্তি এবং শুরু ও শেষ। গোটা কুরআন ও হাদীসের ভাণ্ডার ও সীরাতে নববী (স) এর উপর সাক্ষী। তিনি তাওহীদ ও শিরকের মাঝে এমন প্রভেদকারী প্রাচীর দাঁড় করিয়েছেন, তাওহীদের নিগুঢ়তা ও বাস্তবতাকে এমনভাবে প্রস্ফুটিত করেছেন, শিরকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সংশয়-সংমিশ্রণ ও এর হালকা থেকে হালকা বিষয়গুলোর বিরুদ্ধে এমন জিহাদ করেছেন, উম্মতের আকীদা-বিশ্বাসে শিরকের অনুপ্রবেশ এবং আকাইদে দোষ-ত্রুটি সৃষ্টি হওয়ার উপাদানগুলোর এমন কঠোর প্রতিরোধ গড়ে তুলেছেন, যার থেকে বেশি কল্পনা করা সম্ভব নয়। এসব তত্ত্ব-বাস্তবতা এতটাই মুতাওয়াতির ও সুস্পষ্ট, যার দলীল-প্রমাণ ও উদাহরণের প্রয়োজন নেই। কুরআন-হাদীসের উপর যার সামান্য দৃষ্টিও আছে, সে তা স্বীকার না করে পারে না।

তদুপরি এই উম্মতের মধ্যে ধনৈশ্বর্যের যুগ অতিবাহিত হওয়া, নতুন নতুন দেশ-অঞ্চল বিজিত হওয়া, সেখানকার মানুষের ইসলাম গ্রহণ, অমুসলিম সম্প্রদায় ও জাতির সঙ্গে মেলামেশা ও বসবাস এবং কাল পরিক্রমার প্রভাবে জনসাধারণের বড় এক শ্রেণীর মাঝে শিরকী আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকর্ম কোত্থেকে প্রবিষ্ট হয়ে গেল, তাদের একত্ববাদের অনেক নিদর্শন ও শে'আর এর সঙ্গে মুসলিম সমাজে স্বস্থান তৈরী করে নেওয়ার কেমন সুযোগ হয়ে গেল, প্রচুর পাণিপ্রার্থী বিদ্যাকে তাদের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ এবং সেগুলোকে পছন্দনীয় ও জায়েয সাব্যস্ত করার সাহস কিভাবে হল আর অসংখ্য শিক্ষিত মুসলমান কিভাবে এই ভুল-ভ্রান্তির শিকার হয়ে গেল?

শাহ সাহেবের মতে এর কারণ তাওহীদের বাস্তবতা, জাহেলী যুগের মুশরিক ও আরববাসীদের মহান আল্লাহর 'বিশ্বজগতের সৃষ্টিকর্তা এবং বড় বড় সকল বিষয়ের ব্যবস্থাপক হওয়া'র ব্যাপারে আকীদাকে সঠিকভাবে না

বুঝা। জনসাধারণের বড় একটি শ্রেণী মনে করেছে, শিরকের বাস্তবতা হচ্ছে, কোনও সত্ত্বাকে (সে জীবিত হোক চাই মৃত) একেবারে আল্লাহর সমকক্ষ ও সমতূল্য বানিয়ে নেওয়া, আল্লাহর প্রত্যেক গুণাবলি ও কাজকর্মকে তার সাথে সম্পৃক্ত করা। বাস্তবিক ও মৌলিকভাবে তাকেই সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা মনে করা। তবে আল্লাহর কোনও কোনও গুণকে তার কোনও প্রিয় বান্দার সাথে সম্পৃক্ত করা এবং কোনও কোনও কাজকর্ম (যা আল্লাহর সঙ্গে নির্দিষ্ট) তার থেকে প্রকাশ পায় বলে মানা, কুদরতের কোনও কোনও বিষয় তাদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়া আবার আল্লাহ তা'আলা কর্তৃক স্বেচ্ছায় তার কিছু খোদায়ী অধিকার তাদের উপর ন্যস্ত করা ইত্যাদি তাওহীদের পরিপন্থী এবং শিরকের নামান্তর নয়। এভাবে নিছক আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও আল্লাহর দরবারে শাফা'আত পাওয়ার প্রত্যাশায় কারও এতধিক সম্মান প্রদর্শন করা, তার সঙ্গে এমন সব কাজকর্ম ও আচরণ করা, যা ইবাদতের (উপাসনার) গণ্ডিভুক্ত – তা-ও শিরকের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা এসব কেবল আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জনের একটি উপায় এবং ঐ 'কী ও কেন মুক্ত দরবার' পর্যন্ত পৌঁছার (যেখানে সাধারণ মানুষ পৌঁছাতে পারে না) একটি ফলপ্রসূ ও কার্যকর পন্থা মাত্র। আরবের কাফিররা বলত,

ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى

আমরা তাদের পুজা কেবল এজন্যই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটতর করে দেবে। (সূরা যুমার : ৩)

এ ছিল সেই ধোঁকা ও অন্ধতা, যার কারণে এই উম্মতের অসংখ্য লোকজন শিরকের নিষিদ্ধ ভূমিতে গিয়ে পতিত হয়েছিল। আর এই প্রাচীনত্বের সীমানা এফোঁড়-ওফোঁড় করে গিয়েছিল, যা তাওহীদ ও শিরকের পার্থক্য বিধানকারী। (Line of Demarcation) এজন্য সর্বপ্রথম ও সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ জানার বিষয় ছিল– এ বর্বর যুগের লোকজন ও আরবের মুশরিকদের আকীদা আল্লাহর তা'আলার ব্যাপারে কি ছিল, তারা আল্লাহর সত্ত্বা ও গুণাবলি সম্পর্কে কি বিষয়ের দাবীদার ছিল, আল্লাহ তা'আলাকে জগৎস্বামী, আকাশ-যমীনের সৃষ্টিকর্তা এবং মুতলাক কাদের (একচ্ছত্র ক্ষমতার অধিকারী) মনে করা সত্ত্বেও কি কারণে রাসূলুল্লাহ (স) তাদেরকে মুশরিক দল বলেছেন কুরআনে কারীম তাদের মুশরিক হওয়ার ঘোষণা করেছেন?

শাহ সাহেব তার অতুলনীয় কিতাব 'আল ফাওযুল কাবীর' -এ লিখেছেন– শিরক হচ্ছে, মা-সিওয়াল্লাহর (আল্লাহ ব্যতিত অন্য কারও) জন্য এরূপ গুণাবলি সাব্যস্ত করা, যা আল্লাহর সাথে সুনির্দিষ্ট। যেমন– বিশ্বজগতে

تصرفات ارادى বা স্বেচ্ছা কর্মক্রিয়া, যাকে كن فيكون (কুন-ফাইয়াকুন) দ্বারা ব্যাখ্যা করা হয় কিংবা আল্লাহর সত্ত্বাগত জ্ঞান, যা না অর্জিত হয় ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে, না বিবেক-বুদ্ধির জোরে আর না স্বপ্নযোগে ও ইলহাম ইত্যাদির মাধ্যমে। রুগ্নদের আরোগ্য দান কিংবা কারও উপর অভিশম্পাত করা ও তার প্রতি অসন্তুষ্ট হওয়া, যার কারণে তাকে দৈন্যদশা, রোগ-ব্যাধি ও দুর্ভাগ্য ঘিরে ধরে অথবা রহমত প্রেরণ করা, যার ফলে তার স্বচ্ছলতা, সুস্থতা ও সৌভাগ্য হাসিল হবে।'

মুশরিকরাও জাওহার (পরমাণু) ও বিশাল কর্মসৃজনে কাউকে আল্লাহ তা'আলার শরীক মানত না। তাদের বিশ্বাস ছিল, যখন আল্লাহ তা'আলা কোনও কাজ করার ইচ্ছা করে ফেলেন, তখন কারও মধ্যেই তাকে নিবৃত্ত করার শক্তি নেই। তাদের শিরক কেবল এমন সব বিষয়ে ছিল, যেগুলো কতিপয় বান্দার সাথে খাস ছিল। তাদের ধারণা ছিল, যেভাবে মহামান্য সম্রাট তার একান্ত কাছের লোকদেরকে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের শাসক নিযুক্ত করেন এবং কিছু বিশেষ ব্যাপার মীমাংসায় (যতক্ষণ না সরকারী কোনও সুস্পষ্ট নির্দেশ আসে) তাদেরকে স্বাধিকার দিয়ে দেন। নিজ প্রজাসাধারণের ছোট ছোট বিষয়ের ব্যবস্থাপনা স্বয়ং করেন না; বরং সেগুলো ঐ শাসকবর্গের দায়িত্বে ন্যস্ত করেন। আর সেসব শাসকবর্গের সুপারিশ তাদের অধীনস্থ আমলা-কর্মচারীদের ব্যাপারে গ্রহণ করা হয়। অনুরূপভাবে নিখিল বিশ্ব চরাচরের রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহ তা'আলা) তার বিশেষ বান্দাদেরকে প্রভুত্বের মর্যাদার চাদরে সম্মানিত করেছেন। এমন ব্যক্তিবর্গের সন্তুষ্টি-অসন্তুষ্টি অন্যান্য বান্দাদের ব্যাপারে প্রতিক্রিয়াশীল। এজন্য তারা সেসব খাছ বান্দাদের নৈকট্য লাভকে জরুরী মনে করত। যেন আসল বাদশাহর দরবারে গ্রহণযোগ্যতা পাওয়ার উপযোগিতা সৃষ্টি হয়ে যায়। আর বিনিময় দিবসে তাদের পক্ষে সুপারিশ গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদা লাভ করে। এসব কাল্পনিক প্রয়োজনাদির প্রতি লক্ষ্য করে তাদেরকে সিজদা করা, তাদের জন্য কুরবানী করা, তাদের নামে কসম খাওয়া, এমনকি জরুরী বিষয়ে তাদের কুন-ফাইয়াকুন শক্তির সাহায্য নেওয়া জায়েয মনে করত। তারা পাথর, তামা, সীসা ইতাদি মূর্তি বানিয়ে সেসব খাছ বান্দাদের আত্মার প্রতি ধ্যানমগ্ন হওয়ার একটি মাধ্যম সাব্যস্ত করেছিল। কিন্তু কালক্রমে জাহেল-মূর্খরা সেসব পাথরকেই নিজেদের আসল মাবুদ ও উপাস্য বুঝতে শুরু করে। আর মহাভুলের সংমিশ্রণ হয়ে যায়।

অনুরূপভাবে শাহ সাহেব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ' গ্রন্থে আরও লিখেন— শিরকের বাস্তবতা হচ্ছে, মানুষ এমন কোনও ব্যক্তি, সমাজে যাকে

সম্মানযোগ্য মনে করা হয়, তার ব্যাপারে এরূপ বিশ্বাস ও আকীদা পোষণ করল যে, তার থেকে যেসব অসাধারণ কাজকর্ম ও ঘটনাবলি প্রকাশ পায়, তার কারণ সে সিফাতে কামাল (পূর্ণাঙ্গ গুণাবলি) থেকে এমন কোনও সিফাত বা গুণে গুণান্বিত, মানব জাতির কারও মধ্যে যার দেখা মিলেনি। সেই সিফাত অপরিহার্য সত্ত্বার সাথে খাছ। তিনি ছাড়া অপর কারও মাঝে তা পাওয়া যায় না। এর একাধিক রূপরেখা হতে পারে। প্রথমতঃ সেই অপরিহার্য সত্ত্বা তার কোনও সৃষ্টিকে প্রভুত্বের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন কিংবা ঐ মাখলুক আল্লাহর যাতের মধ্যে লীন বা আত্মবিস্তৃত হয়ে গিয়ে বাকীবিল্লাহর রূপ নেবে অথবা এই আকীদা পোষণকারীর নিজের পক্ষ থেকে আবিস্কৃত কোনও রূপ ধারণ করবে। হাদীস শরীফে মুশরিকদের পঠিত তালবিয়া (লাব্বাইক ....) এর যে শব্দাবলি উদ্ধৃত হয়েছে, তা এ আকীদার একটি নমুনা ও উদাহরণ। হাদীস শরীফে এসেছে, আরবের মুশরিকরা (জাহেলী যুগে ইসলাম আসার পূর্বে) নিম্নোক্ত শব্দে তালবিয়া পাঠ করত,

لبيك لبيك لا شريك لك، إلا شريكا هو لك تملكه و ما ملك-

'ওহে প্রভু! আমি হাজির। আমি হাজির। তোমার কোনও শরীক নেই, একমাত্র তোমার খাছ বান্দা ছাড়া, তুমি তারও মালিক এবং তার মালিকানাধীন বিষয়-আশয়েরও মালিক।'

সে মতে এই আকীদায় বিশ্বাসী লোক উক্ত মহাপুরুষের সামনে (যাকে সে আল্লাহর বিভিন্ন গুণের অধিকারী এবং প্রভুত্বের পোশাকে সম্মানিত মনে করে) নিজের চরম দীনতা-হীনতা ও অসহায়ত্ব প্রকাশ করে। অধিকন্তু তার সঙ্গে এরূপ আচরণ করে, যেমনটি করা উচিত বান্দাদের আল্লাহ তা'আলার সাথে।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' -এর অপর এক স্থানে মুশরিকদের শিরকের বাস্তবতা কি ছিল, মহান আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারে তাদের এবং (বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী) মুসলমানদের মাঝে কয়টি বিষয়ে ঐকমত্য ছিল– এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেন। বস্তুতঃ মুশরিকরা আল্লাহর অস্তিত্ব, তার একত্ব ও সর্বশক্তিমান হওয়াকে অস্বীকার করত না। কেবলমাত্র কিছু গুণাবলি ও অধিকারের ব্যাপারে তারা (আল্লাহ পাকেরই সন্তুষ্টি ও ইচ্ছানুযায়ী) তার কতিপয় নৈকট্যশীল প্রিয় বান্দাদেরকে অংশীদার ও স্বাধীন ক্ষমতার অধিকারী মনে করত আর তাই তাদের সঙ্গে উপাস্য ও দাসত্বের আচরণ করত ইত্যাদি বিষয়গুলোর ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে 'তাওহীদ অধ্যায়' শিরোনামে তিনি লিখেন, 'মুশরিকরা এক্ষেত্রে মুসলমানদের মতই চিন্তাধারা ও আকীদা পোষণ করত যে, বড় বড় কাজ আঞ্জাম দেওয়া এবং যে ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা চূড়ান্ত

সিদ্ধান্ত নিয়ে নেন এবং তার ইচ্ছা চূড়ান্ত হয়ে যায়, তাতে অন্য কারও অধিকার বাকী থাকে না। অবশ্য অন্যান্য বিষয়ে তারা মুসলমানদের থেকে পৃথক মতাদর্শ অনুসরণ করেছিল। তাদের ধারণা ছিল, প্রাচীন যুগের নেককার-বুযুর্গগণ প্রচুর ইবাদত-বন্দেগী করেছেন এবং আল্লাহর নৈকট্য লাভ করেছেন। সুতরাং আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে প্রভুত্বের পোশাক দান করেছেন। এজন্য তারা আল্লাহর অন্যান্য বান্দাদের উপাসনা পাওয়ার যোগ্য হয়ে গেছেন। যেমন– বাদশার কোনও চাকর যদি উক্ত বাদশার সেবার হক পুরোপুরি আদায় করে, তবে বাদশা তাকে রাজকীয় পোশাক দান করেন এবং নিজের রাজত্বের কোনও এলাকার শাসনভার তার উপর ন্যস্ত করেন। তখন সে ঐ এলাকাবাসীর দাবী-দাওয়া শোনা ও পূরণের অধিকারী হয়ে যায়। কাজেই তারা বলত, আল্লাহর দাসত্ব ও ইবাদত তখনই কবুল হতে পারে, যখন তাতে এমন গ্রহণযোগ্য ও প্রিয় বান্দাদের দাসত্বও শামিল থাকবে। বস্তুতঃ আল্লাহ তা'আলা মানুষদের থেকে এত বেশি উঁচু ও বড় যে, সরাসরি তার ইবাদত আদৌ ফলপ্রসূ হতে ও তার দরবারে পৌঁছুতে পারে না। তাই দরবারে এলাহীর সেসব প্রিয়পাত্রগণ দেখেন, শোনেন এবং স্বীয় বান্দাদের জন্য সুপারিশ করেন। তাদের কাজ কারবারের ব্যবস্থা করেন। তাদের সাহায্য করেন। তারা তাদের নামে পাথর খোদাই করে এবং তাদেরকে নিজেদের মনোযোগিতার কেন্দ্রবিন্দু ও কিবলা বানিয়ে নেয়। পরবর্তী এমন লোক এসেছে, যারা ঐ মূর্তিগুলো এবং যাদের নামে এসব মূর্তি তৈরী করা হয়েছিল, তাদের মধ্যে পার্থক্য বুঝতে পারেনি। তারা স্বয়ং এগুলোকে উপাস্য মনে করে বসে।

অন্যত্র আরও লিখেন, 'আরবের মুশরিকরা দাবী করত, আল্লাহ তা'আলার আকাশ-মাটি সৃজনে কেউ অংশীদার নেই। তদ্রূপ এতদুভয়ের মধ্যে যেসব অণু-পরমাণু রয়েছে, সেগুলোর সৃষ্টিতেও কেউ তার অংশীদার নেই। গুরুত্বপূর্ণ বিষয়াদি ও কাজকর্ম সমাধানেও কেউ তার অংশীদার নেই। তার সিদ্ধান্তকে রহিত বা স্থগিতকারী চূড়ান্ত নির্দেশ প্রতিহতকারীও কেউ নেই। আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমে ইরশাদ করেন,

ولئن سألتهم من خلق السموت والأرض ليقولن الله.

'তোমরা যদি সেসব মুশরিকদের জিজ্ঞেস করো, আকাশ-মাটি কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে তারা অবশ্য অবশ্যই বলবে, আল্লাহ।' (সূরা লোকমান : ২৫)

কুরআনে কারীম স্বয়ং সাক্ষ্য দিচ্ছে, এসব মুশরিক আল্লাহ তা'আলাকে মানত। তার কাছে প্রার্থনাও করত।

بل اياه تدعون

'বরং তার কাছেই প্রার্থনা করত।' (সূরা আন'আম : ৪১)

ضل من تدعون الا اياه.

'একমাত্র তার কাছেই দু'আ করলে কাজে আসে। অন্যের কাছে দু'আ প্রার্থনা বৃথা (নিষ্ফল) যায়।' (সূরা ইসরা : ৬৭)

বস্তুতঃ এসব মুশরিকের ভ্রষ্টতা ও অধর্ম ছিল এই যে, তাদের বিশ্বাস ছিল, কিছু ফিরিশতা ও পুণ্যাত্মা আছেন– যারা (বড় কাজগুলো বাদ দিয়ে) স্বীয় প্রভুর সেসব ছোট-খাট, ক্ষুদ্র ও পরোক্ষ বিষয় আঞ্জাম দেন এবং তার কাজ সমাধান করে দেন, যেগুলোর সম্পর্ক তার সত্ত্বা, সন্তানাদি, ধন-সম্পদ ও অধীনস্থদের সাথে। তাদের মতে তাদের সাথে প্রভুর এমনই সম্পর্ক রয়েছে, যেমনটি বাদশার সাথে কোনও রাজকীয় গোলামের থাকে এবং কোন দূত, সুপারিশিকারী ও প্রিয়পাত্রদের হয়ে থাকে ক্ষমতাধর সম্রাটের সাথে। আল্লাহর শরীয়তে যেখানেই আলোচিত হয়েছে, আল্লাহ তা'আলা কিছু কাজ তার কিছু ফিরিশতাদের দায়িত্বে ন্যস্ত করেছেন কিংবা প্রিয়পাত্রদের দু'আ প্রার্থনাগুলো কবুল করা হয়, মূর্খ লোকজন সেসবকে ভিত্তি করে তাদেরকে এমন ক্ষমতাধর ও শক্তিমান বুঝে নিয়েছে, যেমন স্বয়ং বাদশা স্বাধীন সর্বেসর্বা হয়ে থাকে। অথচ এটা ছিল বাস্তবের উপর অদৃশ্য জগতকে অনুমান করা আর এর দ্বারাই সকল কলুষতা ও পাপাচার সৃষ্টি হয়েছে।

এভাবেই শাহ সাহেব সর্বসাধারণ এবং সাধারণদের মত বিশেষ মহলের লোকদের অসংখ্য শিরকী আকীদা ও কাজকর্মের মূলোৎপাটন করেন। বিদীর্ণ করেন, সেই ধোঁকার পর্দা, যার কারণে অনেক জাহেল-মূর্খ ও জ্ঞানের দাবীদাররা যেসব কাজকর্ম, রুসম-রেওয়াজ, শিরকী নিদর্শন, গাইরুল্লাহর নামে মান্নত ও যবাই করা, বুযুর্গদের নামে রোযা রাখা, ওয়ালী-বুযুর্গদের কাছে দু'আ প্রার্থনা, ভয় ও আশা, সাহায্য ও আশ্রয় প্রার্থনা, তাদের সাথে সম্পৃক্ত বস্তুসমূহকে হেরেম শরীফ ও বাইতুল্লাহর মত সম্মান প্রদর্শন, তাদের জন্য তদ্রূপ সম্মানের প্রতি যত্নবান থাকা, বিশ্বজগতে তাদের ছোট ছোট কার্যক্রম, মানুষের সৌভাগ্য-দুর্ভাগ্য, অসুস্থতা ও সুস্থতা, রিযিকের স্বচ্ছলতা ও দৈন্যদশায় ক্রিয়াশীল হওয়ার শিরকী আকীদায় আক্রান্ত আর فاعبد الله مخلصا له الدين এর উপর আমল করা, তাওবা-ইস্তিগফার, আল্লাহর উপর তাওয়াক্কুল ইত্যাদির অমূল্য সম্পদ থেকে তারা ছিল বঞ্চিত। যাদের কোনও কোনও অবস্থা শুনে ও আমল দেখে অজান্তেই মনে পড়ে যায় কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত-

وما يؤمن من اكثرهم بالله الا وهم شركون.

'আর এরা অধিকাংশই আল্লাহর উপর ঈমান রাখে না, তবে সেই সাথে তারা শিরক করে।' (সূরা ইউসুফ : ১০৬)

শাহ সাহেব এবং তার উত্তরসূরীদের যদি এই তাওহীদের আকীদা-সংস্কার, এর ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, প্রচার-প্রসার ও এ সংক্রান্ত ভুল তথ্য-জ্ঞান দূরীভূত করা ছাড়া অন্য কোন কৃতিত্ব না-ও থাকত, তবু এই একটিমাত্র কৃতিত্বই তাকে উম্মতের মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) বলে গণ্য করতে যথেষ্ট ছিল। অন্যান্য কৃতিত্ব তো আরও উর্ধ্বে; যার বিবরণ অত্যাসন্ন।

আকাইদের তত্ত্ব-জ্ঞান

কুরআন সুন্নাহর আলোকে, সাহাবা ও তাবেঈনে কিরামের মতানুসারে

শাহ সাহেব (র) এর বুনিয়াদী সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ড ছাড়া, যার সম্পর্ক ছিল সাধারণ মুসলমান ও গোটা মুসলিম সমাজের সাথে, যা ছাড়া হেদায়াত ও জটিলতা মুক্ত এবং আল্লাহর সাহায্য-সহযোগিতা ছিল অসম্ভব– তাঁর আরেকটি পরোক্ষ শিক্ষা ও সংস্কারমূলক কীর্তি ছিল, তিনি আকাইদের তত্ত্ব-জ্ঞানের কাজ কুরআন-সুন্নাহের আলোকে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈগণের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা অনুযায়ী কাজ করার দাওয়াত দিয়েছেন। আর নিজে এর উপর আমল করে পেশ করেছেন এর শিক্ষণীয় দৃষ্টান্ত। মুসলিম বিশ্বের শিক্ষা জগতে যুগ যুগ ধরে এমন যুগশ্রেষ্ঠ অসাধারণ ধীমান চিন্তাবিদ ও নছসমূহের অনুবর্তী মুজাহিদের প্রয়োজন ছিল অপরিসীম। যিনি দর্শন ও দার্শনিকদের চিন্তাধারার সঙ্গে (স্বয়ং যাদের ইলমে কালামের উপর পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল) চক্ষু মিলিয়ে কথা বলবেন। কুরআনের উপর যার ঈমান হবে এমন, যেভাবে তা অবতীর্ণ হয়েছে। আল্লাহ তা'আলার গুণাবলি ও কর্মক্রিয়াসমূহ তিনি কোন প্রকার রদবদল ও ব্যাখ্যা টানা ছাড়া তদ্রূপই মেনে চলবেন, যেরূপ তিনি স্বয়ং তার সম্পর্কে বলে থাকেন। এসব বাস্তবতার এমন তাফসীর (ব্যাখ্যা) করবেন, যাকে একদিকে জ্ঞান ও শরয়ী দলীল-প্রমাণ শক্তিশালী করে, অপরদিকে বিবেক এবং যুক্তিও একে স্বীকার করে অকুণ্ঠচিত্তে। এরূপ মহাপুরুষ কুরআনিক জ্ঞানের সাগর ও নববী ইলমের পাঠশালা থেকে ফয়েয ও বরকতপ্রাপ্ত হকপন্থী উলামায়ে কিরামই হতে পারেন। যিনি ছিলেন দর্শন শাস্ত্র ও মুতাকাল্লিমসুলভ সূক্ষ্মদৃষ্টি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আকাইদে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে মুতাওয়াতিরের অনুগত। আল্লাহ তা'আলার উপর সেসব গুণবৈশিষ্ট্যসহ ঈমান ও বিশ্বাস রাখতেন, যা তিনি তার কিতাবে (কুরআনে কারীমে) বর্ণনা

করেছেন। একটি হাদীসে উলামায়ে হকের যে পরিচয় বর্ণিত হয়েছে, তাঁর উপর পুরোপুরিভাবে তা প্রযোজ্য হত।

ينفقون عن هذه الدين تحريف الغالين، وانتحال المبطلين وتاويل الجاهلين.

'তিনি উগ্রবাদীদের বিকৃতি-রদবদল, মিথ্যাপূজারীদের ভুল সম্পর্ক এবং মূর্খদের অপব্যাখ্যা থেকে দীনকে সংরক্ষণ করেন।'

এসব উলামায়ে কিরাম থেকে কোনও যুগ শূন্য ছিল না। এই মহাপুরুষদের মধ্যে ৮ম হিজরী শতকের বিশিষ্ট আলেম শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবেন তাইমিয়া হাররানী (র) (মৃত্যু ৭২৮ হি.) তারপরে তার বিশিষ্ট শিষ্য আল্লামা ইবনে কাইয়িম জযিয়া 'যাদুল মা'আদ' রচয়িতা (মৃত্যু ৭৯১ হি.) এবং এই মতাদর্শে বিশ্বাসী অন্যান্য অনেক বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম রয়েছেন, যাদের তালিকা তেমন দীর্ঘ নয়।

ইমাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর পরে যদি এক্ষেত্রে পূর্ণ আস্থার সাথে কারও নাম নেওয়া যায় এবং তার কর্মতৎপরতা আলেম-উলামাদের সম্মুখে থাকে, তাহলে তিনি হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র)। যিনি আকাইদের তত্ত্ব-জ্ঞান এবং একে পূর্বসূরী তাবিঈন ও তাবে-তাবেঈদের জ্ঞান ও মতাদর্শ অনুযায়ী পেশ করার পূর্ণ যোগ্যতা রাখতেন। কেননা একদিকে তিনি ইউনানী দর্শন ব্যাপক ও গভীরভাবে অধ্যয়ন করেছিলেন। ইলমে কালামের পূর্ণ ভাণ্ডার তার চোখের সামনে বরং তার আয়ত্বাধীন ছিল। অপরদিকে তিনি ছিলেন কুরআনে কারীমের দূরদর্শী মুফাসসির, ইলমে হাদীসের বিশিষ্ট পণ্ডিত এবং শরীয়তের সূক্ষ্মতা ও উদ্দেশ্যের তত্ত্বজ্ঞানী। এজন্য তিনি ছিলেন 'শাব্দিকতা' ও 'ব্যাখ্যা' এর মাঝে ভারসাম্য রক্ষাকারী। তার রচিত 'العقيدة الحسنة' (আল-আকীদাতুল হাসানাহ) মর্মের গভীরতা এবং ভাষার মধুরতা ও গতিশালতা দু'টিরই সম্পূরক ছিল। এ গ্রন্থটি ইলমে তাওহীদ তথা ইলমে কালামের এমন একটি মতন (মেরুদণ্ড), যার মধ্যে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকীদা-বিশ্বাসের সেই মগজ ও সারনির্যাস এসে গেছে, যার সম্পর্কে প্রত্যেক শিক্ষিত-জ্ঞানী মুসলমানের অবগত হওয়া উচিত; যে নিজেকে আহলে সুন্নাতের দলভুক্ত বলে পরিচয় দেয় এবং তাদের আকীদা-বিশ্বাসকে নিজের শে'আর ও আদর্শ বানাতে চায়।

শাহ সাহেব তার স্বরচিত ফার্সী পুস্তিকা 'ওছায়া'তে লিখেন, এই অধমের প্রথম অসীয়ত হচ্ছে, ঈমান ও আমলে কুরআন-সুন্নাহকে দৃঢ় হস্তে আকড়ে

ধরতে হবে। সর্বদা এর উপর আমল করতে হবে। আকীদা-বিশ্বাসে মুতাকাদ্দিমীন (প্রবীণ) আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ গ্রহণ করতে হবে। আর সিফাত ও আয়াতে মুতাশাবিহাত (সাদৃশ্যপূর্ণ বা অস্পষ্ট আয়াতসমূহ) -এর ব্যাপারে সালফগণ (প্রবীণ উলামায়ে কিরাম) যেসব স্থানে ব্যাখ্যা ও তত্ত্বানসন্ধানের মাধ্যমে কাজ নেননি, তা থেকে বিরত থাকতে হবে। কাঁচা তার্কিকের কাল্পনিক চিত্রকলার প্রতি ভ্রুক্ষেপ করবে না।

'আসমা ও সিফাত' সম্পর্কে শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও মতাদর্শ কিছুটা অনুমান করা যাবে পরবর্তী উদ্ধৃতি থেকে। তিনি লিখেন– 'আল্লাহ্ তদপেক্ষা মহান ও উঁচু যে, তিনি বিবেক-বুদ্ধি কিংবা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যাচাই-বাছাই হবেন অথবা তার মধ্যে সিফাতগুলো এমনভাবে বিদ্যমান হবে, যেভাবে অণুগুলো পরমাণুর মধ্যস্থতায় অস্তিত্ব লাভ করে অথবা তিনি এমন হবেন যাকে সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি উপলব্ধি করতে পারে বা প্রচলিত শব্দে তাকে ব্যক্ত করতে পারে। সেই সাথে মানুষদেরকে বলে দেওয়াও জরুরী, যাতে যথাসম্ভব মানবতার পূর্ণতা এসে যায়। এমতাবস্থায় উক্ত সিফাতগুলোর ব্যবহার সেসব অর্থে করা ছাড়া গত্যন্তর নেই, যাতে সেগুলোর ফলাফল ও আবশ্যকীয়তা বুঝে নেওয়া যায়। যেমন, আমরা আল্লাহর জন্য 'রহমত' সাব্যস্ত করি। এর দ্বারা উদ্দেশ্য অনুগ্রহ-অনুকম্পার বিশাল দান; মনের বিশেষ অবস্থা নয়। (যাকে মূলতঃ রহমত বলা হয়।) এ পন্থায় আল্লাহর কুদরতের ব্যাপকতা প্রকাশের জন্য বাধ্য হয়ে আমাদেরকে ইস্তি'আরা (রূপক) হিসেবে সেসব শব্দ ব্যবহার করতে হবে, যেগুলো মানবীয় শক্তি-ক্ষমতার জন্য ব্যবহার করা হয়। কারণ, সেসব অর্থ ব্যক্ত করার জন্য আমাদের কাছে এর চেয়ে উত্তম কোনও শব্দমালা নেই। এরূপভাবে উদাহরণস্বরূপ অনেক শব্দ ব্যবহার করতে হবে। তবে শর্ত হল, তার দ্বারা যেন প্রকৃত অর্থ উদ্দেশ্য না হয় বরং যেসব অর্থ আল্লাহর জন্য সত্ত্বার মুনাসিব ও উপযোগী, সকল আসমানী ধর্মের ঐকমত্যে সে পদ্ধতিতেই সিফাতসমূহ ব্যক্ত করতে হবে। উক্ত শব্দগুলো এভাবেই উদ্ধৃত হবে। এছাড়া অন্য কোনও আলোচনা ও অনুসন্ধান করা হবে না। এ মতাদর্শ বা মাযহাবই সেকালে ছিল। যার কল্যাণ ও বরকতের সাক্ষ্য দেওয়া হয়েছে। (অর্থাৎ তাবে তাবেঈনের যুগ পর্যন্ত)। এরপর এমন কিছু লোক মুসলমানদের মধ্যে জন্ম নিয়েছে, যারা কোনও অকাট্য নছ ও সুদৃঢ় দলীল-প্রমাণ ব্যতিত এসব মাসয়ালায় চিন্তা-গবেষণা শুরু করে দিয়েছে।'

শত শত বছর ধরে মুসলিম বিশ্বে বিশেষতঃ সেসব রাষ্ট্রে যেগুলো শিক্ষা, জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তাধারা ও পাঠ্যক্রম হিসেবে ইরানের পদানত ছিল, যেসব দার্শনিক সূক্ষ্মদর্শিতা, সিফাতসমূহের সুদূরপ্রসারী ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ– যার

ফলশ্রুতিতে সে বেকার ও অর্থহীন হয়ে পড়ে আর ইউনানী দর্শনের মানসিক গোলামী পর্যন্ত প্রভাবিত হওয়ার যুগ ছিল। সালফ বা প্রবীণদের সম্পর্কে তাদের ধারণা চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল, যারা অত্যন্ত সতর্কতা ও ইনসাফের সাথে কাজ করতেন। তারা বলতেন مذهب السلف اسلم ومذهب الخلف اعلم তথা সালফদের মতাদর্শে সতর্কতা আর খালফ বা পরবর্তীদের গবেষণায় আছে তত্ত্ব-জ্ঞান। সুতরাং এই প্রেক্ষাপটে শাহ সাহেবের এই খেদমত ও সাহসিকতা এক মুজতাহিদ ও মুজাদ্দিদসুলভ কৃতিত্ব বৈ কি?

আসমা ও সিফাত (আল্লাহর নাম ও গুণাবলি) সম্পর্কে প্রবীণদের মাযহাবের সমর্থন, মুতাকাল্লিমীন (বাগ্মী) দার্শনিকদের সঙ্গে (যারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের মাধ্যমে কাজ নিয়েছেন এবং তাদের আকওয়ালে সিফাত বা সিফাত সম্পর্কিত অভিব্যক্তি সম্পর্কে অনেক সময় এদেরকে নিরর্থকতা ও সিফাতসমূহ নাকচ করার স্তরে যেতেও দেখা যায়) সম্পর্কহীনতা এবং হাদীস ও সুন্নাতের আকর্ষণ, ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন তাকে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর পক্ষ থেকে (জবাবদান) ও তার উচ্চ মর্যাদার স্বীকৃতিদানে উৎসাহিত করেছেন। যার ব্যক্তিত্ব এ শেষ শতকগুলোতে বড় বিতর্কিত বরং ভৎর্সনা, অভিশাপ ও সংশয়ের লক্ষ্যস্থল হয়ে গিয়েছিল। শাহ সাহেব অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের ভাষায় তার পরিচয় দিয়েছেন এবং তার পক্ষ থেকে প্রতিরোধ করেছেন। তিনি 'তাফহীমাতে এলাহিয়্যাহ' গ্রন্থে লিখেন, 'শায়খুল ইসলামের কথাবার্তায় এমন কোনও বিষয় নেই, যার পক্ষে তার কাছে কুরআন-হাদীস ও আছারে সলফ (পূর্বসূরীদের আমল)-এর মধ্য হতে কোন তত্ত্ব-প্রমাণ নেই। এমন আলেমে দীন পৃথিবীর বুকে (আল্লাহর প্রিয় সৃষ্টি) সুপাংক্তেয়। কে সে ব্যক্তি, যে রচনা ও বর্ণনায় তার মর্যাদায় পৌঁছার সক্ষমতা বা যোগ্যতা রাখে? আর যারা তার বিরুদ্ধে অসংখ্য অভিযোগ-আপত্তি ছুড়ে মেরেছে, তাদের ভাগ্যে তার যোগ্যতাসমূহের দশভাগের একভাগও নসীব হয়নি।

ষষ্ঠ অধ্যায়

হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার, ফিকাহ্ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় আনার প্রয়াস

হাদীসের গুরুত্ব এবং প্রত্যেক দেশ ও যুগে এর প্রয়োজনীয়তা

ভারত উপমহাদেশে শেষযুগে (তথা বারো হিজরী শতকের মাঝামাঝি থেকে অদ্যাবধি) শাহ সাহেব হাদীসের প্রচার-প্রসার, দরসে হাদীসের পুনর্জীবন দান, হাদীস শাস্ত্রের সঙ্গে মহানুভবতা এবং এই শাস্ত্রে তাঁর বিজ্ঞতা ও গবেষণামূলক রচনাবলির মাধ্যমে এমন বিশাল সংস্কারকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন, যা তার সংস্কার প্রবন্ধ ও জীবনগ্রন্থের একটি গুরুত্বপূর্ণ ও আলোকোজ্জ্বল অধ্যায়। তার অন্যান্য জ্ঞানগত যোগ্যতা ও ধর্মীয় খেদমতের উপর যা এতখানি প্রবল হয়ে গেছে যে, 'মুহাদ্দিসে দেহলভী' তার নামের অংশ ও তার পরিচিতির শিরোনাম হয়ে গেছে। আর মানুষের মুখে মুখে ও লিখনীতে 'হযরত শাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী' প্রচলিত হয়ে গেছে।

কিন্তু এই কৃতিত্বের ইতিহাস ও ব্যাখ্যা প্রদানের পূর্বে এর গুরুত্ব-মাহাত্ম্য বুঝার জন্য প্রথমে জেনে নিতে হবে, দীনী শরীয়তের নেযাম, ইসলামকে তার সঠিকরূপে টিকিয়ে রাখার চেষ্টা-সংগ্রাম, ইসলামী ভাবধারা ও পরিবেশ তৈরী এবং সংরক্ষণে হাদীস কিরূপ মর্যাদা রাখে? প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক দেশে (যেখানে মুসলমান আছে) এর প্রসার ও সংরক্ষণের প্রয়োজন কেন? এর প্রতি উদাসীনতা, অজ্ঞতা বা অস্বীকৃতি কতটা ভয়াবহ এবং কত বড় বিপর্যয় ডেকে আনে? কোনও যুগ বা দেশ থেকে এই শাস্ত্র বিলীন বা বিস্মৃত হয়ে যাওয়া কত বড় শূন্যতা সৃষ্টি করে, যা অন্য কোনও পন্থায় বা উপাদানে পূরণ হতে পারে না? এর ব্যাখ্যার জন্য লেখক তার স্বরচিত একটি পুস্তিকার একটি উদ্ধৃতি পেশ করছে। যেখানে এই বাস্তবতাকে পুরোপুরিভাবে প্রতিভাত ও প্রমাণ করার চেষ্টা চালানো হয়েছে।

হাদীস উম্মতের জন্য সঠিক মানদণ্ড

'হাদীসে নববী (স)' এমন একটি যথোপযুক্ত মানদণ্ড, যাতে প্রত্যেক যুগের সৎকর্মশীল ও সংস্কারক-মুজাদ্দিদগণ এ উম্মতের ঈমান-আমল ও আকীদা-বিশ্বাস, চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গিগুলো পরিমাপ করতে পারে। অবগত

হতে পারে উম্মতের দীর্ঘ ঐতিহাসিক ও বিশ্বময় সংঘটিত বিপ্লব ও পরিবর্তন সম্পর্কে। আখলাক-চরিত্র ও আমলে ততক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য আসতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত কুরআন-হাদীসকে একই সাথে সামনে না রাখা হবে। যদি হাদীসে নববী (স)-এর সেই ভাণ্ডার না হত, যা সংযত, পূর্ণাঙ্গ ও ভারসাম্যপূর্ণ জীবনের সঠিক পথপ্রদর্শন করে, যদি সেই প্রজ্ঞাপূর্ণ নববী শিক্ষা আর এই আহকাম না হত, যার আনুগত্য, রাসূলে কারীম (স) মুসলিম সমাজকে করিয়েছেন, তাহলে এই উম্মত ইফরাত-তাফরীত তথা অতিরঞ্জন-বাড়াবাড়ি ও শিথিলতার শিকার হয়ে যেত। অক্ষুণ্ন থাকত না তার ভারসাম্য। সেই আমলী ও বাস্তব দৃষ্টান্ত অস্তিত্ব লাভ করত না, যার অনুসরণ করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায় উপমা দিয়েছেন

لقد كان لكم فى رسول الله أسوة حسنة

'নিশ্চয় তোমাদের জন্য রাসূলে কারীম (স)-এর সত্ত্বায় রয়েছে উত্তম আদর্শ।' (সূরা আহযাব-২১)

আর সে আনুগত্যের দাওয়াত দিয়েছেন নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমায়–

قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببكم الله ويغفرلكم ذنوبكم.

'আপনি বলে দিন! তোমরা যদি আল্লাহর ভালবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর। আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহগুলো ক্ষমা করে দিবেন।' (সূরা আলে ইমরান ৩১)

এটি এমন একটি বাস্তবিক দৃষ্টান্ত, যার প্রয়োজন সকল মানুষের। যার দ্বারা সে পারে সফল জীবন লাভ এবং শক্তি ও আস্থা-নির্ভরতা অর্জন করতে। নিশ্চিত হতে পারে যে, ব্যবহারিক জীবনে ধর্মীয় বিধি-বিধান কার্যকর করা নিছক সহজই নয় বরং একটি বাস্তবতা।

হাদীসে নববী (স) জীবনী, শক্তি ও প্রভাবশক্তিতে ভরপুর। সর্বদা তা সংশোধন-সংস্কার কার্যক্রম, বিপর্যয়, কলুষতা ও বিদ'আতের বিরুদ্ধে কাতারবন্দি ও যুদ্ধোন্মুখ হওয়া এবং সমাজের হিসাব নেওয়ার প্রতি উদ্বুদ্ধ করতে থাকে। আর এর প্রভাবে প্রত্যেক যুগ ও প্রত্যেক দেশে এমন ব্যক্তিবর্গ তৈরী হতে থাকে, যারা সংস্কার-সংশোধনের ঝাণ্ডা সমুন্নত করেছেন। কাফন পরে রণাঙ্গণে এসেছেন। প্রকাশ্য যুদ্ধ করেছেন বিদ'আত, গোমরাহী, কুসংস্কার ও বর্বর তার বিরুদ্ধে। দাওয়াত দিয়েছেন খাঁটি দীন ও সঠিক ইসলামের। কাজেই মুসলিম উম্মাহর জন্য হাদীসে নববী একটি অকাট্য অবিচ্ছেদ্য

বাস্তবতা এবং তার অস্তিত্বের জন্য আবশ্যকীয় শর্ত। এর সংরক্ষণ, বিন্যাস ও সংকলন, নিরাপত্তা ও প্রচার-প্রসার ব্যতীত উম্মতের এই ধর্মীয়, চিন্তাগত, বাস্তবিক ও চারিত্রিক স্থায়িত্ব আর ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন থাকত না।

ইসলামের ইতিহাসে সংস্কার আন্দোলন হাদীস শাস্ত্রের সঙ্গে সম্পৃক্ত

হাদীসে নববী ও সুন্নাতে নববী (স)-এর ভাণ্ডার সর্বদা সংশোধন-সংস্কার ও মুসলিম উম্মাহর মধ্যে সঠিক ইসলামী চিন্তাধারার উৎস ছিল। এর থেকেই সংস্কারের ঝাণ্ডা উত্তোলনকারীগণ ইতিহাসের বিভিন্ন যুগে বিশুদ্ধ ধর্মীয় জ্ঞান ও সঠিক ইসলামী চিন্তাধারা সংগ্রহ করেছেন। সেসব হাদীস দ্বারাই তারা দলীল-প্রমাণ দিয়েছেন। দীন ও ইসলামের দাওয়াতে এটাই ছিল তাদের সনদ, তাদের হাতিয়ার ও ঢাল। ফিৎনা-ফাসাদ, বিপদ-বিপর্যয় ও দাঙ্গা-হাঙ্গামার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্রে এটাই ছিল তাদের প্রেরণা ও প্রতিরোধশক্তি। আজও যে ব্যক্তি মুসলিম উম্মাহকে সত্য দীন ও পূর্ণাঙ্গ ইসলামের পথে ফিরে আসার দাওয়াত দিতে চায়, তার এবং নববী জীবন ও আদর্শের মাঝে সুসম্পর্ক স্থাপনের ইচ্ছা রাখে আর যাকেই প্রয়োজন ও যুগের পরিবর্তন নতুন আহকাম উদ্ভাবনে বাধ্য করে, তিনি এই উৎসমূল থেকে অমুখাপেক্ষী হতে পারেন না।

এ বাস্তবতার পক্ষে ইসলাম ও মুসলমানদের ইতিহাস সাক্ষ্য– যখনই হাদীস ও সুন্নাতের কিতাবাদির সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ও জ্ঞানে ঘাটতি সৃষ্টি হয়েছে আর দীর্ঘ সময় পর্যন্ত এই ঘাটতি অব্যাহত রয়েছে, তখন দাঈগণ এবং চারিত্রিক দীক্ষা ও আত্মশুদ্ধির আধ্যাত্মিক মুরব্বীদের আধিক্য, পৃথিবীতে যুহদ অবলম্বনকারীদের উপস্থিতি এক ধরনের সুন্নাতের অনুসরণ সত্ত্বেও এই মুসলিম সমাজ, যা ইসলামী শাস্ত্র-জ্ঞানে সুদক্ষ, দর্শন-প্রজ্ঞার শাস্ত্রীয় পণ্ডিত ও কবি সাহিত্যিকে পরিপূর্ণ ছিল; ইসলামের শক্তি ও বিজয় আর মুসলমানদের শাসন ব্যবস্থায় কালাতিপাত করছিল, সেখানে নিত্যনতুন বিদ'আত, কুসংস্কার, অনারব রুসম-রেওয়াজ এবং অচেনা পরিবেশের প্রভাব তার আধিপত্য বিস্তার করে ফেলে। এমনকি পূর্বের সেই বর্বর সমাজের নতুন সংস্করণ এবং তার পূর্ণাঙ্গ প্রতিচ্ছবি হয়ে যাওয়ার আশংকা হতে থাকে। অক্ষরে অক্ষরে রাসূলে কারীম (স)-এর নিম্নোক্ত ভবিষ্যদ্বাণী ও হাদীস প্রতিফলিত হয়।

لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع.

'তোমরা অক্ষরে অক্ষরে পূর্ববর্তী উম্মতদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলবে।' তখন সংস্কারের শ্লোগান স্তব্ধ এবং জ্ঞানের প্রদীপ নিষ্প্রভ হতে থাকে।

দশম হিজরী শতকে ভারতবর্ষের ধর্মীয় অবস্থাসমূহ এবং মুসলমানদের জীবন পর্যালোচনা করুন, যখন ভারত উপমহাদেশের শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্রগুলোর হাদীস শরীফ ও সুন্নাতে নববী (স)-এর খাঁটি উৎসস্থল ও প্রাণকেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক প্রায় বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছিল। ইলমে দীনের কেন্দ্রসমূহ এবং হিজায, ইয়ামেন ও মিসর ও সিরিয়ার সেসব মাদরাসার সঙ্গে যেখানে হাদীস শরীফের দরস হত- কোনও সম্পর্ক ছিল না। ফিকাহ, উসূল ও তার ব্যাখ্যাগ্রন্থসমূহ এবং ফিকহী সূক্ষ্মতা ও দূরদর্শীতা, আর দর্শন-প্রজ্ঞার বই-পুস্তকের ব্যাপক প্রচলন ছিল। অনায়াসেই দেখা যেত, কিভাবে বিদ'আতীদের দৌরাত্ম্য চলছে। অপকর্ম সাধারণ হয়ে গিয়েছিল। ইবাদত ও আল্লাহর নৈকট্য লাভের কত শত নতুন রূপরেখা ও পথ-পন্থা আবিস্কার করে নিয়েছিল মানুষ। লেখক 'তারীখে দাওয়াত ও আযীমত' গ্রন্থের চতুর্থ খণ্ডে হিজরী দশ শতকের এক বিখ্যাত ও মকবূল শায়খে তরীকত শায়খ মুহাম্মদ গাউস গোয়ালিয়ারী (র) বিরচিত 'জাওয়াহিরে খামসা'-এর আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেছেন,

'গুজরাটে, যেখানে উলামায়ে আরবের শুভাগমন ও হারামাইন শরীফাইনে আসা-যাওয়ার কারণে হাদীসের ব্যাপক প্রসার হয়ে গিয়েছিল, জন্ম নিয়েছিলেন আল্লামা আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী ও তার বিখ্যাত শাগরেদ মুহাম্মদ তাহের পাটনী (দশ হিজরী শতকে)। ভারতবর্ষ তখন সিহাহ সিত্তাহ এবং সেসব লেখকদের কিতাবাদি সম্পর্কে অপরিচিত ছিল, যারা হাদীস সংকলন ও বিদ'আত-কুসংস্কার প্রতিরোধের কাজ করেছেন, বিশুদ্ধ সুন্নাত ও প্রামাণ্য হাদীসসমূহের আলোকে জীবনের কর্ম পদ্ধতি পেশ করেছেন। ভারতবর্ষের সেসব স্থানীয় পুণ্যময় আধ্যাত্মিক দর্শন ও অভিজ্ঞতাসমূহের প্রভাব সমকালের প্রসিদ্ধ ও মাকবূল শাত্তারী বুযুর্গ শায়খ মুহাম্মদ গাউছ গোয়ালিয়ারী (র) -এর নন্দিত কিতাব 'জাওয়াহিরে খামসা' এর মধ্যে দেখা যেতে পারে। যার উৎস বেশিরভাগ বুযুর্গদের উক্তি ও অভিজ্ঞতা। মনে হয় যেন বিশুদ্ধ হাদীসমূহ প্রমাণিত হওয়া কিংবা নির্ভরযোগ্য শামায়েল ও সীরাতগ্রন্থ থেকে সংগ্রহ করাকে জরুরী জ্ঞান করা হয়নি। এতে রয়েছে নামাযে আহযাব (যুদ্ধকালীন নামায), আশেকদের নামায, কবরকে আলোকিত করার নামায এবং বিভিন্ন মাসের বিশেষ নামায ও দু'আসমূহ। হাদীস ও সুন্নাতের আলোকে যার কোনও অস্তিত্ব নেই।

এটা কেবল 'জাওয়াহেরে খামসা'-এরই বৈশিষ্ট্য নয়। বুযুর্গদের মালফূযাতের অনির্ভরযোগ্য সংকলনে এর অসংখ্য দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। মাশায়িখের জন্য সম্মানসূচক সিজদার ব্যাপক প্রচলন ছিল। কবরসমূহকে প্রকাশ্যে সিজদাস্থল বানিয়ে নেওয়া হয়েছিল। এর উপর প্রদীপ জ্বালানো

হত। চাদর চড়ানো হত। মক্কার হারাম শরীফের মত তার চারপাশে ঘুরে সম্মান প্রদর্শন করা হত। ওরস ও ফাতিহা পাঠের নানা ধরনের জশনে জুলূস করা হত। যেখানে থাকত বিপুল সংখ্যক নারী। নামাযে গাউছিয়া, নামাযে মা'কুছ (প্রতিবিম্ব নামায), গাইরুল্লাহর নামে মান্নত, ওয়ালীআল্লাহ ও বুযুর্গদের নামে এবং তাদের সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে পশু যবাহ ও কুরবানী, গাইরুল্লাহর নামে রোযা রাখাসহ আরও বহু ধরনের (শিরক সমতূল্য) বিদ'আত-কুসংস্কার সর্বসাধারণের কাছে সমাদৃত ছিল। পীর-আউলিয়াদের জন্মদিন ও মৃত্যুদিবসে মাহফিল করা হত, নানা মেলা বসত।

উলামায়ে কিরামের হাতে যদি হাদীসের গ্রন্থাবলি না হত এবং সুন্নাত ও বিদ'আতের মাঝে প্রভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টির এই নির্ভরযোগ্য ও সহজপন্থা না হত, তাহলে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) (মৃত্যু ৭২৮ হি.)-এর যুগ থেকে হাকীমুল ইসলাম শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র) (মৃত্যু ১১৭৬ হি.)-এর যুগ পর্যন্ত উম্মতের সংস্কারক এবং দীনের খাঁটি-একনিষ্ঠ মুবাল্লিগ-ধর্মপ্রচারকগণের এই ধারাবাহিকতা অস্তিত্ব লাভ করত না। দৃষ্টিগোচর হত না যুগশ্রেষ্ঠ সংস্কারক এবং আকাইদ ও কুপ্রথা সংশোধনের নিবেদিতপ্রাণ অপরাজেয় ঝাণ্ডাবাহীদের।

হিজরী দশ ও এগার শতকের আফগানিস্তান (কাবুল, হেরাত ও গজনী) -এর উলামায়ে কিরামের অবস্থাসমূহ পর্যবেক্ষণ করুন। তাদের রচনাবলি দেখুন। সুন্নাত সংরক্ষণ, কুসংস্কার-বিদ'আত প্রতিরোধ, জ্ঞানগর্ভ গবেষণা ও মাসায়েল বিশ্লেষণের চিত্র খুব কম দৃষ্টিগোচর হবে। অকস্মাৎ মোল্লা আলী কারী (র) (আলী ইবনে সুলতান মুহাম্মদ হারবী, মৃত্যু : ১০১৪ হি.)-এর মত ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব হয়। যিনি হিজায গমন করে সেখানকার বড় বড় মুহাদ্দিস ও উস্তাদদের থেকে হাদীসের সবক গ্রহণ করেন। তাতে অর্জন করেন দক্ষতা ও ব্যুৎপত্তি। হাদীস ও ফিকাহ গ্রন্থাবলির ব্যাখ্যা, বিভিন্ন মাসয়ালাকে প্রাধান্য দান এবং সমকালীন কিছু বিদ'আত নির্দ্বিধায় প্রতিরোধে তার এই সংস্কার ও গবেষণামূলক চিত্র সুস্পষ্ট দীপ্তিমান। তাকে তার অধ্যয়ন, জ্ঞান-গবেষণা, সততা-সত্যবাদিতা ও ন্যায়ানুগতা এমন পর্যায়ে পৌঁছে দেয় যে, তিনি শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর সহায়তা করেন। সাক্ষ্য দেন, তিনি (শায়খুল ইসলাম) ছিলেন আহ্লে সুন্নাত ওয়াল জামাতের আকাবির (প্রবীণ আলেম) এবং উম্মতের পীর-আউলিয়াদের অন্তর্ভুক্ত। একই অবস্থা ছিল বহু আরব রাষ্ট্র ইরাক, সিরিয়া, মিসর, তাইওয়ান্স, আল-জাযায়ের ও মারাকাশ প্রভৃতির।

ইলমে হাদীস ও আরব

ইসলামের ইতিহাস-দর্শনের তত্ত্ব হল, যেসব দেশে ইসলাম আরবজাতির মাধ্যমে পৌঁছেছে, সেখানে হাদীসের ইলমও ইসলামের সাথে বিস্তার লাভ করেছে এবং সমৃদ্ধশালী হয়েছে অর্থাৎ সেখানকার মানুষের মধ্যে আরবীদের মানসিকতা, তাদের ধীশক্তি, তাদের কর্মশক্তি, বাস্তববাদিতা এবং স্বয়ং রাসূলুল্লাহ (স) এর প্রতি গভীর হৃদ্যতার সাথে বিশেষ যোগসূত্র ছিল। তারা যেখানে গিয়েছেন, নিজের সঙ্গে ইলমে হাদীসও নিয়ে গেছেন। তাদের নেতৃত্বের যুগ এবং প্রভাব ও কার্যকারিতার পরিসরে এর সঙ্গে পুরোপুরি সহায়তা করা হয়েছে। এর দরস (শিক্ষাদান) এবং এর বিভিন্ন দিক নিয়ে গ্রন্থনা ও সংকলনের ধারা পূর্ণ তৎপরতার সঙ্গে চালু ছিল। ইয়ামেন, হাযরামাউত, মিসর, সিরিয়া, ইরাক, উত্তর আফ্রিকা ও উন্দুলুস (স্পেন) এর মত রাষ্ট্রগুলোর অবস্থাই ছিল এমন। স্বয়ং ভারতের গুজরাট প্রদেশে এর একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে যে, শায়খ আলী মুত্তাকী বুরহানপুরী (কানযুল উম্মাল রচয়িতা (মৃত্যু ৯৭৫ হি.) এবং শায়খ মুহাম্মদ তাহের পাটনী (মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার রচয়িতা (মৃত্যু ৯৮৬ হি.)-এর মত উঁচু মাপের মুহাদ্দিস জন্ম দিয়েছে। এর কারণ সেটিই, ইতোপূর্বে যা আমরা বর্ণনা করেছি অর্থাৎ হিজাযের সঙ্গে গুজরাটের সম্পর্ক অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বেশি ছিল। সেখানে আরবী উলামা-মাশায়িখের আসা-যাওয়া যথারীতি অব্যাহত ছিল।

কিন্তু যেসব দেশে অনারব লোকদের মাধ্যমে ইসলাম পৌঁছেছে, সেখানের অবস্থা এরূপ নয়। ভারতবর্ষে তুর্কি কিংবা আফগান বংশধরগণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর সেসব মাশায়িখ ও ইসলামের দাঈগণের মাধ্যমে (এখানে) ইসলামের প্রচার-প্রসার হয়েছে, যাদের সিংহভাগ অনারব বংশোদ্ভূত ও ইরান-তুরস্কের বাসিন্দা ছিলেন। পরবর্তীতে যখন ভারতবর্ষে দরস-তাদরীস (শিক্ষাদান ও লিখনী), মাদরাসা প্রতিষ্ঠা এবং পাঠ্যক্রম তৈরীর যুগ এল, তখন এর উপর অনারব বিদ্বান, পণ্ডিত ও ইরানী চিন্তাবিদদের পূর্ণ প্রভাব পড়েছিল। প্রথম অধ্যায়ে বলে এসেছি, ইরানে ছফাবী শাসন প্রতিষ্ঠা এবং শী'আ মতাদর্শ রাষ্ট্রীয় ধর্মে পরিণত হওয়ার পর (হিজরী দশ শতকের প্রথম দিকের ঘটনা) ইরানের (যে হাদীসের প্রাসাদের গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ নির্মাতা) হাদীসের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল।

কাজেই তার দ্বারা ভারতবর্ষে হাদীস শাস্ত্রের প্রসার, এর গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠার কোনও সম্ভাবনা ছিল না। পক্ষান্তরে ভারতের শিক্ষাজগতে তার প্রভাব যত গভীর হতে থাকে, ততই হাদীসের সঙ্গে দূরত্ব ও অবজ্ঞা বেড়ে

যাচ্ছিল, বারো হিজরী শতকে যখন শাহ্ সাহেবের আবির্ভাব হয়, তখন এর তোড়জোড় অবস্থা ছিল।

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের উত্থান-পতন

ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের উত্থান-পতনের পরিসংখ্যান নেওয়ার জন্য আমরা এখানে মাওলানা হাকীম সাইয়্যিদ আবদুল হাই সাহেব (র) বিরচিত الثقافة الاسلامية فى الهند এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করছি, যাতে শত সহস্র পৃষ্ঠা মুতালা'আর সারসংক্ষেপ এসে গেছে। তিনি লিখেন–

'যখন সিন্ধুতে আরবদের শাসন বিলুপ্ত হয়ে গেল। তাদের পরিবর্তে গযনবী ও ঘোরী শাসকবর্গ সিন্ধু দখল করে নিল, আর খোরাসান ও মাওরাউন্নাহার থেকে উলামায়ে কিরাম সিন্ধুতে আসেন, তখন ইলমে হাদীস এ অঞ্চলে হ্রাস পেতে থাকে। এমনকি বিলুপ্ত হয়ে যায়। মানুষের মাঝে কবিতা-কবিত্ব, জ্যোতিষ শাস্ত্র, গণিত শাস্ত্র আর ধর্মীয় শাস্ত্রের মধ্যে ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহের প্রচলন বেড়ে যায়। এই অবস্থা দীর্ঘকাল পর্যন্ত চলতে থাকে। এমনকি ভারতীয় আলেমদের একান্ত ব্যস্ততা হয়ে দাঁড়ায় ইউনানী দর্শন চর্চা। আর উদাসীনতা বেড়ে যায় ইলমে তাফসীর ও হাদীস শাস্ত্রে। ফিকহী মাসায়েল সম্পর্কে সামান্য কিছু যে আলোচনা কুরআন সুন্নাহতে এসে যেত, তাতেই তারা পরিতৃপ্ত থাকত। হাদীস শাস্ত্রে প্রচলিত ছিল ইমাম ছাগানীর মাশারিকুল আনওয়ার। কেউ যদি এ শাস্ত্রে আরও বেশি অগ্রগতি লাভ করত, তাহলে ইমাম বগভী (র)-এর 'মাছাবীহুস সুন্নাহ' বা মিশকাত শরীফ পড়ে নিত। এমন ব্যক্তি সম্পর্কে ধারণা করা হত, তিনি মুহাদ্দিস হয়ে গেছেন। এসবের একমাত্র কারণ ছিল, মানুষ সাধারণতঃ ভারতে এ শাস্ত্রের গুরুত্ব, প্রয়োজনীয়তা ও মর্যাদা সম্পর্কে ছিল অজ্ঞ। সেসব মানুষ এ শাস্ত্র সম্পর্কে ছিল সম্পূর্ণ উদাসীন। না তারা এ শাস্ত্রের ইমামদের সম্পর্কে জানত আর না তাদের মধ্যে এ শাস্ত্রের কোনও চর্চা ছিল। কেবল বরকতস্বরূপ তারা মিশকাত শরীফ পড়ে নিত। তাদের জন্য সবচেয়ে বড় পুঁজি ছিল ইলমে ফিকহ্ শিক্ষা করা আর তা-ও অনুকরণ হিসেবে; গবেষণা বা তত্ত্বানুসন্ধান হিসেবে নয়। এ কারণেই সে যুগে ফাতওয়া প্রদান ও ফিকহী রিওয়ায়েতের প্রচলন বেড়ে গিয়েছিল। নছূছ ও মুহকামাত (সরাসরি কুরআন-হাদীসের উদ্ধৃতি) পরিত্যক্ত হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যাখ্যাত হয়েছিল ফিকহী মাসায়েলের বিশুদ্ধতা কুরআন-হাদীসের আলোকে যাচাই করা এবং ফিকহী ইজতিহাদগুলোকে হাদীসে নববীর সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানের পদ্ধতি।

তারপর এমন এক যুগ আসল, আল্লাহ্ তা'আলা ভারতবর্ষে এই ইলমের (হাদীস শাস্ত্রের) প্রচার-প্রসারের ব্যবস্থা করলেন। হিজরী দশম শতকে

অনেক উলামায়ে কিরাম ভারতে শুভাগমন করেন। তাদের মাধ্যমে ভারতবর্ষে এই শাস্ত্র ব্যাপক প্রসার লাভ করে। যেমন,

১. শায়খ আবদুল মু'তী মাক্কী ইবনে আবদুল্লাহ বাকছীর (মৃত্যু ৯৮৯ হি. আহমদাবাদ)।
২. শায়খ শিহাব আহমদ মিসরী ইবনে বদরুদ্দীন (মৃত্যু ৯৯২ হি. আহমদাবাদ)।
৩. শায়খ মুহাম্মদ ফাকেহী হাম্বলী ইবনে আহমদ ইবনে আলী (মৃত্যু ৯৯২ হি. আহমদাবাদ)।
৪. শায়খ মুহাম্মদ মালেকী মিসরী ইবনে মুহাম্মদ আবদুর রহমান (মৃত্যু ৯১৯ হি. আহমদাবাদ)।
৫. শায়খ রফীউদ্দীন চিশতী শীরাজী (মৃত্যু ৯৫৪ হি. আকবরাবাদ)।
৬. শায়খ ইবরাহীম বাগদাদী ইবনে আহমদ ইবনে হাসান।
৭. শায়খ যিয়াউদ্দীন মাদানী (লাখনৌ জেলার কাকোরীতে সমাহিত)।
৮. শায়খ বাহলূল ব-দখশী, খাজা মীর কাঁলা হারবী (মৃত্যু ৯৮১ হি. আকবরাবাদ)।

এছাড়া আরও অনেক উলামায়ে কিরাম।

ভারতবর্ষের কিছু উলামায়ে কিরাম হারামাইন শরীফাইন সফর করেন। সেখানে তারা হাদীস শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন এবং এ শাস্ত্র নিয়ে ভারত প্রত্যাবর্তন করেন। গুজরাটে হাদীসের দরস দিতে থাকেন দীর্ঘকাল পর্যন্ত। এরপর পুনরায় হিজায হিজরত করেন শায়খ ইয়াকুব ইবনে হাসান কাশ্মিরী (মৃত্যু ১০০৩ হি.), শায়খ জওহার কাশ্মিরী (মৃত্যু ১০২৬ হি.), শায়খ আবদুন নবী গাঙ্গুহী ইবনে আহমদ, শায়খ আবদুল্লাহ সুলতানপুরী ইবনে শামছুদ্দীন, শায়খ কুতুবুদ্দীন আব্বাসী গুজরাটী, শায়খ আহমদ ইবনে ইসমাইল মাণ্ডবী, শায়খ রাজেই ইবনে দাউদ গুজরাটী, শায়খ আলীমুদ্দীন মাণ্ডবী, শায়খ মু'আম্মার ইবরাহীম ইবনে দাউদ মনীপুরী (যাকে দাফন করা হয় আকবরাবাদ), মাজমাউ বিহারিল আনওয়ার রচয়িতা শায়খ মুহাম্মদ ইবনে তাহের ইবনে আলী পাটনী ও সাইয়িদ আবদুল আউয়াল হুসাইনী ইবনে আলী ইবনুল আলা হুসাইনীসহ অন্যান্য উলামায়ে কিরাম।

الثقافة الاسلامية فى الهند রচয়িতা আরেকটু সামনে এগিয়ে লিখেন-

শায়খ আবদুল হক দেহলবী (র) এর কৃতিত্ব

এরপর হাদীস শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) ইবনে সাইফুদ্দীন বুখারী (মৃত্যু ১০৫২ হি.)

কে মনোনীত করেন। তার দ্বারা হাদীস শাস্ত্র প্রচার-প্রসারের বিরাট কাজ হয়েছে। তিনি রাজধানী দিল্লীতে শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেন। তিনি নিজের সর্বাত্মক চেষ্টা-সাধনা ও যোগ্যতাগুলো ব্যয় করেছেন এ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে। তার শিক্ষার মজলিস থেকে অনেক উলামায়ে কিরাম হাদীস শাস্ত্র সম্পন্ন করেন এবং হাদীস শাস্ত্রে প্রচুর কিতাবাদি রচনা করেন। শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী এ শাস্ত্রের প্রচার-প্রসারে অক্লান্ত চেষ্টা-সংগ্রাম চালিয়ে যান। তার ব্যক্তিত্ব ও ইলম দ্বারা আল্লাহর অনেক বান্দার প্রভূত কল্যাণ লাভ হয়। হাদীস শাস্ত্রে তার এই চেষ্টা-সংগ্রাম তার পূর্বসূরীদের থেকে এত বেশি উজ্জল ও বৈশিষ্ট্যময় ছিল যে, লোকজন এক পর্যায়ে বলে ফেলে হাদীস শাস্ত্রকে সর্বপ্রথম নিয়ে এসেছেন এই শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)। অথচ ঐতিহাসিক দিক থেকে ইতোপূর্বে আমি যেমন বলেছি, একথা সঠিক নয়।

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর পরে তার সুযোগ্য পুত্র শায়খ নূরুল হক (মৃত্যু ১০৭৩ হি.) এ শাস্ত্রের খেদমত ও প্রচার-প্রসারের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। তার কিছু শিষ্য এবং সন্তানও এ শাস্ত্রের খেদমত করেছেন। যেমন শায়খুল ইসলাম শারেহে বুখারী এবং শায়খ নূরুল হক (র)-এর পুত্র মাওলানা সালামুল্লাহ, যিনি 'মুহল্লা' ও 'কামালাইন' রচয়িতা।

অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী যথার্থই লিখেছেন, 'মোটকথা, শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) যে সময় শিক্ষার আসন বিছিয়েছিলেন, তখন উত্তর ভারতে হাদীস শাস্ত্র বিলুপ্ত প্রায় হয়ে গিয়েছিল। তিনি সেই সংকীর্ণ ও অন্ধকার পরিবেশে ধর্মীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞার এমন প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করেছেন, যার ফলে দূর-দূরান্ত থেকে লোকজন পতঙ্গের মত ঝাঁপিয়ে পড়ে সেখানে সমবেত হতে থাকে। উত্তর ভারতে দরসে হাদীস (হাদীস শিক্ষা)-এর এক নতুন দিগন্ত খুলে যায়। ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যা বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের তৎকালীন প্রাণকেন্দ্র গুজরাট থেকে স্থানান্তরিত হয়ে দিল্লী চলে আসে।'

একজন মুজাদ্দিদের প্রয়োজনীয়তা

শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর সততা, একনিষ্ঠতা ও আধ্যাত্মিক বরকতে হাদীসের প্রতি মনোযোগিতা শুরু হয়। তিনি হাদীস শেখা-শেখানো, সংকলন-রচনা এবং ব্যাখ্যা-টীকা (সংযোজন)-এর এক নতুন আগ্রহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি করে দেন। তার যেসব উত্তরসূরী ও বংশধরগণ স্ব-স্ব স্থানে এক একজন মুহাদ্দিস, মুদাররিস ও লেখক ছিলেন, আশা ছিল তারা এই খেদমতের ধারাকে এমনভাবে চালু রাখবেন, যার ফলে ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা, পাঠ্যক্রম এবং শিক্ষাদান ও লেখালেখি তৎপরতায় এ শাস্ত্র

উচ্চাসন লাভ করবে। স্বয়ং তার সম্মানিত পুত্র আল্লামা মুফতী নূরুল হক দেহলভী (র) (মৃত্যু ১০৭৩ হি.) যিনি ফার্সীতে ছয় খণ্ডে সহীহ বুখারীর শরাহ এবং শামায়েলে তিরমিযীর উপরও একটি শরাহ রচয়িতা– তিনি এক্ষেত্রে তাঁর (শায়খ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী) শুরু করা কাজগুলোর পূর্ণতা দিতে পারতেন। কিন্তু প্রায় সময় আকবরাবাদ (আগ্রা)-এর মত কেন্দ্রীয় শহরে বিচারকের পদে অধিষ্ঠিত থাকার কারণে তার দরস-তাদরীস (শিক্ষাদান ও লেখালেখি) ও ইলমে হাদীস প্রসারের খুব একটা সুযোগ হয়নি। তার নাতি মাওলানা শায়খুল ইসলাম দেহলভী (র)ও বড় মুহাদ্দিস ছিলেন। সহীহ বুখারীর উপর তারও ফার্সীতে সংক্ষিপ্ত শরাহ রয়েছে। কিন্তু কিছু জ্ঞাত আর কিছু অজ্ঞাত কারণে এসব হযরতের ব্যক্তিগত চেষ্টা-সংগ্রাম ভারতে হাদীসের প্রতি সেই গণজোয়ার এবং তার প্রসার, শিক্ষাদান ও লেখালেখিতে সেই আগ্রহ-উদ্যম ও তৎপরতা সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়নি, যার আশা করা হয়েছিল। সম্ভবতঃ এর একটি কারণ হল সেসব মহাপুরুষের উপর হাদীসের মাধ্যমে হানাফী মাযহাবের সমর্থনের প্রেরণা ও দৃষ্টিভঙ্গি প্রবল ছিল। দ্বিতীয় আরেকটি কারণ ছিল, বারো হিজরী শতকের মাঝামাঝিই শিক্ষা-দীক্ষার প্রাণকেন্দ্র দিল্লী থেকে লাখনৌতে স্থানান্তরিত হচ্ছিল। আর সেখানে বহু উলামায়ে কিরামের উস্তাদ মোল্লা নিযামুদ্দীন সাহলভী (মৃত্যু ১১৬১ হি.)-এর বরকতপূর্ণ ও শক্তিশালী হাতে নতুন পাঠ্যক্রম তৈরী হচ্ছিল। এই পাঠ্যসূচী প্রণেতা ও লেখকদের শিক্ষাগত সম্পর্ক হারামাইন শরীফাইন এবং সেসব স্থানের সঙ্গে কায়েম হতে পারেনি, যা ছিল হাদীসের পঠন-পাঠন, লেখালেখি, খেদমত ও প্রচারের কেন্দ্রস্থল। তাদের উপর (যেমনটি প্রকাশ পায় দরসে নেযামীর ইতিহাস, জীবনী ও স্মারকগ্রন্থ থেকে) দর্শন শাস্ত্র ও দীনী শাস্ত্রগুলোর মধ্য হতে উসূলে ফিকহর প্রভাব ছিল বেশি।

মোটকথা, ভারতবর্ষের শিক্ষা ও ধর্মীয় কেন্দ্র এমন এক ব্যক্তিত্বের জন্য অপেক্ষমান ও মুখাপেক্ষী ছিল, যিনি হাদীসের সাথে ইশক ও হৃদ্যতার সম্পর্কের অধিকারী হবেন এবং এর প্রচার-প্রসারকে তিনি তার জীবনের মূখ্য উদ্দেশ্য স্থির করবেন। ভারত সেই ব্যক্তিত্ব হিজরী বারো শতকের মাঝামাঝিতে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভীর সত্ত্বারূপে লাভ করে, যিনি যথার্থরূপে নিম্নোক্ত কবিতার উপর আমল করেছেন–

[illegible] ☆ [illegible]

'আছ-ছাকাফাতুল ইসলামিয়া ফিল হিন্দ' রচয়িতা সেসব মহাপুরুষ, যারা এগার ও বারো শতকের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে ইলমে হাদীসের প্রচার-প্রসারে

অংশ নিয়েছেন এবং স্বীয় দরস-তাদরীস (শিক্ষাদান ও লেখালেখি)-এর দ্বারা ব্যাপকভাবে উপকৃত করেছেন, তাদের আলোচনার পর হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব (র)-এর হাদীসের খেদমতের বৃত্তান্ত দিয়েছেন। যা কেবল এদেশেই নয়, এই শেষ যুগে সংস্কারমূলক ও ইজাতিহাদী বৈশিষ্ট্য ও জীবনদানের রূপে ছিল এবং যার ফলে এদেশে হাদীসের মুদ্রা প্রচলিত সময়ের মত সচল হয়ে যায়। সেই পাঠ্যসূচী দরসের অবিচ্ছেদ্য অংশ ও সম্মানের মানদণ্ড সাব্যস্ত হয়। প্রতিষ্ঠিত হয় দরসে হাদীসের পৃথক কেন্দ্র। মাদরাসাগুলোতে সিহাহ সিত্তাহর পাঠদান বিশেষতঃ চার কিতাব; বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী ও আবু দাউদ শরীফ তত্ত্বানুসন্ধানের সাথে পড়ানোর প্রচলন হয় (যা আজ আরব দেশেও বিলুপ্ত হয়ে গেছে)। হাদীসের শরাহ (ব্যাখ্যাগ্রন্থ) রচনার যুগ শুরু হয়। আর দেখতে দেখতেই এর উপর বিশাল-বিস্তৃত এক গ্রন্থাগার তৈরী হয়ে যায়। আরব দেশগুলোতেও যার নযীর পাওয়া যায় না। হাদীস গ্রন্থসমূহের অনুবাদ হয়। এর দ্বারা সাধারণ মুসলমান এবং আরবী না জানা লোকদের সাথে সাথে মুসলিম মহিলাদেরও বিরাট উপকার হয়। আমলের প্রেরণা এবং ইত্তিবায়ে সুন্নাতের আগ্রহ জন্মে। হাদীসের এজাযত ও সনদের আকুলতা সৃষ্টি হয়। সর্বোপরি ভারত এই পুণ্যময় শাস্ত্রের এমন এক কেন্দ্রে পরিণত হয়ে যায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে মিসরের বিখ্যাত আলেম আল্লামা সাইয়িদ রশীদ রেযা 'আল-মানার' সম্পাদকের কলম থেকে বেরিয়ে আসে নিম্নোক্ত বাক্য–

'আমাদের ভাই ভারতের উলামায়ে কিরাম যদি এ যুগে উলূমে হাদীস (হাদীস শাস্ত্র)-এর সাথে সহানুভূতি পোষণ না করতেন, তাহলে প্রাচ্যদেশগুলোতে তার বিলুপ্তি চূড়ান্ত হয়ে যেত। কেননা মিসর, সিরিয়া, ইরাক ও হিজাযে হিজরী দশ শতক থেকেই এতে দুর্বলতা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। আর এই হিজরী চৌদ্দ শতকের প্রথমভাগে এ শাস্ত্র তার চরম অবস্থায় পৌঁছে গেছে।'

হাদীস সম্পর্কে শাহ্ সাহেবের চিন্তাধারা ও আগ্রহ

শাহ সাহেবের জন্য কোন্ আগ্রহ এই শাস্ত্রের সঙ্গে এত নিবিড়তা, এর প্রচার-প্রসারের তৎপরতা এবং এর জন্য নিজের জীবন ও যোগ্যতা-ক্ষমতাকে ওয়াক্ফ করে দেওয়ার প্রেরণা সৃষ্টি করেছিল, তা জানার জন্য স্বয়ং শাহ সাহেব (র)-এরই রচনাবলির শরণাপন্ন হওয়া উচিৎ। কারণ, এটা তার চিন্তাধারায় সঠিক দর্পণ। 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ'-এর প্রথম পৃষ্ঠাতেই লিখেছেন– 'তাওহীদ ও ঈমানের জ্ঞানের নির্ভরযোগ্য মূলধন ও শিরোমণি এবং ধর্মীয় শাস্ত্রের মূল ও ভিত্তি ইলমে হাদীস। যাতে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী (স) এর

কথা-কাজ কিংবা কোনও বিষয়ে তার নীরবতা ও সন্তুষ্টি বা মৌন সম্মতির কল্যাণময় বর্ণনা রয়েছে। কাজেই এই হাদীসভাণ্ডার অন্ধকারে আলোর প্রদীপ, রুশদ ও হেদায়াতের মাইলফলক এবং পূর্ণিমা চাঁদের মতই দীপ্তিমান। যে ব্যক্তি এসবের উপর আমল করবে এবং এর সংরক্ষণ করে, সে হেদায়াতপ্রাপ্ত ও অফুরন্ত কল্যাণের অধিকারী হয়। আর যে হতভাগা এর থেকে বিমুখ হয় এবং ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করে, সে পথভ্রষ্ট ও ধ্বংস হয়ে যায়। নিজেরই বিরাট ক্ষতি করে। কেননা রাসূলে কারীম (স)-এর জীবন আদেশ-নিষেধ, ভীতি প্রদর্শন ও সুসংবাদ প্রদান, ওয়াজ-নসীহত ও উপদেশ প্রদানে পরিপূর্ণ। তাঁর হাদীসসমূহে এসব বিষয় (পরিমাণের দিক থেকে) কুরআনের মতই কিংবা তদপেক্ষা আরও বেশি আছে।'

অন্যত্র বলেন– 'প্রথমতঃ যে বিষয়টিকে বিবেক নিজের উপর আবশ্যক সাব্যস্ত করে, তা হল, রাসূলে কারীম (স)-এর জীবনচরিত ও ইরশাদ তথা কথা ও কাজে তত্ত্বানুসন্ধান চালাতে হবে, তিনি আল্লাহর বিধান সম্পর্কে কি বলেছেন এবং কিভাবে তার উপর আমল করেছেন? এরপর তনুমনে কর্মে সেসব কথা ও অবস্থার অনুকরণ-আনুগত্য করতে হবে। কারণ, আমাদের কথা সেই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে, বস্তুতঃ যিনি স্বীকার করে নিয়েছেন যে, আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে স্বীয় বিধি-নিষেধের আজ্ঞাবহ বানিয়েছেন। আর তিনি শরয়ী আদেশের এই দায়িত্ব মুক্ত হওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে নিয়েছেন।

ভারতে ইলমে হাদীসের সাথে নির্দয়তার অভিযোগ

শাহ সাহেব (র)-এর জন্য ভারতে ইলমে হাদীসের পুনর্জীবন দান ও প্রচার-প্রসারের দ্বিতীয় প্রেরণা ছিল ভারতের সেই অবস্থা-পরিস্থিতি, যা বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। ধর্মীয় মহলে বিদ'আত-কুসংস্কার, বর্বর অজ্ঞতার যুগের রুসম-রেওয়াজ, অমুসলিমদের অনুসরণ এবং অনৈসলামিক রীতিনীতি অবলম্বনের ধোঁয়া ছেয়ে গিয়েছিল সর্বত্র, যার ভেতর থেকে প্রকৃত ইসলামের অনুপম আকৃতির দর্শন পাওয়া ছিল দুরূহ। শিক্ষালয় ও বিদ্যাপীঠগুলোতে গ্রীস থেকে আগত গ্রীক দর্শন বিদ্যা, যাকে তারা 'বুদ্ধিমত্তা বা দর্শন শাস্ত্র' বলত এবং উলূমে আলিয়া (কারিগরি বিদ্যা), বালাগাত শাস্ত্র ও ইলমে কালামের প্রাধান্য ছিল। আর উভয় মহলেই শরয়ী জ্ঞান বিশেষতঃ ইলমে হাদীস স্থানই পেত না। ধর্মীয় জ্ঞানের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হলেও ইলমে ফিকহ ও উসূলে ফিকহ চর্চা ও এর সূক্ষ্মদৃষ্টি থেকে ব্যাপারখানা সামনে অগ্রসর হত না। এ অবস্থা দেখে শাহ সাহেব সীমাহীন প্রভাবিত ও প্রচণ্ড আক্ষেপে লিখেন–

'আমি সেসব শিক্ষার্থীদেরকে বলি, যারা নিজেদেরকে আলেম-উলামা বলেন, হে আল্লাহর বান্দা! তোমরা গ্রীক দর্শনের ভেল্কি আর নাহব-ছরফ ও মা'আনীর দ্বন্দ্বে ফেঁসে গিয়েছ। তোমরা মনে করেছ, এরই নাম জ্ঞান। অথচ তোমাদের বুঝা প্রয়োজন ছিল কিতাবুল্লাহর আয়াতে মুহকাম কিংবা রাসূলে কারীম (স) এর প্রমাণিত সুন্নাতই জ্ঞান। যেন তোমাদের স্মরণ থাকে, রাসূলুল্লাহ (স) কিভাবে অযু করতেন, কিভাবে নামায পড়তেন, প্রাকৃতিক প্রয়োজন পূরণ করতেন কিভাবে, রোযা রাখতেন কিভাবে, হজ্জ করতে কিভাবে, জিহাদ করতেন কিভাবে? তার কথা বলার ধরন বা বাচনভঙ্গি কেমন ছিল? ভাষা আয়ত্বের পদ্ধতি কী ছিল? কেমন ছিল তার উন্নত চরিত্র মাধুরী? তোমরা তার আদর্শের উপর চলবে। তার সুন্নাতের উপর আমল করবে। কারণ, এটাই তোমাদের জন্য তার জীবনাদর্শ ও সুন্নাতে নববী (স)। এ হিসেবে নয় যে, তা ফরয কিংবা ওয়াজিব। তোমাদের কর্তব্য ছিল, তোমরা দীনের বিধি-বিধান, মাসায়েল শিখবে। আর জীবন চরিত এবং সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের যেসব ঘটনা পরকালীন ভাবনা ও আগ্রহ সৃষ্টি করে, সেগুলো একটি সম্পূরক ও অতিরিক্ত বিষয়। পক্ষান্তরে তোমাদের কর্মব্যস্ততা এবং যেসব বিষয়ে তোমরা পূর্ণ মনোযোগিতা নিয়োজিত করছ, সেগুলো পরকালের জ্ঞান নয়; জাগতিক জ্ঞান।

তোমরা তোমাদের পূববর্তী ফকীহগণের দান-অনুকম্পা ও তাদের মাসআলা উদ্ভাবনী শক্তিতে ডুব দাও। অথচ জানো না যে, হুকুম সেটিই, যা আল্লাহ ও তার রাসূল (স) দিবেন। তোমাদের মধ্যে কত লোক আছে, যখন তাদের কাছে রাসূলে কারীম (স)-এর কোন হাদীস পৌঁছে, তারা এর উপর আমল করে না। বলে– আমরা তো অমুকের মাযহাবের (মতাদর্শের) অনুসারী; হাদীসের নয়।

অধিকন্তু তোমরা মনে করেছ, হাদীসের জ্ঞান এবং তদনুযায়ী সিদ্ধান্ত প্রদান যোগ্য ও অভিজ্ঞজনদের কাজ। মহান ইমামগণের কাছে এ হাদীস অস্পষ্ট থাকতে পারে না। এরপরও যদি তারা একে বর্জন করে, তাহলে নিশ্চয় তা এমন কোন কারণে, যা তাদের কাছে সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়েছে। যেমন, রহিতকরণ বা প্রাধান্য না দেওয়া।

স্মরণ রাখবে, দীনের সাথে এর কোনও সম্পর্ক নেই। তোমাদের যদি আপন নবীর উপর ঈমান থাকে, তবে তার আনুগত্য করো। সেটি তোমাদের মাযহাবের অনুকূল হোক চাই বিপরীত। আল্লাহ তা'আলার ইচ্ছা তো ছিল, তোমরা কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূল (র)-এর সাথে প্রথম থেকে মগ্ন

থাকবে। যদি এতদুভয়ের উপর আমল করা তোমাদের জন্য সহজ হয়, তাহলে কি বলার আছে। আর যদি তোমাদের জ্ঞান এক্ষেত্রে অসম্পূর্ণ হয়, তবে পূর্বেকার উলামায়ে কিরামের ইজতিহাদ থেকে সাহায্য নাও। এরপর যেটাকে অধিক বিশুদ্ধ, সুস্পষ্ট এবং সুন্নাতের অনুকূল পাও, তা-ই অবলম্বন করো। উলূমে আলিয়া বা কারিগরি বিদ্যাতে এই দৃষ্টিতে আত্মনিয়োজিত হও যে, তা যন্ত্র-হাতিয়ার ও উপকরণ; এর বিশেষ গুরুত্ব, মর্যাদা ও লক্ষ্যবস্তু হওয়ার সুযোগ নেই। আল্লাহ তা'আলা কি তোমাদের উপর ওয়াজিব করেননি যে, তোমরা জ্ঞানের প্রসার করবে, যাবৎ না মুসলমানদের দেশে ইসলামী নিদর্শন ও আদর্শ প্রকাশিত ও বিজয়ী হয়। তোমরা তো সেসব নিদর্শন প্রকাশ করনি। মানুষকে নিরর্থক বিষয়ে নিয়োজিত করেছ।'

শাহ সাহেবের হাদীসের আলোচনায় যে উন্মত্ততার অবস্থা এবং হাদীসের ইমামগণের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যে গভীর শ্রদ্ধা-ভালোবাসা ছিল, তার খানিকটা নমুনা পাওয়া যায় তার সেই অমূল্য পত্রে, যা তিনি ইমাম বুখারী (র)-এর শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদা সম্পর্কে আপন এক শিষ্যকে লিখেছিলেন।

হাদীসের খেদমত ও প্রসারের তৎপরতা

ইতোপূর্বে বলে এসেছি, শাহ সাহেব যখন তার উস্তাদ ও শায়খ আবু তাহের মাদানী থেকে বিদায় নেন, তখন তিনি (শায়খ) নিম্নোক্ত কবিতা আবৃত্তি করেন,

نسيت كل طريق كنت أعرفه # إلا طريقا يؤدينى لربكم.

'আমি ভুলে গেছি চলার সব পথ, বিনে সেই পথ,
যে পথ মোরে পৌঁছে দেয় তোমার দুয়ারে।'

শাহ সাহেবও তখন প্রস্থানের মুহূর্তে বলেন, 'আমি যা কিছু পড়েছি, ইলমে হাদীস ছাড়া ভুলে গিয়েছি সব।'

শাহ সাহেবের গোটা জীবনই সাক্ষ্য দেয় যে, তিনি হাদীস শাস্ত্রেরই পঠন-পাঠন, অধ্যয়ন-শিক্ষাদান, লেখালেখি ও প্রচার-প্রসারে আত্মনিয়োজিত ছিলেন। কবির ভাষায়–

[illegible] ☆ [illegible]

'তুমি বিনে যে বলত ওগো
বাঁচার আশা ক্ষীণ,
তাই সে শপথ করছি পূরণ
আমরা অধম হীন।

ভারত প্রত্যাবর্তনের পরপরই তিনি হাদীসের প্রচার-প্রসারে যেন কোমর বেঁধে নেমে পড়েন। অতি দ্রুত তার 'মাদরাসা রহীমিয়া' ভারতের মাটিতে হাদীসের সর্ববৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়। যেখানে ভারতের প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে ইলমে হাদীস পিপাসুগণ পতঙ্গের মত ভীড় জমায়। তন্মধ্যে সিন্ধু-কাশ্মীরের মত দূরাঞ্চলও ছিল। দিল্লী ও তার আশপাশ এবং উত্তর ভারতের কথা তো বলাই বাহুল্য।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র), যিনি শাহ সাহেবের ভাগ্যবান সুযোগ্য পুত্র এবং শাহ সাহেবের কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ ও পূর্ণতাদানকারী, তিনি ছাড়া এই দরসে হাদীস থেকে উপকৃত হয়েছেন ভারতের গর্ব আল্লামা সাইয়িদ মুর্তাযা বলগারামী ওরফে যুবাইদী (র) (১১৪৫-১২০৫ হি.), কামূসের শরাহ 'তাজুল উরূস' এবং এহইয়াউল উলূমিদ্দীনের শরাহ 'ইত্তিহাফুস সাদাতিল মুত্তাকীন' রচয়িতা, যার জ্ঞানের গভীরতা ও হাদীস বর্ণনার রব পড়ে যায় আরব বিশ্বে, কাহেরার মজলিসে শাসকদের দরবার থেকে যার বিরোধিতা করা হত। সেসব শিষ্যদের মধ্যে ছিলেন তাফসীরে মাযহারী ও মালাবুদ্দা মিনহু রচয়িতা কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি (র) (মৃত্যু ১২২৫ হি.)-এর সৌভাগ্যবান খলীফা মির্যা মাযহার জানে জানাঁ (র)ও। (এছাড়াও ছিলেন মাওলানা মুহাম্মদ মঈন, খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী প্রমুখ খাছ শাগরেদগণ।)

এভাবে ভারতে শত শত বছর পর (সম্ভবতঃ প্রথমবার) ইলমে হাদীসের এরূপ চর্চা ও তার প্রতি এতোধিক মনোনিবেশ হয়, ফলে ভারত ইয়ামেনের সমতুল্য হয়ে যায়। তার আকুল আগ্রহ স্বয়ং হিজাযের মাটিতেও পৌঁছতে থাকে। নবাব সাইয়িদ সিদ্দীক হাসান খান শাহ সাহেবের হাদীসের খেদমত ও প্রচার-প্রসারের তৎপরতার আলোচনা করতে গিয়ে উচ্চাঙ্গের দুটি পংক্তি চয়ন করেন, যা প্রকৃত অবস্থার বাস্তব প্রতিচ্ছবি।

من راد بابك لم تبرح جوارحه # تروى أحاديث ما أوليت من منن.

فالعين عن قرة، والكف عن صلة # والقلب عن جابر، والسمع عن حسن.

'যে তোমার দুয়ারে এসেছে,
তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ তোমার অনুগ্রহ-দানের হাদীস বর্ণনায় লিপ্ত হয়ে গেছে।'
'চক্ষু বলছে, কুররাহ থেকে আমি শীতলতা পেয়েছি,
হাত বলছে ছিলাহ থেকে আমি ধনবান হয়েছি।

আর বর্ণনাকারীর মন বলছে,

সে (জাবেরের মাধ্যমে) প্রশান্তির নেয়ামত লাভ করেছে।

কান বলছে,

সে (হাসানের মাধ্যমে) চমৎকার বিষয়ে আদিষ্ট হয়েছে।'

মজার ব্যাপার হল, এই অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেসব অনুগ্রহ-দানের বর্ণনা দিয়েছে আর সেই সঙ্গে যেসব অনুগ্রহদাতার নাম নিয়েছে, তারা সকলেই হাদীসের রাবী এবং কামিল শায়খ। যেমন কুররাহ ইবনে খালেদ আস-সুদূসী, ছিলাহ ইবনে আশীম আদবী, হযরত জাবের ইবনে আবদুল্লাহ (রা) ও ইমাম হাসান বসরী (র)।

শাহ্ সাহেবের লেখনী খেদমত

শাহ্ সাহেব হাদীস ও উসূলে হাদীসের উপর যে রচনাবলী জাতিকে উপহার দিয়েছেন, সেগুলো নিম্নরূপ।

১. মুস্তফা। (মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র) এর ফার্সী ব্যাখ্যাগ্রন্থ।)

২. মুসাওয়া (মুয়াত্তার আরবী শরাহ্)।

শাহ্ সাহেব হাদীসের ব্যুৎপত্তি ও শিক্ষাদানের যে পদ্ধতি চালু করতে চাচ্ছিলেন, এ দুটি কিতাবই তার প্রতিচ্ছবি। এর থেকে শাহ্ সাহেবের হাদীসের জ্ঞান ও পাণ্ডিত্বে গবেষক ও মুজতাহিদসুলভ ব্যক্তিত্বের বহিঃপ্রকাশ ঘটে। তিনি মুয়াত্তাকে সিহাহ সিত্তাহর মধ্যে প্রথম স্তরে রাখতেন। একে সিহাহ্ সিত্তাহ গণনায় 'ইবনে মাজাহ'র স্থলে হিসেব করতেন। তিনি মুয়াত্তার সীমাহীন সমীহকারী, এর সাথে সহানুভূতিশীল এবং একে দরসে হাদীসে প্রথম স্তরে রাখার আগ্রহী দাবীদার ও প্রচারক ছিলেন। তিনি তার অসীয়তনামায় লিখেন, যখন আরবী ভাষায় দক্ষতা অর্জিত হয়ে যাবে, তখন ইয়াহইয়া ইবনে ইয়াহইয়া মাহমূদীর রিওয়ায়েতকৃত মুয়াত্তার সংস্করণটি পড়াবেন। কখনও এ ব্যাপারে গাফলতী করবেন না। কেননা এটি ইলমে হাদীসের আসল। এটি পড়া অত্যন্ত বরকতময়। আমি ধারাবাহিক সনদে মুয়াত্তা শুনেছি।

৩. শরহে তারাজিমে আবওয়াব সহীহ বুখারী। বুখারী শরীফের শিরোনাম ও অধ্যায়গুলোকে প্রত্যেক যুগে বুখারীর সবকে রীতিমত অতি সূক্ষ্ম মনে করা হয়েছে। আর প্রত্যেক যুগেই বুখারীর শারেহ ও উস্তাদগণ এতে নিজের বিচক্ষণতা, বুদ্ধিমত্তা ও সূক্ষ্ম প্রজ্ঞার দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন। এ পুস্তিকাটি আরবী ভাষায় রচিত। প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হয়েছে ১৩২৩ হিজরীতে দায়েরাতুল মা'আরিফ হায়দারাবাদ থেকে। এরপর সংশোধিত সংস্করণ 'আসাহহুল মাতাবে দিল্লী' -এর ছাপা সহীহ বুখারীর শুরুতে ভূমিকাস্বরূপ সংযোজন করে দেওয়া হয়েছে।

৪. মজমূ'আয়ে রাসায়েলে আরবা'আ তথা চারটি সংক্ষিপ্ত পুস্তিকার একত্রিত সংকলন। যাতে ارشاد إلى مهمات الإسناد এবং তারাজিমুল বুখারী (শরহে তারাজিমে আবওয়াবে বুখারী ভিন্ন এক পৃষ্ঠাব্যাপী একটি শরাহ) শাহ সাহেবের লিখা।

৫. ক. الفضل المبين في المسلسل من حديث النبى الأمين

খ. النوادر من حديث سيد الأوائل والأواخر

গ. আরবাঈন।

শাহ সাহেব সেসব মর্যাদা লাভের প্রত্যাশায় এই পুস্তিকা রচনা করেছেন, যা চল্লিশ হাদীস সংকলনের ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে এবং বিভিন্ন যুগে উলামায়ে কিরাম এর উপর আমল করেছেন। এসব হাদীস সাধারণতঃ খুবই সংক্ষিপ্ত। শব্দ কম; কিন্তু অর্থ ব্যাপক। পুস্তিকাটি মুখস্ত করে নেওয়া এবং পাঠ্যভুক্ত করে নেওয়ার দাবীদার।

৬. মুসালসালাত : যেসব কিতাব সরাসরি হাদীস শাস্ত্রের উপর নয়। কিন্তু পরোক্ষভাবে হাদীসের সাথে সম্পৃক্ত এবং যেগুলোকে ইলমে হাদীসের ভূমিকাস্বরূপ পড়া উচিৎ। এগুলো থেকে শাহ সাহেবের হাদীস শাস্ত্রের উপর গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন, মাযহাব সংক্রান্ত বিতর্কে ইনসাফ ও প্রশস্ত মানসিকতা, মুহাদ্দিসীনে কিরাম ও হাদীস গ্রন্থাবলির শ্রেণীবিন্যাসে তার উদার দৃষ্টি এবং আল্লাহ তা'আলা তাঁকে যে ভারসাম্য ও ন্যায়ানুগতা দান করেছিলেন, তার ধারণা পাওয়া যায়। সেসব কিতাব নিম্নরূপ-

১. الإنصاف في بيان اسباب الإختلاف : 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে 'তাতিম্মাহ' বা 'যবনিকা' নামে কয়েকটি শিরোনাম ও বিষয়বস্তু নিয়ে ১৪০-১৬২ পৃষ্ঠাব্যাপী বিস্তৃত একটি রচনা। এই তাতিম্মাহ চার অনুচ্ছেদে বিভক্ত। প্রকাশকের গবেষণামতে উক্ত তাতিম্মাহ কেবল একটি সংস্করণেই পাওয়া গেছে। এই অনুচ্ছেদের শেষে শাহ সাহেব লিখেন, 'আমি স্বতন্ত্র একটি বই লিখার চূড়ান্ত মনস্থির করেছি। যার নাম রাখব الإنصاف في بيان اسباب الإختلاف (মতানৈক্যের কারণ বর্ণনায় চূড়ান্ত ন্যায়ানুগতা)। এতে বিস্তারিতভাবে মতানৈক্যের কারণসমূহ এবং তার প্রামাণ্য দলীল ও উদাহরণ পেশ করব। কিন্তু আজও সে কাজের জন্য সুযোগ হয়নি। যখন এই গ্রন্থে (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা) এ প্রসঙ্গ পর্যন্ত আলোচনা চলে এসেছে, তাই এই মুহূর্তে (সংশ্লিষ্ট বিষয়ে) যা কিছু মাথায় আছে, তা লিখে দেওয়া যথোপযুক্ত মনে করলাম। আর তা লিখে দেওয়া সহজ।'

মনে হয়, পরবর্তীতে শাহ সাহেবের সে সুযোগ হয়েছে। তিনি হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা থেকে এই বিষয়বস্তু নিয়ে আরও কিছু বাড়িয়ে পৃথক একটি পুস্তিকায় 'আল-ইনসাফ ফী বয়ানি আসবাবিল ইখতিলাফ' নামে পূর্ণ করে দেন। কাজেই এই পুস্তিকা এবং হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা এর তাতিম্মায়ে দোয়ম (দ্বিতীয় যবনিকা) এর মধ্যে কোথাও কোথাও বিরোধ ও সামান্য পরিবর্তন-পরিবর্ধন পরিলক্ষিত হয়।

এই পুস্তিকা 'আল-ইনসাফ' (যা তার বিষয়বস্তুতে স্বতন্ত্র) ভারত এবং ভারতের বাইরে কয়েকবার ছাপা হয়েছে। যার মধ্যে কোথাও কোথাও বিরোধ পরিলক্ষিত হত। ১৩২৭ হিজরীতে 'শিরকাতুল মাতবু'আতিল আলামিয়্যাহ, মিসর' -এর পক্ষ থেকে প্রথমবার আর 'মাকতাবাতুল মান্‌সূরার পক্ষ থেকে দ্বিতীয়বার আরবী বর্ণাক্ষরে ছাপা হয়। বর্তমানে আমাদের সামনে দারুন নাফায়েস, বৈরুতের উন্নত বর্ণাক্ষরে ছাপা সংস্করণ রয়েছে, যা ছোট আকারে একশ এগার পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। সমকালীন বিখ্যাত মুহাদ্দিস শায়খ আবদুল ফাত্তাহ আবু গুদ্দাহ এর সম্পাদনা ও সংশোধনের কাজ আঞ্জাম দেন এবং তার উপর টীকা সংযোজন করেন।

২. عقد الجيد فى احكام الإجتهاد والتقليد

৩. হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার সপ্তম অধ্যায়।

বস্তুত হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার প্রথম অংশের القسم الثانى فى بيان اسرار ما جاء عن النبى صلى الله عليه وسلم تفضيلا থেকে নিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডের শেষ অংশ الفتن والمناقب পর্যন্ত হাদীসেরই প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিজ্ঞোচিত ব্যাখ্যা, এর তত্ত্বও ও হুকুম এবং এর বাস্তব সমন্বয়ের সেই মুজতাহিদসুলভ প্রচেষ্টা, যা ছিল শাহ সাহেবেরই বৈশিষ্ট্য, যাতে তার প্রাধান্য ও শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। আক্ষেপ হচ্ছে, হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পাঠক-শিক্ষকও (যদিও সংখ্যায় তারা নগণ্য) এ অংশকে অপ্রয়োজনীয় বা গুরুত্বহীন ভেবে উপেক্ষা করে থাকে।

ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন

যুগ যুগ ধরে মুসলিম বিশ্বের জ্ঞান-গবেষণা, শিক্ষা ও লিখনী জগতে ফিকহ ও হাদীসের মাঝে দুটি ভারসাম্যপূর্ণ ধারা চলে আসছে, যার মধ্যে প্রত্যেকটিই (চালু হওয়ার সময় থেকে) স্বস্থানে অপরটি থেকে অমুখাপেক্ষী ও স্বনির্ভর হয়ে আপন গন্তব্যে এগিয়ে চলছে। আর অধিকাংশ সময় একটি অপরটি থেকে পৃথক হয়ে এরপর আর কোন তত্ত্ব-উপাত্তে গিয়ে সমন্বয় হত না। অনেক ফিকহী মতাদর্শে হাদীস তখনই আলোচনায় আসত, যখন মাসআলা সমর্থন এবং অপর মাযহাবের দিশারীদের সেই আপত্তি খণ্ডন করার

প্রয়োজন পড়ত– এ মাসআলাটি কি হাদীসের বিপরীত! অথবা অন্য মাযহাবের উপর তার প্রাধান্য প্রমাণ করতে হত। সিহাহ সিত্তাহর সবকে হয়ত সেসব হাদীসের ব্যাখ্যা দেওয়া হত যেগুলো আপন মাযহাবের বিপরীত মনে হত অথবা অন্যান্য কিতাবের সেসব হাদীস পেশ করা হত, যেগুলো স্বীয় মাযহাবের সমর্থনে পাওয়া যেত। যদি কোন ফিকহী মাযহাবের নির্ভরযোগ্য ও উচ্চ মাপের কিতাবে হাদীসগুলো দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়ে থাকে, তাহলে অনেক সময় উক্ত মাযহাবের সেসব উলামায়ে কিরাম যাদের হাদীস শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি ও প্রশস্ত দৃষ্টি এবং মুহাদ্দিসসুলভ আগ্রহ ছিল, তারা সেসব হাদীসের তাখরীজ (উদ্ধৃতি) বের করার চেষ্টা করেছেন। সেগুলোর উপর মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনা করেছেন। যার দ্বারা উক্ত গ্রন্থে প্রমাণ পেশ করা হয়েছে। সুতরাং এই প্রশংসিত প্রচেষ্টাও ছিল উক্ত ফিকহী মাযহাবের সমর্থন-সাহায্য এবং তাকে হাদীসের অনুকূল প্রমাণ করার একটি পদ্ধতি আর সেই মাযহাবের বিজ্ঞোচিত ও গবেষকসুলভ খেদমত, যা অতি মূল্যবান ও কৃতজ্ঞতাযোগ্য; তবে এতে মূল মাসআলায় পুনর্দৃষ্টি দান এবং ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টা ছিল না।

ফিকহী মাযহাবগুলো কিছুটা এমন লৌহজাত বাক্স হয়ে গিয়েছিল, যা ভেঙ্গে যাওয়া তো সম্ভব ছিল, তবে প্রসারিত হওয়া ছিল অসম্ভব। প্রত্যেক মাযহাবের অনুসারীই নিজের মাযহাব সম্পর্কে ধারণা রাখত, তার মাযহাব একশতভাগ বিশুদ্ধ হওয়াই প্রকৃত কথা। তবে মানবিক কারণে ভুল-ভ্রান্তির সম্ভাবনা অবশ্যই আছে। কেউ এই চিন্তাধারাকে অত্যন্ত উচ্চাঙ্গের বাক্যে নিম্নরূপে ব্যক্ত করেন–

مذهبنا صواب يحتمل الخطاء ومذهب غيرنا خطاء يحتمل الصواب.

'আমাদের মাযহাব প্রকৃতপক্ষে তো সঠিক এবং সত্য, ভুলের সম্ভাবনাও আছে। আর অন্যদের মাযহাব মূলতঃ ভুল; কদাচিৎ শুদ্ধতার সম্ভাবনা আছে।'

এই চিন্তাধারার পরিণতি ছিল, মাযহাব চতুষ্টয় তথা হানাফী, মালেকী, শাফেঈ ও হাম্বলী মাযহাবের মধ্যে (উম্মত যেগুলোকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে সার্টিফিকেট প্রদান করেছে এবং যেসব মাযহাব সম্পর্কে হকপন্থী ও জ্ঞানী মহলের মধ্যে প্রথম থেকেই নীতিগতভাবে স্বীকার করা হত যে, সত্য এগুলোর মধ্যে সীমাবদ্ধ। এগুলোর প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতিগণ ছিলেন হিদায়াতের ইমাম ও উম্মতের দিশারী। আর এ মাযহাবগুলো সত্য) মতবিরোধের উপসাগর দিন দিন গভীর ও সম্প্রসারিত হচ্ছিল। এসবের অনুসারীদের মাঝে মতবিরোধ, ঘৃণা-ভৎর্সনা আর তর্ক-বিতর্ক অনেক সময়

বিবাদ ও যুদ্ধ পর্যন্ত গড়িয়ে যেত। এর চেয়ে কঠিন আচরণ সেসব জ্ঞানী-বিদ্বানদের সাথে হত, যারা পুরোপুরি বা আংশিকভাবে ইবাদত-বন্দেগীতে হাদীসের উপর আমল শুরু করে দিত। এর একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত সেই বারো শতকের এক প্রবীণ আলেম ও মুহাদ্দিস শায়খ মুহাম্মদ ফাখের যায়েরে এলাহাবাদী (১১২০-১১৬৪ হি.)। যিনি (কোনও কোনও লেখকের বর্ণনামতে) তার ইত্তিবায়ে হাদীস বা হাদীসের অনুসরণ ও প্রবীণতার কারণে জনসাধারণের গণরোষের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হন।

শাহ সাহেবের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের মধ্যে একটি সাফল্য, হাদীসের খেদমত ও সুন্নাতের সাহায্যের মুক্তামালারই একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। ফিকহ ও হাদীসের মধ্যে সমন্বয় সাধন। অধিকন্তু তিনি মাযহাব চতুষ্টয় সম্পর্কে যে সংকলন ও কলমযুদ্ধের চেষ্টা চালিয়েছেন, তা থেকে নবী করীম (স)-এর সেই শুভসংবাদেরই সত্যতা প্রমাণিত হয়, যাতে বলা হয়েছিল, 'তোমাদের দ্বারা আল্লাহ তা'আলা এই উম্মতের ঐক্য-সংহতির এক বিশেষ প্রকারের কাজ নিবেন।' ভারত উপমহাদেশ সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে এই চিন্তাধারা, সংকলন ও সমন্বয় সাধনের সেই প্রচেষ্টার আলামত পাওয়া যায় না। আর এর ঐতিহাসিক ও শিক্ষণীয় বহু কারণও আছে। এই উপমহাদেশ প্রথম থেকেই সেসব দিগ্বীজয়ী ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠাতাদের পদানত ছিল, যারা ছিল তুর্কি কিংবা আফগান বংশোদ্ভুত লোক। এতদুভয় জাতিই প্রায় তাদের ইসলাম গ্রহণের সময় থেকে হানাফী মাযহাবের অনুসারী বরং তার সাহায্য-সহযোগিতা ও প্রচার-প্রসারে তৎপর ও উৎসাহী থাকে। এখানে প্রায় আটশ বছর পর্যন্ত মালেকী ও হাম্বলী মাযহাবের পা রাখারই সুযোগ হয়নি। শাফিঈ মাযহাব সীমান্ত-উপকূল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে কিংবা দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ এবং উত্তর প্রদেশ (বর্তমান কিরণাটেক) এর কিছু অংশ ভাটকল প্রভৃতি ও কেরালায়ে সীমাবদ্ধ থাকে। তন্মধ্যেও মালাবার (প্রাচীন আলমা'বার শহর) বাদ দিয়ে, যেখানে বেশির ভাগ শাফিঈ মতাবলম্বী ইসলামের দাঈগণ, ব্যবসায়ী, মাশায়িখ, ফকীহ, আলেম ও জ্ঞানী-বিদ্বান ব্যক্তিবর্গ এসেছেন। শায়খ মাখদূম, ফকীহ আলী মাহাইমী (মৃত্যু ৮৩৫ হি.) যিনি তাবছিরাতুর রহমান ও তাইসীরুল মান্নান রচয়িতা, মালাবার শায়খ মাখদূম ইসমাঈল ফকীহ সুক্কারী সিদ্দিকী (মৃত্যু ৯৪৯ হি.) এবং শায়খ মাখদূম যাইনুদ্দীন ইয়ালীবারী (মৃত্যু ৯২৮ হি.) ছাড়া আমাদের ক্ষুদ্রজ্ঞানে এ ধরনের শাফিঈ ফকীহ ও মুহাদ্দিস জন্ম নেয়নি। যারা ভারতে বিশেষতঃ উত্তর ভারতের শিক্ষাজগতে বিরাট প্রভাব ফেলতেন, হানাফী উলামায়ে কিরামকে শাফিঈ ফিকহের উপর গভীর পর্যবেক্ষণ, অন্তর্দৃষ্টি দান এবং এর দ্বারা উপকৃত হতে

উৎসাহিত করতেন। ভারত থেকে যেসব উলামায়ে কিরাম ও ইলমে হাদীস ও ইলমে ফিকহ অনুসন্ধিৎসু হিজায গমন করতেন (যা ছিল তুর্কি রাজত্বের শাসনাধীন আর তুর্কিরা প্রত্যেক যুগে শতভাগ সুন্নী ও হানাফী ছিল) তারাও বেশিরভাগ নিজ মাযহাবেরই উলামায়ে কিরাম এবং বিশেষভাবে নিজের স্বদেশী আসাতিযায়ে ফিকহ ও হাদীসের সঙ্গে সম্পর্ক রাখতেন। যারা সেখানে ভারত কিংবা আফগানিস্তান থেকে হিযরত করে চলে গিয়েছেন। তাদের শিষ্যদের বিরাট মজলিস ছিল।

শাহ ওয়ালীউল্লাহ সাহেব প্রথম ব্যক্তি ছিলেন, যিনি হারামাইন শরীফাইনে মৌলিক শিক্ষা ও উপকারিতা লাভ করেছেন এক বিশিষ্ট শাফিঈ মুহাদ্দিস শায়খ আবু তাহের কুর্দী মাদানীর কাছ থেকে তিনি তার (কুর্দীর) জ্ঞান-প্রজ্ঞা, তার ব্যক্তিত্ব, তার বাতেনী (আধ্যাত্মিক) যোগ্যতাসমূহ, উদার দৃষ্টি ও উদার প্রাণের দ্বারাও প্রভাবিত হয়েছেন। শাহ সাহেব 'ইনসানুল আইন' গ্রন্থে তার যেসব মাশায়িখে হারামাইনের পরিচয় পেশ করেছেন, সেখানে কেবল একজন শায়খ তাজুদ্দীন কালঈ ছিলেন হানাফী আলেম ও মুহাদ্দিস। তন্মধ্যে শায়খ মুহাম্মদ ওফদুল্লাহ ইবনে শায়খ মুহাম্মদ ইবনে মুহাম্মদ ইবনে সুলাইমান ছিলেন মালেকী মতাবলম্বী। শাহ সাহেব হারামাইন শরীফে অবস্থানের যুগে হিজাযের জ্ঞানগত নেতৃত্ব, শিক্ষা ও লিখনী ময়দানে বিশেষতঃ হাদীস শাস্ত্রের নেতৃত্ব ও পৃষ্ঠপোষকতার লাগাম ছিল ইয়ামেনের আলেম ও মুহাদ্দিস অথবা কুর্দী বংশোদ্ভূত উলামায়ে কিরামের হাতে। আর তারা সাধারণতঃ শাফিঈ মতাবলম্বী ছিলেন। এসব কারণে শাহ্ সাহেবের শাফিঈ ফিকহের মূলনীতি ও নিয়ম-পদ্ধতি, তার বৈশিষ্ট্যাবলী এবং কিছু ব্যতিক্রমধর্মী বিষয় সম্পর্কে অবগতি লাভের পূর্ণ সুযোগ হয়েছে। এভাবে তিনি মালেকী ফিকহ্ এবং হাম্বলী ফিকহ্ সম্পর্কেও অবগত হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। ভারতীয় আলেমদের জন্য দীর্ঘকাল ধরে (ঐতিহাসিক, ভৌগোলিক, রাজনৈতিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক কারণে) যার ব্যবস্থা হচ্ছিল না। এভাবে মাযহাব চতুষ্টয়ের তুলনামূলক বা বিপরীতধর্মী ফিকহী ব্যুৎপত্তি তার জন্য সহজসাধ্য হয়েছে। যা ছিল সেসব উলামায়ে কিরামের জন্য কঠিন, যাদের এ সুযোগ হয়নি।

শাহ্ সাহেব প্রায় বার বছর ভারতে শিক্ষাদান করার পর, হিজরী ১১৪৩ সালে ত্রিশ বছর বয়সে হিজায গমনের মনস্থ করেন। কিন্তু আল্লাহ তা'আলা তার মন-মানসে জন্মগতভাবেই যে সামগ্রিকতা, দৃষ্টি ও অন্তরে প্রশস্ততা, জন্মগত সমন্বয় আগ্রহ এবং আরেফ রুমী (র)-এর অসীয়তের উপর আমল করার স্বভাবগত আকর্ষণ ও ব্যাকুলতা সৃষ্টি করেছিলেন, কবির ভাষায়-

সে কারণে হিজায সফরের পূর্বেই তার মধ্যে ফিকহ ও হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধনের আগ্রহ-উদ্যম, মুহাদ্দিস ফকীহগণের মতাদর্শকে প্রাধান্য দান এবং একে আপন জীবনের অভীষ্ট লক্ষ্য বানানোর সংকল্প সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। 'আল-জুযউল লাতীফ' গ্রন্থে শাহ সাহেব স্বয়ং লিখেছেন, 'মাযহাব চতুষ্টয় ও তাদের উসূলে ফিকহের কিতাবাদি অধ্যয়ন এবং যেসব হাদীস দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, সেগুলো সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা করার পর মন-মানসে মুহাদ্দিস ফকীহগণের চমকপ্রদ পছন্দনীয়তা বদ্ধমূল হয়। এতে অদৃশ্য আলোকবর্তিকার সাহায্যও ছিল।

শাহ সাহেব কট্টরপন্থী ফকীহগণ (যারা তাদের মাযহাব থেকে চুল পরিমাণ সরে আসতে প্রস্তুত নয়) এবং যাহেরিয়াহ ফিরকা (যারা সুস্পষ্ট ফিকহ অস্বীকারকারী এবং সেসব ফকীহগণের উপর কটুক্তি করে, যারা আলেম-উলামা ও জ্ঞানী মহলের শিরোমণি এবং আহলে দীনের ইমাম ও নেতা) এর রীতিনীতির বিরুদ্ধে কঠোর সমালোচনা করেছেন। তাদের জালিয়াতি ও চরমপন্থাকে ঘৃণা করেছেন। পরিষ্কার ভাষায় লিখেছেন, ان الحق امر بين بين 'প্রত্যেক ব্যাপারে নিঃসন্দেহে মিতাচারই সঠিক।' না প্রথম পক্ষ একশতভাগ সত্যের উপর আছে, আর না দ্বিতীয় পক্ষ।

শাহ সাহেব (র) তার জগদ্বিখ্যাত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' গ্রন্থে লিখেছেন, একদিকে কালামে ফিকহের উপর তাখরীজ অপরদিকে হাদীসসমূহের শব্দাবলীর তত্ত্বানুসন্ধান। ধর্মে দু'টিরই সুদৃঢ় ভিত্তি রয়েছে। প্রত্যেক যুগেরই উভয়েরই গবেষক উলামায়ে কিরাম এতদুভয়ের মূলনীতির উপর আমল করে গেছেন। কেউ কেউ এমন, তাখরীজ সম্পর্কে যারা পিছপা আর হাদীসের শব্দাবলীর তত্ত্বানসন্ধানে অগ্রণী। আবার কেউ কেউ এর বিপরীত। তন্মধ্যে কোনও একটি মূলনীতিকে মোটেও উপেক্ষা করা অনুচিত। যেমনটি দু'পক্ষেরই সাধারণ রীতি। এক্ষেত্রে উভয়ের মাঝে সমন্বয় সাধনের চেষ্টা চালানোই কার্যকরী পথ। আর একটির ঘাটতি অপরটি দ্বারা পূর্ণ করতে হবে। এটাই ইমাম হাসান বসরী (র)-এর অভিমত।'

শাহ সাহেব তার ফার্সী অসীয়তনামায় লিখেন– 'শাখা মাসআলায় এমন মুহাদ্দিস উলামায়ে কিরামের অনুসরণ করা উচিৎ, যিনি ফিকহ ও হাদীস উভয় শাস্ত্রের (সমান অভীজ্ঞা) আলেম। ফিকহী মাসআলাগুলোকে কিতাবুল্লাহ ও সুন্নাতে রাসূলের সাথে মিলিয়ে নেওয়া কর্তব্য।'

আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন– 'উম্মতের জন্য যৌক্তিক মাসআলাগুলো কুরআন-হাদীসের সাথে পরিমাপ করা জরুরী। এক্ষেত্রে আদৌ অমুখাপেক্ষিতা আসতে পারে না।'

শাহ সাহেব (র)-এর সময়ে শিক্ষাগত উন্নতি-সমৃদ্ধি হয়েছিল হানাফী ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহে হানাফীর পরিবেশে। তিনি হানাফী মাযহাবের বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে এতটাই ওয়াকিফহাল এবং এর এত বেশি প্রবক্তা ছিলেন, যতখানি হতে পারেন বড় কোন হানাফী আলেম। তিনি এ বাস্তবতা সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন এবং স্থানে স্থানে তার প্রকাশ করতেন যে, বিভিন্ন ঐতিহাসিক, শিক্ষাগত, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কারণে হানাফী ফিকহ্ (শাফিঈ ফিকহ্সহ) এর যতদূর খেদমত হয়েছে এবং এর চেহারার সুষমাবর্ধন তথা এর খুঁটিনাটি ঠিক করা হয়েছে আর এর মতনগুলো (মূল পাঠ) এর ব্যাখ্যা ও মূলনীতিগুলোর বিশ্লেষণ করা হয়েছে, অপর কোনও মাযহাবের ক্ষেত্রে এমনটি করা হয়নি। তিনি ইমাম আবু হানীফা সম্পর্কে লিখেন, 'ইমাম আবু হানীফা (র)-এর মর্যাদা ইবরাহীম নাখঈ এবং তার সমপর্যায়ের উলামায়ে কিরামের মাযহাবের উপর ইজতিহাদ-ইস্তিম্বাত (মাসআলা উৎসারণ)-এর ব্যাপারে অনেক উর্ধ্বে ছিল। সেসব তাখরীজ (উদ্ভাবন-উদ্ধৃতি)-এর নানা দিক ও আপত্তি সম্পর্কে তিনি অত্যন্ত গভীর দৃষ্টি রাখতেন। শাখা মাসআলাগুলো উদ্ভাবনে ছিল তার অসাধারণ গভীরতা।'

কিন্তু সেসঙ্গে তিনি ইমাম মালেক (র) এর বড়ত্ব, বিশেষতঃ মুয়াত্তার বিশুদ্ধতা, তার মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব তার বরকতের নিছক প্রবক্তাই নন বরং দাবীদার এবং একে হাদীসের বুনিয়াদী (ভিত্তিমূলক) কিতাবাদির মধ্যে গণ্য করতেন। অপরদিকে শাফিঈ মাযহাবের পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ও হাদীসের সঙ্গে নিকটতর হওয়ার আলোচনা করতেন বলিষ্ঠ কণ্ঠে। ইমাম শাফিঈ (র)-এর দূরদর্শীতা ও বিচক্ষণতার বড় প্রবক্তা ছিলেন। অনন্তর সেসঙ্গে ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-এর জীবনালেখ্য বর্ণনা করতে গিয়ে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় লিখেন, "সেসব ফকীহ্ ও মুহাদ্দিসগণের মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন, অধিক বর্ণনাকারী, হাদীস সম্পর্কে পরিজ্ঞাত এবং ফিকহী জ্ঞানের তীক্ষ্মদৃষ্টির অধিকারী ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র), এরপর ইমাম ইসহাক ইবনে রাওয়ায়েহ।"

উক্ত চার ইমামের উচ্চ মর্যাদা, জ্ঞানের প্রশস্ততা, তীক্ষ্মদৃষ্টি এবং উম্মতের উপর ইহসান-অনুগ্রহ সম্পর্কে (সেসব কিতাব, ইতিহাস ও অনুবাদের মাধ্যমে) সরাসরি অবগতি লাভ ও তাদের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা-ভালবাসার কারণে শাহ সাহেবের মধ্যে সেই সামগ্রিকতা, স্বয়ংসম্পূর্ণতা এবং ফিকহ ও

হাদীসের তুলনামূলক মুতালা'আয় এমন ভারসাম্য ও মিতাচার সৃষ্টি হয়ে যায়, যার প্রত্যাশা কুদরতীভাবে সেসব আলেম ও লেখকদের নিকট থেকে করা যায় না, যাদের জ্ঞান-গবেষণা ও চিন্তাধারার সম্পর্ক নিছক একই ফিকহী মাযহাব ও তার প্রবর্তক-স্থপতির সঙ্গে ছিল। আর তাদের সেই সীমানা থেকে বেরিয়ে আসার (নানাবিধ মানসিক ও ব্যক্তিগত কারণে) সুযোগ হয়নি।'

ইজতিহাদ ও তাকলীদের মাঝে ভারসাম্য রক্ষা

হযরতের শাহ সাহেবের সেসব ভূতপূর্ব যোগ্যতা ও সংস্কারমূলক বৈশিষ্ট্যাবলির মধ্যে, যা দ্বারা আল্লাহ তা'আলা তাকে বিশেষ সম্মানে ভূষিত করেছেন, তা হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও ন্যায়ানুগ মতাদর্শ ও মিতাচারের পদ্ধতি, যা তিনি ইজতিহাদ ও তাকলীদ তথা অনুকরণের মাঝে অবলম্বন করেছেন, যা তার সুস্থ মানসিকতা, সঠিক আগ্রহ ও বাস্তবদর্শীতার উত্তম বহিঃপ্রকাশ। একদিকে ছিল সেসব লোক, যারা প্রত্যেক মুসলমানকে চাই সে সাধারণ কিংবা বিশিষ্ট ব্যক্তিই হোক, সরাসরি কিতাব ও সুন্নাতের উপর আমল করা এবং প্রত্যেক বিষয়ে কুরআন-সুন্নাহ থেকে বিধান গ্রহণে আদিষ্ট সাব্যস্ত করত। আর কারও অনুকরণকে বলত সম্পূর্ণরূপে হারাম। তাদের কথাবার্তায় এর সুস্পষ্টতা না পাওয়া গেলেও তাদের কর্মপদ্ধতি ও তাদের রচনাবলি থেকে অলৌকিকভাবে এই ফলাফল বের করা যায়। এ দলে প্রবীণদের মধ্য হতে আল্লামা ইবনে হাযাম (র) কে আগে আগে দেখা যায়। কিন্তু এটা পুরোপুরি অমূলক কথা। আর প্রত্যেক মুসলমানকে এর জন্য আদিষ্ট সাব্যস্ত করা অসাধ্য সাধন বা অসম্ভব বিষয়ের আদেশ দেওয়ার নামান্তর।

অপরদিকে আরেকটি দল ছিল, যারা তাকলীদ (অনুকরণ)কে প্রত্যেক মুসলমানের উপর ওয়াজিব সাব্যস্ত করত এবং তা পরিত্যাগকারীকে কঠিন ফিকহী হুকুম 'ফাসিক' ও 'গোমরাহ' বলে অভিহিত করত। যেমনটি বলত প্রথম দল অনুকরণকারীদের এবং কোন বিশেষ ফিকহী মাযহাবের অনুসারীদেরকে। এ দল সেই বাস্তবতাকে ভুলে যেত যে, অনুকরণ মূলতঃ সাধারণ মানুষকে প্রবৃত্তির তাড়না ও আত্মপূজা, বিলাসিতা ও অহংকার থেকে বাঁচানো, মুসলিম সমাজকে বিচ্ছিন্নতা ও লাগামহীনতা থেকে নিরাপদ রাখা, ধর্মীয় জীবনে ঐক্য-সংহতি ও শৃঙ্খলা তৈরী করা এবং শরয়ী আহকামের উপর সহজে আমল করার সুযোগ দানের একটি ব্যবস্থামূলক কৌশল। কিন্তু তারা এই ব্যবস্থামূলক কাজকে শরয়ী আমলের মর্যাদা দিয়ে দেয় এবং এর উপর এত কঠোরভাবে বাড়াবাড়ি করে, যা তাকে একটি ফিকহী মাযহাব ও ইজতিহাদী মাসআলার স্থলে মানছূছ, অকাট্য আমল এবং স্বতন্ত্র দীনের মর্যাদা দিয়ে দেয়।

শাহ সাহেব এক্ষেত্রে যে মতাদর্শ অবলম্বন করেছেন এবং তার যে ব্যাখ্যা তিনি প্রদান করেছেন, তা শরীয়তের উৎস-প্রাণের নিকটতর, প্রথম শতাব্দীর আমলের সঙ্গে অধিক সঙ্গতিপূর্ণ, মানবীয় স্বভাবের সাথে বেশি অনুকূল এবং বাস্তব জীবনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব চতুর্থ হিজরী শতকের পূববর্তী কর্মপদ্ধতি বর্ণনা করেন। বলেন– 'মানুষ তার ধর্মীয় জীবনে ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানে নিত্য-নতুন যেসব সমস্যা-সংকটের মুখোমুখি হত, তারা সেসব কিভাবে সমাধান করত, তারা সেক্ষেত্রে কী পন্থা অবলম্বন করত, তা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগায় 'হিজরী চতুর্থ শতকের পূর্বাপর ধর্মীয় বিষয়ে তত্ত্বানুসন্ধান ও আমলের ব্যাপারে মানুষ কী পন্থা অবলম্বন করত?'– শিরোনামে বর্ণনা করেন। যা নিম্নরূপ–

প্রথম শতকে মুসলমানদের কর্মপন্থা

উল্লেখ্য যে, চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বে মানুষ নির্দিষ্ট কোনও মাযহাবের অনুসরণ ও তার পূর্ণ আনুগত্যের উপর ঐক্যবদ্ধ ছিল না। আবু তালেব মাক্কী (তার প্রসিদ্ধ গ্রন্থ) 'কূতুল কুলূব'-এ লিখেছেন, সংকলন বা রচনামূলক কিতাবাদি (ও ফিকহী-মাসআলা সমগ্র) সে যুগের পরের কথা। মানুষের বর্ণিত কথাবার্তা বলা, কোন একটি মাযহাবের উপর ফাতওয়া প্রদান, তার কথাকে আইন বা কর্মনীতি বানিয়ে নেওয়া এবং তা-ই অনুলিখন বা নকল করা, সে মাযহাবেরই মূলনীতি ও উৎসগুলোর পাণ্ডিত্য অর্জনের রীতি প্রথম ও দ্বিতীয় শতকে বিদ্যমান ছিল না।

আমি তাতে বাড়িয়ে বলি, প্রথম দুই শতকের পর তাখরীজ (কুরআন-হাদীসের আলোকে মাসআলা উৎসারণ) -এর ধারা কিঞ্চিৎ পরিমাণে শুরু হয়। কিন্তু স্বতঃসিদ্ধ যে, চতুর্থ হিজরী শতকের মানুষ একই মাযহাবের গণ্ডিতে থেকে বিশেষ অনুকরণের প্রতি আনুগত্যশীল, তদনুযায়ী মাসায়েল ও আহকাম সম্পর্কে ব্যুৎপত্তি অর্জন এবং সে মাযহাবেরই গবেষণা ও ইজতিহাদগুলো অনুলিখন ও বর্ণনায় অভ্যস্ত ছিল না। যেমনটি তত্ত্বানুসন্ধানের মাধ্যমে জানা যায়।

উম্মতের মধ্যে (ও মুসলিম সমাজে) দু'টি শ্রেণী ছিল। একটি উলামায়ে কিরামের; অপরটি সাধারণ মানুষের। তন্মধ্যে সাধারণ মানুষ সেসব যৌথ বিষয় ও সম্মিলিত মাসআলাগুলোতে কেবল শরীয়ত প্রণেতার অনুসরণ করত, যেগুলোতে মুসলমানগণ কিংবা জমহূর মুজতাহিদগণের মাঝে কোনও মতবিরোধ নেই। তারা অযু-গোসল করা এবং নামায-যাকাত আদায় করার পদ্ধতি এবং এ জাতীয় ইবাদত-বন্দেগী ও ফরযসমূহের জ্ঞান আপন

পিতামাতা কিংবা নিজ শহরের উস্তাদ ও আলেমদের থেকে আহরণ করত আর তদনুযায়ীই আমল করত। নতুন কোনও বিষয়ের মুখোমুখি হলে বা নতুন কোন মাসআলা সামনে এলে, সে ব্যাপারে কোনও মুফতীর শরণাপন্ন হত ঠিক। কিন্তু কোন মাযহাব নির্ধারণ করা ছাড়াই প্রয়োজন সেরে নিত এবং তার কাছে মাসআলা জিজ্ঞাসা করত।

আর খাছ শ্রেণী বা বিশেষ মহল সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায়, তাদের মধ্যে যাদের প্রতিপাদ্য এ বিষয়বস্তু ছিল হাদীস শরীফ, তারা হাদীস নিয়েই ব্যস্ত থাকত। তারা হাদীসে নববী (স) ও আছারে সাহাবা (রা)-এর এত বড় ভাণ্ডার পেয়ে যেত, যার উপস্থিতিতে তাদের সংশ্লিষ্ট মাসআলা অন্য কোনও কিছুর প্রয়োজন পড়ত না। তাদের কাছে কোনও না কোনও এমন হাদীস বিদ্যমান ছিল, যা প্রসিদ্ধি, ব্যাপকতা কিংবা বিশুদ্ধতার স্তরে উন্নীত হত অথবা বিশুদ্ধ হাদীস হত, যার উপর ফকীহগণ ও বড় বড় উলামায়ে কিরামের কেউ না কেউ আমল করত। আবার কারও কাছে সেটি প্রত্যাখ্যানের যুক্তিগ্রাহ্য কোন ওজর-আপত্তিও থাকত না। অথবা জমহূর সাহাবা (রা) ও তাবেঈদের ক্রমান্বয়ে একে অপরকে সমর্থন জানানোর অভিমত তাদের নিকট থাকত। যার সম্পর্কে মতবিরোধ করার কোনও সুযোগ হত না। যদি তাদের কারও কোনও মাসআলায় এমন কোনও বিষয় না মিলত, যাতে তার মন পরিতৃপ্ত বা প্রশান্ত হয় -অনুলিপির বৈপরিত্য কিংবা প্রাধান্য দানের কারণগুলোর অস্পষ্টতার দরুণ অথবা অন্য কোনও যৌক্তিক কারণে, তাহলে তারা তাদের পূর্ববর্তী ফকীহ ও উলামায়ে কিরামের কথা ও অভিমতের প্রতি লক্ষ্য করত। এক্ষেত্রে যদি তারা দু'টি উক্তি পেত, তবে তন্মধ্যে তারা অধিক শক্তিশালী ও প্রামাণ্যনির্ভর উক্তিটিই গ্রহণ করত। চাই সে উক্তি বা মতটি মদীনার আলেমদের হোক কিংবা কূফার আলেমদের।

আর যারা তাখরীজ (ইজতিহাদ ও ইস্তিম্বাত) এর যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল, তারা যেসব মাসআলায় সুস্পষ্ট কোনও বিধান না পেত, সে মাসআলায় তাখরীজ ও ইজতিহাদের মাধ্যমে কাজ নিত। এসব লোককে তাদের উস্তাদ কিংবা দলের প্রধানের প্রতি সম্পৃক্ত করা হত। যেমন বলা হত, অমুক শাফিঈ। অমুক হানাফী। হাদীসের আলেমদের মধ্যেও যিনি কোনও মাযহাবের অনুসরণ বেশি করতেন, তাকে তার সাথেই সম্বন্ধিত করা হত। যেমন, ইমাম নাসাঈ ও বায়হাকীর সম্বন্ধ করা হত ইমাম শাফিঈ (র)-এর সাথে। সে যুগে বিচার ও ফাতওয়া প্রদানের ক্ষেত্রে তাকেই স্বীকৃতি দেওয়া হত, যার মধ্যে ইজতিহাদের যোগ্যতা থাকত। ফকীহও তাকে বলা হত, যিনি

মুজতাহিদ হতেন। এর কয়েকশত বছর পর এমন লোকের জন্ম হয়, যারা নীরবতা ও সততার পথ অবলম্বন করেন।'

তাকলীদের বৈধ ও সৃষ্টিগত রূপরেখা

শাহ্ সাহেব অত্যন্ত ন্যায়নিষ্ঠা ও বাস্তবদর্শীতার ভিত্তিতে কাজ করতেন। সেমতে তিনি এমন ব্যক্তিকে তাকলীদের (অনুকরণের) ব্যাপারে অক্ষম মনে করতেন, যে অবশ্যই কোন ফিকহী মাযহাব কিংবা নির্দিষ্ট ইমামের অনুসারী। তবে তার নিয়ত হচ্ছে, কেবল শরীয়ত প্রণেতার আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ (সা)-এর অনুসরণ। কিন্তু তার মধ্যে এমন যোগ্যতা নেই যে, সে শরয়ী হুকুম এবং কুরআন-সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত বিষয় পর্যন্ত পৌঁছে যাবে। এর একাধিক কারণ হতে পারে। যেমন– সে অতি সাধারণ মানুষ অথবা তার হাতে সরাসরি তত্ত্বানুসন্ধান ও গবেষণার জন্য সময়-সুযোগ নেই অথবা এমন উপাদান (জ্ঞান-গবেষণা) অর্জিত নেই, যার দ্বারা সে স্বয়ং নুছূছ বা অকাট্য প্রমাণ্যের তত্ত্বানুসন্ধান চালাতে পারে কিংবা সেখান থেকে মাসআলা বের করে নিতে পারে। শাহ্ সাহেব (র) আল্লামা ইবনে হাযম (র)-এর "তাকলীদ তথা অনুকরণ হারাম। কোনও মুসলমানের জন্য বিনা দলীলে আল্লাহ্ রাসূল (স) ছাড়া অন্য কারও কথা বা মতামত গ্রহণ করা জায়েয নয়।" উক্তিটি উদ্ধৃত করার পর লিখেন–

'ইবনে হাযম (র)-এর (উপরিল্লিখিত) উক্তির পাত্র সে ব্যক্তি নয়, যে রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা/মতামত ব্যতিত অন্য কাউকে নিজের জন্য ওয়াজিবুল ইতাআত বা অনিবার্য অনুসৃত মনে করে না। সে সেটিকেই হালাল জ্ঞান করে, যাকে আল্লাহ্ ও আল্লাহর রাসূল (স) হালাল করেছেন। আর তাকেই হারাম বলে মানে, যাকে আল্লাহ্-আল্লাহর রাসূল (সা) হারাম সাব্যস্ত করেছেন। কিন্তু তার যেহেতু সরাসরি রাসূলুল্লাহ (স)-এর কথা, কাজ ও মতামতের জ্ঞান নেই, সে নবীজীর বিভিন্ন উক্তি ও কথার মাঝে সামঞ্জস্য বিধানের যোগ্যতা এবং তাঁর বাণী থেকে মাসআলা বের করার ক্ষমতা রাখে না, তাই সে কোনও আল্লাহভীরু আলেমের আঁচল আকড়ে ধরে বসে। মনে করে, তিনি সঠিক কথা বলেন। আর যদি সে কোনও মাসআলা বর্ণনা করে তবে তাতে নিছক সুন্নাতে নববীর অনুসৃত ও ব্যাখ্যাতা হয় সে। যখনই সে জানতে পারে, তার এই ধারণা সঠিক ছিল না, তৎক্ষণাৎ সে কোন প্রকার টানাপোড়েন ও বাড়াবাড়ি ছাড়া তার আঁচল ছেড়ে দেয়। সুতরাং এমন ব্যক্তিকে কিভাবে কেউ ভৎর্সনা করবে এবং তাকে সুন্নাত ও শরীয়তের বিরোধী সাব্যস্ত করবে?

সকলেই জানেন, ফাতওয়া গ্রহণ ও ফাতওয়া প্রদানের ধারা নববী যুগ থেকে নিয়ে অব্যাহতভাবে চলে আসছে। আর সেই দু'ব্যক্তির মাঝে কী তফাৎ, যাদের একজন সবসময় অন্যের থেকে ফাতওয়া গ্রহণ করে। কখনও একজন থেকে, কখনও আরেকজন থেকে। কিন্তু তার মেধা স্বচ্ছ। তার নিয়ত সঠিক। আর সে নিছক ইত্তিবায়ে শরীয়ত তথা শরীয়তের অনুসরণ চায়। এটা কিভাবে নাজায়েয? অথচ কোনও ফকীহ্ সম্পর্কে আমাদের এই বিশ্বাস ও ঈমান নেই যে, আল্লাহ্ তা'আলা তার উপর আকাশ থেকে ফিকহ্ অবতীর্ণ করেছেন এবং আমাদের উপর তার আনুগত্য ফরয করেছেন। আর তিনি নিষ্পাপ। সুতরাং আমরা যদি সেসব ফকীহ্ ও ইমামগণের মধ্য হতে কারও অনুসরণ করি, তবে তা নিছক এ কারণে যে, আমরা জানি, তিনি কুরআন-সুন্নাহ্র আলেম, তার অভিমত (ফাতওয়া) দু'অবস্থার এক অবস্থা থেকে মুক্ত নয়। হয়ত সেটি কুরআন-হাদীসের সুস্পষ্ট কোনও হুকুমের উপর নির্ভরশীল অথবা স্বতঃসিদ্ধ কোনও মূলনীতির আলোকে তা কুরআন-হাদীস থেকে উৎসারিত। অথবা তিনি বিভিন্ন নিদর্শন থেকে ধারণা করেছেন, হুকুমটি অমুক ইল্লতের সাথে সম্পৃক্ত। (এখানেও সে ইল্লাত বিদ্যমান) আর তার মন এ বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়ে গেছে। কারণ, তিনি গাইরে মানছূছ (অকাট্য প্রামাণ্য নছশূন্য বিষয়কে) মানছূছের (অকাট্য প্রামাণ্যনির্ভর বিষয়ের) উপর কিয়াস (পরিমাপ) করেছেন। যেন তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলছেন– আমি বুঝি, রাসূলে কারীম (স) বলেছেন– যেখানে এই ইল্লত বা কারণ পাওয়া যাবে, সেখানে এই হুকুম হবে। আর এই যৌক্তিক মাসআলা উক্ত ব্যাপকতা ও মূলনীতির অন্তর্ভুক্ত।

অনুরূপভাবে এই হুকুম সম্বন্ধ রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতিও করা যায়। কিন্তু তা ধারণাগতভাবে। যদি অবস্থা-প্রেক্ষিত এমন না হত, তাহলে কোনও ঈমানদার কোনও মুজতাহিদের অনুসরণ করত না। যদি আমাদের নিকট নিষ্পাপ রাসূলে কারীম (স)-এর কোনও হাদীস নির্ভরযোগ্য সূত্রে পৌঁছে, যার আনুগত্য আল্লাহ্ তা'আলা আমাদের উপর ফরয করেছেন, যে হাদীসখানা ঐ মুজতাহিদ অথবা ইমামের ফাতওয়া ও অভিমতের বিপরীত আর আমরা সে হাদীসখানা ছেড়ে দেই এবং ঐ যন্নী বা সংশয়পূর্ণ পন্থা অনুসরণ করি, তাহলে আমাদের অপেক্ষা বেশি অর্থহীন পদ্ধতি অবলম্বনকারী আর কে হবে? আগামী দিনে আল্লাহ্র সামনে কী অজুহাত থাকবে আমাদের?'

মাযহাব চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্যাবলি

এই ন্যায়ানুগ ও গবেষণামূলক পর্যালোচনার পর শাহ সাহেব উক্ত চার মাযহাব তথা হানাফী, মালেকী, শাফিঈ ও হাম্বলী মাযহাবের ব্যাপারে মুসলিম

বিশ্বে সাধারণতঃ যার উপর আমল করা হয়, সে সম্পর্কে রচিত 'কলেবরে ক্ষুদ্র; মূল্যমানে উৎকৃষ্ট' গ্রন্থ عقد الجيد فى احكام الاجتهاد والتقليد এর মধ্যে লিখেছেন,

'স্মরণ রাখবেন, উক্ত মাযহাব চতুষ্টয় গ্রহণ করার মধ্যে বিরাট উপকারিতা রয়েছে। আর এই চারটি মাযহাবকেই একেবারে উপেক্ষা করার মাঝে রয়েছে বিরাট অকল্যাণ ও বিপর্যয়। এর কয়েকটি কারণ আছে। প্রথমতঃ উম্মতের ঐকমত্য রয়েছে যে, শরয়ী জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে তারা প্রবীণ পূর্বসূরী উলামায়ে কিরামের উপর নির্ভর করেছেন। তাবেঈগণ এ ব্যাপারে সাহাবায়ে কিরামের উপর নির্ভর করেছেন আর তাবে তাবেঈগণ নির্ভর করেছেন তাবেঈগণের ওপর। এভাবেই প্রত্যেক যুগের উলামায়ে কিরাম তাদের পূর্বসূরী দিশারীদের উপর নির্ভর করেছেন। যৌক্তিকভাবেও তাদের ন্যায়পরায়ণতা প্রমাণিত। কেননা শরয়ী জ্ঞানের উৎস নকল (কুরআন-হাদীস) ও ইস্তিম্বাত (তথা কুরআন-সুন্নাহর আলোকে মাসআলা উৎসারণ)। আর নকল (বা অনুলিখন) তখনই সম্ভব, যখন প্রত্যেক শ্রেণী তাদের নিকটবর্তী পূর্বপুরুষদের থেকে বিষয়টি চয়ন করবেন। ইস্তিম্বাতেও পূর্ববর্তী বা প্রবীণদের মাযহাব জানা জরুরী, যাতে তাদের অভিমতের সীমানা থেকে বেরিয়ে ঐক্য বিদীর্ণ না হয়ে যায়। কাজেই সেসব অভিমত জানা এবং পূর্ববর্তীদের থেকে সাহায্য নেওয়া প্রয়োজন। অন্যান্য ইলম, শাস্ত্র, গুণাবলি ও পেশারও একই অবস্থা। নাহব, ছরফ, কবিত্ব, কাব্যচর্চা, কামারী, রাজের কাজ ও পেইন্টিং সবকিছু তখনই অর্জিত হতে পারে, যখন সেসব বিদ্যার উস্তাদ এবং এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গের সংশ্রব গ্রহণ করা হবে। এগুলো ছাড়াই দক্ষতা অর্জন হয়ে যাচ্ছে– এমনটি খুব কম দেখা যায়। অবশ্য যৌক্তিকভাবে এমনটি সম্ভব। কিন্তু বাস্তবে হয় না।

যখন চূড়ান্ত হয়ে গেল, প্রবীণদের অভিমত ও জ্ঞান-গবেষণার উপর নির্ভর করা জরুরী, তখন সেই অভিমতগুলোও বিশুদ্ধ সনদে বর্ণিত এবং প্রসিদ্ধ কিতাবাদিতে সংকলিত থাকাও জরুরী হয়ে গেল। সেসবের উপর এমন আলোচনা-পর্যালোচনা হতে হবে, যেন তাতে রাজেহ (প্রাধান্যপ্রাপ্ত) ও মারজুহ (যার উপর প্রাধান্য দেওয়া হল) এবং আম-খাছ তথা বিশেষ-অবিশেষের মধ্যকার পার্থক্য নির্ণয় সহজ হয়। যেখানে ইতলাক বা (শর্তমুক্ত হওয়া) পাওয়া যায়, সেখানে জানতে হবে– এতে মুকাইয়াদ (বা শর্তযুক্ত বিষয়টি) কী? বিভিন্ন অভিমতের মাঝে ইতোমধ্যে সমন্বয় সাধন করা হয়েছে। হুকুমসমূহের ইল্লত ও কারণ সম্পর্কে লেখালেখি হয়েছে। অন্যথায়

এমন সব মাযহাব ও ইজতিহাদের উপর নির্ভর করা শুদ্ধ হবে না। সেই পূর্বযুগগুলোতে এমন কোনও ফিকহী মাযহাব নেই, যার মধ্যে এসব গুণ ও বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় এবং এসব শর্ত উক্ত চার মাযহাব ছাড়া পূর্ণ হয়।'

এভাবে শাহ সাহেব ইজতিহাদ ও তাকলীদের মাঝে সেই মিতাচার ও সাম্যনীতি রক্ষা করেছেন, যা শরীয়তের উদ্দেশ্য, মানবীয় বৈশিষ্ট্য এবং ঘটনাবহুল পৃথিবীর সঙ্গে পুরোপুরি সামঞ্জস্যশীল। তারা তাকলীদের সঙ্গে শর্ত জুড়ে দিয়েছেন– এ ব্যাপারে মেধা-মনন পরিস্কার এবং নিয়ত পরিশুদ্ধ হতে হবে। কেননা লক্ষ্য তো শরীয়ত প্রণেতার অনুকরণ এবং কুরআন-সুন্নাহর আনুগত্য। আর আমরা যাকে মাধ্যম বানাচ্ছি, তিনি কুরআন-সুন্নাহর আলেম এবং ইসলামী শরীয়তের একজন পথপ্রদর্শক ও ব্যাখ্যাতা মাত্র। যখন নিশ্চিত হয়ে যাবে যে, আসল ব্যাপার ভিন্ন। সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হুকুম আরেকটি, তখন একজন ঈমানদারের জন্য আরেকটি রূপরেখা গ্রহণ করতে কখনও সংশয় বা দ্বিধাদ্বন্দ্ব হবে না। মানসিকভাবে সেজন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে। চাই সে অবস্থা-সুযোগ বহুদিনেই হোক। আল্লাহ তা'আলা বলেন–

فلا و ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فى انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما.

'তোমাদের প্রতিপালকের শপথ! মানুষ যাবৎ না তাদের পারস্পরিক বিবাদে তোমাকে মীমাংসাকারী বিচারক না বানাবে আর এরপর তুমি যে ফায়সালা করবে, সে সম্পর্কে নিজের মনে কোনও বক্রতা বা সংকীর্ণতা না পাবে বরং সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে, ততক্ষণ পর্যন্ত তারা মুমিন (পূর্ণাঙ্গভাবে) হবে না।' (সূরা নিসা : ৬৫)

প্রত্যেক যুগের ইজতিহাদের প্রয়োজনীয়তা

শাহ সাহেব মাযহার চতুষ্টয়ের বৈশিষ্ট্যাবলি এবং মুহাদ্দিস ফকীহগণের খেদমত ও তাদের মর্যাদার পূর্ণ স্বীকৃতি দেন। এই ফিকহ ও হাদীসের ভাণ্ডারকে তিনি সাব্যস্ত করেন অতি মূল্যবান ও কল্যাণকর রত্ন হিসেবে। এর থেকে বৈরিতা ও অমুখাপেক্ষিতাকে মনে করেন বিরাট ক্ষতি ও বঞ্চনার কারণ। অধিকন্তু তিনি বলেন, ইজতিহাদ (তার শর্তাবলি, জরুরী নীতিমালা ও সতর্কতাসহ) প্রত্যেক যুগের প্রয়োজনীয়তা, মানব জীবন, সভ্যতা-সংস্কৃতি ও সমাজের পট পরিবর্তন, উন্নতি-অগ্রগতির যোগ্যতা, মানবীয় প্রয়োজনাদি, নানা ঘটনাপ্রবাহ ও পরিবর্তনের যথারীতি স্বভাবগত চাহিদা, ইসলামী শরীয়তের প্রশস্ততা, এটি 'মিন জানিবিল্লাহ' তথা আল্লাহর পক্ষ থেকে হওয়া

এবং কিয়ামত পর্যন্ত মানবজাতির দিকনির্দেশনা দান ও সমাজের জায়েয চাহিদাগুলো পূরণের যোগ্যতার অধিকারী হওয়ার জন্য প্রয়োজন রয়েছে, যার বহিঃপ্রকাশ ও প্রমাণ দান প্রত্যেক যুগে জরুরী; শরীয়তের ধারক-বাহকদের উপর ফরয কর্তব্য। 'মুস্তফা' -এর ভূমিকায় তিনি লিখেন, 'ইজতিহাদ প্রত্যেক যুগে ফরযে কিফায়া। এখানে ইজতিহাদ দ্বারা উদ্দেশ্য বিশেষ ইজতিহাদ/স্বতন্ত্র ইজতিহাদ নয়। যেমন ছিল ইমাম শাফিঈ (র) এর ইজতিহাদ। যিনি জরাহ ও তাদীল (সমালোচনা), ভাষাজ্ঞান ইত্যাদিতে অন্য কারও মুখাপেক্ষী ছিলেন না। এভাবে তিনি তার মুজতাহিদসুলভ জ্ঞান-বুদ্ধিতে (তার সকল শাখায়) অপরের অনুসারী ছিলেন না। মূল উদ্দেশ্য প্রয়োজনীয় ইজতিহাদ। আর তা হচ্ছে, শরঈ আহকামগুলোকে তার বিস্তারিত দলীল-প্রমাণের মাধ্যমে জানা এবং মুজতাহিদগণের নিয়মানুসারে শাখা-মাসআলা উৎসারণ ও আহকাম বিন্যাস করা; চাই তা কোনও মাযহাব প্রণেতার দিকনির্দেশনায় ও তত্ত্বাবধানে হোক।'

আমরা যে বলি, এ যুগে ইজতিহাদ ফরয অর্থাৎ অনিবার্য। (আর এটি গবেষক আহলে ইলমদের ঐকমত্যপূর্ণ মাসআলা)। এর কারণ হচ্ছে, মাসআলা অসংখ্য। যার সীমাবদ্ধতা অসম্ভব। সে সবের ব্যাপারে আল্লাহর হুকুম জানা ওয়াজিব। আর লেখা ও সংকলনে যতটুকু এসেছে, তা অপর্যাপ্ত। এসবের ব্যাপারেও যথেষ্ট মতবিরোধ আছে। সেগুলো সমাধান করা দলীল-প্রমাণের শরণাপন্ন হওয়া ছাড়া সম্ভব নয়। আইম্মায়ে মাসায়েল থেকে যেসব রিওয়ায়েত বর্ণিত আছে, তার সিংহভাগেই বিচ্ছিন্নতা আছে। মন সেসবের উপর প্রশান্তির সাথে নির্ভর করতে পারে না। কাজেই সেগুলোকে ইজতিহাদের নীতিমালায় যাচাই করা ও গবেষণা করা ছাড়া তা আমলযোগ্য হতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার দর্পণে ইসলামী শরীয়তের মজবুত ও প্রামাণ্য ব্যাখ্যা এবং হাদীসের তত্ত্ব-মর্মের পর্দা উন্মোচন

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার বৈশিষ্ট্য

শাহ সাহেবের সবচেয়ে আলোড়ন সৃষ্টিকারী গ্রন্থ ও জ্ঞানগত কৃতিত্ব 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা'। যার মধ্যে ইসলামী শরীয়তের এমন এক মজবুত, সামগ্রিক ও প্রামাণ্য চিত্র পেশ করা হয়েছে, যেখানে আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, আখলাক-চরিত্র, সামাজিকতা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনীতি ও ইহসান (অনুগ্রহ-দান) কে এমন এক যোগসূত্র ও সঠিক সামঞ্জস্যের সঙ্গে পেশ করা হয়েছে, মনে হয় যেন তা একই মালার মুক্তা ও একই শিকলের অসংখ্য কড়া। তাতে আসল ও শাখা-প্রশাখা, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও উপায়-উপকরণ এবং সার্বক্ষণিক ও সাময়িকের পার্থক্য দৃষ্টির আড়াল হতে পারে না। এ তো সেসব রচনাবলি ও গবেষণাকর্মের পুরোনো দুর্বলতা, যা কোনও বাড়াবাড়ি ও অন্যায়, বে-ইনসাফী প্রত্যাখ্যান কিংবা কোনও আবেগ-আগ্রহ নিয়ে রচিত হয়েছে। এই যোগসূত্রতা ও সামঞ্জস্যের কারণ (শাহ সাহেবের জন্মগত মানসিক ও চিন্তাগত সুস্থতা ও মিতাচার ব্যতিত) তার হাদীস শাস্ত্রের গভীর ও ব্যাপক অধ্যয়ন এবং সেই বিশেষ মানসিকতা ও আকর্ষণ, যা হাদীস ও সীরাতের নিমগ্নতা কিংবা নববী মেজায ও আদর্শের সঙ্গে সামঞ্জস্যশীল কোনও 'আলেমে রব্বানী' (বুযুর্গ আলেম)-এর সংস্পর্শ ও তরবিয়ত-তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয়। ইসলামের এই মজবুত ও পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা, যা হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগার পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় পরিলক্ষিত হয়, তা খুব কম ধর্মীয় বই-পুস্তক ও রচনাবলিতেই দৃষ্টিগোচর হবে। এভাবে হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা সেই যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের যুগে এক নতুন ইলমে কালাম হয়ে গেছে, যার মধ্যে রয়েছে হকপন্থী ও সুস্থ মনের মানুষের জন্য (যার শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অন্তদৃষ্টিও কিছুটা আছে) প্রশান্তি ও স্বস্তির পর্যাপ্ত খোরাক। আমার জানামতে কোনও মাযহাবের সমর্থনে এবং তার প্রজ্ঞাপূর্ণ ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণে (আমাদের পরিজ্ঞাত ভাষায়) এই মানের গ্রন্থ রচনা করা হয়নি। আর রচিত হয়ে থাকলেও বর্তমান সময়ে তা শিক্ষাজগতের সামনে নেই।

বারো হিজরী শতকের সামান্য পরেই ভারতবর্ষ এবং গোটা মুসলিম বিশ্বে বিভিন্ন শিক্ষা-সাংস্কৃতিক ও জ্ঞান-গবেষণামূলক নানা কারণে এক বিশেষ ধরনের 'দর্শন ও যুক্তিবিদ্যা' -এর যে যুগ শুরু হতে যাচ্ছিল এবং শরীয়তের আহকামের তত্ত্বাবলি ও উপকারিতা অনুসন্ধানের যে গণজোয়ার সৃষ্টি হচ্ছিল, সে কারণে অনেক মেধা-মনন বিভ্রান্ত হওয়া এবং বহু কলম বিপথে চালিত হওয়ার জন্য প্রস্তুত ছিল। বিশেষতঃ হাদীস ও সুন্নাহ (বিশেষ কারণে) নানা আপত্তি-অভিযোগ ও সংশয়-সন্দেহের সবচেয়ে বেশি লক্ষ্যস্থলে পরিণত হচ্ছিল। এসব নতুন চাহিদার কারণে সঠিকভাবে সে ব্যক্তিই কর্তব্য পালন করতে পারত, যিনি কুরআন-সুন্নাহ, দর্শন ও হিকমত শাস্ত্র, কালাম শাস্ত্র, চারিত্রিক জ্ঞান, জীববিদ্যা, (সমকালীন গণ্ডিতে) ব্যবস্থাপনা, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে জ্ঞাত। সেই সাথে ইহসান ও আত্মশুদ্ধির রত্ন ও বাস্তবতা সম্পর্কে শুধু জ্ঞাতই নয় বরং এক্ষেত্রে ইজতিহাদের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হবেন। চাহিদা ছিল, সে যুগ শুরু হওয়ার পূর্বে হিজরী বারো শতকের ইমামের কলমে এমন গ্রন্থ রচিত হয়ে যাবে, যা এই প্রয়োজনীয়তা এমন পর্যাপ্তভাবে পূর্ণ করবে, যা এরূপ কোনও মানুষের কলম দ্বারাই সম্ভব, যিনি একজন মানুষ মাত্র। না তিনি নিষ্পাপ; না তার জ্ঞান প্রত্যেক যুগ, স্থান ও শাস্ত্রসমূহের উপর পরিব্যাপ্ত। তার উপর সমকালের (ন্যূনতম পর্যায়ে) স্পর্শ এবং সেই শিক্ষাব্যবস্থা ও তরবিয়তের প্রভাবও আছে, যেখানে তিনি বেড়ে উঠেছেন। অধিকন্তু তাকে মূলতঃ কুরআনিক শিক্ষাকেন্দ্র, হাদীস ও সুন্নাহর বিদ্যাপীঠের বরকত ও সংশ্রবপ্রাপ্ত এবং মুখপাত্র বলেই পরিলক্ষিত হয়।

শাহ সাহেব উক্ত গ্রন্থ রচনার উৎসাহ-প্রেরণার কারণ সম্পর্কে লিখেন, 'উলূমে হাদীসের মধ্যে সবচেয়ে জটিল, সূক্ষ্ম ও গভীর, উঁচু ও নতুন শাস্ত্র হল, দীনের তত্ত্ব-রহস্যের সেই জ্ঞান, যাতে আহকাম ও বিধি-নিষেধের হিকমত, তার শ্রেষ্ঠত্ব ও বিশেষ বিশেষ আমলগুলোর সূক্ষ্মতা ও তত্ত্ব বর্ণনা করা হবে। যার মাধ্যমে মানুষ শরীয়তের আনীত বিষয়গুলোর ব্যাপারে অন্ত দৃষ্টি সম্পন্ন হয়ে যায় এবং ভুল-ভ্রান্তি থেকে নিরাপদ থাকে।

বিষয়বস্তুর কমনীয়তা

ধর্মীয় গভীরতা ও শরয়ী আহকামের রহস্য, উপকারিতাসমূহ, কারণ ও ইল্লতগুলো বর্ণনা করার বিষয়টি অত্যন্ত সূক্ষ্ম। সামান্য অসতর্কতা-পক্ষপাতিত্ব, বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গির প্রাধান্য কিংবা যুগের প্রভাবে পাঠকবর্গের মেধা-মনন আসমানী শরীয়ত ও নববী শিক্ষার সেই ফলক-যেখানে মূল লক্ষ্য বলা হয়েছে আল্লাহর সন্তুষ্টি, নৈকট্য ও পারলৌকিক মুক্তি,

সেখান থেকে নেমে এসে বস্তুবাদী জীবনোপকরণগুলোর সুব্যবস্থা ও সাংস্কৃতিক কল্যাণ কিংবা রাজনৈতিক স্বার্থ হাসিলের ফাঁদে পড়ে যায়। আর চেষ্টা-সংগ্রামের পূর্ণ ক্রমধারা থেকে ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির প্রাণ হয়ত সম্পূর্ণরূপে বেরিয়ে যায় অথবা অত্যন্ত দুর্বল ও আহত হয়ে যায়। উদাহরণস্বরূপ নামাযের রহস্য ও উপকারিতা প্রসঙ্গে বলা যায়, তা এক ধরনের সামরিক প্যারেড। এর দ্বারা শৃঙ্খলা, আমীরের আনুগত্য ও ইসলামী শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য পাওয়া যায়। রোযা সুস্থতার জন্য ফলপ্রসূ পদ্ধতি। যাকাত ধনাঢ্যদের উপর গরীব-অসহায়দের প্রাপ্য ট্যাক্স। হজ্জ একটি আন্তর্জাতিক ইসলামী কনফারেন্স। যেখানে জাতীয় স্বার্থে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে চিন্তা-ভাবনা ও পরামর্শ করা হয়।

সেসব সমস্যা-সংকটে অবস্থার প্রেক্ষিতে (যেগুলো সম্ভাবনা ও আশঙ্কা থেকে অগ্রসর হয়ে ঘটনাবলি ও বাস্তব দৃষ্টান্তের স্থান দখল করে নিয়েছে) এ বিষয়ে সঠিকভাবে সে আলেমই দায়িত্ব পালন করতে পারেন, যার হাতে থাকবে দীন ও শরীয়তের আসল সংবিধান, যিনি আল্লাহর শরীয়ত অবতরণ এবং নবী-রাসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্য সম্পর্কে হবেন সম্যক অবগত। যার শিরা-উপশিরায় বিস্তৃত থাকবে ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির প্রাণ। যার চিন্তাধারা ও জ্ঞানগত উন্নতি হবে কুরআন-সুন্নাহ, ঈমান ও হিসাব প্রস্তুতির পরিবেশে এবং তার ছায়াতলে। আর শাহ সাহেব (র) ছিলেন (যেমনটি তার জীবনকর্ম থেকে জানা যায়) এই স্পর্শকাতর জটিল বিষয়ে কলম ধরার জন্য উচ্চ মাপের ব্যক্তিত্ব।

পৃথক সংকলনের প্রয়োজনীয়তা এবং প্রবীণ আলেমদের প্রাথমিক চেষ্টা

শাহ সাহেব (র) এ বিষয়ে প্রবীণদের সংক্ষিপ্ত চেষ্টা-সাধনার বর্ণনা দিয়ে লিখেন– 'পূর্বসূরীগণ সেসব উপকারিতার পর্দা উন্মোচন করেছেন, শরয়ী অধ্যায়গুলোতে যার প্রতি লক্ষ্য রাখা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকগণ কতিপয় অতি মূল্যবান তত্ত্বও বর্ণনা করেছেন। কিন্তু তার পরিমাণ এতটুকু যে, আজ এ বিষয়ের সমালোচনা ঐক্য বিনষ্টকারী হয়নি। কেউ এ বিষয়ে স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেনি। এর মূলনীতি ও শাখামূলক বিষয়গুলো কেউ পুরোপুরি বিন্যাস করেননি।'

এ প্রসঙ্গে শাহ সাহেব (র) ইমাম গাযালী (র), আল্লামা খাত্তাবী ও শায়খুল ইসলাম ইযযুদ্দীন ইবনে আবদুস সালাম (র)-এর উদ্ধৃতি দিয়েছেন। যাদের গ্রন্থাবলি ও রচনাবলিতে অল্প অল্প এমন সব বিষয়বস্তু ও ইংগিত পাওয়া যায়, শাহ সাহেব (র) "শরয়ী আহকাম উপকারিতা নির্ভর নয় এবং

আসল ও প্রতিদানের মধ্যে সামঞ্জস্য থাকা তেমন একটা জরুরী নয়।" এই দাবী প্রত্যাখ্যান প্রসঙ্গে সেসব আয়াতে কারীমা ও হাদীসসমূহ্ দ্বারা প্রমাণ পেশ করেছেন, যেগুলোর মধ্যে বিভিন্ন আমল এবং তার পরিণতির মাঝে সম্পৃক্ততার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কোনও কোনও বিধি-বিধানের ইল্লত এবং উপকারিতাও বর্ণনা করা হয়েছে। আবার সেসব হাদীসও উল্লেখ করেছেন, যেগুলো কোনও ইবাদত-বন্দেগী অথবা কোনও আমল শরীয়ত-নির্দেশিত হওয়ার কারণ এবং নিরূপণের রহস্য বর্ণনা করা হয়েছে। আবার কোনও কোনও নিষেধাজ্ঞার সেসব কারণ ও রহস্যের বিভিন্ন উদাহরণও দিয়েছেন, যা হযরত উমর (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরাম থেকে বর্ণিত আছে। আর প্রত্যাখ্যান করেছেন সেসব চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেসবের জবাবও দিয়েছেন, যারা এই জটিল বিষয়ের সংকলনকে অসম্ভব কিংবা নিরর্থক বা অভিনব কাজ বলতেন। তাছাড়া এ বিষয়ে সে সময় পূর্ণ মনোযোগিতা না থাকার কী কারণ ছিল, তারও ব্যাখ্যা দিয়েছেন।

এ শাস্ত্র সংকলনের প্রয়োজনীয়তা ও রহস্য বর্ণনা করতঃ শাহ সাহেব লিখেন, এমন কিছু হাদীস বাহ্যতঃ যেগুলোকে পুরোপুরি কিয়াসবিরোধী মনে হত, কোনও কোনও ফকীহ্ সেগুলোকে অযৌক্তিক বলে প্রত্যাখ্যান করাকে বৈধ জ্ঞান করতেন। এ কারণেও হাদীসসমূহের যৌক্তিকতা প্রমাণ করা জরুরী হয়ে দাঁড়ায়। উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর বিরোধপূর্ণ কর্মপদ্ধতি, কারও কারও যুক্তি ও বিবেক থেকে একেবারে চোখ বন্ধ করে নেওয়া, কারও কারও অলীক ব্যাখ্যা দান এবং এহেন অবস্থায় 'صرف عن الظاهر' (বাহ্যিকতা বিমুখ হওয়া)-এর উপর নির্দ্বিধায় আমল করা, যেখানে হাদীসসমূহ্ যৌক্তিক নীতিমালার পরিপন্থী দেখা যায় এবং এ ব্যাপারে অসংখ্য দলের সীমালঙ্ঘন শাহ্ সাহেবের নিকট এ শাস্ত্রের নতুন সংকলনকে না কেবল বৈধ ও উপকারী সাব্যস্ত করে বরং একে দীনের বিরাট বড় খেদমত এবং সময়ের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন বলেই প্রমাণ করে।

প্রয়োজনীয়তার এই অনুভূতি, বাস্তব অভিজ্ঞতা ও সময়ের চাহিদাগুলো ছাড়া শাহ সাহেব এই মহান কাজের পূর্ণতা দানের জন্য কিছু গাইবী (অদৃশ্য) সুসংবাদ এবং নবুওয়াতের দরবার থেকে এমন একটি ইংগিতও পেয়েছেন— যাতে অনুমিত হয়, দীনের নতুন একটি বৈশিষ্ট্যের ব্যাখ্যা উদ্দেশ্য। শাহ সাহেব (র) বলেন, 'আমি অন্তরে এমন একটি আলোকবর্তিকা পেলাম, যা বরাবরই বৃদ্ধি পেতে থাকে। মক্কা শরীফে অবস্থানকালে আমি একবার ইমাম হাসান ও ইমাম হুসাইন (রা) কে স্বপ্নে দেখলাম। তারা আমাকে কলম দান করলেন আর বললেন, এটা আমাদের নানা রাসূলুল্লাহ (স)-এর কলম।'

শাহ্ সাহেবের শিষ্য ও সঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি স্নেহের ছাত্র তার মামাতো ভাই, শ্যালক, ঘর-বাইরের বন্ধু শায়খ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)-এর সবচেয়ে বেশি আকাঙ্ক্ষা ও পীড়াপীড়ি ছিল এ কাজের পূর্ণতা দানের পেছনে। যিনি শাহ সাহেবের মন-মানস সম্পর্কে সবচেয়ে অভিজ্ঞ, তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও যোগ্যতা সম্পর্কে সর্বাধিক ওয়াকিফহাল ছিলেন। মোটকথা, আল্লাহ্ তা'আলা শাহ সাহেবকে এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ সুসম্পন্ন করার তাওফীক দান করেন আর তার কলম দ্বারা এই অমূল্য গ্রন্থ রচিত হয়ে জ্ঞানী মহলের হাতে পৌঁছে যায়।

ভূমিকা, মৌলিক বিষয়সমূহ, আদেশ দান, পুরস্কার ও শাস্তি

কিতাবের প্রথমভাগে শাহ সাহেব ভূমিকাস্বরূপ সেসব আলোচনা সন্নিবেশিত করেছেন, যার দ্বারা সৃষ্টিকর্তার হেদায়াত, আসমানী শিক্ষা, নবী-রাসূল প্রেরণ ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা প্রতীয়মান হয়। তাতে অত্যন্ত মৌলিক ও ভিত্তিমূলক আলোচনাটি তিনি باب سر التكليف শিরোনামের অধীনে বর্ণনা করেছেন। যেখানে তিনি প্রমাণ করেছেন, 'তাকলীফ বা আদেশ দান' মানবজাতির জন্মগত চাহিদাগুলোর একটি। মানুষ তার যোগ্যতার ভাষায় আবেদন করে– আল্লাহ্ তা'আলা যেন তার উপর এমন জিনিস ওয়াজিব করেন, যা ফিরিশতাসুলভ শক্তিতুল্য। এরপর তার বিনিময়ে যেন সওয়াব দেন। আর তার উপর (তার মধ্যে সুপ্ত) পশুবৃত্তি বা পাশবিকতায় নিমজ্জিত হওয়াকে হারাম করেন এবং তাকে শাস্তি দেন। এ ব্যাপারে শাহ্ সাহেবের প্রাণী জগৎ, উদ্ভিদ এবং মানব জাতির উপর ব্যাপক ও গভীর জ্ঞান-গবেষণার বহিঃপ্রকাশ ঘটে। সাথে সাথে মনস্তত্ত্ব, চিকিৎসা ও বনাজী সম্পর্কে অবগতিও প্রকাশ পায়। শাহ্ সাহেব যৌক্তিকভাবে প্রমাণ করেছেন, মানুষের প্রাণীজগৎ ও উদ্ভিৎজগতের সাথে যে বিশেষ পার্থক্য রয়েছে এবং তার ভেতর যেসব যোগ্যতা ও জন্মগত প্রত্যাশা-চাহিদা সুপ্ত রাখা হয়েছে, তা বস্তুতঃ শরয়ী তাকলীফ (আল্লাহর পক্ষ থেকে বান্দাকে সম্বোধন করে কোনও বিধি-নিষেধ পালনের আদেশ দান) এবং মহান স্রষ্টা আল্লাহ্ তা'আলার হেদায়াত প্রত্যাশা করে। শাহ্ সাহেব একে 'التكفف الحالى' (প্রকৃতির ভাষায় ভিক্ষে চাওয়া ও হাত পাতা) -এর মত উচ্চাঙ্গের শব্দে ব্যক্ত করেছেন। সেসঙ্গে 'التكفف العلمى' (জ্ঞানের ভিক্ষাবৃত্তি) শব্দ বৃদ্ধি করেন।

তাঁর মতে মানুষের মধ্যে (বিবেক-বুদ্ধি ও বাকশক্তি ছাড়াও) আরও দুটি বিষয় রয়েছে। براعة القوة العملية ও زيادة القوة العقلية এতে মানুষের মধ্যে কেবল বিবেকবুদ্ধি ও কর্মশক্তির অস্তিত্বই নয় বরং সেসবের উন্নতি, সাহসিকতা,

পূর্ণতা কামনা, অতৃপ্তিও তার জন্মগত স্বভাব। শাহ সাহেবের মতে ফিরিশতাগণের সৃষ্টি, বড় বড় ঘটনাবলি ও নবী-রাসূল প্রেরণ এরই ফলাফল। প্রকারান্তরে ঐ অনুগ্রহ ও ব্যবস্থাপনার বিস্ময়-কমনীয়তা, যা গোটা মানবজাতির মাঝে ব্যাপৃত। এসব খোদায়িত্ব ও আল্লাহর রহমতের ঝলক। তার মতে ইবাদত-বন্দেগী ও শরীয়ত পরিপালন মানব জাতির এমন এক জাতিগত চাহিদা, যেমন– হিংস্র প্রাণীর গোশত ভক্ষণ, চতুষ্পদ জন্তুর ঘাসে বিচরণ, মৌমাছির স্বীয় নেতা (রাণী) -এর প্রতি আনুগত্য-প্রদর্শন। তবে প্রাণীজগতের জ্ঞান প্রাকৃতিক প্রত্যাদেশের সাথে সম্পৃক্ত, আর মানবীয় জ্ঞান, কাজকর্ম ও জীবিকার্জন দেখা বা অহী কিংবা অনুসরণ-অনুকরণের সাথে সম্পৃক্ত।

এরপর শাহ সাহেব মাজাযাত (প্রতিদান ও শাস্তি) কে শরয়ী তাকলীফের কুদরতী চাহিদা বলেন। তার নিকট এর কারণ চারটি। ১. শ্রেণীগত চাহিদা। ২. উর্ধ্বজগতের প্রভাব। ৩. শরীয়তের চাহিদা। ৪. নবী প্রেরণের ফল ও চাহিদা। আল্লাহ তা'আলার কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা ও সাহায্যের ফায়সালার আবশ্যকীয়তা। তারপর মানুষের মধ্যে নিজের স্বভাব-প্রকৃতিতে পার্থক্যের কারণে চরিত্র, কাজকর্ম ও যোগ্যতার স্তরেও পার্থক্য হয়ে থাকে। এ প্রসঙ্গে শাহ সাহেব মালাকিয়্যাত ও রাহীমিয়্যাত (ফিরিশতাসুলভ ও পশুসুলভ অবস্থা-গুণ)-এর সহাবস্থান, এগুলোর প্রবলতা ও দুর্বলতার সাদৃশ্য আর এগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের প্রকারভেদের (যেগুলোকে তিনি 'আকর্ষণ' ও 'পরিভাষা' শব্দে ব্যক্ত করেন) আটটি রূপ এবং সেগুলোর বৈশিষ্ট্যাবলি বর্ণনা করেছেন। তন্মধ্যে যেগুলো প্রাধান্যপ্রাপ্ত, সেগুলো উল্লেখ করেছেন। এই আলোচনা ও বিশ্লেষণ শাহ সাহেবের ধীশক্তি ও বুদ্ধিমত্তার নিদর্শন এবং কিতাবেরই একটি বৈশিষ্ট্য। এতে মানুষের অবস্থা ও স্বভাব-প্রকৃতি সম্পর্কে তার গভীর জ্ঞান-গবেষণা জানা যায়।

আমলের গুরুত্ব ও তার প্রভাব

শাহ সাহেব আমলের গুরুত্ব, মানবীয় বৈশিষ্ট্য-গুণের উপর তার প্রভাব এবং দুনিয়া-আখেরাতে তার প্রতিক্রিয়ার রূপরেখা বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, একটি সময় এমন আসে, যখন আমলসমূহে (উর্ধ্বজগতের পছন্দ-অপছন্দের কারণে) এমন প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়, যা হয়ে থাকে সেসব তাবীয ও নকশায়, যেগুলো সবিশেষ গঠন-বৈশিষ্ট্যসহ প্রবীণদের থেকে বর্ণিত।

এভাবে বইটির এ প্রারম্ভিক আলোচনা অধ্যয়নকারীদের মেধা-মননকে সামনের সেসব আলোচনার জন্য প্রস্তুত করে দেয়, যার ভিত্তিই হল, মানুষের শ্রেণীগত চাহিদাসমূহ উপলব্ধি করা, শরয়ী তাকলীফের কারণগুলো ও তার

উপর আরোপিত সাজা ও পুরস্কার, খোদায়িত্ব ও রহমতের দাবীসমূহ, আমলসমূহের রূপরেখা এবং সেগুলোর মানুষের সামাজিক পদ্ধতি, মানবজীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ততা এবং সেসব অদৃশ্য আলামত ও জিনিসগুলোর অস্তিত্ব স্বীকার করে নেওয়ার উপর সীমাবদ্ধ।

ইরতিফাকাত বা আশ্রয় গ্রহণ

হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা পাঠ করলে মনে হয়, শাহ সাহেবের দূরদৃষ্টি ও পরিবর্তনশীল অবস্থা-পরিস্থিতিগুলোর গভীর ও বাস্তবদর্শী পর্যবেক্ষণ (আল্লাহর সমর্থনের সাহায্যে) বুঝে নিয়েছিল যে, শীঘ্রই এমন যুগ আসবে, যাতে একদিকে মানুষ শরীয়তের আহকামে বিশেষতঃ হাদীস ও সুন্নাহর শিক্ষা আর নবীজীর পবিত্র বাণীসমূহের রহস্যভেদগুলো বুঝার জন্য সচেষ্ট হবে। এসবের সভ্যতা-সাংস্কৃতিক, সম্মিলিত, সামাজিক ও বাস্তবিক উপকারিতাগুলো জানতে চাইবে। অপরদিকে সে দীন-ধর্ম ও জীবনের মধ্যকার সম্পর্ক উপলব্ধি করবে। ধর্মীয় শিক্ষাদীক্ষা ও আসমানী হেদায়াতকে জীবনের বিস্তৃত পরিমণ্ডল এবং মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক, উপকরণ ও ফলাফলের মধ্যকার সম্পর্কের নিরিখে বুঝা এবং এসবের উপকারিতা উপলব্ধির চেষ্টা করবে।

এজন্য শাহ সাহেব যে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' কে মূলতঃ শরীয়তের রহস্যভেদ এবং হাদীস ও সুন্নাহর যৌক্তিক ব্যাখ্যাস্বরূপ লেখা হয়েছে, সে গ্রন্থখানা 'শরীয়া ব্যবস্থা' থেকে শুরু করার কারণে– যার শুরুভাগে সেসব আদেশ-নিষেধ বর্ণিত হয়েছে, যার মৌলিক সম্পর্ক প্রতিদান ও শাস্তি, পারলৌকিক মুক্তি আর শাহ সাহেবের পরিভাষায় 'مبحث البر والاثم' (পাপ-পুণ্য অধ্যায়) এর সাথে, প্রথমে সেসব আলোচনা দ্বারা শুরু করেছেন, যার সম্পর্ক বিশ্ব চরাচরের সৃষ্টিগত ব্যবস্থা ও মানব জীবনের সাথে। যার অনুসরণে একটি সুস্থ সামাজিক রূপরেখা ও একটি সুস্থ সভ্যতা অস্তিত্ব লাভ করে। শাহ সাহেব এক্ষেত্রে 'ইরতিফাকাত' পরিভাষা ব্যবহার করেছেন। যা আমাদের জানামতে ইতোপূর্বে মুসলমান দার্শনিক-মুতাকাল্লিম, প্রজ্ঞাবান চিন্তাবিদ ও আলেম শ্রেণী (অন্তত এতটুকু সুস্পষ্ট ও ধারাবাহিকভাবে) ব্যবহার করেননি।

ইরতিফাকাতের গুরুত্ব

ইরতিফাকাত বলে শাহ সাহেবের উদ্দেশ্য, মানুষের পারস্পরিক বৈধ হিতাকাঙ্ক্ষা, সাহায্য-সহযোগিতা, সামাজিক সম্মিলিত কর্মকাণ্ড, ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ নাগরিক জীবন প্রতিষ্ঠার জন্য 'হিতকর ব্যবস্থাপনা'।

এভাবে শাহ সাহেব মানবীয় উৎকর্ষতার ব্যক্তিগত ও সামাজিক উভয় দিক এবং ইহ ও পারলৌকিক উভয় জীবন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। শাহ সাহেবের মতে এই নেযামে তাকবীনী তথা সৃজনশীল ব্যবস্থাপনা কেবল নবীগণের আনীত শরয়ী ব্যবস্থাপনার অনুকূল হওয়াই যথেষ্ট নয় বরং তার জন্য সাহায্য-সহযোগিতাকারী ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের খাদেম হয়ে থাকা উচিৎ। তিনি চরিত্র-সভ্যতার আলেম ও অভিজ্ঞ অর্থনীতিবিদদের মাঝে প্রথমবার চারিত্রিক জ্ঞানের সাথে অর্থনীতি ও জীবিকা নির্বাহ জ্ঞানের গভীর সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। শাহ সাহেবের মতে যখন এই সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তখন অর্থনীতি ও চরিত্র-নৈতিকতা দুটিই চরম মুমূর্ষু অবস্থায় পতিত হয়। যার প্রভাব ধর্ম, চরিত্র, স্থিতিশীল শান্তিপূর্ণ জীবন, মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর পতিত হয়। তার মতে মানুষের সামাজিক অবকাঠামো তখনই একেবারে ধ্বংস হয়ে যায়, যখন কোনও কঠোরতা আরোপের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক সংকটে বাধ্য করা হয়। সে সময় এই মানুষ (যাদের ভেতর আল্লাহ তা'আলা উচ্চস্তরের আত্মিক যোগ্যতা, আধ্যাত্মিক শক্তি ও উন্নতির অপার সম্ভাবনা সুপ্ত রেখেছেন, তারা) এক টুকরো রুটির জন্য গাধা ও বলদের মত বাধ্যগত হয়ে থাকে এবং সব ধরনের উন্নতি-সমৃদ্ধি ও সৌভাগ্য থেকে হয়ে যায় বঞ্চিত।

নাগরিক ও সামাজিক জীবনের গুরুত্ব ও তার রূপরেখা

শাহ সাহেব নাগরিক ও সামাজিক জীবনের পরিচয় (যার কেন্দ্রস্থলকে المدينة -রাজধানী শব্দে ব্যক্ত করে) এমন জ্ঞানগর্ভ ভাষায় পেশ করেন, যার চেয়ে উৎকৃষ্ট ও স্বয়ংসম্পূর্ণ সংজ্ঞা আজ পর্যন্ত (লেখক-দার্শনিকদের মাঝে) করা হয়নি। তিনি باب سياسة المدينة (শহরের রাজনীতি অনুচ্ছেদ) শিরোনামে লিখেছেন– 'শহর বলে আমার উদ্দেশ্য মানুষের সে দল, যাতে কোনও শ্রেণীর ঘনিষ্ঠতা থাকবে এবং তাদের মধ্যে লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানে থাকবে অংশীদারিত্ব। অবশ্য তারা বসবাস করবে বিভিন্ন স্থানে।

তিনি নগর ব্যবস্থা-এর সংজ্ঞায় বলেন, 'নগর ব্যবস্থা' দ্বারা আমার উদ্দেশ্য হল এমন কৌশল, যা এই নাগরিক জীবনের মানুষের মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক সংরক্ষণের পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করে।

অনন্তর তিনি এই সভ্যজীবন বা শহরের সংজ্ঞায় আরেকটু অগ্রসর হয়ে বলেন, 'শহরকে তার অধিবাসী বা নাগরিকদের মাঝে বিদ্যমান পারস্পরিক সম্পর্কের কারণে একক ব্যক্তি মনে করা উচিৎ, যা বিভিন্ন অঞ্চল ও সামাজিক রূপরেখায় গঠিত হয়েছে।'

তার মতে "ইরতিফাক" (মৌলিক অধিকার) দুই প্রকার। ১. প্রাথমিক ও প্রয়োজনীয়। যা গ্রাম্যলোকদেরও আছে। ২. সামাজিক বা উন্নত, যা শহরবাসীর (শহুরে ও সভ্য লোকজনের) রয়েছে। এছাড়া তৃতীয় আরেকটি প্রকারও আছে। সেটি হচ্ছে, রাজনীতি ও ব্যবস্থাপনা। অধিকন্তু এর ফলে চতুর্থ আরেক প্রকার বেরিয়েছে– গণপ্রতিনিধিত্ব। শাহ সাহেব চতুর্থ ইরতিফাকে দেশবাসী (বিভিন্ন রাষ্ট্র ও দূরাঞ্চলগুলো) -এর পারস্পরিক সম্পর্ক রক্ষার উপর জোর দেন। এই সম্পর্ক (বিভিন্ন অঞ্চলের মাঝে) এতই জরুরী, যেমন ছিল একই শহরের নাগরিকদের মাঝে প্রাথমিক ও নির্দিষ্ট অবস্থায়।'

কর্মক্ষেত্র ও জীবিকা নির্বাহের প্রশংসিত ও ঘৃণিত রূপরেখা

ইরতিফাকাত প্রসঙ্গে জীবিকা নির্বাহের উপায় বর্ণনা করতে গিয়ে শাহ সাহেব অস্বাভাবিক ও অনৈতিক জীবনোপকরণ বা জীবিকা নির্বাহের পথগুলো উল্লেখ করতে ভুলেননি। তিনি বলেন, 'অনেকের মন-মানসিকতা এমন হয়ে থাকে, যাদের বৈধ পন্থায় জীবিকা নির্বাহ কঠিন মনে হয়। তখন তারা জীবিকা নির্বাহের এমন সব পথে অগ্রসর হয়, যা নাগরিক ও সামাজিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়ায়। যেমন– চুরি, জুয়া, লুটতরাজ, ভিক্ষাবৃত্তি এবং বেআইনী ও অনৈতিক কাজ-কারবার।'

এই 'ইরতিফাকাত' সম্পর্কিত আলোচনায় শাহ সাহেবের কলম থেকে এমন কিছু তত্ত্বকণিকা বেরিয়ে এসেছে, যার দ্বারা সভ্যতা, সমাজ ও মানবতার উত্থান-পতনের ইতিহাস সম্পর্কে তার গভীর-জ্ঞান-প্রজ্ঞাই প্রমাণ করে। তিনি বলেন, 'যখন মন-মানসে অস্বাভাবিক স্পর্শকাতরতা, ভারসাম্যহীনতা, সীমাতিরিক্ত স্বাদ-আহ্লাদ, বাড়াবাড়ি পর্যায়ের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ও শঙ্কামুক্ত নিরাপত্তা এসে যায়, তখন জীবিকা নির্বাহের স্পর্শকাতর-মসৃণ ও জঘন্য নীচু পথ সৃষ্টি হয় আর প্রত্যেক ব্যক্তি একটি বিশেষ জীবনোপকরণ বা উৎপাদন প্রক্রিয়ার ঠিকাদার হয়ে যায়।'

শাহ সাহেব নাগরিক জীবনের জন্য ক্ষতিকর বিষয়গুলোর মধ্যে আরও উল্লেখ করেছেন, সকল নাগরিকের একই আয়ের পথ বেছে নেয়া। যেমন, সকলেই ব্যবসা শুরু করল, কৃষিকাজ ছেড়ে দিল অথবা যুদ্ধের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহের পথ অবলম্বন করল। তাঁর মতে কৃষি খাদ্যের পর্যায়ে আর কারিগরি, শিল্প, ব্যবসা ও আইন-শৃঙ্খলা লবণের পর্যায়ে। এ প্রসঙ্গেই শাহ সাহেব বিরাট এক তাত্ত্বিক কথা লিখেছেন। বলেছেন, 'এ যুগে দেশ ধ্বংসের বড় দুটি কারণ রয়েছে।

১. বিনা পরিশ্রমে সরকারী তহবিলের উপর বোঝা হওয়া।

২. কৃষক, ব্যবসায়ী, পেশাজীবী ও বিভিন্ন কর্মজীবীদের উপর ভারী ভারী ট্যাক্স চাপিয়ে দেওয়া। শেষাংশে বলেন– আমাদের যুগের লোকদের এই তাত্ত্বিক বাস্তবতা বুঝে নেওয়া এবং সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত।'

সভ্যতা ও সামাজিক বিপর্যয় ও অবক্ষয় সৃষ্টিকারী কারণগুলোর মধ্যে শাহ সাহেব অতিরিক্ত আনন্দ-বিনোদনকেও গণ্য করেন। এতে জীবনোপকরণ ও পরকাল উভয়ই ক্ষতিগ্রস্থ হয়। তন্মধ্যে দাবা খেলায় বিভোর-মত্ততা, শিকারের ব্যাপকতা ও কবুতর পালনকে অন্তর্ভুক্ত করেন। এভাবে চারিত্রিক অপরাধসমূহ ও এমন সব কাজকর্মকে মেনে নেওয়া, সাধারণতঃ যেগুলোকে কোনও সুস্থ-বিবেকবান মানুষ নিজের সত্ত্বার জন্য মেনে নিতে পারে না। সেগুলোকে সভ্যতার জন্য ক্ষতিকর মনে করে। তার মতে এসব কারণে রাজত্বের পতন দেখা দেয়।

সৌভাগ্য ও তার চার উৎস

কিতাবের চতুর্থ অনুচ্ছেদ مبحث السعادة (বা সৌভাগ্যের সোপান) প্রসঙ্গে। তাতে বলা হয়েছে, সৌভাগ্য অর্জন করা মানুষের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। আর তা আত্মশুদ্ধি এবং পশুবৃত্তিকে ফিরিশতাসুলভ শক্তির অনুগত বানানোর দ্বারা অর্জিত হয়।

শাহ্ সাহেবের মতে সৌভাগ্য লাভের মূল উৎস চারটি। যার জন্য নবী-রাসূল প্রেরিত হয়েছেন। আর এর ব্যাখ্যা আসমানী শরীয়ত। এটা বস্তুতঃ ধর্ম ও শরীয়তসমূহের মৌলিক শাখাগুলোর সামগ্রিক শিরোনাম এবং নবী-রাসূল (স) প্রেরণের উদ্দেশ্যসমূহ পূর্ণতা দানের কার্যকরী মাধ্যম।

১. পবিত্রতা (তথা শারীরিক পবিত্রতা, যা মানুষকে আল্লাহর প্রতি মনোনিবেশ ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রস্তুত করে)।
২. আল্লাহর প্রতি মুখাপেক্ষিতা (তথা তাওবা ও অক্ষমতা প্রকাশ, অনুতাপ-অনুশোচনা, আল্লাহর প্রতি মনযোগিতা এবং বিনয়-নম্রতা)।
৩. সততা, উন্নত চরিত্র ও উঁচু স্তরের কাজকর্ম।
৪. দীনদারী ও ন্যায়নিষ্ঠা (তথা এমন আত্মিক যোগ্যতা, যার প্রতিক্রিয়ায় দেশ ও জাতির শৃঙ্খলা সহজেই প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়)।

এভাবে শাহ সাহেব মানুষের ব্যক্তিত্ব গঠন, আল্লাহর সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং একটি সুস্থ ও পরস্পর সহমর্মী সমাজ বিনির্মাণের মূলনীতিগুলো তুলে ধরেছেন, যা আসমানী শরীয়ত ও নবী-রাসূল প্রেরণের অন্যতম উদ্দেশ্য।

এরপর উক্ত চারটি গুণ অর্জনের পদ্ধতি বর্ণনা করেছেন। অনন্তর সেসব প্রতিবন্ধকতা উল্লেখ করেছেন, যেগুলো স্বভাবজাত আদর্শ বিকাশের ক্ষেত্রে অন্তরায়। তন্মধ্যে তিন প্রকার গ্রহণ করেছেন।

১. হিজাবুত তবা (তথা মানবিক ও মানসিক চাহিদাগুলোর প্রাধান্য)।
২. হিজাবুর্ রুসম (বাইরের অবস্থা ও পরিবেশের ক্ষতিকর প্রভাব)।
৩. হিজাবু সূইল মা'রিফা (তথা ভ্রান্ত শিক্ষা-দীক্ষা ও প্রচলিত ভ্রান্ত আকীদাসমূহের প্রভাব)।

এরপর তিনি এসবের প্রতিকার বর্ণনা করেছেন।

আকীদা ও ইবাদত

কিতাবের মূখ্য বিষয় শুরু হয়েছে পঞ্চম অধ্যায় مبحث البر والاثم তথা পাপ-পুণ্য অনুচ্ছেদ থেকে। বস্তুতঃ কিতাবের আলোচ্য বিষয় ও উদ্দেশ্য এটিই। 'بر' বা পুণ্যের মূলনীতি হিসেবে শাহ সাহেব সর্বপ্রথম তাওহীদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। কারণ, এর উপরই মুখাপেক্ষিতা, অক্ষমতা, অনুতাপ-অনুযোগ প্রকাশ সীমাবদ্ধ, যা সৌভাগ্য লাভের সবচেয়ে বড় উপায়। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব তাওহীদের চারটি স্তর বর্ণনা করেছেন। সাথে সাথে আরবের মুশরিকদের শিরকের বাস্তবতা উন্মোচন করেছেন। তাওহীদের পর আল্লাহ পাকের গুণাবলির উপর ঈমান আনয়ন, ভাগ্যলিপির উপর ঈমান আনয়ন এবং আল্লাহর নিদর্শনাবলির প্রতি সম্মান প্রদর্শন (যেমন- শাহ সাহেবের মতে কুরআন, কা'বা, নবী এবং নামায সবচেয়ে সুস্পষ্ট ও গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন)। এর আলোচনা করতঃ শাহ সাহেব ইবাদত-আনুগত্য ও ফরযসমূহের প্রসঙ্গ শুরু করেছেন এবং সংক্ষেপে অযু-গোসলের রহস্য, নামাযের রহস্য, যাকাতের রহস্য, রোযার রহস্য ও হজ্জের রহস্য সম্পর্কে বিবরণ দিয়েছেন। এসব আলোচনা যদিও মৌলিক ও সংক্ষিপ্ত, তথাপি তাতে এমন এমন তত্ত্ব ও তথ্য রয়েছে, যা অন্য কোথাও পাওয়া কঠিন।

যেমন 'নামাযের রহস্য' অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব লিখেন, ইবাদতের এই পদ্ধতি তিনটি শারীরিক অবস্থা তথা কিয়াম (দণ্ডায়মান হওয়া), রুকু (মাথা অর্ধনমিত করে ঝুঁকে থাকার অবস্থা) ও সিজদা (কপাল মাটিতে মিলানো অবস্থা) এর সমন্বয়। এখানে বড় থেকে ছোট দিকে অবনমিত হওয়ার স্থলে নিচ থেকে বড় দিকে (কিয়াম থেকে রুকু; রুকু থেকে সিজদার দিকে) উন্নীত হওয়ার নিয়ম রাখা হয়েছে। আর এটাই যুক্তি ও স্বভাবসম্মত। এরপর শাহ সাহেব ইবাদত প্রসঙ্গে আল্লাহ পাকের শ্রেষ্ঠত্ব-মাহাত্ম্য চিন্তাভাবনা, ধ্যান-মগ্নতা ও অব্যাহত যিকির-এর উপর আলোচনা সংক্ষিপ্ত না করার (যা ছিল প্রাচ্যবিদ, দার্শনিক ও হিন্দু সন্ন্যাসীদের রীতি আবার কোনও কোনও লাগামহীন সূফী দরবেশও এ পদ্ধতি অবলম্বন করেছিল) কারণ বর্ণনা করেছেন। বলেছেন, এই চিন্তা-গবেষণা ও ধ্যান-তন্ময়তা সেসব লোকদের

জন্য সম্ভব ও উপকারী ছিল, যাদের মন-মানস সেসবের সাথে সামঞ্জস্য রাখত। তারা এর মাধ্যমে উন্নতি করতে পারত। নামায হচ্ছে চিন্তা-গবেষণা ও কাজ, মানসিক আকর্ষণ ও শারীরিক কর্মব্যস্ততার অবলেহ সমন্বয়। নামায সর্বশ্রেণীর জন্য উপকারী ও বিরাট প্রতিক্রিয়াশীল প্রতিষেধক। কুসংস্কারের বিষবাষ্প (পরিবেশের বিরূপ প্রভাব) থেকে পরিত্রাণ লাভ এবং মন-মানস বিবেকের অনুগত হওয়ার প্রশিক্ষণের জন্য নামায অপেক্ষা বড় কোনও ফলপ্রসূ ও কার্যকরী পদ্ধতি নেই।

রোযা ও হজ্জের সম্পর্ক যতদূর, সে সম্পর্কেও এ আলোচনায় কিছুটা ইংগিত প্রদান করা হয়েছে। কিন্তু কিতাবের দ্বিতীয় খণ্ডে এসবের উদ্দেশ্য, রহস্য ও তত্ত্বাবলি সম্পর্কে যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তার উপমা ইতোপূর্বে কোনও গ্রন্থে দৃষ্টিগোচর হয়নি। তার বিবরণ সামনে যথাস্থানে দেওয়া হবে।

জাতীয় রাজনীতি ও নবী-রাসূলের প্রয়োজনীয়তা

ষষ্ঠ অধ্যায়ের শিরোনাম مبحث السياسات الملية বা জাতীয় রাজনীতি প্রসঙ্গ। এটি কিতাবের অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ। এর প্রথম অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব অত্যন্ত বিচক্ষণতা, দূরদর্শীতা ও বাস্তবধর্মীতার সাথে বলেছেন, মানবজাতির জন্য সত্যের পথপ্রদর্শক ও জাতির সংস্কারক-সংগঠক (তথা নবী-রাসূল)-এর প্রয়োজন কেন হয়েছে? এর জন্য তাদের সুস্থ স্বভাবজাত জ্ঞান ও সাধারণ বিবেক-বুদ্ধি কেন যথেষ্ট ছিল না? এরপর তিনি এ দলের গুণাবলি ও প্রয়োজনীয় শর্তাবলী সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। আরও লিখেছেন, তিনি কখন, কিভাবে আপন উদ্দেশ্য পূর্ণ করতে পারেন এবং তাতে সাফল্য লাভ করতে পারেন। এ অনুচ্ছেদটি কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে বর্ণিত, 'নবুওয়াত প্রমাণের সাধারণ আলোচনা' থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম মনে হয়। এতে সুস্থ জ্ঞান-বিবেককে আশ্বস্ত করার মত এমন উপাদান রয়েছে, যা কালাম শাস্ত্র ও আকাইদের কিতাবাদিতে সাধারণতঃ পাওয়া যায় না। এ আলোচনায় নবুওয়াতের পদমর্যাদা ও এর বৈশিষ্ট্যাবলী সম্পর্কে যে অনুচ্ছেদ রয়েছে, তা শাহ সাহেবের শরীয়তের প্রাণ ও নবুওয়াতের মেজাযের বাস্তবতা সম্পর্কে বিজ্ঞতা, মানবাত্মা সম্পর্কে গভীর অধ্যয়ন এবং চরিত্রের আভ্যন্তরীণ উৎস সম্পর্কে সচেতনতার প্রতি ইংগিত করে। এ অধ্যায়ে নবী-রাসূল প্রেরণের কারণসমূহের ব্যাপারে স্ববিস্তার আলোচনা করা হয়েছে।

সমসাময়িক দূতপ্রেরণ

শাহ সাহেব লিখেন, সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ নবুওয়াত বা রিসালাত সেই নবী-রাসূলেরই হয়ে থাকে, যার প্রেরণ 'মাকরূন' (বা যৌথ) হয় অর্থাৎ তার

নবুওয়াতির সাথে গোটা এক জাতি তাবলীগ ও দাওয়াতের জন্য আদিষ্ট এবং তার সংস্পর্শের বরকতে তৈরী হয়ে অন্যান্য মানুষের শিক্ষা-দীক্ষার মাধ্যম হয়। নবীর আবির্ভাব হয় মৌলিকভাবে (আর একে নবুওয়াত বলা হয়); উম্মতের স্থলাভিষিক্ততা ও খেদমতের দায়িত্ব অর্পণ হয় মধ্যস্থতা ও প্রতিনিধিত্ব হিসেবে। রাসূলে কারীম (স) -এর আবির্ভাব এমনই পূর্ণাঙ্গ ছিল, যার সাথে পুরো এক উম্মতকে তাঁর নবুওয়াতের পদমর্যাদার খেদমত ও প্রসারের জন্য হাতিয়ার ও অস্ত্র বানানো হয়েছে। আর এর জন্য দূতপ্রেরণ ও সমার্থক শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। কুরআনে কারীমে ইরশাদ হয়েছে–

كنتم خير أمة اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر.

'যত উম্মত সৃষ্টি হয়েছে, তন্মধ্যে তোমরা শ্রেষ্ঠ উম্মত। তোমাদেরকে মানুষের জন্য বের করা হয়েছে, যাতে তোমরা লোকদেরকে সৎকাজের আদেশ কর আর নিষেধ কর অসৎকাজ থেকে। (সূরা আলে ইমরান : ১১০)

হাদীস শরীফে (বা'ছাত) 'দূত প্রেরণ' শব্দই ব্যবহার করা হয়েছে। রাসূলুল্লাহ (স) সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বলেন,

فانما بعثتم ميسرين ولم تعثوا معسرين.

'তোমাদেরকে সহজতার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে; কঠিনতার জন্য সৃষ্টি করা হয়নি।'

এ অনুচ্ছেদের বিশেষ প্রতিপাদ্য হচ্ছে সেটি, যাতে নবী-রাসূলগণের সীরাত (জীবন চরিত), তাদের আগ্রহ-চেতনা, মন-মানসিকতা, তাদের দাওয়াত-তাবলীগের পদ্ধতি, তাদের সম্বোধন ভঙ্গি ও শিক্ষাধারা বর্ণনা করা হয়েছে। এতে শাহ সাহেবের দূরদর্শীতা, বিচক্ষণতা, নবুওয়াত ও আম্বিয়ায়ে কিরামের বৈশিষ্ট্যাবলির গভীর অধ্যয়ন এবং কুরআনে কারীমের অগাধ ব্যুৎপত্তি অনুমান করা যায়।

ইরান ও রোম সভ্যতায় চারিত্রিক ও ঈমানী মূল্যবোধের বিভৎসতা এবং মানবতার দুরাবস্থা

বর্বরতার যুগ যদিও আরবের সাথে সুনির্দিষ্ট ছিল না। তা ছিল বিশ্বময় বিস্তৃত আকীদাগত, চারিত্রিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক এক বিপর্যয়, যা গোটা পৃথিবীকে গ্রাস করে নিয়েছিল। কিন্তু ইরানী ও রোমীরা ছিল এর নেতা ও আসল কর্ণধার। তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতিকেই সে সময় পৃথিবীতে মানদণ্ড মনে করা হত। তারই (অন্ধ) অনুকরণ করা হত সর্বত্র। তাদের দেশগুলো, কেন্দ্রীয় শহর ও সমাজ সবচেয়ে বেশি এর আক্রমণে ছিল।

এই অবস্থা-পরিস্থিতির যে চিত্র শাহ সাহেব অংকণ করেছেন এবং এর যেসব কারণ তিনি উল্লেখ করেছেন, এর উত্তম চিত্র প্রাচীন জীবনচরিত ও ইতিহাসের কোনও কিতাবে এবং ইতিহাসে-দর্শন ও সামাজিক জ্ঞানের কোনও পণ্ডিতের কলমে রচিত হতে দেখা যায়নি। এখানে এসে শাহ সাহেবের কলম তার পূর্ণ কৃতিত্ব দেখিয়েছে। তার লিখনী শক্তি ও রচনাশৈলী আপন উৎকর্ষতায় দেখা যায়। সে আলোচনা নিম্নে উদ্ধৃত করা হচ্ছে।

এর দ্বারা সাহেবের ইতিহাসের গভীর জ্ঞান, বাস্তবতা পর্যন্ত পৌঁছার যোগ্যতা ও প্রকৃত অবস্থাচিত্র পর্যবেক্ষণের আল্লাহর প্রদত্ত যোগ্যতা উপলব্ধি করা যায়। শাহ সাহেব লিখেন, 'শত শত বছর ধরে স্বাধীন রাজত্ব করতে করতে আর দুনিয়ার নানা স্বাদ আস্বাদনে নিমজ্জিত থেকে, পরকালকে একেবারে ভুলে যাওয়া ও শয়তানের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণাধীন হয়ে যাওয়ার কারণে ইরানী ও রোমীরা জীবনের সহজতা-অনাড়ম্বরতা ও সুখ-শান্তির উপকরণে বিরাট জটিলতা ও স্পর্শকাতর চিন্তাধারা সৃষ্টি করে নিয়েছিল। এতে সর্বপ্রকার উন্নতি ও উৎকৃষ্টতায় একে অন্যের থেকে অগ্রগামী হওয়া এবং গর্ব করার চেষ্টা চালাত। পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চল থেকে এসব কেন্দ্রস্থলে বড় বড় শিল্পী-কারিগর, পেশাজীবী ও দক্ষ লোকজন এসে জড়ো হয়েছিল। যারা আরাম-আয়েশ ও সুখ-শান্তির উপকরণে জটিলতা সৃষ্টি করত। নতুন নতুন সাজগোজ-প্রসাধন বের করত। তার উপর তাৎক্ষণিক আমল শুরু হয়ে যেত। তাতে যথারীতি পরিবর্ধন ও চমক থাকত। এসব নিয়ে গর্বও করা হত। জীবনযাত্রা এত উঁচু হয়ে গিয়েছিল যে, আমীরদের কারও জন্য এক লাখ দিরহামের কমমূল্যের পাগড়ী বাঁধা ও মুকুট পরা ছিল চরম দোষণীয়। কারও নিকট যদি বিলাসবহুল প্রাসাদ, ফোয়ারা, গোসলখানা, বাগ-বাগিচা, আয়েশী খাবার, প্রশিক্ষিত জীবজন্তু, সুদর্শন যুবক ও গোলাম না থাকত, খাবারে বিলাসিতা ও আড়ম্বরতা আর পোশাক-পরিচ্ছদে বৈচিত্র্য না হত, তাহলে সম-সাময়িকদের মাঝে তার কোনও সম্মান থাকত না। এ বিবরণ অনেক দীর্ঘ। স্বদেশের রাজা-বাদশাদের যে অবস্থা দেখছেন, তা এর সঙ্গে অনুমান করতে পারেন।

এসব বিলাসিতা তাদের জীবন ও সমাজের (অবিচ্ছেদ্য) অংশ হয়ে গিয়েছিল। তাদের মনের ভেতর এমনভাবে বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে, কোনভাবেই বের করা যেত না। এ কারণে এমন এক দূরারোগ্য ব্যাধি সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল, যা তাদের সভ্যতায় ছড়িয়ে পড়েছিল। এ ছিল এক মহাবিপদ। যার থেকে সাধারণ-অসাধারণ, ধনী-দরিদ্র কেউই নিরাপদ ছিল না। প্রত্যেক নাগরিকের উপর এই বিলাসিতা ও আমীরানা জীবনধারা এমনভাবে চেপে বসেছিল, যা তাদেরকে (সহজ) জীবন থেকে অক্ষম করে

দিয়েছিল। তাদের মাথার উপর প্রতিনিয়ত উদ্বেগ-উৎকণ্ঠার এক পাহাড় পড়ে থাকত।

কথা হল, এই বিলাসিতা বিপুল পরিমাণ অর্থ ব্যয় করা ছাড়া লাভ করা যেত না আর এই অর্থ ও অঢেল ধন-সম্পদ কৃষক, ব্যবসায়ী ও অন্যান্য পেশাজীবীদের উপর কর ও ট্যাক্স বাড়ানো এবং তাদের উপর শোষণ চালানো ছাড়া হস্তগত হত না। তারা যদি এসব দাবী পূরণ করতে অস্বীকৃতি জানাত, তবে তাদের সঙ্গে যুদ্ধ করা হত। তাদেরকে নানা ধরনের শাস্তি দেওয়া হত। আর তারা যদি মেনে নিত, তবে তাদেরকে খাটানো হত গাধা ও বলদের মত। যাদের দ্বারা পানি উত্তোলন ও কৃষিকাজে সাহায্য নেওয়া হত। কেবল সেবার জন্যই তাদের লালন-পালন করা হত। তারা কখনও কষ্ট-পরিশ্রম থেকে নিস্কৃতি পেত না।

এই কষ্টপূর্ণ ও পশুসুলভ (মানবেতর) জীবনের পরিণামে কখনও তাদের মাথা উঠানো এবং পরকালীন সৌভাগ্য লাভের কল্পনা করারও সময়-সুযোগ হত না। অনেক সময় গোটা দেশেও এমন কোনও মানব সন্তান পাওয়া যেত না, যার মধ্যে নিজ ধর্মের চিন্তা-ভাবনা ও গুরুত্ব রয়েছে।'

আরও কিছু উপকারী কথা

এর পরের বিষয়বস্তু 'ধর্মের আসল/উৎস একটি।' আর শরীয়তের রাস্তায় বিশেষ কোনও যুগ ও জাতির পক্ষাবলম্বনের কারণে মতবিরোধ হয়। তারপর এর ব্যাখ্যা দিয়ে বলেন, দীন-ধর্মের একটি উৎস হওয়া সত্ত্বেও সেসব পথে কেন জবাবদিহি করা হয়?

সহজিকরণ, উৎসাহ প্রদান ও ভীতি প্রদর্শনের তত্ত্ব ইত্যাদির অধীন বিষয়গুলো আলোচনার পর শাহ্ সাহেব এমন ধর্মের প্রয়োজনীয়তা প্রমাণ করেছেন, যা সকল ধর্ম বিলুপ্তকারী হবে। তাছাড়া ধর্মকে কিভাবে বিকৃতির ছোবল থেকে রক্ষা করা যায়, বিকৃতি-পরিবর্তন কোন কোন পথে ও ছিদ্র দিয়ে ধর্মে অনুপ্রবেশ করে, কী কী রূপে তা বিকশিত হয়? আর কী কী রঙ-রূপ ধারণ করে? শরীয়ত সেসবের প্রতিকার হিসেবে কী পন্থা অবলম্বন করেছে এবং কী কী ব্যবস্থা নিয়েছে? এরপর বিশদভাবে বর্ণনা করেছেন, নবুওয়াতের যুগে জাহেলী যুগের কী অবস্থা ছিল, রাসূলে কারীম (স) যার সংস্কার করেছেন।

হাদীস ও সুন্নাহর মর্যাদা এবং এ ব্যাপারে উম্মতের কর্মপদ্ধতি

সপ্তম অধ্যায়ের শিরোনাম 'مبحث الشرائع من حديث النبى صلى الله عليه وسلم' তথা হাদীসে নববী সম্পর্কে শরয়ী দৃষ্টিভঙ্গি। এতে সেসব

আলোচনা স্থান পেয়েছে, যেগুলো সরাসরি হাদীস ও সুন্নাহর জ্ঞান, তা থেকে মাসায়েল উৎসারণ, উলূমে নববী (স)-এর শ্রেণীভাগ, নবী (স) থেকে শরীয়ত আহরণের অবস্থা-পদ্ধতি, হাদীস গ্রন্থাবলির শ্রেণীবিন্যাস, কুরআন-সুন্নাহর আলোকে শরয়ী উদ্দেশ্যসমূহ উদঘাটনের পদ্ধতি ও বিভিন্ন হাদীসের মাঝে সমন্বয় সাধন কিংবা প্রাধান্য দানের বিষয়। এ প্রসঙ্গে অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার সাথে শাহ সাহেব শাখামূলক আলোচনায় সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈদের মতানৈক্যের কারণগুলো বর্ণনা করেন। সেসবের উদাহরণ উদ্ধৃত করার পর ফকীহগণের মতাদর্শে মতবিরোধ এবং হাদীস বিশারদ ও চিন্তাবিদগণের মতানৈক্যের পার্থক্য বর্ণনা করেন। চতুর্থ হিজরী শতকের পূর্বাপর মানুষের মাসআলা জিজ্ঞাসা ও এর উপর আমল করা এবং এক্ষেত্রে বিশেষ-অবিশেষ মহলের দৃষ্টিভঙ্গি কী ছিল? এসবের সবিস্তর ব্যাখ্যা দেন, যা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ও গভীর আলোচনা সমৃদ্ধ এবং যা কালাম কিংবা উসূলে ফিকহ শাস্ত্রের কোনও কিতাবে পাওয়া দুষ্কর।

ফরযসমূহ ও রুকনগুলোর তত্ত্ব-রহস্য

শাহ সাহেব আকাইদ থেকে নিয়ে ইবাদত-আনুগত্য, লেনদেন, আচার-অনুষ্ঠান, ইহসান-অনুগ্রহ, আত্মশুদ্ধি, আইন-শৃঙ্খলা, অবস্থা-পরিস্থিতি, জীবনোপকরণ বা জীবিকা নির্বাহের পদ্ধতি, দান ও সাহায্য-সহযোগিতা, পরিবার ব্যবস্থা, খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা, যুদ্ধ-জিহাদ, পানাহারের শিষ্ঠাচার, বন্ধুত্ব নীতি, সামাজিকতা আর সবশেষে ফিতান, পরকালীন ঘটনাপ্রবাহ ও কিয়ামতের আলামত পর্যন্ত হাদীসের আলোকে আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে সীরাতে নববী (স)-এর সারমর্মও পেশ করেছেন। সেসব অনুচ্ছেদের উদ্দেশ্য-রহস্য বর্ণনা করতে গিয়ে লিখেছেন, এসব বিষয়ের সম্পর্ক জীবন, সভ্যতা, চরিত্র-নৈতিকতা থেকে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বস্তুতঃ এটিই কিতাবের কেন্দ্রীয় বা মূল প্রতিপাদ্য। শাহ সাহেবের ইচ্ছা ছিল, হাদীস শিক্ষাদান যেন সেসব তত্ত্ব-রহস্যের আলোকে আমল ও চরিত্র-নৈতিকতা, সভ্যতা-সামাজিকতা, মানবীয় সাফল্য ও পারস্পরিক সম্পর্কের সঙ্গে হয়। যেন সেসবের পূর্ণ প্রভাব পড়ে জীবন, আমল-আখলাক, সভ্যতা ও সামাজিকতার ওপর। সামঞ্জস্য বিধান হয় ঐতিহ্যগত ও যৌক্তিক দলীল-প্রমাণের মাঝে, বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষে এসবের উপর আপত্তি উত্থাপন, হাদীস ও সুন্নাতের মূল্য, উপকারিতা এবং তার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা হ্রাস করা (যাকে শাহ সাহেবের দূরদর্শী ও সূক্ষ্মদৃষ্টি দেখে নিয়েছিল) ও মানসিক বিক্ষিপ্ত সৃষ্টির সুযোগ না হয়। আমলী আরকান ও চার

ফরয সম্পর্কে যা কিছু লিখেছেন, তা এরই অংশ এবং 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' -এর একটি বৈশিষ্ট্য। এখানে উদাহরণস্বরূপ কেবল রোযা ও হজ্জের উদ্দেশ্যভেদ এবং এগুলোর ইসলামী ও শরয়ী রূপরেখার সূক্ষ্মতার উপর শাহ সাহেব যা কিছু লিখেছেন, তা উল্লেখ করা হচ্ছে। রোযা সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তার পরিমাণ ও রোযার সংখ্যা নির্ধারণের রহস্য (যা ইসলামী শরীয়তের সাথে নির্দিষ্ট) এবং এর শরয়ী বিধানের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে তিনি লিখেন, 'রোযার মধ্যে (সময়, সংখ্যা ও পরিমাণের) স্বেচ্ছাধিকার দিয়ে দেওয়া হলে অপব্যাখ্যা ও পলায়নের পথ উন্মুক্ত হয়ে যাবে। রুদ্ধ হয়ে যাবে সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ-এর পথ। বিরাট উদাসীনতার শিকার হয়ে যাবে ইসলামের এই সবচেয়ে বড় আনুগত্য-ইবাদত।

এরপর রোযার পরিমাণ ও সংখ্যা প্রসঙ্গে লিখেন, 'এর নির্ধারণেরও প্রয়োজন ছিল। যেন তাতে বাড়াবাড়ি ও উদাসীনতার না থাকে। নতুবা কেউ কেউ এর উপর এতটুকু আমল করত, যার দ্বারা কোনও কল্যাণ হত না আর না কোন প্রভাব পড়ত। আবার কেউ কেউ এত বাড়াবাড়ি ও অতিরঞ্জন করত যে, তার অক্ষমতা ও দুর্বলতার সীমায় পৌঁছে যেত। আর সে হয়ে যেত মৃতপ্রায়/অর্ধমৃত। মূলতঃ রোযা একটি প্রতিষেধক। প্রবৃত্তির বিষ নামানোর জন্য যার ব্যবস্থা করা হয়েছে। কাজেই এতে প্রয়োজনীয়তার প্রতি লক্ষ্য রাখা বাঞ্ছনীয়।

তারপর রোযার উভয় শ্রেণী (তথা প্রথমতঃ সেই রোযা, যাতে পানাহারসহ রোযার পরিপন্থী সকল প্রকার কাজকর্ম থেকে পুরোপুরি বেঁচে থাকতে হয়। দ্বিতীয়তঃ সেই রোযা যাতে কতিপয় বিষয় থেকে বাঁচতে হয়। আর কতিপয় বিষয় থেকে বাঁচতে হয় না -এর মাঝে তুলনা করে প্রথমোক্ত রোযাকে প্রাধান্য দেন। সাথে সাথে অভিজ্ঞতা, জ্ঞানের গভীরতা ও আধ্যাত্মিকতার আলোকে এর শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতঃ লিখেন, 'আহার কমানোর দুটি পদ্ধতি। এক. খাবারের পরিমাণ হ্রাস করে দেওয়া। দুই. আহারের মধ্যে এত দীর্ঘ বিলম্ব রাখা, যাতে উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়ে যায়। শরীয়তে এই দ্বিতীয় পদ্ধতি অবলম্বন করা হয়েছে। কেননা এতে ক্ষুৎ-পিপাসার সঠিক ধারণা জন্মে। পাশবিক কামনায় আঘাত লাগে। বাস্তবেই এতে হ্রাস পেতে দেখা যায়। পক্ষান্তরে প্রথম পদ্ধতিতে মানুষের উপর বিশেষ কোনও প্রভাব পড়ার পূর্বে তা সৃষ্টি হয় না। কেননা যথারীতি পানাহার চালিয়ে যাওয়া হয়। দ্বিতীয়তঃ প্রথম পদ্ধতির জন্য কোনও সাধারণ নীতিমালা প্রণয়ন করা কঠিন। কারণ, মানুষের অবস্থা বিভিন্ন ধরনের। কেউ এক পোয়া খায় আবার কেউ

খায় আধা সের। সুতরাং এ পদ্ধতি নির্ধারণের ফলে যদি একজনের কল্যাণ হয়, তবে অন্যজনের ক্ষতি হবে।'

তিনি আরও বলেন, এই সুনির্দিষ্টতা ও সময়ের বাধ্যবাধকতায় ভারসাম্য থাকা প্রয়োজন। তিনি লিখেন, 'এটাও জরুরী ছিল যে, এ সময় যেন অসাধ্য সাধন বা সাধ্যাতীত হুকুম পালনে আক্রান্তকারী না হয়। যেমন, তিনদিন তিনরাত। কেননা এটা শরীয়তের আলোচ্য বিষয়ের বাইরে এবং তার উদ্দেশ্য পরিপন্থী। সাধারণতঃ এর উপর আমল করাও অসম্ভব।'

হজ্জ প্রসঙ্গে তার আলোচনা সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত। তিনি সেখানে লিখেন–

'(হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে) সেই উত্তরাধিকার সত্ত্ব সংরক্ষণও আছে, যা আমাদের জাতির পিতা ইবরাহীম (আ) ও আমাদের নেতা ইসমাইল (আ) আমাদের জন্য রেখে গেছেন। কারণ, এ দুজনই মিল্লাতে হানীফার (পবিত্র উম্মাহর) ইমাম এবং আরবে তার প্রতিষ্ঠাতা ও স্থপতি বলা যেতে পারে। রাসূলে কারীম (স)-এর শুভাগমনও এজন্য হয়েছিল, যেন মিল্লাতে হানীফা তার মাধ্যমে পৃথিবীতে জয়লাভ করে এবং তার ঝাণ্ডা সমুন্নত হয়।'

আল্লাহ তা'আলা বলেন,

ملة أبيكم ابراهيم

তোমাদের পিতা ইবরাহীম (আ) এর ধর্ম।

কাজেই এই ধর্মের ইমামের (দিশারীর) পক্ষ থেকে যেসব বিষয় আমরা উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়েছি, যেমন– স্বভাবজাত গুণাবলি, হজ্জব্রত পালন ইত্যাদি আমাদের সংরক্ষণ করা জরুরী। রাসূলুল্লাহ (স) ইরশাদ করেন–

قفوا على مشاعركم فانكم على أرث من إرث أبيكم.

'আপন নিদর্শন/স্থানসমূহে অবস্থান করো। কেননা তোমরা আপন পিতার একই উত্তরাধিকার সত্ত্বের উত্তরাধিকারী।'

এছাড়া তিনি আরেকটি তত্ত্ব-দর্শন বর্ণনা করে লিখেন– 'যেভাবে সরকারের কিছুদিন পরপর একটি গণজরিপ ও পরিদর্শনের প্রয়োজন হয়, যেন সে জানাতে পারে– কে কৃতজ্ঞ? কে বিদ্রোহী? কে কর্তব্য পরায়ণ, দায়িত্বশীল আর কে কামচোরা প্রতারক? সাথে সাথে এর মাধ্যমে তার সততা, বিশ্বস্ততার সুখ্যাতি ও সুনাম হয়। তার শ্রমিক, কর্মচারী-কর্মকর্তা ও নাগরিকগণ একে অন্যের সাথে পরিচিত হয়। অনুরূপভাবে জাতির জন্য হজ্জ প্রয়োজন। যাতে মুনাফিক-অমুনাফিক (কপট-অকপট)-এর মাঝে পার্থক্য

নির্ণয় হয়। আল্লাহ পাকের নির্দিষ্ট দিনে আল্লাহ্ পাকের দরবারে আবেগ-উচ্ছাস নিয়ে দলে দলে লোকজন হাজির হয়। মানুষ পরস্পর পরিচয় লাভ করে। প্রত্যেক ব্যক্তি যা তার কাছে নেই, সে বিষয়ে অন্যের থেকে উপকার লাভ করে। কেননা উত্তমতর ও সুন্দর আনন্দদায়ক বিষয়গুলো সাধারণতঃ সংস্পর্শ ও বন্ধুত্বের মাধ্যমে এবং একে অপরকে দেখে-শুনেই অর্জিত হয়।'

তিনি আরও লিখেন, 'হজ্জ যেহেতু এমন একটি মুহূর্ত, যেখানে সকলেই সমবেত হয়, তাই এটি বিভ্রান্তিকর রুসম-রেওয়াজ থেকে নিরাপত্তা লাভের জন্য খুবই ফলপ্রসূ। জাতির মধ্যে তাঁদের ইমাম ও দিশারীদের স্মৃতিচারণ এবং মনের মণিকোঠায় তাদের আনুগত্য ও অনুকরণের আগ্রহ সৃষ্টি করার জন্য কোনও কিছু এ পর্যায়ের নেই, যা তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারে।'

অন্যত্র লিখেন, 'হজ্জের উদ্দেশ্যসমূহের মধ্যে আরেকটি বিষয় হল, যার জন্য সরকার-প্রশাসন কোনও প্রদর্শনী কিংবা সরকারী উৎসবের আয়োজন করে। আর তা দেখার জন্য কাছে-দূরের সকল স্থান থেকে মানুষ এসে সমবেত হয়। মিলিত হয় একে অন্যের সাথে। নিজের শাসন ব্যবস্থা ও জাতির শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে অবগতি লাভ করে। তার পবিত্র ও পুণ্যময় স্থানগুলোর সম্মান রক্ষা করে। অনুরূপভাবে হজ্জ মুসলমানদের একটি জাতীয় প্রদর্শনী কিংবা রাজকীয় অনুষ্ঠান। যেখানে তাদের প্রভাব-প্রতিপত্তি প্রকাশ পায়। তাদের শক্তিসমূহ ঐক্যবদ্ধ হয়। তাদের জাতির নাম উজ্জল হয়।' আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন– '

وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا.

'আর (স্মরণ করো সে সময়ের কথা) আমি কাবাকে করেছি মানুষের জন্য প্রত্যাবর্তনস্থল ও নিরাপদ শান্তির স্থান।'

কিতাবের স্বয়ংসম্পূর্ণতা

এ গ্রন্থের আরেকটি বৈশিষ্ট্য হল, ফিক্হ, হাদীস, আকাইদ, ইবাদত, লেনদেন ও আচার-অনুষ্ঠানের সাথে সম্পৃক্ত অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো ব্যতিত এতে পরিবারব্যবস্থা, পারিবারিক শৃঙ্খলা বিধান, খেলাফত (গণপ্রতিনিধিত্ব) ও বিচারব্যবস্থা, অর্থনৈতিক অধ্যায় এবং সাহচর্যের শিষ্টাচারসমূহের আলোচনাও রয়েছে। যা চরিত্র, নৈতিকতা, সামাজিকতা, সভ্যতা ও জীবনোপায়ের সাথে সম্পৃক্ত। সাধারণতঃ কোনও ফিকহী কিংবা দর্শন শাস্ত্রের বই-পুস্তকে এসবের আশা করা যায় না।

অনুগ্রহ ও আত্মশুদ্ধি

অধিকন্তু এ গ্রন্থে শাহ সাহেব হাদীস ও জীবন-চরিতের আলোকে বিন্যস্ত অনুগ্রহ ও আত্মশুদ্ধির এমন নীতিমালা উপস্থাপন করেছেন, যার উপর চলে মানুষ আল্লাহর নৈকট্যের উঁচু থেকে উঁচু সিঁড়িগুলো, বেলায়েতের স্তরসমূহ, মর্যাদার আসন ও অবস্থাসমূহ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। ইহ্সান সম্পর্কিত এই অনুচ্ছেদটি কিতাবের ৬৬-১০১ পৃষ্ঠা পর্যন্ত বিস্তৃত। এ অনুচ্ছেদে শাহ সাহেব সেসব উপাদানসমূহ নিয়ে আলোকপাত করেছেন, যেগুলো বিভিন্ন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে শুধুমাত্র হাজির করা, ইচ্ছা-সংকল্প এবং শারীরিক ও বাতেনী অবস্থাসমূহের সঙ্গে আত্মার প্রতি মনোনিবেশ করার উপর জোর দিয়েছেন। সেসঙ্গে ক্রমাগত দুঃখ-ব্যথা ও রোগ-ব্যাধির চিকিৎসা, ঐ শরীয়তসম্মত পন্থা, ফরয, ইবাদত ও যিকির-আযকারের মাধ্যমে নির্বাচন করেছেন। সাথে সাথে বদঅভ্যাস ও নীচুতার প্রতিষেধক চিকিৎসা এবং উত্তম-উন্নত স্বভাব-চরিত্র অর্জনের পন্থাও শরীয়ত ও সুন্নাতের সুস্পষ্ট নির্দেশনায় বর্ণনা করেছেন।

এ অধ্যায়ে তিনি বর্ণিত যিকিরসমূহ, শরীয়তসম্মত দু'আসমূহ এবং ইস্তিগফার-তাওবার গুরুত্বপূর্ণ শব্দাবলীও সন্নিবেশিত করেছেন। কার্যকরী মাকবূল দু'আর পদ্ধতি এবং তার শর্তাবলীও বর্ণনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে মানবিক চাহিদা, জীবনের প্রয়োজনাদি ও ধর্মীয় আমলগুলো নিয়তের পরিচ্ছন্নতার সাথে আদায় করার প্রতি তাগিদ করেছেন। এসবের প্রভাব-ক্রিয়া ও অবস্থাবলি ব্যতিক্রম হওয়ার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি লিখেছেন, 'ভালোভাবে হৃদয়াঙ্গম করে নিন, নিয়ত হচ্ছে (সবকিছুর) প্রাণ-আত্মা। আর ইবাদত হল দেহ। আত্মা ছাড়া শরীর/দেহ বেঁচে থাকা সম্ভব নয়। আত্মা দেহ থেকে পৃথক হয়ে যাওয়ার পরও জীবিত থাকে। কিন্তু জীবন/বেঁচে থাকার প্রতিক্রিয়া দেহ ছাড়া পুরোপুরিভাবে প্রকাশ পায় না। কাজেই আল্লাহ তা'আলা বলেন,

'لن ينال الله لحمها و لا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم.

'আল্লাহ পাকের এসব কুরবানীর (পশুর) গোশত ও রক্ত পৌঁছে না। সেখানে পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া বা আল্লাহভীরুতা। (সূরা হজ্জ : ৩৭)

আর রাসূলে কারীম (স) ইরশাদ করেছেন,

إنما الاعمال بالنيات

'সকল আমলের গ্রহণযোগ্যতা নিয়তের উপর নির্ভরশীল।'

অনন্তর শাহ সাহেব নিম্নোক্ত ভাষায় 'নিয়ত'-এর সংজ্ঞা পেশ করেন। 'নিয়ত বলে আমাদের উদ্দেশ্য তাসদীক তথা সত্যায়ন ও বিশ্বাসের সেই মানসিক অবস্থা, যা তাকে সে কাজের প্রতি উদ্বুদ্ধ করে। অর্থাৎ আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নবী-রাসূলগণের মাধ্যমে আনুগত্যকারীদের প্রতিদান আর অবাধ্যদেরকে শাস্তি দেওয়ার যে অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন, তা এই হুকুম পালন এবং এই পাপাচার থেকে বেঁচে থাকার কারণ —এ বিশ্বাস করা।'

আলোচ্য অনুচ্ছেদের শেষে শাহ সাহেব উন্নত চরিত্র গঠন, সৃষ্টিজীবের অধিকার সংরক্ষণ ও উত্তম আচার-ব্যবহার সম্পর্কে কয়েকটি হাদীস বাছাই করে লিখে দিয়েছেন। যার উপর আমল করলে মানুষ কল্যাণ ও পবিত্রতার উচ্চস্তরে পৌঁছে যেতে পারে। এরপর সেসব মর্যাদা ও অবস্থার বর্ণনা দিয়েছেন, যেগুলো উপকার ও পবিত্রতার সুফলে অর্জিত হয়; যা বাতেনী নূর, অন্তরের সচেতনতা, আত্মার পরিচ্ছন্নতা, মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ও উর্ধ্বজগতের সাহায্য-সমর্থনের সুফল।

জিহাদ

উক্ত গ্রন্থে জিহাদ সম্পর্কেও একটি অনুচ্ছেদ রয়েছে। আর তা শাহ সাহেব এক তথ্যবহুল ও বিস্ময়কর শব্দমালা দিয়ে শুরু করেছেন। যা সকল ধর্ম ও জাতির পুরো ইতিহাস, মানব সৃষ্টির উদ্দেশ্যসমূহ ও সমগ্র বিশ্বজগতের স্রষ্টার উদ্দিষ্ট ব্যবস্থার উপর অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন কোনও জ্ঞানী পণ্ডিতই লিখতে পারেন। শাহ সাহেব লিখেন, 'স্মরণ রাখুন! সার্বিকভাবে পূর্ণাঙ্গ শরীয়ত এবং তার স্বয়ংসম্পূর্ণ সংবিধান হচ্ছে সেই শরীয়ত, যাতে জিহাদের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।'

মোটকথা, এই গ্রন্থখানা তার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, তাত্ত্বিকতা, দীন ও শরীয়তের ব্যাপক-প্রশস্ত, মজবুত নিবিড় ব্যাখ্যা এবং কিতাবের পৃষ্ঠায় পৃষ্ঠায় ছড়ানো ছিটানো শত-সহস্র অমূল্য তথ্য-কণিকা ও সূক্ষ্ম গবেষণার ভিত্তিতে ইসলামী গ্রন্থশালায় বহুদিক থেকে সম্পূর্ণ স্বকীয় বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। এক কথায় 'كم ترك الاول للاخر' 'কত কী রেখে গেলেন প্রবীণগণ পরবর্তীদের জন্য'-এর উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। মাওলানা শিবলী (র) তার বিখ্যাত 'ইলমুল কালাম' গ্রন্থে লিখেছেন— 'আল্লামা ইবনে তাইমিয়া (র) ও ইবনে রুশদ -এর পরে বরং স্বয়ং তাদের যুগেই মুসলমানদের মধ্যে চিন্তাধারার যে অধঃপতন শুরু হয়, সেই দৃষ্টিকোণ থেকে এ আশা ছিল না যে, ফের কোনও (মুসলিম) চিন্ত াবিদ, সূক্ষ্মদর্শী ও গবেষক জন্ম নিবে। কিন্তু মহান কুদরতের আপন যাদুর শক্তি দেখানোর ইচ্ছা ছিল। শেষ যুগে যখন ইসলামের প্রাণ ওষ্ঠাগত, ঠিক তখন শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মত ব্যক্তিত্বের শুভজন্ম হয়, যার

বিচক্ষণতার সামনে ইমাম গাযালী (র), রাযী (র) ইবনে রুশদ (প্রমুখ ব্যক্তিত্ব) -এর কৃতিত্বও ম্লান হয়ে যায়।

আরেকটু সামনে লিখেন– 'শাহ সাহেব ইলমে কালাম বা দর্শন শাস্ত্রের শিরোনামে কোনও রচনা লিখেননি। সে দৃষ্টিকোণ থেকে তাকে দার্শনিকদের কাতারে শামিল করা বাহ্যতঃ উচিত নয়। কিন্তু তার রচিত 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা', যাতে তিনি শরীয়তের তত্ত্বভেদ বর্ণনা করেছেন, বস্তুতঃ কালাম শাস্ত্রের উজ্জ্বল প্রাণ।'

সমকালীন চিন্তাবিদ মাওলানা আবদুল হক হক্কানী (তাফসীরে হাক্কানী ও আকাইদুল ইসলাম রচয়িতা) হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা -এর অনুবাদ গ্রন্থ নি'মাতুল্লাহিস সাবিগাহ -এর ভূমিকায় লিখেন– 'যে শাস্ত্রে এই গ্রন্থনা, তাঁর (শাহ সাহেব) পূর্বে একত্রে কেউ তা সন্নিবেশিত করেনি। এ শাস্ত্রের বিষয়বস্তু শরীয়তে মুহাম্মদী (স)-এর ব্যবস্থাপনা 'من حيث المصلحة و المفيدة' (উপকারী সংস্কারের দৃষ্টিকোণে)। আর তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে, মানুষ যেন স্পষ্ট জেনে নেয়- আল্লাহ্ ও তার রাসূল (স)-এর হুকুম-আহকামের মধ্যে কোন সংকীর্ণতা নেই; আর না তা সুস্থ স্বভাবরীতির পরিপন্থী। যেন সেগুলোর উপর মানুষের পরিপূর্ণ আস্থা জন্মে। সেগুলোকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল জ্ঞান করে মন সেদিকে আকৃষ্ট হয়। কোনও সন্দিগ্ধতার অজুহাতে মনের মধ্যে সংশয় না জাগে। এর সংজ্ঞা হচ্ছে- এটি সেই ইলম, যাতে ধর্মীয় আইন-কানুন ও শরয়ী আহকামের সূক্ষ্মতা-প্রজ্ঞা জানা যায় আর এর উৎস তার সকল ইলম।'

অষ্টম অধ্যায়

খেলাফত ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা
খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের প্রমাণ এবং তাদের অনুগ্রহ-দান
"ইযালাতুল খফা' 'আন খিলাফাতিল খুলাফা" -এর দর্পণে

'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থের গুরুত্ব ও স্বকীয়তা

'ইযালাতুল খফা' শাহ সাহেবের (হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা-এর পর) আরেকটি বিশ্বনন্দিত রচনা এবং নিজের বহুমুখী অসংখ্য বৈশিষ্ট্যের বিচারে আপন বিষয়বস্তুতে একক ও স্বতন্ত্র কিতাব। পূর্ণ কিতাবটিই উন্মত্ততা ও উদ্যম সৃষ্টিকারী জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও আনন্দদায়ক তথ্যকণিকায় ভরা। বিশেষতঃ শাহ সাহেবের কুরআনে কারীমের উপর দীর্ঘ গবেষণা, বিস্ময়কর সম্পৃক্ততা, তার গভীর ও তীক্ষ্ম জ্ঞান, আয়াতের ইংগিত ও সূক্ষ্মতার প্রতি আত্মিক আকর্ষণ, মাসআলা উদঘাটনের গভীরতা এবং মেধার প্রখরতা ইত্যাদির এমন দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যার ফলে একজন ইনসাফপ্রিয় ও সুস্থ বিবেকবান মানুষ নিজে নিজেই এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারে যে, এই জ্ঞান-প্রজ্ঞা নিছক পুঁথিগত ও অর্জিত নয়। এ কিতাবের লেখক সমকালের প্রচলিত পাঠ্য বই, তাফসীর গ্রন্থাবলি, উসূলে ফিকহ ও কালাম শাস্ত্রের সাজানো রঙিন মোড়ক এবং সেসবের বর্জ্য ও উচ্ছিষ্ট চয়নকারী নন; তার এই জ্ঞান-প্রজ্ঞার সম্পর্ক মহান স্রষ্টার দান ও খোদায়ী অনুকম্পার সঙ্গে। স্বয়ং শাহ সাহেবের কলম থেকেই অনিচ্ছায় গ্রন্থের সূচনাতেই বেরিয়ে এসেছে নিম্নোক্ত শব্দমালা।

'ঘটনা হল, আল্লাহর তাওফীকের নূর এই অধম বান্দার অন্তরে (স্বতন্ত্র একটি শাস্ত্রকে) এত ব্যাপক-বিস্তৃত আকারে প্রক্ষিপ্ত করেছে যে, অকাট্যভাবে প্রশান্তির সাথে তার জ্ঞান হয়ে গেছে- সেসব মহাপুরুষগণের (খোলাফায়ে রাশেদীনের) খিলাফতের সত্যতা ও প্রমাণ উসূলে দীন তথা ধর্মীয় উৎসসমূহের মধ্য থেকে একটি বিশাল উৎস। যতক্ষণ পর্যন্ত এই উৎসকে পূর্ণ দৃঢ়তার সাথে স্বীকার না করা হবে, শরীয়তের কোনও মাসআলাই অকাট্য সাব্যস্ত হবে না।'

যেসব সুযোগ্য উলামায়ে কিরামের বিভিন্ন মাসআলায় শাহ সাহেবের সঙ্গে মতবিরোধ ছিল এবং যাদের যুক্তিবিদ্যায় ব্যাপৃতি বরং নেতৃত্বের আসন অর্জিত ছিল– এ কিতাবের প্রতি যখন তাদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, তখন তারা লেখকের জ্ঞানের গভীরতা ও অতলদর্শিতার মূল্য না দিয়ে পারেননি।

মাওলানা মহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারহতী 'اليانع الجنى' রচয়িতা বলেন, 'আমি আপন উস্তাদ মাওলানা ফযলে হক খায়রাবাদী (মৃত্যু ১২৭৮ হি.) কে দেখেছি, একটু সময়-সুযোগ পেলেই কোন না কোন কিতাব মুতালা'আয় ধ্যানমগ্ন ও নিমজ্জিত হয়ে যেতেন। আমরা অভ্যাসের পরিপন্থী তার এই ধ্যানমগ্নতা দেখে বিস্মিত হলাম। কৌতূহল জাগল, এটা কী কিতাব? কার রচিত? তিনি নিজেই বলেন, 'এ কিতাবের লেখক জ্ঞানের এমন অথৈ সমুদ্র, যার কোনও কূল-কিনারা নেই।' জানলাম, এটি শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) বিরচিত 'ইযালাতুল খফা'; যার একটি সংস্করণ হযরতের হাতে।

শেষকালের গৌরব মাওলানা আবুল হাসানাত আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লী (মৃত্যু ১৩০৪ হি.), যার জ্ঞানের গভীরতা, যুগের অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও দূরদর্শিতা প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত– তিনি তার সুপ্রসিদ্ধ 'التعليق الممجد على مؤطا الامام محمد' গ্রন্থে 'ইযালাতুল খফা' র আলোচনা প্রসঙ্গে লিখেন– كتبا عديم النظير فى بابه তথা এটি এমন একটি গ্রন্থ যা তার বিষয়বস্তুতে বিরল ও ভূতপূর্ব।

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খফা'-এর পারস্পরিক সম্পর্ক

'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' রচনার পর, যাতে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ ও সুবিন্যস্ত নেযাম এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, যার ফলে জীবন, সমাজ ও সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের নিবিড়তা ও সম্পৃক্ততা প্রমাণিত হয়। পরিষ্কার হয়ে যায়, ইসলাম নির্দেশিত আকীদা-বিশ্বাস, ইবাদত-বন্দেগী ও সামাজিক জীবনের বিধি-বিধানের উপর যথাযথ আমল করা ব্যতিত কোনও সুস্থ সমাজ, পরিচ্ছন্ন সভ্যতা, ন্যায়ানুগ ও ভারসাম্যপূর্ণ সামাজিকতার অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। এই লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বিশ্লেষণ ও পূর্ণতা দান এবং এই মঞ্জিলের বিজ্ঞচিত ও প্রজ্ঞাপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের সাথে (যাতে অদূর ভবিষ্যতে আগত বৈপ্লবিক যুগের যুক্তিপ্রিয় মন-মানসের প্রশান্তি ও পরিতৃপ্তির খোরাক ছিল) খোদ ইসলামের সমাজব্যবস্থার চাহিদা, বৈশিষ্ট্যাবলি, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও কার্যক্রমের পরিধির ওপর এবং তার বিশ্বব্যাপী ও স্থায়ী, সুস্পষ্ট ও অকাট্য খিলাফতের দপ্তরের উপর সেই ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, ঐতিহ্যগত প্রমাণ ও যৌক্তিকতার সাহায্য, ইতিহাসের সাক্ষ্য এবং কুরআন-হাদীসের আলোকে কলম ধরার খুব বেশি প্রয়োজন ছিল। তাছাড়া সেসব ভুল ধারণা ও পথভ্রষ্টতার পর্দা বিদীর্ণ করারও প্রয়োজন ছিল, যা এক্ষেত্রে প্রাচীনকাল থেকে প্রকাশ্যে ছড়িয়ে পড়েছে এবং সেসবের ভিত্তিতে বিরাট এক ফিরকার আত্মপ্রকাশ ঘটেছে। যে ফিরকা বিশেষতঃ শাহ সাহেবের যুগে ইরানী শক্তির বিজয়ের পরিপ্রেক্ষিতে চিন্তাধারার এমন এক বিক্ষিপ্ততা সৃষ্টি করে দিয়েছে, যার প্রভাব আকীদা-বিশ্বাস ও কাজকর্মের সীমানা পেরিয়ে সরকার ব্যবস্থা এবং ভারতবর্ষে

মুসলমানদের শীর্ষ নেতৃত্বের উপরও পড়েছিল। সন্দিগ্ধ ও এলোমেলো করে দিয়েছিল এদেশের মুসলমানদের ভবিষ্যত।

এর অবস্থান (সেসব লোকের দৃষ্টিতে, যারা এ ধর্মের ইতিহাস তার মৌলিক আকীদাসমূহ ও তার ধর্মের অনুভূতি-জ্ঞান সম্পর্কে অবগত ছিল এবং যারা সরাসরি এর নির্ভরযোগ্য গ্রন্থাবলি ও মৌলিক উৎসের মুতালা'আ করেছিল) নিছক একটি ইজতিহাদী (উদ্ঘাটনমূলক) মতবিরোধ কিংবা শরীয়তের আওতার মধ্যে একটি ক্ষুদ্র ফিরকার মত ছিল না বরং তা ছিল ঐ ধর্মীয় জ্ঞানের সমতূল্য, যার ভিত্তি কুরআন-হাদীস, নবুওয়াতের পদমর্যাদার সম্মান ও খতমে নবুওয়াতের আকীদার ওপর –এর থেকে ভিন্ন একটি স্বতন্ত্র চিন্তাধারা ও ধর্মীয় অনুভূতি। এর কিছুটা ধারণা হতে পারে ইছনা আশারিয়াহ ফিরকার ইমামতের (নেতৃত্বের) আকীদা থেকে। যাদের মতে ইমামত (নেতৃত্ব) নবুওয়াতের সমতুল্য বরং কোনও কোনও ক্ষেত্রে তদপেক্ষা উর্ধ্বে।

শাহ সাহেব উক্ত গ্রন্থ রচনার প্রাথমিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বর্ণনা প্রসঙ্গে লিখেন– 'নগণ্য দীন ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন) বলেন, এ যুগে শী'আ ধর্মমত গ্রহণের বিদ'আত (কুপ্রথা) চালু হয়েছে। সর্বসাধারণের মন-মানসিকতা তাদের সৃষ্ট সংশয়-সন্দেহে গভীরভাবে প্রভাবিত হয়ে পড়েছে। এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোকের মনে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের নিশ্চয়তার ব্যাপারে নানা ধরনের সন্দেহ ও প্রশ্নের সৃষ্টি হয়ে গেছে।'

শাহ সাহেবের দৃষ্টি এই সন্দিগ্ধকরণ ফিৎনার বাহ্যিক মোড়কের উপরই ছিল না; এর পরতে পরতে যে গভীর ষড়যন্ত্র কাজ করছিল এবং এর যে সুদূরপ্রসারী পরিণতি প্রকাশিতব্য ছিল (যেমন– ইসলামের প্রথম ও সোনালী যুগে ব্যর্থ প্রমাণিত হওয়া, নবীজীর সাহচর্য ও শিক্ষাদীক্ষার নিষ্ক্রিয়তা, সাহাবায়ে কিরামের মাধ্যমে সোনালী যুগে কুরআন সংরক্ষণ, সুন্নাতের প্রচার-প্রসার এবং যেসব বিষয়ে ঐকমত্য হয়েছে, সেসবের উপর আস্থাহীনতা ও অবিশ্বাস ইত্যাদি।)– তা-ও দেখতে পাচ্ছিলেন। সুতরাং শাহ সাহেব লিখেন, 'যে ব্যক্তিই খেলাফতে রাশেদার সত্যতা বা শুদ্ধতার নীতিমালা ভেঙে ফেলার অপচেষ্টা করে এবং দীনের এই মৌলিকতাকে অস্বীকার করে, বস্তুতঃ সে যাবতীয় ধর্মীয় জ্ঞানকে ধ্বংস করতে চায়।'

আরেকটু সামনে গিয়ে লিখেন, 'খোলাফায়ে রাশেদীন হলেন রাসূলে কারীম (স) এবং তাঁর উম্মতের মাঝে কুরআনে কারীমের জ্ঞান-গবেষণা প্রাপ্তিতে মাধ্যম বা সেতুবন্ধন।'

এরপর তিনি এ আওতায় সেসব শাস্ত্র ও শাখা-প্রশাখাকেও অন্তর্ভুক্ত করেন, যার দৌলত খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমেই উম্মত লাভ করেছে।

যেমন– ইলমে হাদীস, ইলমে ফিকহ। আরেকটু সামনে গিয়ে উদ্ভাবিত মাসায়েলে বিশেষ কোন রূপরেখায় ঐক্যমত প্রতিষ্ঠা ও উম্মতের মতবিরোধের যবনিকাপাত, সেসঙ্গে ইলমে ইহসান (পরবর্তী যুগে যাকে ইলমে সুলূক বা আধ্যাত্মিকতা নামে অভিহিত করা হয়), এরপর বর্ণনা করেছেন, দর্শন শাস্ত্রের মর্যাদা, উত্তম চরিত্র এবং হীন চরিত্রের ব্যাখ্যা ও পার্থক্য বিধান, পরিবার ব্যবস্থা বা পারিবারিক শৃঙ্খলা রক্ষা ও দেশের রাজনীতি ইত্যাদি। শাহ সাহেবের মতে এসব জ্ঞান-বিদ্যা ও যোগ্যতা উম্মত খোলাফায়ে রাশেদীনের শিক্ষা ও কর্মপদ্ধতির মাধ্যমেই পেয়েছে।

এজন্য হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা, যা কেমন যেন ইসলামের শিক্ষা ও চিন্তাগত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ –এর পরে এটাই দেখানো যথোপযুক্ত ছিল যে, ঘটনাবহুল পৃথিবীতে নবুওয়াত পরবর্তী যুগে কিভাবে সফলতার সাথে সেসব মূলনীতি ও শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দেওয়া হয়েছে? জীবনের উপর কত সুচারুরূপে সেসব প্রয়োগ হয়েছে? মানব সমাজের উপর তার কী কী প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে? দু'টি প্রাচীন পরাশক্তি ও ক্ষমতাধর সভ্যতা (যারা সভ্য দুনিয়াকে পরস্পর ভাগ করে নিয়েছিল এবং যাদের ইতিহাস ছিল শত শত বছরের পুরোনো) যে যে সাম্রাজ্যের (সাসানী রাজত্ব ও রোম সাম্রাজ্য) আশ্রয়ে এবং তাদের নেতৃত্ব ও দিকনির্দেশনায় পত্র-পল্লবিত হচ্ছিল আর মানব জীবনের উপর প্রভাব বিস্তার করছিল, তা কিভাবে ধূলিস্যাৎ হয়েছে?

কতিপয় প্রাচীন রচনা

ইসলামের সমাজ ব্যবস্থা, রাষ্ট্রব্যবস্থা ও এর কর্মপরিধির উপর (মান ও ধরনের প্রতি দৃষ্টিপাত না করে কেবল সংখ্যা ও পরিমাণের দিক থেকে) আমরা প্রাচীন গ্রন্থভাণ্ডারে খুব কম কিতাবাদিই পাই। এ বিষয়ে ইমাম আবু ইউসূফ (র) (১১৩-১৮২ হি.), যিনি ছিলেন ইমাম আযম আবু হানীফা (র)-এর বিশিষ্ট শাগরেদ ও খেলাফতে আব্বাসিয়ার প্রধান বিচারপতি। তার রচিত 'কিতাবুল খিরাজ' উৎসমূলের মর্যাদা রাখে। কিন্তু এর আলোচনার পরিধি ইসলামী রাজত্বের আয়ের উৎস, মূলধন ও রাজস্ব ব্যবস্থা পর্যন্ত সীমাবদ্ধ।

এ বিষয়ে সর্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ প্রধান বিচারপতি আল্লামা আবুল হাসান আলী ইবনে মুহাম্মদ ইবনে হাবীব মাওয়ারদী (৩৬৪-৪৫০ হি.) বিরচিত 'الأحكام السلطانية والولايات الدينية'। এ গ্রন্থখানা মাঝারি আকারের ২৫৯ পৃষ্ঠায় মুদ্রিত। এর প্রধান বিষয়বস্তু ইমামত এবং এর শরয়ী বিধান, শর্তাবলী, প্রতিষ্ঠার রূপরেখা, এর নির্বাচিত পদসমূহ, ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান)-এর ফরয-ওয়াজিবসমূহ (আবশ্যকীয় দায়িত্ব-কর্তব্য), বিচারক

নিয়োগের নীতিমালা, নেতৃত্ব, দান-সদকার তত্ত্বাবধায়ন এবং রাজস্ব ও কর উসূল ইত্যাদির বিধি-বিধান, দণ্ডবিধি ও হিসাব প্রস্তুতি ইত্যাদির বিবরণ। খেলাফতে রাশেদার শুদ্ধতা ও প্রমাণ, তাদের মর্যাদা, শ্রেষ্ঠত্ব ও কৃতিত্ব সম্পর্কে এতে কোনও বর্ণনা নেই।

এই বিষয়বস্তুর উপর সবচেয়ে বড় কিতাব 'আল-গিয়াছী'-এর পূর্ণ নাম 'غياث الامم فى التياث الظلم'। কিতাবখানার রচয়িতা ইমাম গাযালী (র)-এর স্বনামধন্য উস্তাদ এবং সমকালীন উস্তাদগণের উস্তাদ ইমামুল হারামাইন আবুল মা'আলী আবদুল মালিক আল জুওয়াইনী (৪১৯-৪৭৮ হি.)। এটি মূলতঃ সালজুকী সাম্রাজ্যের বিখ্যাত বিচক্ষণ উযীর নিযামুল মুলক তূসী (৪০৮-৪৮৫ হি.) (যিনি মাদরাসায়ে নিযামিয়া বাগদাদ ও নিশাপুর)-এর পরামর্শ ও পর্যালোচনার জন্য লিখা হয়েছে। প্রতিষ্ঠাতা যথারীতি মুলুকে আলফে আরসালান ও মালিক শাহ্ সালজুকীর উযীর এবং রাজত্বের সেনাপ্রধান ছিলেন আর প্রকৃতপক্ষে ছিলেন এই বিশাল সাম্রাজ্যের বরং রাজত্বের প্রধান কর্তা। উক্ত কিতাবখানা বস্তুতঃ ইমামতের শরয়ী বিধান, গুণ- বৈশিষ্ট্যসমূহ ও দায়িত্ব-কতর্ব্য সম্পর্কিত। এ প্রথম অংশে ইমাম ও নেতৃবর্গ, জনপ্রতিনিধি ও বিচারকদের গুণাবলি বর্ণনা করা হয়েছে। তাছাড়া কদাচ কোনকালে যদি কোনও ইমাম (রাষ্ট্রপ্রধান) না থাকে, তখন কী করতে হবে, তা-ও আলোচনা করা হয়েছে। সেসঙ্গে মুফতী ও শাসকবর্গের গুণাবলি ও মর্যাদার বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তাদের অনুপস্থিতিতে উম্মতের দায়িত্ব-কর্তব্য কী হবে? যদি নেতৃত্বের আসনে অযোগ্য কেউ অস্ত্রের জোরে চড়ে বসে, তাহলে মুসলমানদের কী করা উচিৎ? সময়কাল যদি মুফতীশূন্য হয় (বা কোন সময় যদি দেশে ফাতওয়া প্রদানকারী লোকজন না পাওয়া যায়) তখন উম্মতের কী কর্তব্য? ইমাম শূন্যতার কারণগুলো কী কী? এরপর বিস্তারিতভাবে সেসব ফিকহী মাসায়েল বর্ণনা করা হয়েছে, যেগুলা মুফতীগণ না থাকাবস্থায় উম্মতের জন্য জানা ও তার উপর আমল করা প্রয়োজন। এখানে কিতাবখানা (শাফিঈ) ফিকহের কিতাব হয়ে যায়। তাতে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের শুদ্ধতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে আলোচনা নেই। সেটি মূলতঃ ইমামতের শরয়ী বিধান, গুণাবলি ও দায়িত্ব-কর্তব্যের উপর লিখিত। কিতাবটিতে জায়গায় জায়গায় মাওয়ারদী বিরচিত 'আল-আহকামুস সুলতানিয়্যাহ' এর প্রতি কটাক্ষ আর এর লেখকের বিরুদ্ধে নানা প্রশ্ন-আপত্তিও রয়েছে।

তৃতীয় উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র) (৬৬১-৭২৮ হি.) বিরচিত السياسة الشرعية فى اصلاح الراعى والرعية নামক কিতাবখানা। এই বিজ্ঞ লেখক কিতাবের ভূমিকায় সরাসরি বলে দিয়েছেন,

এটি একটি সংক্ষিপ্ত কিতাব; যার মধ্যে খোদায়ী রাষ্ট্রনীতি ও নববী প্রতিনিধিত্বের এমন কতিপয় নীতিমালা বর্ণনা করা হবে, যার থেকে রাজা-প্রজা (শাসক ও অধীনস্থ) কেউই অমুখাপেক্ষী নয়। কিতাবটি মূলতঃ নিম্নোক্ত আয়াতে কারীমার তাফসীর ও ব্যাখ্যা। যাতে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

إن الله يامركم أن تؤدوا الامنت إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، .... ذلك خير واحسن تاويلا.

'আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন যে, তোমরা আমানতগুলো আমানতদাতাদের কাছে অর্পণ করে দাও আর যখন তোমরা মানুষের মাঝে (কোন বিষয়ে) মীমাংসা করো, তখন ন্যায়ানুগভাবে (ইনসাফের সাথে) মীমাংসা করবে।........ এটাই অতি মঙ্গলজনক। আর কতই না উত্তম তার প্রত্যাবর্তনস্থল। (সূরা নিসা : ৫৮-৫৯)

কিতাবের প্রথম অংশে প্রথম অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'আল-ওয়ালানাত' দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের শিরোনাম 'আল-আমওয়াল'। আর দ্বিতীয় অংশে প্রথমে হুদুদুল্লাহ ও হুকূকুল্লাহ সম্পর্কে, এরপর হুকূকুল ইবাদ (বান্দার অধিকার) সম্পর্কে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিতাবখানা কলেবরে মধ্যম আকারের ১৬৮ পৃষ্ঠায় লিখিত। এতেও খেলাফতে রাশেদাহ ও খোলাফায়ে রাশেদীন সম্পর্কে মৌলিক, যৌক্তিক ও ঐতিহাসিক বিষয়ে কোনও প্রতিবাদ করা হয়নি। যার ব্যাপারে কিতাবের স্বনামধন্য লেখক সনদ ও ইমামের মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি যদি এদিকে মনোনিবেশ করতেন, তাহলে সেটি হত ইসলামের গবেষণামূলক গ্রন্থ ভাণ্ডার ও আলোচ্য বিষয়ে বিরাট অমূল্য সমৃদ্ধি। এ বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও লিখনী শক্তি 'মিনহাজুস্ সুন্নাহ'র পাতায় পাতায় তার আসল কৃতিত্ব দেখিয়েছে। সেখানে তার জ্ঞানসমুদ্রের তরঙ্গমালা ও তীক্ষ্ম কলমের তেজস্বিতার যাদু পরিলক্ষিত হয়।

ইসলামে খেলাফতের মর্যাদা ও অবস্থান

কুরআনে কারীম ও হাদীসে নববীতে ইসলামী দাওয়াত দীনে মুহাম্মাদী (স) গ্রহণ এবং এর প্রতি বিশ্বাসস্থাপনকারীদের চিন্তা-ভাবনা একটি সুশৃঙ্খল ও ঐক্যবদ্ধ দল হিসেবেই করা হয়েছে। সে লক্ষ্যে উম্মত, মিল্লাত, জামাআত ইত্যাদি যেসব শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে, সেগুলো সবই এ বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করে। বিচক্ষণ চিন্তাবিদগণ জানেন, এ শব্দগুলো কুরআন-হাদীসের অভিধান ও পরিভাষায় 'নিছক সংখ্যার আধিক্য ও মানুষের ভীড়'-এর মত বাহ্যিক অর্থ ও মর্মের জন্য ব্যবহার করা হয়নি। বিভিন্ন ধর্ম ও জাতির

ইতিহাসে এবং গোষ্ঠী ও সভ্যতার ক্ষেত্রেও যার কোনও মূল্য ও প্রভাব নেই, বরং গোটা কুরআনে কারীমে কোথাও প্রাচীন উম্মতসমূহের ঘটনাবলির ধারাবাহিকতায় আবার কোথাও শক্তি-দুর্বলতা ও জয়-পরাজয়ের কারণগুলো বর্ণনায় সংখ্যাধিক্যের নিষ্ক্রিয়তা, মানবীয় ভীড়ের মূল্যহীনতা, পুণ্যবান কত ব্যক্তিত্বের উপস্থিতিতে বিপদ-বিপর্যয়ের প্রাচুর্য, মানুষের নিষ্ঠুরতা-নির্মমতা এবং সত্যধর্মের পরাভবের আলোচনায় ভরা। যাতে মনে হয়, ন্যায়-ইনসাফের মানদণ্ড ও বিবেকের মানদণ্ড উভয়ভাবে বিক্ষিপ্ত-বিচ্ছিন্ন জনসংখ্যার (গণনায় যত বেশিই হোক) তেমন কোনও গুরুত্ব ও উপকারিতা নেই।

ইসলামের দৃষ্টিতে যেসব মহান লক্ষ্য-উদ্দেশ্য রয়েছে, তন্মধ্যে দাস ও প্রভুর মধ্যকার সম্পর্কের সংশোধন, শৃঙ্খলা বিন্যাস, এর উন্নতি ও ব্যাপৃতি, মানব জীবনকে তার ছাঁচে ঢেলে সাজানোর প্রচেষ্টা, জামাতের সদস্যদের পারস্পরিক সম্পর্কোন্নয়ন, পরিচ্ছন্নতা এবং মনোহারিতাও রয়েছে। এমন এক সুশৃঙ্খল, সুসজ্জিত নিরাপদ ও শান্তিপূর্ণ জীবনের জন্য রয়েছে পরিবেশ সমতল করার বিষয়টিও। যেখানে সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত ফরযসমূহ (অবশ্য পালনীয় নির্দেশসমূহ) ও সৃষ্টিজীবের অধিকার দু'টিই আদায় করার পূর্ণ সুযোগ এবং সেসব যোগ্যতা-পূর্ণতা ও উচ্চাসনে পৌঁছার পুরোপুরি অবকাশ পাওয়া যায়, যার যোগ্যতা মানব সত্ত্বায় গচ্ছিত রাখা হয়েছে। সে চেষ্টা করেছে, তার কর্মক্ষমতা ও বুদ্ধিমত্তা যেন সেসব বিপদ-আশঙ্কার মোকাবেলা করা, সেসব ক্ষয়ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা ও সেসব বিপর্যয়-বিশৃঙ্খল বিদূরিতকরণে বিনষ্ট না হয়, যা কখনো বিশৃঙ্খল জীবন থেকে জন্ম নেয়, কখনো মনগড়া আইন-কানুন থেকে, কখনও লাগামহীনতা থেকে, সম্মান ও নেতৃত্বের মোহ থেকে। সেজন্য মহান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ একটি আইন/সংবিধান, আসমানী শরীয়ত, আল্লাহ পাকের প্রভুত্ব ও প্রজ্ঞায় বিশ্বাসী একটি খেলাফত ও শাসন ব্যবস্থা জরুরী। খোদায়ী শরীয়তের সম্পর্ক যতদূর, তার আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ, ভুল-ত্রুটি মুক্ত, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য ও স্বার্থসমূহ, সাম্প্রদায়িকতা ও পক্ষপাতিত্ব থেকে অনেক উর্ধ্বে হওয়ার বিশ্বাস থাকা জরুরী। আর খেলাফত ও শাসন যতদূর বিস্তৃত তা এই শরীয়তের সঠিক ব্যাখ্যাতা ও মুখপাত্র। আর মানবীয় শক্তি ও ইচ্ছার শেষ পর্যন্ত অপাত্রে সাহায্য-সহযোগিতা ও সাম্প্রদায়িকতা, খোশামোদ এবং অসাম্য থেকে দূরে থাকা আবশ্যক।

এসব মহান উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ও তার সুফল প্রকাশের জন্য প্রথম থেকেই শরীয়তপ্রণেতা (মুহাম্মদ স.) এমন সব হুকুম-আহকাম, হেদায়াত ও দিকনির্দেশনা দিয়েছেন, যার বিদ্যমানতায় মুসলমান এমন এক অসাধারণ সুশৃঙ্খল ও সুসংহত জনগোষ্ঠীর রূপ ধারণ করতে বাধ্য হয়। যা এমন এক

ব্যক্তিসত্ত্বার হুকুম ও ব্যবস্থার অনুগত– যিনি বহুবিধ বৈশিষ্ট্যে তাদের থেকে স্বকীয়তার অধিকারী। তাদের কল্যাণ, স্বার্থ ও প্রয়োজনাদির ব্যবস্থাপক। তিনি একে মনোনীত করেছেন শরীয়তের প্রশস্ত ও লাবণ্যময় দিকনির্দেশনা ও মূলনীতির আলোকে। তিনি যদি ইমামতে কুররার আসনে তথা রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়, তবে তাকে খলীফাতুল মুসলিমীন, আমীরুল মুমিনীন বা শাসক বলা হবে। আর যদি তিনি তার প্রতিনিধি বা তার বিশেষ দূত হন কিংবা শরীয়তের বিধি-বিধান কার্যকর করা, মামলা-মোকাদ্দমা নিষ্পত্তি ও সুশৃঙ্খল ধর্মীয় জীবন-যাপনের জন্য মুসলমানগণ তাকে (ছোটখাট বিষয়ে ও স্থানীয়ভাবে) মনোনীত করে, তবে তাকে আমল বলা হবে।

খলীফা নির্বাচন করা মূলতঃ এমন একটি দীনী ও ধর্মীয় কর্তব্য, যার ফলে সবচেয়ে বড় আশেকে রাসূল (স) নিবেদিতপ্রাণ বন্ধু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা) এবং সবচেয়ে বড় প্রেমিক ও প্রাণউৎসর্গকারী সাহাবায়ে কিরাম (রা) (মহান আহলে বাইতসহ) এ বিষয়টির সমাধান তথা খলীফাতুল মুসলিমীন নির্বাচনকে নবীজীর পূতঃপবিত্র ও পুণ্যময় নূরানী দেহ সমাহিত করার পূর্বে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। আর সম্ভবতঃ প্রত্যেক খলীফার ইন্তিকালের পর এ নীতিই কার্যকর ছিল। হযরত আবু বকর (রা)-এর নির্বাচন দশ হিজরী থেকে নিয়ে খলীফা মুস্তাকিম বিল্লাহ আব্বাসীর শাহাদাত (৬৫৬ হি.) পর্যন্ত মুসলিম বিশ্ব কখনও ইসলামী খলীফা থেকে বঞ্চিত ছিল না। শুধুমাত্র খলীফা মুস্তারশাদ বিল্লাহ, যিনি সুলতান (শাসক) মাসউদ সালজুকীর হাতে ১০ রমযান ৫২৯ হিজরীতে বন্দি হয়েছিলেন, তার অনুপস্থিতি ও বন্দিদশার কিছুদিন তথা প্রায় তিন মাস সাতদিন মুসলিম বিশ্ব ইসলামী খলীফা শূন্য ছিল। কিন্তু এটি মুসলিম বিশ্বের জন্য এমন বিরল বিস্ময়কর অভিজ্ঞতা ও মর্মন্তুদ ঘটনা ছিল, যার কারণে সে অন্ধকারাচ্ছন্ন ও বিভৎস আর বাগদাদ ধ্বংস-বিরান হয়ে গিয়েছিল। আল্লামা ইবনে কাছীর (র)-এর ভাষায়, 'বাগদাদের অধিবাসীদের মাঝে প্রকাশ্য-পরোক্ষ সবদিক থেকে এক ধরনের ভূমিকম্প ছেয়ে যায়। সর্বসাধারণগণ মসজিদের মিম্বরগুলো পর্যন্ত ভেঙে ফেলে। জামাতে অংশগ্রহণও ছেড়ে দেয়। মহিলারা মাথা থেকে দোপাট্টা-উড়না সরিয়ে মাতম করতে করতে বাইরে বেরিয়ে আসে। খলীফার গ্রেফতারী এবং পেরেশানী-অস্থিরতা ও তার বিপদ-বিপর্যয়ে শোক করতে থাকে। অন্যান্য অঞ্চলও বাগদাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলে। এরপর এই বিপর্যয় এত বেড়ে যায় যে, কমবেশি সব এলাকাই এতে প্রভাবিত হয়ে পড়ে। বাদশা সানজর এই অবস্থাদৃষ্টে তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে উদ্ভূত অবস্থা-পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা ও গুরুত্ব সম্পর্কে অবহিত এবং সচেতন করেন।

তাকে নির্দেশ দেন, খলীফাকে পুনর্বহাল করার জন্য। বাদশা মাসউদ তার এ নির্দেশ পালন করেন।'

খলীফা মুস্তা'ছিম বিল্লাহর শাহাদাতের প্রেক্ষিতে শায়খ সাদী (র), যিনি খেলাফতের কেন্দ্রস্থল থেকে বহুদূরে শীরাজ নগরীতে বসবাস করতেন, তিনি যে হৃদয়বিদারক ও জ্বালাময়ী মর্সিয়া গেয়েছেন, তার সারমর্ম–

[illegible] ☆ [illegible]

এর দ্বারা অনুভূত হয়, মুসলমান খেলাফত ও খলীফাকে কী দৃষ্টিতে দেখত আর মুসলিম বিশ্ব তাদের হারালে কী অনুভূতি ও ব্যাকুলতা প্রকাশ করত!

খেলাফতের স্বয়ংসম্পূর্ণতা

শাহ সাহেব (র) কুরআন-সুন্নাহ, ফিক্‌হ আকাঈদ, ইলমে কালাম-দর্শন, জীবনচরিত ও ইতিহাসের উপর যার প্রশস্ত ও গভীর দৃষ্টি ছিল এবং শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের সূক্ষ্মতা সম্পর্কে পরিজ্ঞাত ছিলেন। তিনি খেলাফতের এমন পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা দিয়েছেন, যার থেকে উৎকৃষ্টতর সংজ্ঞা দেওয়া কঠিন। এ সংজ্ঞার প্রতিটি শব্দে তার অর্থ, মর্ম ও উদাহরণের এক অমূল্য সম্পদ গচ্ছিত রয়েছে। তিনি লিখেন, 'খেলাফত ঐ জনপ্রতিনিধিত্ব ও সাধারণ রাজনীতির নাম, যা 'দীন প্রতিষ্ঠা' এর কার্যক্রমের পূর্ণতা দানের জন্য অস্তিত্ব লাভ করে। এই দীন প্রতিষ্ঠার কর্মপরিধিতে ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যাগুলো পুনর্জীবিত করা, ইসলামের স্তম্ভগুলো প্রতিষ্ঠা করা, জিহাদ ও তার আনুসঙ্গিক ব্যবস্থাপনা, যেমন– সৈন্যদেরকে সুসজ্জিতকরণ, যুদ্ধ-জিহাদে অংশগ্রহণকারীদের অংশসমূহ ও যুদ্ধলব্ধ সম্পদে (বা মালে গণীমতে) তাদের অধিকার প্রদান, বিচারব্যবস্থা কার্যকর করা, দণ্ডবিধি প্রয়োগ করা, জুলুম-শোষণ ও অভিযোগ নিরসন, সৎকাজের আদেশ এবং অসৎকাজের নিষেধ করা ইত্যাদি কর্তব্য পালন অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আর এসব রাসূলে কারীম (স)-এর প্রতিনিধিত্ব ও দিকনির্দেশনায় হতে হবে।'

তারপর দীন প্রতিষ্ঠার আরও ব্যাখ্যা ও সংজ্ঞা দিয়ে লিখেন, 'আমরা যখন সমস্যাগুলো আপেক্ষিক দৃষ্টিতে দেখি, ছোটখাট বিষয়গুলো থেকে বড় বড় বিষয় আর বড় বড় বিষয়গুলো থেকে শুধু সকলের উপর ব্যাপৃত একটি মৌলিক বিষয়ের দিকে ধাবিত হই, তখন এ সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারি যে, সেসব বিষয়-সমস্যা, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র যৌথ সমস্যাবলি, উঁচু ধরনের বহু মৌলিক সমস্যার (যেন সবচেয়ে প্রধান সমস্যা/বিষয়) এমন একটি বাস্তবতা, যার নাম 'দীন প্রতিষ্ঠা।' যার আওতায় আরও অন্যান্য বহু প্রকার ও শ্রেণী রয়েছে। যেমন,

ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যাগুলোকে পুনর্জীবিত করা। যার মধ্যে কুরআন-সুন্নাহর শিক্ষাদান, ওয়ায-নসীহতও রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন–

هو الذى بعث فى الاميين رسولا منهم يتلوا عليهم ايته ويزكيهم ويعلمهم الكتب والحكمة، وإن كانوا من قبل لفى ضلل مبين.

'আপনি সেই সত্ত্বা, যিনি উম্মীদের (নিরক্ষরদের) মধ্যে তাদের থেকেই একজন (মুহাম্মদ স.) কে নবী বানিয়ে প্রেরণ করেছেন। যিনি তাদের সম্মুখে আপনার আয়াত (নিদর্শন)সমূহ পড়ে শোনায় আর তাদেরকে পবিত্র করে এবং তাদের (আল্লাহর) কিতাব (তথা কুরআন) ও জ্ঞান-প্রজ্ঞা শিক্ষা দেয়। আর ইতোপূর্বে তো এসব লোক সুস্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় লিপ্ত ছিল।' (সূরা জুম'আ-২)

খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের পক্ষে কুরআনিক প্রমাণ

কিতাবের সবচেয়ে বিস্ময়কর জ্ঞানগর্ভ অংশ সেটি, যাতে শাহ সাহেব (র) কুরআনে কারীমের একাধিক আয়াতের মাধ্যমে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের অকাট্যতা এবং তাদের খোলাফায়ে রাশেদ (নববী খেলাফতের পথিকৃৎ) হওয়া, তাদের মাধ্যমে আল্লাহ পাকের ইচ্ছার পূর্ণতা দান ও সৃষ্টিগত বিষয়ের বাস্তবায়ন সম্পর্কে প্রমাণ পেশ করেছেন। আয়াতে কারীমাগুলোর এমন এমন সূক্ষ্মতা বরং সুস্পষ্ট ইংগিতসমূহের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন, যার দ্বারা অস্পষ্টভাবে (বরং কোথাও কোথাও গাণিতিকভাবে) প্রতীয়মান হয় যে, এসব মহামানব ছাড়া সংশ্লিষ্ট আয়াতে কারীমাগুলোর উদ্দেশ্য আর কেউ হতে পারে না; সেসব ভবিষ্যদ্বাণী তাদের সত্ত্বা ছাড়া আর কারও উপর প্রযোজ্য হতে এবং প্রতিশ্রুতিগুলোর বাস্তবায়ন তাদের খেলাফতকাল ছাড়া কোনও যুগে হতে দেখা যায়নি। যদি এসব ব্যক্তিত্ব ও তাদের খেলাফতকে মূলসহ উপড়ে ফেলা হয়, তাহলে ঐ গুণাবলি কোনও পাত্রবিহীন আর ঐ প্রতিশ্রুতিগুলো অপূর্ণই থেকে যাবে।

শাহ সাহেবের উদ্ধৃত আয়াতে কারীমাগুলোর এখানে উপমাস্বরূপ মাত্র দু'টি আয়াত চয়ন করছি। তন্মধ্যে একটি সূরা নূরের ৫৫ নং আয়াত। সেখানে আল্লাহ তা'আলা বলেন,

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحت ليستخلفنهم فى الارض كما استخلف الذين من قبلهم، وليمكنن لهم دينهم الذى ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن، يعبدوننى لايشركو بى شيئا، ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون.

'তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস স্থাপন করে ও সৎকর্ম করে, আল্লাহ তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যে, তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন। যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং তিনি অবশ্যই সুদৃঢ় করবেন তাদের ধর্মকে, যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে অবশ্যই তাদেরকে শান্তি দান করবেন, তারা আমার ইবাদত করবে এবং আমার সাথে কাউকে শরীক করবে না। এরপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে, তারাই অবাধ্য। (সূরা নূর : ৫৫)

শাহ সাহেব বলেন, এই অঙ্গীকার (তথা শাসন কর্তৃত্ব দান, পৃথিবীতে শক্তিশালীকরণ ও ভীতির পর নিরাপত্তা দান) সেসব লোকদের সঙ্গে করা হয়েছে, যারা সূরা নূর অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান, ইসলাম ও নবীজীর সাহচর্যে ধন্য এবং দীন-ধর্মের সাহায্য ও ক্ষমতায়নে অংশীদার ছিলেন। শাহ সাহেব স্পষ্ট ভাষায় লিখেছেন, এই অঙ্গীকার হযরত মু'আবিয়া (রা), বনূ উমাইয়াহ ও বনূ আব্বাসের ব্যাপারে প্রযোজ্য নয়, যারা সে সময় ইসলামে দীক্ষিত হয়নি অথবা মদীনায় উপস্থিত ছিল না।

এরপর লিখেন, মুসলিম উম্মাহর এই পূর্ণ জামাতকে পৃথিবীর শাসনকর্তৃত্বের সম্মানে ভূষিত করা এবং তাদের সকলেই একই খেলাফতের মসনদে অধিষ্ঠিত হওয়া না সম্ভব আর না যুক্তিগ্রাহ্য। এর দ্বারা কতিপয় বিশেষ ব্যক্তিই উদ্দেশ্য নেওয়া যেতে পারে। শাহ বলেন, ليستخلفنهم তথা ليستخلفن جمعا منهم অর্থাৎ তাদের মধ্যে থেকে একদলকে খলীফা (শাসনকর্তা) বানাব আর এর জন্য বশ্যতা ও আনুগত্য শর্ত। এরপর যখন সেই অঙ্গীকার বাস্তবায়িত হবে, তখন দীন-ধর্ম সর্বোত্তমরূপে প্রকাশ পাবে এবং তার পূর্ণ শক্তি-ক্ষমতা ও স্বাধীনতা লাভ হবে। এমন নয়, যেমনটি ইছনা আশারী লোকজন বলে অর্থাৎ আল্লাহর কাছে যে দীন পছন্দনীয়, সর্বদা সেটি গোপন ও লুকায়িত থাকে। এ কারণেই আহলে বাইতের ইমামগণ সবসময় গোপন বাসনার সাথে কাজ করেছেন। তাদের কখনও প্রকাশ্যে নিজ ধর্মের ঘোষণা দেওয়ার শক্তি-সাহস হয়নি।

وليمكن لهم دينهم الذى ارتض لهم

আল্লাহ তা'আলা তাদের জন্য এই দীনের শক্তি ও বিজয় দান করবেন, যাকে তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন।

এর দ্বারা বুঝা যায়, সেই ধর্ম আল্লাহর পছন্দনীয় ও মনোনীত ধর্ম নয়, এই খিলাফতের যুগে যার ঘোষণা ও প্রকাশ করা যাবে না।

অনুরূপভাবে বলেছেন, 'وليبدلنهم من بعد خوفهم امنا' তথা এই খেলাফতকালে (শাসনামলে) আল্লাহ তা'আলা ভয়-ভীতির পরিবেশের স্থলে

শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ তৈরী করে দিবেন। এতেও প্রমাণিত হয়, এসব শাসনকর্তা ও অন্যান্য মুসলমানগণ এই অঙ্গীকারে পূর্ণতা দানের সময় শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে থাকবে। না তাদের বিজাতীয় কাফিরদের কোনও ভয় থাকবে আর না অন্য দল, গোষ্ঠী বা শক্তির আশঙ্কা হবে। পক্ষান্তরে ফিরকায় ইমামিয়ার লোকজন বলে, আহলে বাইতের ইমামগণ সবসময় ভীত-সন্ত্রস্ত ছিলেন। তারা তাকিয়া বা গোপন বাসনার মাধ্যমে কাজ করেছেন। তাদের এবং তাদের সঙ্গী-সাথীদের সব সময় মুসলমানদের দেওয়া কষ্ট-যাতনা ভোগ করতে হয়েছে। আর তারা লাঞ্ছনা-গঞ্জনা সহ্য করে গেছেন। আবার কখনও তাদের সমর্থক-সাহায্যকারী ছিল না। শাসনকর্তৃত্ব দান ও পৃথিবীতে শক্তিশালী করার অঙ্গীকার পূর্ণতা পেয়েছে সেসব প্রথম স্তরের মুজাহিদ এবং শাসন কর্তৃত্ব দান সম্পর্কিত আয়াতে কারীমা অবতীর্ণ হওয়ার সময় বিদ্যমান মহাপুরুষগণের মাধ্যমে। তারা যদি খলীফাই না হয়ে থাকেন, তাহলে উক্ত অঙ্গীকারের বাস্তবায়ন বা বহিঃপ্রকাশ হয়নি। মহান আল্লাহ এসব (সংশয়-সন্দেহ) থেকে অনেক অনেক উর্ধ্বে।

দ্বিতীয় আয়াতখানা 'قل للمخلفين من الاعراب' সূরা আল ফাতহর আয়াত ১৬ থেকে চয়িত। শাহ সাহেব এ আয়াতের উপর বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। যার সারসংক্ষেপ নিম্নরূপ–

রাসূলে কারীম (স) ৬ষ্ঠ হিজরীতে সাহাবায়ে কিরাম (রা)-এর এক বিশাল জামাতসহ তার একটি স্বপ্নের প্রেক্ষিতে উমরা পালনের উদ্দেশ্যে মক্কা মুকাররমার দিকে যাত্রা করলেন। ঘটনার গুরুত্ব, মক্কার অবস্থা-পরিস্থিতি ও কুরাইশ শত্রুদের বিরোধিতার আশঙ্কায় সাহাবায়ে কিরাম (রা) বিশাল জনসংখ্যায় তাঁর সহযাত্রী হলেন। কিন্তু গ্রাম্য লোকজন ভয় ও কপটতার কারণে সঙ্গে গেল না। হুদাইবিয়া নামক স্থানে সংকল্প প্রত্যাহার ও কুরাইশদের সঙ্গে সন্ধিচুক্তির সেই ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হয়, যা হাদীস ও ইতিহাসের গ্রন্থাবলিতে বিশদভাবে বিদ্যমান। সেখানেই ঐতিহাসিক বাই'আতে রিযওয়ান হয়েছে, যাতে অংশগ্রহণকারীদেরকে আল্লাহ তা'আলা তার সন্তুষ্টির বিশেষ সনদ দান করেছেন এবং অদূর ভবিষ্যতের বিজয়ের সুসংবাদ শুনিয়েছেন। অধিকন্তু এই সূরা ফাতহেই আরও ঘোষণা দিয়েছেন, এই নিকটতর (ভবিষ্যত) বিষয়ে তথা (মহররম, সপ্তম হিজরীতে সংঘটিত খায়বার বিজয়ে) সেসব গ্রাম্য বেদুঈনদের সঙ্গে নেওয়া হবে না, যারা হুদাইবিয়ার মুহূর্তে উপস্থিত ছিল না এবং যারা এই বিশাল ও ভয়াবহ অভিযানে রাসূলুল্লাহ (সা) -এর সঙ্গ ত্যাগ করেছে। আল্লাহ তা'আলা বলেন,

سيقول المخلفين اذا انطلقتم إلى مغانم لتـخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون ان يبدلوا كلم الله، قل لن تتبعونا كذا لكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تخسدوننا، بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا.

'তোমরা যখন যুদ্ধলব্ধ ধন-সম্পদ সংগ্রহের জন্য যাবে, তখন যারা পশ্চাতে থেকে গিয়েছিল, তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সঙ্গে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কালাম পরিবর্তন করতে চায়। বলুন, তোমরা কখনও আমাদের সঙ্গে যেতে পারবে না। আল্লাহ পূর্ব থেকেই এরূপ বলে দিয়েছেন। তারা বলবে, বরং তোমরা আমাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করছ। অধিকন্তু তারা সামান্যই বোঝে।' (সূরা ফাতহ : ১৫)

কিন্তু পরক্ষণেই সেসব পশ্চাদপন্থীদের সম্পর্কে বলেছেন, এই নিকট ভবিষ্যতের বিজয়ে (খায়বার বিজয়ে) তো তোমাদের অংশগ্রহণ এবং এর যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দ্বারা উপকৃত হওয়ার অনুমতি নেই। তবে শীঘ্রই তোমাদেরকে এমন লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করা হবে, প্রথমতঃ তারা হবে বিরাট বীরত্ব ও ক্ষমতার অধিকারী। দ্বিতীয়তঃ তাদের সঙ্গে হয়ত যুদ্ধ করা হবে অথবা তারা ইসলামে দীক্ষিত হয়ে যাবে। মাঝামাঝি কোনও বিষয় (ট্যাক্স) নেই। আর এই যুদ্ধের আহবান আল্লাহর নিকট এত প্রিয় এবং এর আহবানকারী এমন নির্ভরযোগ্য ও অনিবার্য অনুসৃত হবে, যদি তোমরা তার ডাকে সাড়া দাও, দাওয়াত কবুল করো এবং তার হুকুম পুরোপুরি পালন করো, তাহলে আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে উত্তম প্রতিদানে সম্মানিত করবেন। আর যদি পূর্বের মতই মুখ ফিরিয়ে নাও, তবে মর্মন্তুদ আযাবে লিপ্ত করবেন।' আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন,

قل للمخلفين من الاعراب ستدعون إلى قوم أولى بأس شديد تقاتلونهم او يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا اليما.

'গৃহে অবস্থানকারী মরুবাসীদের বলে দিন, আগামীতে তোমরা এক প্রবল শক্তিধর জাতির সাথে যুদ্ধ করতে আহুত হবে। তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করবে, যতক্ষণ না তারা মুসলমান হয়ে যায়। তখন যদি তোমরা নির্দেশ পালন কর, তবে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরস্কার দিবেন। আর যদি পৃষ্ঠপ্রদর্শন কর, যেমন ইতোপূর্বে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছ, তবে তিনি তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দিবেন।' (সূরা ফাতহ : ১৬)

শাহ সাহেব বলেন, 'سَتُدْعَوْنَ' (শীঘ্রই তোমরা আহূত হবে) এর চাহিদা অনুসারে প্রতীয়মান হয় যে, অদূর ভবিষ্যতে এমন কোনও আহবানকারী হবে, যিনি বেদুঈন মরুচারীদেরকে (গ্রামে বসবাসকারী যে লোকজন হুদাইবিয়ার সন্ধিকালে ইসলামী সেনাবাহিনীর সাথে না গিয়ে পশ্চাতে রয়ে গিয়েছিল) এমন এক জাতির সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য আহবান করবে, যাদের জন্য দু'টি পথই খোলা থাকবে। হয়ত যুদ্ধ; নয়ত ইসলাম। (যার মিছদাক আরবের মুরতাদ বা ধর্মান্তরিত গোত্রসমূহই হতে পারে, যাদের থেকে ট্যাক্স গ্রহণ জায়েয ছিল না; হয়ত তারা যুদ্ধে মারা পড়বে নতুবা ইসলাম গ্রহণ করবে) আর এ চিত্র একমাত্র হযরত আবু বকর (রা)-এর খেলাফতকালে দেখা গেছে, যিনি আরবের মুরতাদদের সাথে যুদ্ধ করেছেন। তাদের ক্ষেত্রে শরয়ী বিধান এটাই ছিল। এর দ্বারা না রোমবাসী উদ্দেশ্য হতে পারে আর না পারস্যবাসীরা, যাদের জন্য ছিল তিনটি পথ। যুদ্ধ, ইসলাম ও কর প্রদান। কাজেই এর দ্বারা সরাসরি হযরত আবু বকর (রা) -এর খেলাফত প্রমাণিত হয়। যিনি মুরতাদদের সঙ্গে যুদ্ধ করার জন্য হযরত খালিদ বিন ওয়ালিদ (রা)-এর তত্ত্বাবধানে সৈন্য প্রেরণ করেছেন আর মরুচারী বেদুঈনদেরকে যুদ্ধ অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন। অধিকন্তু এই আহবানে সাড়া দেওয়ার ফলে পুরস্কার পাওয়া আর সাড়া না দেওয়ার কারণে শাস্তিযোগ্য হওয়া একজন খলীফায়ে রাশেদরই বৈশিষ্ট্য ও পদমর্যাদা হতে পারে।

কিতাবের আরেকটি মূল্যবান বিষয়বস্তু

গ্রন্থটিতে খোলাফায়ে রাশেদীনের খেলাফতের অকাট্যতা ও বিশুদ্ধতার দলীল-প্রমাণ, চার খলীফার বৈশিষ্ট্য ও মর্যাদা, তাদের শাসনামলের কৃতিত্বসমূহ এবং তাদের অসংখ্য অমূল্য বাণী ও উক্তি ছাড়াও আরও মূল্যবান উপকারিতা, দূর্লভ জ্ঞান-গবেষণা এবং গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু রয়েছে, যেগুলো সাধারণতঃ না আকাইদ ও কালাম শাস্ত্রের কিতাবাদিতে পাওয়া যায় আর না কোনও ইতিহাস ও জীবনচরিত গ্রন্থে। তন্মধ্যে একটি হল, কুরুনে ছালাছাহ (তিন যুগ)-এর ব্যাখ্যা, খেলাফত আর রাজত্বের পার্থক্য ও তার বিশ্লেষণ, অকার্যকর রাষ্ট্র ও লাগামহীন শাসন ব্যবস্থার ব্যাখ্যা এবং বনী উমাইয়ার রাজত্ব ও লাগামহীন শাসন খেলাফত না হওয়ার সুস্পষ্ট বিবরণ রয়েছে। তার মতে খেলাফতে রাশেদাহ যদিও হযরত আলী মুর্তাযা (রা) -এর (শাহাদাতের) মধ্য দিয়ে শেষ হয়ে গেছে, তদুপরি তিনি হযরত মু'আবিয়া (রা) সম্পর্কে (তার সম্পর্কে বর্ণিত মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে) কুধারণা, ভর্ৎসনা ও অভিসম্পাত করা বেঁচে থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। কিন্তু এরপর

বনী মারওয়ানের শাসকদের সম্পর্কে পরিষ্কার ভাষায় লিখেন- 'যখন আব্দুল মালেক (ইবনে মারওয়ান) শাসন কর্তৃত্ব লাভ করে, তখন বিশৃঙ্খলা ও বিক্ষিপ্তাবস্থা খতম হয়ে যায়। আর যে স্বৈরশাসন সম্পর্কে রাসূলে কারীম (স) একাধিক হাদীসে ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন, তা নিত্যদিনের চিত্র হয়ে যায়।'

এ কিতাবের একটি বৈশিষ্ট্য ফারুকে আযম (রা) এর মতাদর্শ, তার ফাতওয়া ও আহকাম সম্পর্কিত তথ্য-প্রমাণ, যেগুলো উক্ত কিতাবে একত্রিক করে দেওয়া হয়েছে। যার ফলে পূর্ণাঙ্গ একটি ফিকহে ফারূকী হাতে এসে গেছে।

ফিকহে ফারূকীকে স্বকীয় বৈশিষ্ট্যে উপস্থাপন এবং হযরত উমর (রা) এর ইজতিহাজদ ও ফাতওয়াসমূহ গ্রন্থিত করার সম্ভবতঃ এটাই প্রথম পদক্ষেপ ছিল। যাতে শাহ সাহেব দ্বিতীয় পর্যায়ে সূচারুরূপে আঞ্জাম দিয়েছেন। এ বিষয়ে অদ্যাবধি কোনও পূর্ণাঙ্গ স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচিত হয়নি। বর্তমান (নিকট অতীত ১৪০১ হিজরী মোতাবেক ১৯৮১ খৃ.) কালে ড. মুহাম্মদ রাওয়াস ফাল'আজী 'মওসূ'আয়ে ফিকহে উমর ইবনুল খাত্তাব' (হযরত উমর (রা) এর ফিকহের জ্ঞানের পরিধি, ইনসাইক্লোপিডিয়া) নামে একটি বিশাল বিস্তৃত গ্রন্থ সংকলন করেছেন। যা মাকতাবাতুল ফালাহ বা আল-ফালাহ প্রকাশনী, কুয়েত এর পক্ষ থেকে ছাপা হয়েছে। এ গ্রন্থ কলেবরে বড় সাইজের ৬৮৭ পৃষ্ঠায় সংকলিত।

খোলাফায়ে ছালাছাহ (রা)-এর খেলাফতের প্রমাণ, তাদের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব, কৃতিত্ব ও খেদমতসমূহের আলোচনা এমন বিস্তারিতভাবে, যার মধ্যে শাহ সাহেবের চিন্তাধারা ও আগ্রহ-চেতনা সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় এবং যা সেই প্রয়োজনীয়তাকে পূরণ করেছে, যা এ যুগের চাহিদা ও কিতাব রচনার আসল প্রেরণা। তার আমীরুল মুমিনীন আলী মুর্তাযা (রা) -এর কৃতিত্ব, শ্রেষ্ঠত্ব ও মর্যাদাসমূহের বিবরণে বিচক্ষণতা ও সাবধানতার সাথে কাজ করেনি। তিনি তার প্রতিও পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তি, তাঁর মর্যাদা-অধিকারের স্বীকৃতি এবং সম্মানিত আহলে বাইতের সঙ্গে হৃদ্যতা-ভালবাসার আকুলতা ও পূর্ণ উদারতার সাথে বর্ণনা করেছেন। তিনি হযরত আলী (রা)-এর বৈশিষ্ট্য ও কৃতিত্বের আলোচনা নিম্নোক্ত শব্দে শুরু করেন–

ما ثر امير المؤمنين وامام الاشجعين اسد الله الغالب على بن ابى طالب رضى الله عنه.

অর্থাৎ 'আমীরুল মুমিনীন, বড় বড় বীর বাহাদুরের নেতা, আল্লাহর শক্তিশালী সিংহ আলী ইবনে আবী তালিব (রা)।' অনুরূপভাবে হযরত হাসান-হুসাইন বিশেষতঃ বড় দৌহিত্র সাইয়িদুনা হাসান মুজতবা (রা)-এর

আলোচনা পূর্ণ শ্রদ্ধা ও মুহাব্বতের সাথে করেন। রাসূলুল্লাহ (স)-এর ওফাতের পরে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলির মধ্যে হযরত উসমান (রা)-এর শাহাদাতকে প্রথম বিপর্যয় গণ্য করেছেন। আর দ্বিতীয় বিপর্যয় হিসেবে রাসূলে কারীম (স)-এর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হুসাইন (রা)-এর শাহাদাতকে ধরেছেন এবং মিশকাত শরীফের এমন এমন (বাইহাকী শরীফ থেকে চয়িত) রিওয়ায়েতে উদ্ধৃত করেছেন, যার দ্বারা বুঝা যায়, ইমাম হুসাইন (রা)-এর রাসূলে কারীম (স)-এর সাথে সেই সম্পর্ক রয়েছে, যা হয় দেহের সাথে একটি গোশত পিণ্ডের। নবী করীম (সা.) তাকে সংবাদ দিয়েছিলেন, উম্মত তাকে (ইমাম হুসাইন (রা) কে) শহীদ করে দিবে। এই বিপর্যয়ের মধ্যে হাররার ভয়াবহ ঘটনাকেও অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যেখানে ইয়াযীদের শাসনামলে তার সেনাবাহিনীর হাতে পবিত্র মদীনায় হত্যা-লুণ্ঠনের নির্লজ্জ ঘটনা ঘটেছে। চরম অসম্মানী হয়েছে মদীনা নগরী ও মদীনাবাসীদের। শাহ সাহেব বনী উমাইয়াদের ব্যাপারে স্থানে স্থানে প্রকাশ্য সমালোচনা করেছেন। এভাবে গ্রন্থটিতে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের নিদর্শন ও গৌরবময় ভারসাম্য এবং ন্যায়ানুগতাও পুরোপুরি বিদ্যমান।

নবীজীর ইন্তিকাল পরবর্তী পরিবর্তন ও বিপর্যয়সমূহ সনাক্তকরণ

এ কিতাবের আরেকটি বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এতে ইসলামের ধর্মীয় ইতিহাস, চিন্তাধারা ও ধর্মীয় বিপ্লব ও পরিবর্তনের সংক্ষিপ্ত একটি প্রকাশ্য চিত্রও উঠে এসেছে। ইসলামের রাজনৈতিক শিক্ষামূলক ইতিহাস তো অসংখ্য-অগণিত। কিন্তু এমন ইতিহাস কোথাও পাওয়া যায় না, যেখানে ইসলামের রাজনৈতিক ও সভ্যতা-সাংস্কৃতিক ইতিহাসের ক্রমধারায় নতুন চিন্তাধারা ও শিক্ষামূলক এবং চারিত্রিক পরিবর্তন ও বিপ্লবসমূহের চিহ্ন দেখা গেছে (চাই তা এতই হালকা ও সাদামাঠা হোক, যা সঠিক ইসলামী ভাবধারার জ্ঞানের কষ্টিপাথর ছাড়া দৃষ্টিগোচর হয় না)। বিভিন্ন কিতাবে সামান্য ভিন্ন বিষয়বস্তু পাওয়া যায়। কিন্তু কেউ তা নিজ আলোচনার শিরোনাম নির্ধারণ করেননি। শাহ সাহেব খায়রুল কুরূনের সাথে মিলিত পরবর্তী সময়ের ফিতনা, খায়রুল কুরূন ও শাররুল কুরূনের বিধি-বিধানের পার্থক্য এবং মৌলিক পরিবর্তনের আড়ালে সেসব পরোক্ষ ও চিন্তাগত পরিবর্তনসমূহের আলোচনা করেছেন, যা নবুওয়াতের এবং তৎপরবর্তী খায়রুল কুরূনের পরে দেখা দিয়েছে। শাহ সাহেবের ভাষায় সেসব আলোচনার শিরোনাম নিম্নরূপ-

মিথ্যার প্রকাশ। তাজবীদে কুরআনের ধ্যানমগ্নতা ও অতিরঞ্জন। পড়া ও তিলাওয়াতের ওপর যথেষ্ট করা আর কুরআনের প্রজ্ঞা ও ব্যুৎপত্তিতে ঘাটতি।

ফিকহী মাসায়েলে সূক্ষ্মদৃষ্টি আর মাসআলার কাল্পনিক যে রূপরেখা এখনও অস্তিত্ব লাভ করেনি, তা নিয়ে পূর্ব থেকেই তর্ক-বিতর্ক। মুতাশাবিহাতে কুরআন (সূক্ষ্ম আয়াতে কারীমা)-এর ব্যাখ্যা দান এবং তাতে দূরবর্তী সম্পৃক্ততা আনয়ন। আকাইদ ও খোদায়িত্বের মাঝে নতুন নতুন প্রশ্ন সৃষ্টি করা। আল্লাহর নৈকট্য লাভের নিয়তে নতুন নতুন দু'আ-দরূদ ও নানা দল আবিষ্কার, যা বর্ণিত সুন্নাতের উপর বৃদ্ধি করে। মুস্তাহাবসমূহের এমন অনুকরণ ও আবশ্যকীয়করণ, যেমনটি হওয়া উচিৎ ওয়াজিবসমূহের। ফাতওয়া দানের ব্যাপারে সামাজিক পরামর্শ আর বুযুর্গ উলামায়ে কিরামের শরণাপন্ন হওয়ার ধারাবাহিকতার বিলুপ্তি। নতুন নতুন ফিরকা- কাদরিয়া, মারজিয়া ইত্যাদির আত্মপ্রকাশ। মুসলমানদের পারস্পরিক বিশ্বাস ও নিরাপত্তা উঠে যাওয়া। শাসন ক্ষমতায় এমন লোকজন অধিষ্ঠিত হওয়া, যারা শুরু থেকেই শাসন কর্তৃত্বের অযোগ্য কিংবা দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর লোক। আরকানে ইসলাম বা ইসলামের স্তম্ভসমূহ বাস্তবায়নে অলসতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়া।

কিতাবের মুদ্রণ ও পরিবেশন

'ইযালাতুল খফা' গ্রন্থখানা প্রথমবার মৌলভী মুহাম্মদ হাসান সিদ্দীকী (র)-এর তত্ত্বাবধানে মুন্সী জামালুদ্দীন খান সাহেবের আদেশ ও দিক নির্দেশনায় ১২৮৬ হিজরী সনে বেরেলীতে সিদ্দিকী প্রকাশনীর অধীনে ছাপা হয়। এ সময় তিনটি সংস্করণের ব্যবস্থা হতে পারে। যার দ্বারা সংশোধন ও তুলনার কাজ করা হয়েছে। একটি মুন্সী সাহেবের ভূপালী সংস্করণ, দ্বিতীয়টি মাওলানা আহমদ হাসান আমরোহীর সংস্করণ, তৃতীয়টি মাওলানা নূরুল হাসান কান্ধলভীর। মনে হয় বিজ্ঞ গ্রন্থকার কিতাবের উপর পুনঃদৃষ্টিদান বা সম্পাদনার সুযোগ পাননি।

কিতাবের দ্বিতীয় মুদ্রণ ছাপা হয়েছে সুহাইল একাডেমী লাহোর, পাকিস্তানের পক্ষ থেকে ১৯৭৬ খৃ. মোতাবেক ১৩৯৬ হিজরী সনে, যা প্রথম মুদ্রণের অফসেট। কিতাবটির আরবী অনুবাদ তৈরী হয়েছে 'আল-মজলিসুল ইলমী ঢাবীল'-এর তত্ত্বাবধানে। কিন্তু আরব বিশ্বে সেটি যথাযথভাবে প্রকাশিত হতে পারেনি। ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা আবদুশ শাকুর ফারূকী লাখনৌভীর (র) এর উর্দু অনুবাদ করেন, যা কিতাবের প্রথম অনুচ্ছেদ থেকে পঞ্চম অনুচ্ছেদ (১৫৫ পৃষ্ঠা) পর্যন্ত সন্নিবেশিত হয়েছে। এর নাম 'كشف الغطاء عن السنة البيضاء' রাখা হয়েছে। প্রকাশিত এ খণ্ডের কলেবর ৩৩৬ পৃষ্ঠা। ১৩২৯ হিজরীতে 'উমদাতুল মাতাবে' লাখনৌ থেকে তা প্রকাশিত হয়েছে।

নবম অধ্যায়

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল শাসনের ক্রান্তিকালে শাহ্ সাহেবের বীরত্বপূর্ণ ও সাহসী কর্মকাণ্ড

তিনটি অনভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ শক্তি

বক্ষমান কিতাবের দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমি বলে এসেছি, হিজরী বার শতকের ভারতবর্ষ রাজনৈতিক, শাসনব্যবস্থা ও চারিত্রিক দিক থেকে বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা, অধঃপতন-অনিয়ম, অরাজকতা, লুটতরাজ, বিক্ষিপ্তাবস্থা ও অক্ষমতার এমন পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছিল, যাকে কোনও সমাজ, জাতি ও শাসনব্যবস্থার মুমূর্ষাবস্থা কিংবা নাভিশ্বাস বলা যেতে পারে। মোঘল সাম্রাজ্য একটি মুসলিম শাসকবংশের সুদীর্ঘ ও ক্ষমতাধর নেতৃত্বের স্মৃতিফলক (Symbol বা নমুনা) হয়ে বেঁচেছিল। যার পিছনে না ছিল কোনও শক্তি-ক্ষমতা, না সম্ভ্রমবোধ আর না উৎসাহ-হিম্মত। বাহ্যতঃ সে সময় মোঘল সাম্রাজ্যই নয় বরং গোটা রাজ্যের ভাগ্য নির্ধারণকারী ছিল তিনটি অনভিজ্ঞ যুদ্ধবাজ শক্তি। এগুলো যথাক্রমে মারাঠী, শিখ ও জাঠ।

মারাঠী

যাদের তৎপরতা প্রথমে দক্ষিণাত্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। এদের গুরুত্ব একটি নিয়মতান্ত্রিক সাংবিধানিক সরকারের বিরুদ্ধে এক 'বিদ্রোহী গ্রুপ' (AGITATORS) ও গুপ্তচোরা গেরিলাশক্তি অপেক্ষা বেশি ছিল না। সেই মারাঠীরা কেন্দ্রীয় শাসন ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান দুর্বলতা, ভাগ্যপরখকারী যুদ্ধবাজ নেতাদের পারস্পরিক শক্তিপরীক্ষা এবং রাজত্বের আমীর-উমারাদের অদূরদর্শিতার কারণে (যারা প্রতিপক্ষকে অপমান করা কিংবা পরাজিত করার অভিপ্রায়ে মারাঠীদের দ্বারা কাজ নিত) ভারতব্যাপী এমন একটি বৃহৎ শক্তি হয়ে যায়, যে দিল্লীর সিংহাসন দখল এবং সেই শূন্যতা পূরণ করার স্বপ্ন দেখতে থাকে, যা মোঘল শাসকদের সামরিক শক্তির দুর্বলতা ও ব্যবস্থাপনার অযোগ্যতা সৃষ্টি করে দিয়েছিল।

১৭৫৬ খৃস্টাব্দে (১১৭০ হি.) মালিহার রাও হাওলাকর ও রঘুনাথ রাও উত্তর ভারতে নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত নেয় এবং জাঠদের সাহায্যে ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে (১১৭১ হি.) দিল্লী আক্রমণ করে বসে। নাজীবুদ্দৌলাহকে বাধ্য হয়ে

সন্ধি করতে হয়। এরপর তারা পাঞ্জাবের পথ ধরে। যা ছিল ঐ গুরুত্বপূর্ণ যুদ্ধকবলিত এলাকার প্রবেশপথ, যেখান দিয়ে বিজেতা ভারতবর্ষে প্রবেশ করতে থাকেন এবং তখন পর্যন্ত যে অঞ্চল কোনও অনৈসলামিক শক্তির পদানত হয়নি। তারা ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে লাহোর দখল করে নেয় এবং আদীনাহ বেগকে নিজেদের পক্ষ থেকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে। আদীনাহ বেগের মৃত্যুর পর তারা সবাজী সিন্ধীকে পাঞ্জাবের গভর্নর নিযুক্ত করে।

সফদার জঙ্গের ইশারা ও মদদে মারাঠীরা প্রথমে (দিল্লীর শোভা বৈচিত্র্য, উলামা-মাশায়েখের কেন্দ্রস্থল) দোয়াবাতে প্রবেশ করে। এবার দাতাজী সিন্ধী ১৭৫১ খৃস্টাব্দে দক্ষিণাত্য থেকে এসে গোটা হিন্দুস্তানে জয়ের ঝাণ্ডা উত্তোলন করে। প্রথমে রোহিলাখণ্ড ১৭৫৮ খৃস্টাব্দে ও উধ যাত্রা করে এবং সে ইচ্ছায় যমুনা অতিক্রম করে। ১৭৫৯ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১১৭২ হিজরীতে যখন সমুদ্র অতিক্রমণের যোগ্য হয়, সেখান দিয়ে গোবিন্দ রায় বন্দিলাকে বিশ হাজার সৈন্যসহ রোহিলাখণ্ডে নামিয়ে দেয়। সে রাম গঙ্গা থেকে নেমে এসে দিল্লীর অনতিদূরে আমরোহা পর্যন্ত অঞ্চল লুট করে নেয়।

২৪ জুন ১৭৬০ খৃস্টাব্দে (৯ যিলহজ্জ ১১৭৩ হি.) মারাঠীরা রাজধানী দিল্লীতে প্রবেশ করে। দূর্গরক্ষী ইয়াকুব আলী খান দূর্গকে তাদের হাতে ছেড়ে দেয়। ভাও দূর্গের দায়িত্বভার শঙ্কর রাওয়ের কাছে ন্যস্ত করে। সে রাজকীয় খাছ বিচারালয়ের রৌপ্য নির্মিত বৈচিত্র্যময় ছাদ নামিয়ে ফেলে এবং টাকশালে পাঠিয়ে দেয়। কুদাম শরীফ ও হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়ার দরবারে সোনা-রূপার যত আসবাবপত্র ছিল, সবই হাতিয়ে নেয়। ১০ নভেম্বর ১৭৬০ খৃস্টাব্দ (১১৭৪ হি.) দ্বিতীয় শাহজাহানকে অপসারণ করে শাহ আলম আলী গোহার -এর যোগ্য উত্তরসূরী মির্যা জোয়ানবখতকে সিংহাসনে বসায়। সে স্বয়ং তৈমুরী সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করত। আর সে তা করতেও পারত। কিন্তু তার বিচক্ষণ সেনারা তাকে এ ইচ্ছা থেকে বিরত রেখেছিল। কেননা এতে সারা দেশে হৈ চৈ পড়ে যেত। আর প্রজা সাধারণ বাবরী সিংহাসনে কোনও মারাঠী নেতাকে উপবিষ্ট দেখে সহজে মেনে নিতে পারত না। সে সময় মারাঠীদের দৌরাত্ম্য ও আস্ফালন যে বিস্তৃতি লাভ করেছিল, তা না ইতোপূর্বে কখনও হয়েছিল আর না পরবর্তী কোনও সময়ে। এর উত্তর সীমান্ত ছিল প্রতিরুদ্ধ ও হিমালয় পাহাড়। দক্ষিণ দিকে উদীয়মান উপদ্বীপ দাক্ষিণাত্যের পিছনের অংশ অর্থাৎ সমুদ্র পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। যেসব অঞ্চল এই সীমানার মধ্যে স্বাধীন ছিল, সে তার ট্যাক্স আদায়কারী ছিল। তাদের কাছে অভিজ্ঞ সেনা কর্মকর্তা ছিল। ইউরোপের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দশ হাজার সৈন্যও ছিল তাদের নিকট। পানিপতের যুদ্ধে

তাদের নিকট পঞ্চান্ন হাজার অশ্বারোহী পনের হাজার পদাতিক, দুইশ' কামান (দূর্গ ধ্বংসকারী কামান ছাড়া) সঙ্গে ছিল। রাজপুতদের সৈন্যও তাদের সঙ্গ নিয়েছিল। এভাবে সব মিলিয়ে তিন লাখ যোদ্ধা তাদের পতাকাতলে ও নেতৃত্বাধীন ছিল। অধিকন্তু মারাঠীদের মানসিকতা বাদশাসুলভ ও দায়িত্ববোধসম্পন্ন ছিল না। ভারতবর্ষের এক ঐতিহাসিকের ভাষায় 'তারা ছিল খানিক বাদশা; খানিক লুটেরা।' জনগণের সেবা, সৃষ্টিজীবের সহমর্মিতা, মানুষের জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু হেফাজতের প্রাচীন ও উত্তরাধিকারমূলক ধারাবাহিকতা, (যা জাঁকজমক ও বিলাসিতার মুহূর্তগুলোতেও স্বাধীন রাজা-বাদশা ও শাসকদেরকে এক পর্যায়ে হেফাজত করত এবং লাগাম টেনে ধরত) সেসঙ্গে গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহাসিক পটভূমি (Back Ground) না থাকা এবং সুউচ্চ ও স্বচ্ছ সৃজনশীল, গঠনমূলক ও রাজনৈতিক লক্ষ্য-উদ্দেশ্য বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কারণে, তদুপরি পৌত্তলিকতা, হিন্দু ধর্মমত ও সংস্কৃতি (Hindu Revivalism) পুনর্জীবিত করার আগ্রহ-উদ্যম তাদের মধ্যে আগ্রাসন, সিদ্ধান্ত গ্রহণে বা মীমাংসায় তড়িঘড়ি ও অসহিষ্ণুতার বদস্বভাব জন্ম দিয়েছিল। লুণ্ঠিত সম্পদ ও এর মোহ ছিল তাদের জাতীয় দুর্বলতা।

মারাঠীদের যুদ্ধবাজিতে হিন্দু-মুসলমান সকলেই প্রভাবিত হয়ে পড়ত। গ্রামগুলোকে নির্বিচারে লুণ্ঠন করা, মানুষের হাত-পা, নাক-কান কেটে নেওয়া তাদের জন্য অস্বাভাবিক কিছু ছিল না। আক্রমণকারীদের লালসার শিকার হত জাতি-ধর্মের পার্থক্যবিহীন গোটা নারী সমাজ। এখানেও সব ধরনের সীমালঙ্ঘন করে পাশবিকতা ও হিংস্র বর্বরতার প্রদর্শনী চলতে থাকে। বাংলা মুলুকের প্রসিদ্ধ কবি গঙ্গারাম বাঙালীদের উপর তাদের নানা আক্রমণের পর্যালোচনা করে এসব প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন।

পর্তুগালের লেখকগণও মারাঠীদের চরিত্র-বিধ্বংসী লোমহর্ষক কর্মকাণ্ডের উপর নিজেদের বিস্ময় প্রকাশ করেছেন। মারাঠীদের কর্তৃত্ব-শক্তির বিরাট অর্থনৈতিক প্রভাব পড়ে জনসাধারণের উপর। মাওলানা গোলাম আলী আযাদ বলঘারামীর উক্তি মতে– 'তাদের ইচ্ছা ছিল, যতদূর তাদের সাধ্য-ক্ষমতায় কুলায়, তারা সৃষ্টিজীবের অর্থনৈতিক পথগুলো অবরুদ্ধ করে নিজেদের করায়ত্বে নিয়ে নিবে।' মারাঠীরা মোঘল সাম্রাজ্যের সেসব দূর্দশাগ্রস্থ এলাকা থেকে এক-চতুর্থাংশ খাজনা উসূল করত, যারা ছিল তাদের দয়া ও করুণাভিখারী।

মারাঠীদের আক্রমণ কেবল সামরিক স্থাপনা ও জনসাধারণের শোষণেই সীমাবদ্ধ ছিল না, তারা হিন্দু ধর্মমত ও সংস্কৃতির 'পুনর্জীবন দান' (Revivalism) এর উপরও ভিত্তিশীল ছিল। এই আন্দোলনের প্রধান

নেতা শীবাজী সম্পর্কে মাউন্ট রেস্টওয়াট এলফানেস্টন (বোম্বাই গভর্নর) তার ভারত ইতিহাসে লিখেন, 'তাদের মানসিকতা হিন্দু (পৌত্তলিক) উগ্রবাদের দীক্ষা পেয়েছিল। .... এই মানসিকতায় বাধ্য হওয়ার কারণে তারা মুসলমান ও তাদের সভ্যতা-সংস্কৃতি -এর প্রতি চরম ঘৃণা-বিদ্বেষ আর হিন্দু সম্প্রদায় ও তাদের রীতিনীতির প্রতি গভীর আকর্ষণ রাখত। এই উন্নতি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছিল। তাদের এই মানসিকতা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতায় এত সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছিল যে, তারা দেবদেবীর মূর্তি বানাল এবং অবতারদের অলৌকিকতা-কারামত ও দেবতাদের সাহায্যের দাবী করল।'

পানিপতের যুদ্ধে শেষ ফায়সালা হওয়ার পূর্বে এবং অবস্থা-পরিস্থিতির স্পর্শকাতরতা ভেবে তারা নবাব শুজাউদ্দৌলাহর মাধ্যমে (ইতোপূর্বে যার মনে মারাঠীদের ব্যাপারে নমনীয়তা ছিল) শাহ আবদালীর সঙ্গে আপস মীমাংসার চেষ্টা করল। শুজাউদ্দৌলাহ ক্রমাগত এসব অভিজ্ঞতা ও নিগূঢ় বাস্তবতার ভিত্তিতে তাদেরকে যে জবাব দিয়েছেন, তাতে মারাঠীদের জাতীয় চেতনা, মানসিকতা এবং তাদের বিজয়-সাফল্যের প্রভাব ও ফলাফলের চমৎকার এক চিত্র অঙ্কিত হয়। নবাব শুজাউদ্দৌলাহ বলেন, 'দক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ দীর্ঘকাল ধরে ভারতের উপর আধিপত্য কায়েম করে আছে। তাদের মাথায় লোভ-লালসার উগ্রতা এবং অঙ্গীকার ভঙ্গ ও কথার লাগামহীনতার কারণে এই দুঃখ-কষ্ট এসেছে দুররানী সম্রাটদের। এমন লোকদের সঙ্গে কেউ কি সন্ধি করবে, যারা কারও ইজ্জত-আব্রু ও সুখ-শান্তির, আরাম-আয়েশ সহ্য করতে পারে না, সব জিনিসকেই যারা নিজের এবং স্বজাতির জন্য মনে করে? অবশেষে সবাই তাদের হাতে এমন অক্ষম হয়েছে, যার ফলে তারা নিজের সাফল্য-সম্মান, ইজ্জত রক্ষা, জনকল্যাণ ও সৃষ্টিসেবার জন্য শাহ আবদালীকে মিনতি করে রাজত্বসহ আহবান করেছেন। আর এর শোকাশ্রুপাতকে মারাঠীদের দূর্ভোগ থেকে সহজ মনে করেছে।'

অবশেষে ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে (১১৭৪ হি.) পানিপতের যুদ্ধে আহমদ শাহ আবদালীর আফগান সামরিক বাহিনী, নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর রোহিলা সৈন্য এবং নবাব শুজাউদ্দৌলাহর সৈন্যের সম্মিলিত শক্তির হাতে মারাঠীদের শোচনীয় পরাজয় হয়। জনৈক ঐতিহাসিকের ভাষায়, 'মারাঠীদের শক্তি চোখের পলকে তুলার মত উড়ে যায়।' আহমদ শাহ আবদালীর আগমনের কারণ ও প্রেক্ষাপট এবং তার চূড়ান্ত যুদ্ধ, যা ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছে, এর আরও বিশদ বিবরণ শাহ সাহেবের নেতৃত্বপূর্ণ কৃতিত্বের বর্ণনায় সামনে অত্যাসন্ন।

শিখ

শিখ পাঞ্জাবের একটি সাধক ধর্মীয় সম্প্রদায়। যাদের উত্থান হয়েছে পনের খৃস্ট শতকে গুরু বাবা নানক (১৪৬৯-১৫৩৯ খৃ.)-এর হাতে। সে প্রবৃত্তি দমনের সাধনা, চারিত্রিক জ্ঞান ও সততার শিক্ষা দিত। 'সিয়ারুল মুতাআখখিরীন' -এর বর্ণনা মতে বাবা নানক ফার্সী ও ধর্মজ্ঞানের শিক্ষা লাভ করেছিল বুযুর্গ সাইয়িদ হাসান থেকে। বাবা নানকের উপর তাঁর বিশেষ দৃষ্টি ছিল। তৃতীয় গুরু ইমর দাস শিখদের ধর্মীয় ও সামাজিক ব্যবস্থাপনার ব্যাপারে সর্বপ্রথম পদক্ষেপ নেয়। বাদশা আকবরও তার আস্তানায় তার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়েছেন এবং তাকে একটি বিরাট জায়গীর দান করেন। সে আচার-ব্যবহার ও চারিত্রিক শিক্ষায় গুরু নানকের শিক্ষার প্রাণ অক্ষুণ্ন রাখে। আর হিন্দুদের অলীক কল্পনা পূজা বিশেষতঃ সতীদাহ প্রথার প্রকাশ্য বিরোধিতা করেন এবং বিধবা বিবাহের বিধান চালু করেন। আকবর ১৫৭৭ খৃস্টাব্দে তাকে এক বিস্তৃর্ণ ভূ-খণ্ড দান করেন। তার যুগেই ইমর তেসার-এর উত্থান হয়। এভাবে শিখদের জাতীয় জীবনের জন্য একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র তৈরী হয়ে যায়।

১৫১৮ খৃস্টাব্দে গুরু আরজন স্বীয় পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়। সে শিখদেরকে একটি জাতির মর্যাদায় সুশৃঙ্খল করার আরও অধিক প্রচেষ্টা চালায় এবং গ্রন্থ সংকলনের ধারাবাহিকতা চালু করে। গুরু আরজন স্বয়ং নিজেকে 'সৎ বাদশা' নামে অভিহিত করে। যা তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্খার ইংগিত দেয়। সম্রাট জাহাঙ্গীরের নির্দেশে তাকে লাহোরে বন্দি করা হয়। কেননা সে তার বিদ্রোহী যুবরাজ খসরুকে আর্থিক সাহায্য দিয়েছিল। সেখানে তাকে হত্যা করা হয়। তার স্থলাভিষিক্ত হরগোবিন্দ মামুলী প্রতিরোধ ও বাঁধা দানের কর্মনীতি গ্রহণ করে, যার দ্বারা শিখদের সামরিক জীবনের সূচনা হয়। তারা দ্রুত রাজকীয় পদ গ্রহণ করে ফেলে। সে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে শত্রুতা পোষণ করত এবং স্বীয় পিতার মৃত্যুর দায়ভার তার উপর চাপাত। তারা হরগোবিন্দপুরে একটি মজবুত দূর্গ বানায়। সেখান থেকে দলে দলে বেরিয়ে এসে চিহ্নিত অঞ্চলগুলোতে লুঠতরাজ করত। জাহাঙ্গীর তাকে গোয়ালিয়র দূর্গে নজরবন্দি করে রাখেন। কিন্তু কিছুদিন পর মুক্ত করে দেন এবং তাকে বিরাট সম্মান দেন। শাহজাহান সিংহাসনে আরোহন করার সাথে সাথে তার মতিগতি পাল্টে যায় এবং সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে বসে। অবশেষে সে পাহাড়ী অঞ্চলের দিকে চলে যায় এবং ১৬৪৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করে।

১৬৬৪ খৃস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেবের শাসনামলে হরগোবিন্দের পুত্র তেগ বাহাদুর গুরু নির্বাচিত হয়। সে অন্যান্য ফেরারী ও বিদ্রোহীদের আশ্রয় দেয়। তার নেতৃত্ব দেশের উন্নতির পথে বাঁধা হয়ে দাঁড়ায়। রাষ্ট্রীয় সৈন্যরা তার উপর আক্রমণ করে এবং তাকে বন্দি করে দিল্লী নিয়ে আসে। সেখানে তাকে সম্রাট আওরঙ্গজেবের নির্দেশে ১৬৭৫ খৃস্টাব্দে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়। তার মৃত্যুর পর তার পুত্র গোবিন্দ রায়কে গুরু নিযুক্তি দেওয়া হয়। সে এই শিখদেরকে, যারা প্রথমে নিছক একটি ধর্মীয় গুণকীর্তনকারী দল ছিল, তাদেরকে একটি যুদ্ধবাজ জাতি বানিয়ে দেয়। সে শিখদের মধ্যে গণতান্ত্রিক সাম্যের আবেগ-অনুভূতি উস্কে দেয় এবং তাদেরকে একটি জাতিরূপে সংঘবদ্ধ করার তৎপরতা চালায়। আওরঙ্গজেবের ইন্তিকাল পর্যন্ত সে বেঁচে ছিল। এরপর সে আওরঙ্গজেবের উত্তরসূরী বাহাদুর শাহ গুরুর সঙ্গে সমঝোতার চেষ্টা করে এবং তাকে দক্ষিণাত্যের সামরিক কামান দান করে দেয়। কিন্তু সে অক্টোবর ১৭০৮ খৃস্টাব্দে জনৈক আফগান সৈনিকের আঘাতে মুমূর্ষু অবস্থায় মারা যায়। কাউকে সে তার স্থলাভিষিক্ত করে যায়নি। তার অনুসারীদেরকে নির্দেশ দিয়ে যায়, যেন তারা গ্রন্থকে তাদের ভবিষ্যৎ গুরু এবং স্রষ্টাকে নিজেদের একমাত্র রক্ষাকারী জ্ঞান করে।

হরগোবিন্দের স্থলাভিষিক্ত হয় দাস বৈরাগী। যে শিখদের সেনা কমান্ডার ছিল। (প্রকৃতপক্ষে সে ছিল একজন কাশ্মীরী রাজপুত্তুর, যে শিখ মতবাদ গ্রহণ করেছি) সে পাঞ্জাবে ব্যাপকাকারে লুটতরাজ শুরু করে। আওরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর মোঘল সাম্রাজ্যে অতি দ্রুত পতন আসতে শুরু করে। তার পুত্র ও পৌত্রদের মাঝে ক্ষমতা দখলের জন্য অব্যাহত যুদ্ধ-বিগ্রহ শুরু হয়ে যায়। যার ফলে শিখরা প্রকাশ্যে নিজেদের শক্তি বৃদ্ধির সুবর্ণ সুযোগ পেয়ে বসে। দাস বৈরাগী হাজার হাজার মুসলমানাকে নির্বিচারে হত্যা করে এবং গ্রামের পর গ্রাম লুণ্ঠন করতে করতে একেবারে দিল্লীর সন্নিকটে গিয়ে পৌঁছে। সে ১৭১০ খৃস্টাব্দে গোটা ভারতে বেপরোয়া আক্রমণ শুরু করে। হত্যা-লুটতরাজের জন্য উন্মুক্তভাবে তার জাতিকে ছেড়ে দেয়। গ্রামের মানুষের উপর (বয়স ও জাতির পার্থক্য ছাড়া) নির্বিশেষে ভয়াবহ জুলুম-নিপীড়ন চালাতে থাকে। বাহাদুর শাহ পাঞ্জাব যাত্রা করেন। সরকারী সৈন্যরা দাসকে পরাজিত করে দেয়। কিন্তু দাস পাহাড়ী অঞ্চলে চলে যায়। ফুররাখ সিয়ার ক্ষমতাসীন হওয়ার পর রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা ও রাজবংশের অন্তর্দ্বন্দ্বে ফায়দা লুটে দাস বৈরাগী পুনরায় ত্রাস সৃষ্টির মাধ্যমে কাজ করতে শুরু করে। অবশেষে ১৭১৬ খৃস্টাব্দে তাকে দিল্লীতে গ্রেফতার করে হত্যা করা হয়।

শিখদের কাছেও সে কোনও শ্রদ্ধাভাজন ও প্রিয় ব্যক্তিত্ব ছিল না। সে শিখ ধর্মের আকীদা-বিশ্বাস এবং আরাধনা-উপাসনায়ও কিছুটা রদবদল করেছিল। তার নেতৃত্বে শিখ একটি সামরিক শক্তি হয়ে যায়। ফুররাখ সিয়ারের শাসনামলে পাঞ্জাবের মোঘল গভর্নর মঈনুল মালিক (যিনি মীর মন্নু নামে অধিক প্রসিদ্ধ) ফুররাখ সিয়ারের শাস্তির কৌশল চালু রাখেন। কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্যের পতনের গতি দ্রুততর হয়ে গিয়েছিল। পাঞ্জাবের শাসনব্যবস্থা আহমদ শাহ আবদালীর অব্যাহত আক্রমণের কারণে বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিল। শিখদের পুনরুত্থানের সুযোগ হয়ে যায়। তারা না কেবল আহমদ শাহ দুররানীর পুত্র যুবরাজকে উৎখাত করতে সক্ষম হয় (যিনি পাঞ্জাবের শাসক ছিলেন এবং মির তেসারের উপর আক্রমণ করে সকল মন্দির ধ্বংস এবং ধর্মীয় জলাশয়কে খড়কুটোয় ভরে দিয়েছিলেন) বরং লাহোরের উপর অস্থায়ী দখলও প্রতিষ্ঠা করেছিল। আর তার সেনা কমান্ডার জাসশা সিং কেলাল নিজ নামে মুদ্রাও চালু করে বসে। কিন্তু ব্যাপক ত্রাসের মধ্য দিয়ে মারাঠীদের আগমনে (১৭৫৮ খৃ.) সে লাহোর থেকে পালিয়ে যায়। আহমদ শাহ পঞ্চমবার পাঞ্জাব যাত্রা করেন। পানিপতের প্রসিদ্ধ সেই যুদ্ধ, যা মারাঠা শক্তির কোমর ভেঙে দেয়, এর পরে তিনি পাঞ্জাব ত্যাগ করেন। শিখরা পুনরায় ফিরে আসে এবং তারা তাদের হারানো রাজত্ব পুনরুদ্ধার করে নেয়। আহমদ শাহ আবার ফিরে আসেন এবং লোধিয়ানায় ১৭৬২ খৃস্টাব্দে তিনি তাদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাভূত করেন। কিন্তু চলে যাওয়ার পর ১৭৬৩ খৃস্টাব্দে শিখরা সমগ্র ভারতকে লুটতরাজ করে বিরান করে দেয় এবং আরেকবার লাহোর দখল করে স্বাধীন রাষ্ট্রের ঘোষণা করে বসে। এরপর শিখ একাধিক রাজত্ব ও দলে-উপদলে (যাদেরকে সাজাপ্রাপ্ত বলা হয়) বিভক্ত হয়ে যায়। তাদের কোনও প্রধান শাসক নির্দিষ্ট ছিল না এবং ধর্মমত ছাড়া তাদের মাঝে কোনও ব্যাপারে মিলও ছিল না। ত্রিশ বছরের এই অপরিবর্তিত অবস্থাচিত্রের পর পাঞ্জাবে রঞ্জিত সিংহের ভাগ্যরবি চমকে উঠে। সে ঐ বিচ্ছিন্ন দলগুলোকে একটি শক্তিশালী রাজত্বরূপে ঐক্যবদ্ধ করে।

শিখ ধর্মের মূল অবকাঠামো ছিল হিন্দুদের ধর্মীয় আকীদাগুলোর পরিশোধক রূপমাত্র। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, বাবা নানক ইসলামী শিক্ষায় প্রভাবিত ছিল। কাজেই তার তাওহীদের আকীদা, মানবজাতির সাম্য এবং মূর্তিপূজা থেকে বেঁচে থাকা ইত্যাদি ছিল ইসলামের প্রভাবের ফল।

শিখদের ধর্মীয় সাহিত্যের ভাষায় ফার্সীর বিরাট প্রভাব রয়েছে। বিশেষতঃ আদি গ্রন্থে ফার্সী ও ইসলামী, ধর্মীয় এবং সূফীসুলভ শব্দাবলির ব্যাপক সংমিশ্রণ রয়েছে।

খুবই সম্ভাবনা ছিল, এই সংস্কার আন্দোলন (যদি তারা স্বীয় মূলনীতিতে কঠোরভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকত এবং হিন্দুধর্ম ও সভ্যতায় প্রবিষ্ট না হয়ে যেত) ভারতীয় সমাজে কোনও বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনবে এবং হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা একটি ভিন্ন গোষ্ঠী হবে, যার মূল ভিত্তি হবে তাওহীদ (একত্ববাদ) ও সাম্য। আর এভাবে তারা মুসলমানদের রূপে শিখ জাতির আত্মপ্রকাশ ধর্মীয় দল বলে স্বীকৃত হত। কিন্তু সমকালীন শাসনব্যবস্থার সঙ্গে সংঘর্ষ এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও পার্শ্ব প্রতিক্রিয়ার নির্দয় ঘূর্ণিপাক, ধর্মীয় ও চারিত্রিক পরিণতি সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে বরাবরই তারা সময়ের চাহিদা ও দলীয় স্বার্থ পূরণের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে । আর তা-ই শিখদেরকে মুসলিম শাসন ব্যবস্থাই নয় বরং সাধারণ মুসলমানদের থেকে দূরে, বিদ্বেষী ও ঘৃণাকারী এবং তাদের সঙ্গে মাথার উপর বর্শার ফলা (দা-কুমড়া) অবস্থা বানিয়ে দিয়েছে। বিশেষতঃ হিজরী বার শতক আর খৃস্ট আঠার শতকের মধ্যভাবে তাদেরকে ভারতবর্ষের বিচ্ছিন্নবাদী শক্তিগুলোকে আরও এক ধাপ বৃদ্ধি এবং বড় বড় শহরের নিরাপদ শান্তিপ্রিয় নাগরিকদের জন্য একটি ভয়ঙ্কর ত্রাস ও আতঙ্ক সৃষ্টিকারী শক্তি পরিণত করে দেয়। তাদের শাসনামলে প্রায় আর মহারাজা রঞ্জিত সিংয়ের শাসমলে বিশেষভাবে মসজিদ ও কবরস্থানগুলোর অসম্মান হয়েছে। ইবাদত-বন্দেগীতে বাঁধা দেওয়া হয়েছে। এমন সব পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে, যার বিবরণ আল্লামা ইকবাল নিম্নোক্ত পংক্তিতে দিয়েছেন,

[illegible]

[illegible]

শিখসেনা নিয়ে গেছে কুরআন তরবারী,
মরেছে এদেশের মুসলমানিত্ব ও ঈমানদারী।

উদ্ভূত এই অবস্থা-পরিস্থিতির বিরুদ্ধে হিজরী তের শতকের প্রায় মধ্যভাগে আর উনিশ খৃস্ট শতকের প্রথম তৃতীয় দশকে হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (১২৪৬ হি./১৮৩০ খৃ.) এবং মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) (১২৪৬ হি./১৮৩০ খৃ.) যারা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর মহা বিদ্যাপীঠের শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং তার বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র শাহ আবদুল আযীয (র)-এর প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত -এই দু'জন রঞ্জিত সিংয়ের সামরিক শাসনের বিরুদ্ধে জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন করেন। আর এর মধ্য দিয়ে সেই সুদূরপ্রসারী গভীর পরিকল্পনা এবং যুদ্ধের সূচনা করেন, যা ভারতবর্ষকে বিদেশী শাসন (ও

পরাধীনতার শৃঙ্খল) থেকে স্বাধীনতা অর্জন, শরয়ী শাসন প্রতিষ্ঠা, মুসলিম সমাজের সংস্কার, সংশোধন ও পরিশুদ্ধি এবং দীনকে পুনর্জীবিত করার জন্য শুরু করেছিলেন।

জাঠ

জাঠ মারাঠীদের মত না সুশৃঙ্খল কোন গোষ্ঠী ছিল আর না শিখদের মত কোনও ধর্মীয় দল ছিল। কিন্তু মোঘল সাম্রাজ্যের দুর্বলতা, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সাধারণ জনপদগুলোর নিয়ন্ত্রণহীনতার অনুভূতি তাদের মধ্যে এক ধরনের প্রত্যাখ্যানমূলক ও আক্রমণাত্মক আগ্রহ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। আর তারা কালক্রমে একটি নাশকতা ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী শক্তি হয়ে উঠছিল। যাদের উদ্দেশ্য রাজত্ব প্রতিষ্ঠা এবং কোনও রাজনৈতিক বিপ্লব ছিল না; শুধুমাত্র গোলযোগ ও বিশৃঙ্খলাপূর্ণ পরিস্থিতি থেকে সাময়িক ফায়দা হাসিল করা। শোষণ ও অর্থনৈতিক উদ্দেশ্য পূরণ করা ছিল লক্ষ্য।

প্রফেসর খলীক আহমদ নিযামী তার 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) কে 'রাজনৈতিক পত্রাবলি' গ্রন্থে লিখেন, 'যমুনার দক্ষিণাঞ্চল আগ্রা থেকে দিল্লী পর্যন্ত জাঠরা বসবাস করত। তাদের পূর্ব সীমানা ছিল মালতী এলাকা। এ অঞ্চলে তাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের অবস্থা এমন ছিল যে, কেন্দ্রীয় সরকারের নিরাপত্তা ব্যবস্থার নাভিশ্বাস উঠে গিয়েছিল। সরকারের উক্তিমতে দিল্লী ও আগ্রার সড়কের উপর এমন কাটা সহ্য করা যেত না। (Fall, Vol-1, P- 369)

দিল্লী থেকে আগ্রা যাতায়াতে খুব সতর্কতা অবলম্বন করতে হত। আজমীর হয়ে দক্ষিণাত্যে যেসব সৈন্য যেত, তাদের এই অঞ্চল দিয়েই যেতে হত।

বাহাদুর শাহের যুগে এই সড়কের ভয়াবহ অবস্থার ধারণা 'দস্তুরুল ইনশা' পাঠ করলে উপলব্ধি করা যায়। (দেখুন, ১৩০ পৃ.)

১৭১২ খৃস্টাব্দে যখন ডাচ নেতৃবৃন্দ এই অঞ্চল দিয়ে গমন করেন, তখন তারাও এই যুদ্ধ-বিগ্রহ দেখেছেন। (Later Mughas, T. P. 321)

জন ম্যার ম্যান (John Surman) জুন ১৭১৫ খৃস্টাব্দে এ অঞ্চল দিয়ে অতিক্রম করেছিলেন। তিনি জাঠদের শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডের আলোচনা নিজ ডায়েরীতে লিখেছেন। (Orme Collections, p : 1694)

শাহ জাহানের যুগে জাঠরা একবার মারাত্মক বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করেছিল। ১০৪৭ হি. মোতাবেক ১৬৩৭ খৃস্টাব্দে মথুরার সেনানায়ক মুর্শিদ কুলী খান মারা গিয়েছিল তার সঙ্গে যুদ্ধ করে।

স্যার যদুনাথ সরকার তারীখে আওরঙ্গযেব পঞ্চম খণ্ড ২৯৬ পৃষ্ঠায় লিখেন, আওরঙ্গজেব দক্ষিণ ভারতে না থাকার সুযোগ নেয় দুই নতুন জাঠ নেতা রাজা রাম এবং রাম চেহারাহ। রাজা রামের বেআইনী শান্তিবিনাশী কর্মকাণ্ডকে আগ্রার গভর্নর খাফী খানও দমন করতে পারেনি। জাঠরা সব রাস্তা বন্ধ করে দেয়। অনেক এলাকা লুটতরাজ করে। আকবরের কবর লুণ্ঠন করার জন্য সেকান্দারাহ যাত্রা করে। কিন্তু সেখানকার সেনাপ্রধান ছিলেন মীর আবুল ফযল। তিনি বীরত্বের সাথে লড়াই করেন এবং বিদ্রোহীদের সামনে অগ্রসর হতে বাধা প্রদান করেন। রাজা রাম প্রসিদ্ধ তাওরানী অফিসার আসগর খানের সকল জিনিসপত্র লুণ্ঠন করে। অনন্তর আসগর খান জাঠদের সঙ্গে লড়াই করে মারা যান।

'চাহার গোলজারে শুজাঈ' বা 'চার বীরের গাঁথা' রচয়িতা হরিচরণ দাসের বর্ণনামতে জাঠরা পুরান দিল্লী লুণ্ঠন শুরু করে। তখন দিল্লীর অধিবাসীরা আতঙ্ক ও পেরেশানীতে ঘর থেকে বেরিয়ে উন্মাদ হয়ে অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়াত। ঠিক তদ্রূপ, যেমন কোনও বিদীর্ণ জাহাজ নিষ্ঠুর তরঙ্গমালায় দয়া করুণার উপর থাকে। প্রত্যেককেই পাগলের মত বিষণ্ন, ভীত-সন্ত্রস্ত দেখা যেত। (হস্তলিখিত সংস্করণ : ৪১০ পৃ.)

মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব ১৭৬৫ খৃস্টাব্দের ঘটনাবলিতে লিখেন, 'আগ্রার দূর্গে জাঠদের দখলদারিত্ব ছিল। দিল্লী থেকে একশত মাইল পর্যন্ত জাঠদের রাজত্ব ছিল। রাজা সুরুজমল ছিল অত্যন্ত সচেতন, সেনাভিযানে সুপরিচিত ও দেশ জয়ে দক্ষ । সে আগ্রা থেকে মারাঠী নেতাকে বের করে দেয় এবং মেওয়াত দখল করে নেয়। সে খুবই মজবুত চারটি দূর্গ বানায়। সে দিল্লীর প্রশাসনের কাছে এমন এমন আবেদন শুরু করে, ফলে রাজত্বের নামচিহ্নও না থাকে। নাজীবুদ্দৌলাহ তার নিপুণ কর্মকৌশল আর বেলুচীদের সাহায্যে জাঠদের উপর জয়লাভ করেন। রাজা সুরুজমল নাজীবুদ্দৌল্লাহর লড়াইয়ে দিল্লীর কাছেই মারা যায়। এরপর জাঠদের রাজত্বে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ চলে। সুরুজমলের দুই পুত্র মারা পড়ে। তৃতীয় পুত্র রঞ্জিত সিংহ রাজা হয়। তার যুগে জাঠ রাজত্বের বিরাট উন্নতি হয়। যে দেশে সে শাসন করত, তার উত্তর পশ্চিমে ছিল আলবর আর দক্ষিণ পূর্বে আগ্রা। তার মাসিক আয় ছিল দুই কোটি রুপি। ষাট হাজার সৈন্য তার নিকট ছিল।

দিল্লীর অবস্থা

মারাঠী, শিখ ও জাঠদের নিত্যনৈমিত্তিক আক্রমণসমূহের কারণে দিল্লী তার নিরাপত্তা আর প্রতিরোধের সব ধরনের শক্তি ও যোগ্যতা হারিয়ে এমন

ফলবিহীন ও অরক্ষিত বৃক্ষ হয়ে গিয়েছিল, যার উপর চতুর্দিক থেকে হিংস্র বন্যরা আক্রমণ করত এবং একে পত্রপল্লব থেকে বঞ্চিত করে দিত। দিল্লীর অধিবাসীগণ যাদেরকে গোটা সাম্রাজ্যে না শুধু ইজ্জত-সম্মানের দৃষ্টিতে দেখা হত বরং শিক্ষা, ভাষা, সভ্যতা, ভদ্রতা, আভিজাত্য, স্বভাব-চরিত্র এবং রীতিনীতিতেও কষ্টিপাথর মনে করা হত, তারা আজ আক্রমণকারীদের জন্য লুটের মালের দস্তরখান হয়ে গিয়েছিল। এ যুগের উলামা-মাশায়িখের (যাদের নিদর্শন আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্কহীনতা ও ভাগ্যের উপর সন্তুষ্টি) চিঠিপত্র থেকেও, যা তারা তাদের ভক্ত-অনুসারী ও প্রিয়জনদেরকে লিখেছেন, এই নিরাপত্তাহীনতা, অনিশ্চয়তা ও অবিশ্বাসের অনুমান করা যায়। এখানে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর প্রসিদ্ধ সমসাময়িক এবং সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়ায়ে মুজাদ্দেদিয়ার শিরোমণি হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (১১১১-১১৯৫ হি.) এর চিঠিপত্রের কয়েকটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে। তিনি একটি চিঠিতে লিখেন, 'দিল্লীর নিত্যকার যুদ্ধ-বিশৃঙ্খলা ও অনিশ্চয়তায় ভারী বিপদগ্রস্ত হয়ে পড়েছি।'

অপর একটি পত্রে লিখেন, 'চতুর্দিক থেকে বিপদ-বিপর্যয় দিল্লীর দিকে ধেয়ে আসছে।'

আরেকটি পত্রে রাজধানী দিল্লীর নিরাপত্তাহীনতা এবং শহরবাসীর শোচনীয় অবস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেন, 'ব্যাপক রোগ-ব্যাধি ও নিরাপত্তাহীনতার কারণে শহরবাসীর পেরেশানী-দুরাবস্থার কথা কতদূর লেখা যায়। আল্লাহ তা'আলা এ শহর থেকে, যা খোদায়ী ক্রোধ অবতরণের স্থান হয়ে যাচ্ছে- বাইরে বের করে নিন। কেননা রাজত্বের কাজকর্মে কোনও আইন-শৃঙ্খলা টিকে নেই। আল্লাহ তার অনুগ্রহ করুন।'

নাদের শাহের আক্রমণ

শাহ সাহেব ১১৫৪ হিজরীতে হজ্জের সফর থেকে দিল্লী প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। মাত্র পাঁচ বছর অতিক্রান্ত হয়েছিল, ১১৫১ হি./১৭৩৮ খৃস্টাব্দে নাদের শাহ দিল্লী আক্রমণ করেন। এ আক্রমণ মোঘল সাম্রাজ্যের সুস্থ সঠিক চূড়াগুলো বাকিয়ে দেয় এবং দিল্লীর মাটি উড়িয়ে দেয়। এই আক্রমণ দিল্লীর আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন শহরবাসী ও সম্ভ্রান্ত বংশগুলোর মন-মগজে এমন প্রভাব বিস্তার করে যে, তারা জীবন থেকে বিতৃষ্ণ, লজ্জিত এবং নিজ হাতে নিজের মৃত্যুর ব্যবস্থা করার জন্য প্রস্তুত ছিল। শাহ আবদুল আযীয (র)-এর উপদেশবাণীতে রয়েছে, তিনি এ অবস্থার বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, 'সেই গণহত্যা, মান-সম্মানের মূলোৎপাটনের সময় পুরোনো দিল্লীর অভিজাত শ্রেণী, প্রবীণ রাজপুতদের রীতি অনুযায়ী 'জোহার' (তথা অভিজাত

রাজপুতদের শোচনীয় অবস্থায় পরিবার-পরিজনদেরকে তরবারীর নিচে রেখে স্বয়ং জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দেওয়া) এর অকাট্যভাবে মনস্থির করে নিয়েছিল। এহেন পরিস্থিতিতে মুহতারাম আব্বাজান (শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) মুসলমানদেরকে 'কারবালার ঘটনা এবং সাইয়্যিদুনা হুসাইন (রা)-এর কষ্ট-যাতনার কথা স্মরণ করিয়ে দিয়ে এই ইচ্ছা থেকে বিরত রাখেন। ফলে তারা সেসব লোমহর্ষক ও কল্পনাতীত কষ্ট-যাতনা সত্ত্বেও ধৈর্য এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির পথ গ্রহণ করে। পরিত্যাগ করে ধূলি ধূসরিত হওয়া, আত্মহত্যা ও আত্মহননের ইচ্ছা।'

প্রতিকূল ও লোমহর্ষক অবস্থায় শিক্ষাদান ও গ্রন্থ রচনায় একাগ্রতা

মারাঠী, জাঠ, শিখ এবং নাদেরী আক্রমণের হৃদয়বিদারক দুঃখ-দূর্দশা ও টলটলায়মান অবস্থায় মধ্যে, যা দিল্লীকে টুকরো টুকরো করে দিয়েছিল এবং যখন মাঝে-মধ্যেই বাড়িঘর স্থানান্তরিত করতে হয়েছে। 'আল কাওলুল জলী' থেকে জানা যায়, ১১৭৩ হিজরীতে দুররানী ফিৎনাকালে শাহ সাহেব (র) তার ভক্ত-অনুসারী-খাদেমদের আবেদনে প্রিয় জন্মভূমি ছেড়ে সপরিবার ও শুভাকাঙ্খীগণ স্থানান্তরিত হয়ে বড়হানায় তাশরীফ রাখেন। রমাযান মাস চলে এলে পূর্বের নিয়ম অনুযায়ী এক চিল্লার ইতিকাফও করেন। শাহ সাহেব (র) শিক্ষাদান, গ্রন্থ রচনা, আল্লাহর রাহে দাওয়াত, আত্মশুদ্ধি ও সালেকের তরবিয়ত প্রদানের কাজ সেই সামগ্রিকতা, সার্বজনীনতা, গুরুত্ব ও যত্নের সাথে করতে থাকেন, যাতে মনে হয় দিল্লীই নয়, গোটা ভারতবর্ষে ভারসাম্য ও শান্তিপূর্ণ অবস্থা রয়েছে। আর তিনি এক নিরাপদ স্থানে বসে জ্ঞান-গবেষণা, চিন্তাগত দিকনির্দেশনা, চারিত্রিক দীক্ষা দান ও জাতির পুনর্জাগরণের কাজে আপদমস্তক নিয়োজিত রয়েছেন। মাওলানা সাইয়িদ সুলাইমান নদভী (র) অত্যন্ত চমৎকার সাহিত্যালঙ্কারে এই বাস্তবতার প্রতি ইংগিত করেছেন। তিনি লিখেন, 'এরূপ কম লেখকই অতিবাহিত হয়েছেন, যাদের রচনাবলিতে তার যুগের প্রাণ (বাস্তব অবস্থা) নেই কিংবা তাতে স্থান-কালের প্রতিচ্ছবি আর অন্ততঃ নিজ যুগের শিক্ষাগত অবমূল্যায়ন ও দুরাবস্থাসমূহের বর্ণনা নেই। তবে শাহ সাহেবের রচনাবলির বৈশিষ্ট্য এমন যে, তার স্থান-কালের সীমাবদ্ধতা থেকে সম্পূর্ণ মুক্ত। সংকীর্ণতা ও অভিযোগ, বর্ণ ও গল্প-কাহিনী থেকে একেবারে অমুখাপেক্ষী। আদৌ মনে হয় না যে, এসব কিতাবাদি সে যুগে লিখা হয়েছে, যখন শান্তি-নিরাপত্তা এদেশ থেকে ভুল অক্ষরের মতে মুছে গিয়েছিল। গোটা দেশ চুরি-ডাকাতি, গৃহবিবাদ, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং সব ধরনের বিপদ-বিপর্যয়ে আক্রান্ত

ছিল। দিল্লীর রাজনৈতিক কেন্দ্রীয়তা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রত্যেক অস্ত্রধারী যোদ্ধা তার রাজত্বের স্বপ্ন দেখছিল। একদিকে শিখ, আরেকদিকে মারাঠী, অপরদিকে জাঠ আর রোহিলা চতুর্দিকে। দেশের মধ্যে সর্বত্রই গোলযোগ-বিদ্রোহ চলছিল। নাদের শাহ ও আহমদ শাহের মত সাহসী সেনা কমান্ডার খায়বারের দরজার পাশে দাঁড়িয়ে যখনই ইচ্ছা হত অন্ধের মত চলে আসত। আর প্লাবনের মত বেরিয়ে যেত। এরই মাঝে আল্লাহ মালুম দিল্লী কতবার লুণ্ঠিত হয়েছে আর কতবার পুনর্গঠিত হয়েছে। দিল্লীর জ্ঞানের মুকুটধারীর কি যে শান্তি ও নিরাপত্তা, এই সব কিছুই তার সামনে হতে থাকে। কিন্তু তার না আছে মনে কোনও দুর্ভাবনা-চাঞ্চল্য, না চিন্তায় বিক্ষিপ্ততা, না কলমে জবরদস্তি, না ভাষায় যুগের চাপ, না কলম দ্বারা অস্থিরতার বহিঃপ্রকাশ। মনে হয়, উচ্চতার যে আকাশ কিংবা ধৈর্য ও সন্তুষ্টির যে অসম্ভাব্যতায় ছিলেন, সে পর্যন্ত মাটির অন্ধকার পৌঁছতে পারে না। এতে বুঝা যায়, প্রকৃত আহলে ইলমের অবস্থা কত উঁচু এবং আত্মসমর্পণ ও সন্তুষ্টি কামনাকারীদের মর্যাদা কত উপরে থাকে।

الا بذكر الله تطمئن القلوب

'হ্যাঁ, আল্লাহর স্মরণে মন-প্রাণ প্রশান্তি লাভ করে। (সূরা রাদ : ২৮)

সঠিক ইলম-জ্ঞানের সঠিক খেদমতও যিকরুল্লাহ তথা আল্লাহকে স্মরণের আরেকটি রূপরেখা। কাজেই সেও যদি মনে প্রশান্তি ও আত্মায় সুখ-স্থিরতা অনুভব করে, তাহলে আশ্চর্যের কিছু নয়। শাহ সাহেবের রচনাবলির হাজার হাজার পৃষ্ঠা পড়লেও আপনাদের এতটুকু অনুভূত হবে না যে, তা হিজরী বার শতকের বিপর্যস্ত সময়ের ফসল। যখন প্রতিটি জিনিস অশান্তি ও নিরাপত্তাহীনতার শিকার ছিল। কেবল মনে হবে, (তা) জ্ঞান-প্রজ্ঞার এক অথৈ সমুদ্র, যা নির্বিঘ্নে শান্তি সুখের কলকল ধ্বনিতে বয়ে চলেছে, যা স্থান-কালের ময়লা-আবর্জনা থেকে পবিত্র-পরিচ্ছন্ন।

রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা এবং মোঘল রাজত্বের শাসনামলে মুজাহিদ ও বীরত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ড

শুধু এতটুকুই নয় যে, শাহ সাহেব বিপদ-আপদ ও দুঃখজনক ঘটনাপ্রবাহের এই ধূলিবালি বরং সেসবের মুষলধারা বৃষ্টির মাঝে খোলা আকাশের নিচে বসে রচনা ও গবেষণা এবং শিক্ষা-দীক্ষা দানে এমনভাবে ডুবে ছিলেন, না বাতাসের তীব্র ঝাপটায় রচনাধীন কিতাবের কোনও পৃষ্ঠা উল্টে যেত, বৃষ্টির কোনও ফোঁটা তার কোন নকশাচিত্র মুছে দিত বরং তিনি সেসব

অবস্থা পরিবর্তন করা, এদেশে মুসলমানদের শাসন ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা এবং একজন কর্তব্যপরায়ণ, বাস্তবপ্রিয়, শরীয়তের আহকামের উপর আমলকারী, সাধারণ মানুষের ইজ্জত-সম্মান রক্ষাকারী, বিশৃঙ্খলা ও অরাজকতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলো ধ্বংসকারী, সুদৃঢ় ও স্বচ্ছল-শান্তিপূর্ণ রাজত্ব প্রতিষ্ঠার জন্যও সচেষ্ট তৎপর ছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি এমনই নেতৃত্ব ও বীরত্বপূর্ণ কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছিলেন, যা বড় থেকে বড় রাজনৈতিক চিন্তাবিদ আঞ্জাম দিতে পারত, যার রচনা-সংকলন, শিক্ষাদান ও জ্ঞান-গবেষণার সাথে ন্যূনতম সম্পৃক্ততা এবং সামান্য পরিমাণ সুযোগ না হয়।

মুজাদ্দিদ ও ইসলামের দাঈগণ, গবেষক ও লেখকগণের মধ্যে যদি কারও জীবনে এই দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জীবনে যিনি ৭০০ হিজরীতে সিরিয়ার মুসলমানদেরকে রক্তখেকো তাতারীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার দাওয়াত দিয়েছেন এবং তাদের নড়বড়ে পাগুলো অটল ও সুদৃঢ় করেন। এরপর যখন সুলতানে মিসর মুহাম্মদ বিন কালাওয়ূঁ সিরিয়া এসে তাতারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করার ইচ্ছা মুলতবী করেন। আর সিরিয়াবাসীর মধ্যে চরম বিপর্যয়-বিশৃঙ্খলা ছড়িয়ে পড়ে, তখন তিনি স্বয়ং মিসর গমন করেন এবং সুলতানকে সিরিয়া রাষ্ট্রের হেফাযত ও তাতারীদের সাথে লড়াই করার জন্য উদ্বুদ্ধ করেন। জিহাদে অংশগ্রহণ করেন সুলতানের সঙ্গে। ফলাফলে তাতারীদের এমন শোচনীয় পরাজয় হয়, যার নযীর তাদের অতীত ইতিহাসে পাওয়া দুরূহ।

শাহ সাহেব (র) তার শিক্ষামূলক কর্মব্যস্ত, জীবনদান ও সংস্কারের প্রচেষ্টার সাথে এমন রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, এমন বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতার মাধ্যমে কাজ আঞ্জাম দেন, যদি মোঘলদের মধ্যে কোনও রকম যোগ্যতা কিংবা রাজন্যবর্গের মাঝে সাহস, রাজনৈতিক চেতনা থাকত, তবে ভারতবর্ষ না কেবল সংকীর্ণমনা ও বিশৃঙ্খলাপ্রিয় রাষ্ট্রীয় কুচক্রী দুঃসাহসীদের থেকে নিরাপদ হয়ে যেত বরং ইংরেজদের সেই দখলদারিত্ব থেকেও মুক্ত হয়ে যেত, যেখানে খৃস্ট উনিশ শতকের মধ্যভাগে ভারতর্বষকে দুর্বল ও শূন্য ময়দান পেয়ে নিজেদের পা সুদৃঢ় করে নিয়েছে। আর একে তারা না কেবল বৃটেন সাম্রাজ্যভুক্ত করেছে বরং এর দ্বারা এমন শক্তি ও উপকরণ লাভ করেছে, যা পুরো বিশ্ব-রাজনীতিতে প্রভাব ফেলে। প্রতিষ্ঠা করে মুসলমান ও আরব দেশগুলোয় নিজের কর্তৃত্ব। শাহ সাহেবের এই চিন্তাহীনতা, সাহস ও অবিচলতা, উচ্চ দৃষ্টি ও দৃঢ় চিত্ততা এবং এর বিপরীতে দেশের লোমহর্ষক পরিস্থিতি দেখে (যার মধ্যে না কোনও বুদ্ধিমত্তা, অন্তর্দৃষ্টি ও ধারাবাহিক

কর্মব্যস্ততার অবকাশ অনুভূত হয় আর না কোনও বৈপ্লবিক অবস্থা ও পতনের উত্থানের আশা করা যায়।) আল্লামা ইকবালের নিম্নোক্ত কবিতা এই বাস্তব অবস্থার নিখুঁত প্রতিচ্ছবি বলেই মনে হয়।

[illegible]

[illegible]

'বাতাস যেন তীব্র গতিশীল; কিন্তু প্রদীপ আপন জ্বালায় নিশিদিন;
সেই মহাপুরুষ আল্লাহ যাকে দিলেন এই মহাবিপর্যয় অনুভূতি জ্ঞান।'

শাহ্ সাহেবের অনুভূতি ও চাঞ্চল্য

শাহ সাহেব যিনি শৈশবের উপলব্ধির বয়সে আওরঙ্গজেব আলমগীরের রাজকীয় জাঁকজমক এবং রাজত্বের সৌভাগ্যের প্রভাব দেখেছিলেন এবং তৎপূর্ববর্তী (যখন মোঘল সাম্রাজ্যের ভাগ্যরবি উন্নত এবং দাপট ও সম্মান সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল) ঘটনাবলি দিল্লীর বুযুর্গগণ ও বংশের সম্ভ্রান্ত লোকজনের মুখে শুনেছিলেন। যার কলম থেকে খেলাফত রাশেদার কীর্তিগুলো ও ইসলামের ইতিহাসের সোনালী যুগের আলোকোজ্জ্বল প্রতিচ্ছবি, ইসলামী রাজত্বের দায়িত্ব-কর্তব্য এবং তার সাথে আল্লাহর মদদ ও সাহায্যে বিশদ বিবরণ, 'ইযালাতুল খফা' -এর পাতায় পাতায় প্রমাণিত হয়েছিল, তার চোখে মোঘল সাম্রাজ্যের পতনকাল, ফুররাখ সিয়ার ও মুহাম্মদ শাহ -এর শাসনামলের বিশৃঙ্খলা, অরাজকতা, চুরি-ডাকাতি, পথঘাটের নিরাপত্তাহীনতা, ধর্ম-জাতির বিনা পার্থক্যে রাষ্ট্রের লোকজনের জানমাল ও ইজ্জত-আব্রুর নিরাপত্তাহীনতা, মানুষের রক্তের মূল্যহীনতা, ইসলামী শে'আর ও নিদর্শনগুলোর অবমাননা এবং মুসলমানদের (যারা ছয়শ বছর ধরে এদেশে রাজত্ব করে আসছিল) অক্ষমতা-অসহায়ত্বের দৃশ্যাবলি দেখেছেন, তখন তার সচেতন অনুভূতিপরায়ণ ও ব্যথাভারাক্রান্ত মন রক্তাশ্রু প্রবাহিত করে।

আর এই রক্তাশ্রুগুলো তার ক্ষুরধার কলম দ্বারা সেসব চিঠিপত্রের পাতায় ঝরে পড়ে, যেগুলো তিনি সমকালের কোনও কোনও সুহৃদ আস্থাভাজন লোকজনকে লিখেছেন। এখানে তার কয়েকটি নমুনা পেশ করা হচ্ছে। সমকালীন এক বাদশার নামে সুরুজমল জাঠের শাসনকাল ও ইসলামের দেশছাড়া অবস্থার বিবরণ দিয়ে একটি পত্রে লিখেন, 'তারপর থেকে সুরুজমলের দাপট বেড়ে গেছে। দিল্লীর দুই মাইল দূর থেকে নিয়ে আগ্রার শেষ পর্যন্ত প্রস্থে আর মিওয়াতের সীমান্ত থেকে ফিরোজাবাদ ও শিকওয়াবাদ

পর্যন্ত প্রস্থে সুরুজমল দখল করে নিয়েছে। কারও সাধ্য নেই যে, সেখানে আযান ও নামায চালু করে।'

এ চিঠিতেই একটি আবাদ ও জনবহুল শহর 'বিয়ানাহ'-এর পৌঢ়ত্ব-পেরেশানীর উল্লেখ করে লিখেন, 'যে বিয়ানাহ শহর ছিল ইসলামের প্রাচীন নগরী, যেখানে উলামা-মাশায়িখ সাতশত বছর ধরে বসবাস করে আসছিলেন, সে শহরের উপর শক্তিবলে দখল কায়েম করে মুসলমানদেরকে লাঞ্ছনা-গঞ্জনার সাথে সেখান থেকে বের করে দিয়েছে।'

লক্ষাধিক রাষ্ট্রীয় কর্মচারীদের শোচনীয়বস্থার বর্ণনা দিয়ে লিখেন, 'যখন বাদশার কোষাগার রইল না, বেতন-ভাতাও স্থগিত হয়ে গেল। অবশেষে সব কর্মচারী বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। হাতে তুলে নিল ভিক্ষার ঝুলি। সাম্রাজ্যের নাম ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট রইল না।'

মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণীর অবস্থা লিখতে গিয়ে তার কলম থেকে প্রভাবময় এ বাক্য বেরিয়ে আসে, 'সর্বোপরি, মুসলিম উম্মাহ করুণার পাত্র।'

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর নামে একটি পত্রে লিখেন, 'ভারতের মুসলমান চাই সে দিল্লীর হোক কিংবা অন্য কোনও অঞ্চলেরই হোক, বহু দুঃখ-শোক দেখেছে। অনেকবার লুটতরাজের শিকার হয়েছে। চাকু অস্থিমজ্জা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। তারা বড়ই করুণার পাত্র।'

শাহ সাহেব বাস্তব প্রকৃতি, ঘটনাবলি এবং প্রভাবময় ও শক্তিশালী কারণসমূহের উপর দৃষ্টি দিয়ে নিশ্চিত পরিণতি ও অদূর ভবিষ্যতের ভবিষ্যদ্বাণী এমনভাবে করতেন, যাতে যুক্তি ও বুদ্ধিমত্তার দখল নেই, নিছক অবস্থা-পরিস্থিতির নিরপেক্ষ ও বাস্তবধর্মী তত্ত্বানুসন্ধান।

'আল্লাহ না করুন, কাফির-বিজাতীয়দের অগ্রগতি যদি এভাবে চলতে থাকে, তবে মুসলমান ইসলামকে বিস্মৃত করে দিবে (ভুলে যাবে)। আর মাত্র কিছুদিনের ব্যবধানে এই মুসলিম জাতি এমন এক জাতিতে পরিণত হবে যে, ইসলাম ও অনৈসলামের মধ্যে পার্থক্য করতে পারবে না।

মোঘল সম্রাট ও রাজন্যবর্গকে উপদেশ ও পরামর্শ

শাহ সাহেব মোঘল বংশের শাসকবর্গের উত্থান-পতন ও তার কারণসমূহ সম্পর্কে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। যেমন, সপ্তম অধ্যায়ে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' থেকে উদ্ধৃত বিষয়বস্তু দ্বারা প্রকাশ পায়। মোঘল সাম্রাজ্য ছাড়াও তিনি অন্যান্য ইসলামী সাম্রাজ্যের ইতিহাসও গভীর দৃষ্টিতে পড়েছিলেন। আর তা থেকে তিনি সেই বিজ্ঞচিত ফলাফল বের করেছিলেন, যা কুরআনে কারীমের এমন ধারক বাহক আলেমই করতে পারেন, যিনি

আল্লাহর অলঙ্ঘনীয় আইন-কানুন এবং আল্লাহর নীতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল। তিনি স্পষ্ট বুঝতে পেরেছিলেন, এ বংশের স্বভাব-চরিত্র দীর্ঘ পৈত্রিক রাজত্ব, ভোগ-বিলাসের উপায়-উপকরণের সহজলভ্যতা, ব্যক্তিস্বার্থ, অনুচর ও সাম্রাজ্যের উপদেষ্টাদের অদূরদর্শীতার কারণে ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। তাদের দেহে শিকড় ছড়িয়ে বসেছিল নানা রোগ-জীবাণু। তিনি আরব দার্শনিক ঐতিহাসিক ইবনে খালদূনের নিম্নোক্ত প্রজ্ঞাপূর্ণ উক্তি সম্পর্কেও বেখবর ছিলেন না। ইবনে খালদূন বলেছিলেন, إن الهرم إذا نزل بالدولة لا يرتفع

যখন কোনও সাম্রাজ্য বার্ধক্যে এসে উপনীত হয়, তখন সাধারণতঃ নতুন করে যৌবনে পদার্পণ করা তথা জেগে উঠা সম্ভব হয় না।

কিন্তু সঠিক চিন্তাভাবনা, খাঁটি আকাঙ্খা ও হৃদয়স্পর্শী কথা মানুষকে এমন স্থানেও ভাগ্যপরীক্ষায় উদ্বুদ্ধ করে, যেখানে সফলতার আশা ক্ষীণ। যে পথিকের পিপাসা প্রকট হয়ে যায়, প্রাণ হয় ওষ্ঠাগত– জ্ঞান-বুদ্ধি, শক্তি-অভিজ্ঞতা পর্যাপ্ত থাকা সত্ত্বেও পানির আশায় তার পদযুগল মরীচিকার তরঙ্গের দিকে অনিচ্ছায় এগিয়ে যায়। যেন বুদ্ধি-বিবেকের আত্মবিস্মৃত খাঁটি পিপাসার নিদর্শন। কবি উরফী কত চমৎকার কথা বলেছেন,

[illegible]

[illegible]

খাঁটি পিপাসার ঘাটতিকে এর কারণ ভেব!
নিজের বুদ্ধি-জ্ঞানের উপর গৌরব কর না।
যদি তোমার মন জেনে বুঝেও
মরীচিকার বাহ্যিক চাকচিক্যে ধোঁকা না খায়।

কিন্তু একে তো মানুষ, এরপর এমন এক বংশের ব্যাপার, যারা শত শত বছর সম্মান ও দাপটের সঙ্গে শাসন করেছিল, এক নিষ্প্রাণ ও স্থির মরীচিকার সঙ্গে সর্বাবস্থায় বিরোধী। আর তার থেকে এ আশা করা অবান্তর নয় যে, তাদের মধ্যে ফের এমন কোন আত্মমর্যাদার অধিকারী দৃঢ়চিত্ত ও রণবীর জন্ম নিতে পারে, যিনি অবস্থার মোড় ঘুরিয়ে দিবেন এবং মুমূর্ষুপ্রায় রাজত্বের জীবনে নতুন প্রাণ সঞ্চার করবেন। শাহ সাহেব (র) ছিলেন তার যুগের কুরআনে কারীমের বড় মর্মজ্ঞ ও ডুবুরী। তার সম্মুখে ছিল কুরআনে কারীমের নিম্নোক্ত আয়াত,

تولج الليل فى النهار وتولج النهار فى الليل، وتخرج الحى من الميت وتخرج الميت من الحى، وترزق من تشاء بغير حساب.

'আপনিই রাতকে দিনে প্রবিষ্ট করান আর দিনকে করান রাতে এবং আপনি নিষ্প্রাণ-মৃত থেকে প্রাণী আর প্রাণী থেকে নিষ্প্রাণ সৃষ্টি করেন। আর আপনি যাকে খুশি বিনা হিসেবে (অফুরন্ত) রিযিক দান করেন।' (সূরা আলে ইমরান- ২৭)

সে মতে শাহ সাহেব (র) মুআলা দূর্গের অবস্থাবলি ভালভাবে জানার পরও সমকালীন এক মোঘল সম্রাটকে পত্র লিখেন। উক্ত পত্রে তাকে অবস্থার সংশোধন, উন্নতি, সাম্রাজ্যের শক্তি বৃদ্ধি এবং আল্লাহর রহমত ও সাহায্যকে নিজের প্রতি ধাবিত করার জন্য এমন প্রজ্ঞাপূর্ণ ও বিজ্ঞচিত পরামর্শ প্রদান করেন, যা তাঁর উচ্চস্তরের ধর্মীয় কল্যাণ, ইতিহাস, রাজনীতি ও রাষ্ট্রব্যবস্থার গভীর ও প্রশস্ত অধ্যাবসায়ের প্রমাণ। শুরুতেই লিখেছেন, 'মহান আল্লাহর অনুগ্রহ-অনুকম্পায় আমল করুন, তাহলে রাজত্বের কর্মকাণ্ডের শক্তি, শাসন কর্তৃত্বে স্থায়িত্ব এবং ইজ্জত সম্মানের উন্নতি প্রকাশ পাবে। জনৈক কবি বলেন,

[illegible] ☆ [illegible]

'অর্থাৎ আমাকে আয়নার পিছনে তোতা পাখির মতো রেখেছেন। অনাদি শিক্ষক যা কিছু বলেন, আমি তা-ই বলি।'

তৎকালীন সম্রাট, তার মন্ত্রী ও রাজন্যবর্গের উদ্দেশ্যে লিখিত সে পত্রে এমন কিছু বিজ্ঞচিত রাজনৈতিক ও ব্যবস্থাপনামূলক পরামর্শ, যা ছাড়া রাজত্বের স্থায়িত্ব, প্রজাদের ব্যাপক কল্যাণ এবং মানুষের আস্থা-বিশ্বাস বহাল থাকতে পারে না প্রভৃতি জরুরী বিষয় উদ্ধৃত করার পর অবশেষে আরও লিখেন, বিচারক ও হিসাবরক্ষক এমন লোককে বানাতে হবে, যার উপর ঘুষ গ্রহণের অপবাদ লাগেনি এবং সে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের অনুসারী। তাছাড়া মসজিদের ইমামদেরকে উত্তমরূপে বেতন-ভাতা দিতে হবে। নামায যথারীতি জামাতে পড়ার তাগিদ দিতে হবে। পূর্ণ গুরুত্বের সাথে ঘোষণা করে দিতে হবে, যেন রমযান মাসের অবমাননা না হয়। শেষ কথা হল, ইসলামের বাদশা ও সম্মানিত শাসকবর্গ যেন নাজায়েয, অবৈধ ভোগ-বিলাসে লিপ্ত না হোন। অতীতের গুনাহগুলোর জন্য খাঁটি মনে তাওবা করবেন এবং ভবিষ্যতে সকল গুনাহ ও পাপাচার থেকে বেঁচে থাকবেন। যদি এসব কথার উপর আমল করা হয়, তবে আমার বিশ্বাস, সাম্রাজ্যের স্থায়িত্ব, গাইবী সাহায্য-শক্তি এবং আল্লাহর মদদ সহজলভ্য হবে। وما توفيق الا بالله عليه توكلت واليه انيب.

এভাবে শাহ সাহেব সেই সুমহান কর্তব্য পালন করে ফেলেন, যা একজন উত্তম আলেমে দীন, কুরআন ও হাদীস বিশারদ এবং সময়ের মুজাদ্দিদ ও সংস্কারকের করা উচিৎ। যিনি তার দায়িত্ব-কর্তব্য সম্পর্কে সচেতন এবং সেসব বিপদাশঙ্কা সম্পর্কে জ্ঞাত, যা কেবল শাসক গোষ্ঠীর মাথার উপরই নয়; সমগ্র দেশবাসীর কাঁধে উপর উন্মুক্ত তরবারীর মত ঝুলছিল। শাহ সাহেব তার পূর্বসূরীদের অনুসরণ এবং উম্মতের বুযুর্গদের রীতি অনুযায়ী রাজদরবারের সঙ্গে সরাসরি কোনও সম্পর্ক রাখেননি। নিজের দারিদ্রের চাটাইয়ের উপর থাকতেই স্বাদ পেতেন। কিন্তু খাজা নিযামুদ্দীন আউলিয়া এবং উত্তরসূরী হযরত সাইয়িদ নাসীরুদ্দীন চেরাগে দিহলী (র)-এর মত তার অন্তর সমকালীন রাজত্ব ও এর সঠিক নেতৃত্বের জন্য দু'আয় মগ্ন ছিল। আর যারা এই শিক্ষা ও আধ্যাত্মিক কেন্দ্রের সাথে সম্পর্ক রাখতেন, তিনি তাদেরকে মুখে-কলমে সঠিক পরামর্শ দানের কোনও প্রকার কৃপণতা ও সাবধানতার সঙ্গে কাজ করতেন না। দু' একবার এমনও হয়েছে যে, বাদশা স্বয়ং আকস্মিক শাহ সাহেবের খেদমতে এসে হাযির হন এবং দু'আর দরখাস্ত করেন। শাহ সাহেব তার প্রিয়ভাজন ও বিশ্বস্ত, ইরশাদের অধিকারী মুরীদ এবং আত্মীয় ভাই শাহ মুহম্মদ আশেক ফুলতী (র) কে একটি পত্রে লিখেন, 'বৃহস্পতিবার দিন বাদশা হযরত নিযামুদ্দীন আউলিয়া এবং অন্যান্য মাশায়িখের মাজার যিয়ারতের জন্য সওয়ার হয়ে গমন করেছিলেন। আমাকে পূর্ব থেকে জানানো ছাড়াই কাবুলী দরজা দিয়ে সাদাসিধে আসনে চড়ে গরীবখানায় এসে উপস্থিত হন। অধমের মোটেও জানা ছিল না। মসজিদে চাটাইগুলোর উপর এসে বসে পড়লেন। বাদশাকে অন্তত এতটুকু সম্মান জানানো আবশ্যক হয়ে পড়েছিল, অধম যে জায়নামাযে বসে এবং নামায আদায় কর, সেটিকে এমনভাবে বিছিয়ে দেওয়া হয় তার এক প্রান্তে অধম বসে আর অপর প্রান্তে বসেন বাদশা। বাদশা প্রথমে অত্যন্ত সম্মানের সাথে মুসাফাহা করলেন। এরপর বললেন, আমি দীর্ঘদিন থেকে আপনার সাক্ষাতের আকাঙ্ক্ষী ছিলাম। কিন্তু আজ এই যুবকের রাহবরীতে এখানে এসে পৌঁছেছি। ইংগিত করলেন উযীরের প্রতি। এরপর বললেন, কুফরের প্রবলতা আর প্রজাদের বিচ্ছিন্নতা-বিক্ষিপ্ততা এমন পর্যায়ে পৌঁছে গেছে, যা সকলেই অবগত। কাজেই আমার তো নিদ্রা, পানাহার কঠিন ও তিক্ত হয়ে গেছে। এ ব্যাপারে আপনার কাছে দু'আর দরখাস্ত। আমি বললাম, ইতোপূর্বেও আমি দু'আ করতাম। আর এখন তো ইনশাআল্লাহ আরও বেশি দু'আয় মগ্ন থাকব।

ইত্যাবসরে উযীর আমাকে বললেন, হযরত! বাদশা পাঁচ ওয়াক্ত নামাযই অত্যন্ত যত্নসহকারে আদায় করেন। আমি বললাম, আলহামদুলিল্লাহ! এটা এমন একটি কথা, যা দীর্ঘকাল পর শোনা যাচ্ছে। নতুবা নিকট অতীতের বাদশাগণের কারও মধ্যে এ নামাযের গুরুত্ব ও যত্ন ছিল বলে শোনা যায়নি।'

অবশেষে শাহ সাহেব বাদশাকে হযরত আবু বকর (রা)-এর সেই অসীয়ত শোনান, যা তিনি হযরত উমর (রা) কে খলীফা বানানোর সময় বলেছিলেন, 'খলীফাকেও আশ্চর্য আশ্চর্য সমস্যাবলির সম্মুখীন হতে হয়। কখনও দীনের শত্রুদের পক্ষ থেকে আবার কখনও সমর্থক-সহযোগীদের পক্ষ থেকেও। এসব সমস্যা সমাধান কেবল একটিই অর্থাৎ আল্লাহর সন্তুষ্টিকে নিজের মূখ্য উদ্দেশ্য বানিয়ে মহান আল্লাহর কাছেই সাহায্য প্রার্থনা করতে হবে; আর এর অন্যথা থেকে দৃষ্টি সম্পূর্ণ সরিয়ে নিতে হবে।'

শায়খ মুহাম্মদ আশেক (র)-এর নামে আরেকটি পত্রে লিখেন, 'বাদশা ও তার মাতা এসেছিলেন। বাদশাহর আগমনের উদ্দেশ্য ছিল, অকৃত্রিমভাবে কিছুক্ষণ অবস্থান করা। প্রায় তিন চার ঘণ্টা তিনি সেখানে বসেন। আহারও করেন। তার বেশিরভাগ কথা আল্লাহর সৃষ্টিজীবের মঙ্গলজনক কাজকর্মে সাহায্য চাওয়ার সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল।

কিন্তু বলাবাহুল্য যে, শাসক গোষ্ঠীর পতন, সুদীর্ঘ পৈতৃক রাজত্বের প্রভাব এবং বাইরের বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্র এমন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল যে, কোনও বড় থেকে বড় সংকল্পচিত্ত আওরঙ্গ উত্তরসূরীও একাকী এই পতনকে নবজাগরণে, দুর্বলতাকে নতুন শক্তি ও ক্ষমতায় বদলে দিয়ে গোটা রাজ্যের সবক্ষেত্রে বিপ্লব আনতে পারত না। ইতিহাস সাক্ষ্য, যখন কোনও সাম্রাজ্যের পতন তার চরম সীমায় পৌঁছে যায় এবং নানা বিদ্রোহ, বিরোধিতা ও ষড়যন্ত্রের সুরঙ্গ সাম্রাজ্যকে বারুদের মত উড়িয়ে দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়, তখন বড় থেকে বড় দৃঢ়চিত্ত, পরিশ্রমী, কষ্টসহিষ্ণু এবং যোগ্যতাসম্পন্ন বাদশাও সাম্রাজ্যের ভগ্ন দেহে নতুন করে প্রাণ সঞ্চারে ব্যর্থ হয়ে পড়ত। একাধিকবার এমন হয়েছে, শাসকগোষ্ঠীর শেষ ব্যক্তি তার পূর্বপুরুষদের থেকে উত্তম ছিলেন। আর তিনি সাম্রাজ্যকে পতন থেকে রক্ষা করার জন্য নিবেদিতপ্রাণ সংগ্রাম করেছেন। কিন্তু সফলকাম হতে পারেননি।

মারওয়ান বংশের এবং বনী উমাইয়ার সাম্রাজ্যের শেষকালে মারওয়ান বিন মুহাম্মদ ওরফে মারওয়ান আল হিমার (মৃত্যু ১৩২ হি.), আব্বাসীয় খলীফাদের বংশের শেষ শাসক মুস্তাছিম বিল্লাহ (মৃত্যু ৬৫৬ হি.) আর এক সময়ের তৈমুর বংশের শেষ শাসক আবু যুফার বাহাদুর শাহ (মৃত্যু ১২৭৯

হি./১৮৬২ খৃ.) এরই কয়েকটি উপমা। কাজেই শাহ সাহেবের মত অন্ত র্দৃষ্টিসম্পন্ন সংস্কারক, দূরদর্শী ঐতিহাসিক ও ঈমানী শক্তির ধারকের জন্য নামসর্বস্ব মোঘল শাসকগোষ্ঠী ও তাদের রাজন্যবর্গের সাথে সম্পর্ক তৈরী, তাদের ভেতর জাতীয় মূল্যবোধ ও ধর্মীয় আত্মসম্ভ্রমবোধ জাগ্রত করা, বিপর্যস্ত অবস্থা-পরিস্থিতি আর বিশৃঙ্খলা ও বিচ্ছিন্নতা সৃষ্টিকারী শক্তিগুলোর সাথে পাঞ্জা লড়ার উৎসাহ দান ও প্রস্তুত করার উপর না থামা জরুরী ছিল। শাহ্ সাহেব (র) দরবারী উমারাদের সংকীর্ণ পরিষদ থেকে বাইরে বেরিয়ে সেসব আমীর-উমারা, যুদ্ধাংদেহী সেনা কমান্ডার এবং উচ্চ সাহসী নেতৃবৃন্দের কাছে চিঠিপত্র প্রেরণ করেন, যাদের ভূমিতে ধর্মীয় মূল্যবোধ ও জাতীয় সম্মানের কোনও চাপা দেওয়া অগ্নিস্ফুলিঙ্গ তার দৃষ্টিগোচর হয়েছে। তন্মধ্যে এসব রাজন্যবর্গ ও নেতৃবৃন্দ ছিলেন– উযীর মামলাকাত আসিফ জাহ, নবাব ফিরায জঙ্গ নিযামুল মালিক আহমদ শাহী, ইমাদুল মালিক উযীর, তাজ মুহাম্মদ খান বেলচী, নবাব মাজদুদ্দৌলাহ্ বাহাদুর, নবাব উবায়দুল্লাহ খান কাশ্মীরী, মিয়া নিয়াযগুল খান, সাইয়িদ আহমদ রোহীলাহ।

কিন্তু শাহ সাহেব (র)-এর (ঈমানী শক্তি ও ইলহামে রব্বানী সম্পৃক্ত) সন্ধানী ও তীক্ষ্মদৃষ্টি নিবদ্ধ হয়, সে যুগের দুই মহান ব্যক্তির ওপর। যাদের একজন ছিলেন ভারতেরই ব্যক্তিত্ব আর অপরজন বাইরের। আমাদের উদ্দেশ্য আমীরুল উমারা নাজীবুদ্দৌলাহ ও আহমদ শাহ্ আবদালী, যিনি আফগানিস্তানের একজন শাসক।

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ্

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর মধ্যে সেসব গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহ পাওয়া যেত, সেগুলো প্রাচীন যুগে সাম্রাজ্যস্থপতিগণের বৈশিষ্ট্য ছিল, যারা নিজস্ব সাম্রাজ্য ও বংশের উত্থান ও নেতৃত্বের যুগে (যখন সৈন্য বাহিনী গঠনের সহজলভ্যতাই বিজয় ও সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য যথেষ্ট ছিল) গুরুত্বপূর্ণ কাজ আঞ্জাম দিয়েছেন এবং তাদের হাতে কোন বিজয়-সাফল্যের কোন কৃতিত্ব প্রকাশ পেয়েছে, তাদের মধ্যে স্বীয় অভিভাবকত্বের নেয়ামতসহ কৃতজ্ঞতার রত্ন, স্বীয় সঙ্গীসাথী ও অধীনস্তদের সাথে ভদ্রতা ও সদাচরণ, সেনানায়কের রত্ন ও বীরত্ব এবং নেতাসুলভ যোগ্যতা কানায় কানায় ভরেছিল। তবে ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা হল, এসব বৈশিষ্ট্য, গুণ-যোগ্যতা সামরিক শক্তিসমূহকে পরাভূত করা এবং রাজ্যজয়ে তো সফলতা লাভ করে। কিন্তু যে অবস্থা পরিবেশে গাদ্দারী, নিমকহারামী ও বিশ্বাসঘাতকতাকে আদর্শিক শাস্ত্রের (!?) মর্যাদা দেওয়া হয়; আইন ভঙ্গ, নীতিহীনতা ও অকার্যকারিতাকে

উচ্চস্তরে রাজনীতি মনে করা হয়, সুযোগে স্বার্থ উদ্ধারকে বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শিতা ভাবা হয়, সেখানে অধিকাংশই উপকারী-ফলপ্রসূ হওয়ার পরিবর্তে সাফল্যের পথে অন্তরায় এবং নানা জটিলতা সৃষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। দুর্ভাগ্যক্রমে নাজীবুদ্দৌলাহ ও আসিফ জাহ নিযামুল মালিকের এমনই বিপর্যস্ত পরিবেশ নসীব হয়েছিল– ঐতিহাসিকগণ তার উঁচু কৃতিত্ব, সামরিক ও নেতাসুলভ যোগ্যতার প্রশংসায় একমত। স্যার যদুনাথ সরকার লিখেন– 'একজন ঐতিহাসিকের বোধগম্য হয় না যে, কি গুণের কারণে সবচেয়ে বেশি প্রশংসা করবে। রণাঙ্গণে তার বিস্ময়কর নেতৃত্বের, না সমস্যাবলিতে তার তীক্ষ্মদৃষ্টি কিংবা সঠিক সিদ্ধান্তের, নাকি তার সেসব স্বভাবগত যোগ্যতাসমূহের, যা তাকে বিচ্ছিন্নতা ও বিশৃঙ্খল অবস্থায় এমন পথ দেখাত, যদ্দরুণ ফলাফল তার পক্ষেই বেরিয়ে আসত।'

মৌলভী যাকাউল্লাহ দেহলভী (র) 'ভারতবর্ষের ইতিহাস' গ্রন্থে লিখেন– 'নাজীবুদ্দৌলাহ এমন জ্ঞানী, বুদ্ধিমান, সচেতন ও বিচক্ষণ ছিলেন, খুব কমই তেমন হয়ে থাকে। আমানত রক্ষা, বিশ্বস্ততা তো সে সময় তার উপর শেষ ছিল। তিনি তার প্রবীণ মনিব নবাব দাবিন্দে খান রোহিলা এবং নবাব শুজাউদ্দৌলাহর আনুগত্য করে চলতেন। মলিহার রাও হাওলাকরের সঙ্গেও তার সামান-খেলোয়ার চলে যেত। হয়ত স্মরণ আছে, এই মারাঠা পানিপতের যুদ্ধ থেকে স্বদেশবাসীদেরকে ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছিল। মোটকথা, এই সাহসী তরুণ ঐ খণ্ডবিখণ্ড রাজত্বকে পুনর্গঠিত করেছিল।'

শাহ আবদুল আযীয (র) বলেন, 'নাজীবুদ্দৌলাহর ওখানে নয়শত আলেম ছিল। যাদের মধ্যে সবচেয়ে নিচু পর্যায়ের আলেম পাঁচ রুপি আর সর্বোচ্চ পর্যায়ের আলেমদের পাঁচশ রুপি লাভ হত।'

অধ্যাপক খলীক আহমদ নিযামীর উক্তি মতে '১৭৬১ খৃস্টাব্দ থেকে ১৭৭০ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি দিল্লীর সবচেয়ে বড় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। সকল রাজনীতি তার পাশে আবর্তিত হত। তিনি গোটা শাসনব্যবস্থা নিজের কাঁধের উপর চাপিয়ে নিয়েছিলেন।

শাহ সাহেবকে আল্লাহ তা'আলা মানবতাবোধ ও বাস্তবদর্শিতার এমন যোগ্যতা দান করেছিলেন, যা সেসব লোকদের দান করা হয়, যারা ইসলাহ ও সংস্কারের ইতিহাস, মানুষ গঠন ও সমাজ বিনির্মাণে বিরাট কোনও ভূমিকা রাখেন। মহান পুরুষের এই দুর্দিনে, যা সাহসী, সচেতন ও শক্তি পরখকারীদের দ্বারা ভরেছিল, শাহ সাহেব স্বীয় কাজের পূর্ণতা দান ও সাহায্য গ্রহণের জন্য নাজীবুদ্দৌলাহকে বেছে নেন। শাহ সাহেবের দূরদর্শী ও

সূক্ষ্মদর্শী চোখ এই যোগ্য রত্ন ও তার ভেতরে ধর্মীয় মূল্যবোধকে দেখে ফেলেন। শাহ সাহেব তার সঙ্গে চিঠিপত্র আদান-প্রদান শুরু করেন। আর সেই অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো প্রজ্জ্বলিত করার চেষ্টা চালান, যা ভস্ম ছাইয়ের ভেতর চাপা পড়েছিল। শাহ সাহেব তার নামে একটি পত্রে লিখেন, 'মহান আল্লাহ তা'আলা আমীরুল মুজাহিদীনকে প্রকাশ্য সাহায্য ও সুস্পষ্ট সমর্থনের সাথে সম্মানিত করুন। আর এই আমলকে গ্রহণযোগ্যতার মর্যাদায় পৌঁছিয়ে বিরাট বিরাট বরকত ও রহমত তার উপর অর্পিত করুন।

ফকীর ওয়ালীউল্লাহ (আল্লাহ তাকে ক্ষমা করুন)-এর পক্ষ থেকে ঐকান্তিক মহব্বতের সালামের পর প্রকাশ থাকে যে, মুসলমানদের সাহায্যার্থে এখানে দু'আ করা হচ্ছে এবং অদৃশ্য শক্তি থেকে উপকারিতা গ্রহণ অনুভূত হচ্ছে। আশা করা যায়, আল্লাহ তা'আলা আপনার হাতে ধর্মীয় চেষ্টা-সংগ্রাম ও জিহাদকে জীবিত করে তার অফুরন্ত বরকত এই দুনিয়া ও পরকালে দান করবেন। إنه هو قريب مجيب. 'নিশ্চয় তিনি সন্নিকটে এবং দু'আ কবুলকারী।'

অপর একটি পত্রে তাকে 'আমীরুল গুযাত' এবং 'রঈসুল মুজাহিদীন' উপাধিতে সম্বোধন করেছেন। অন্য একটি পত্রে লিখেন, 'মনে হয় এ যুগে মুসলিম উম্মাহর শক্তি বৃদ্ধি ও মৃতপ্রায় উম্মতের সাহায্য দানের কাজ আপনার মাধ্যমেই সম্পাদিত হবে, যিনি এই উত্তম ও কল্যাণ কাজের উৎস ও মাধ্যম। আপনি মনের মধ্যে কোনও ধরনের প্রবঞ্চণা ও সংশয় জমতে দিবেন না। ইনশাআল্লাহ সব কাজ বন্ধুদের সন্তুষ্টি ও প্রত্যাশা অনুযায়ী বাস্তবায়িত হবে।

শাহ সাহেব নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর নামে প্রেরিত চিঠিপত্রে দু'আ ও ধন্যবাদ জ্ঞাপনের উপরই যথেষ্ট করতেন না, তাকে অনেক উপকারী মৌলিক পরামর্শও দিতেন। সতর্ক ও বিরত থাকার উৎসাহও দিতেন সেসব ভুলভ্রান্তি ও ঘটনাবলির পুনরাবৃত্তি থেকে, যা ইতোপূর্বে আক্রমণকারী ও মুসলমান সৈন্যদের থেকে প্রকাশ পেয়েছে এবং যা আল্লাহর সাহায্য-সহায়তা আসার ক্ষেত্রে অন্তরায় হয়ে যায়। এক পত্রে হযরত শাহ সাহেব লিখেন, 'যখন শাহী ফৌজের দিল্লী আগমন ঘটবে, তখন এ ব্যাপারে পূর্ণ যত্ন ও শৃঙ্খলা থাকতে হবে, যেন শহর আগের মত অন্যায়-জুলুমে পদদলিত না হয়। দিল্লীবাসী অনেকবার হত্যা-লুণ্ঠন, ইজ্জত হরণ ও লাঞ্ছনার তামাশা দেখেছে। আর তা-ই উদ্দেশ্য হাসিল ও ইচ্ছায় বিলম্ব হচ্ছে। সবশেষ কথা, মজলুমদের 'আহ!' ধ্বনিতেও প্রভাব আছে। এখন যদি আপনি চান, আপনার বহু প্রত্যাশিত কাজটি সম্পন্ন হয়ে যাক, তাহলে যথারীতি পূর্ণ গুরুত্বের সাথে লক্ষ্য রাখতে

হবে, যে কোনও সৈনিক দিল্লীর মুসলমানগণ এবং যেসব অমুসলিমদের সঙ্গে (যারা যিম্মির মর্যাদায় বসবাস করে) প্রতিবাদ করবে না।'

শাহ সাহেব একাধিক চিঠিপত্রে ভারতের সেই তিন (এ অধ্যায়ের শুরুতে উল্লেখিত) বিচ্ছিন্নবাদী ও যুদ্ধবাজ শক্তিগুলোর ত্রাস এবং তাদের আক্রমণ থেকে দেশকে নিরাপদ করার প্রয়োজনীয়তার প্রতি বারবার মনোযোগ আকর্ষণ করেন। অন্যথায় দেশে আইন-শৃঙ্খলা, শান্তি-নিরাপত্তা, ধর্মীয় নিদর্শনাবলি ও ইবাদতখানাগুলো সংরক্ষণ এবং সাম্য-ন্যায়ের আদর্শে সুষম সাধারণ জীবন-যাপন করা সম্ভব নয়। এদের কারণে গোটা দেশ বিশেষভাবে যুদ্ধাবস্থা ও সামরিক শাসনের মধ্যে জীবন যাপন করছে।

নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর সঙ্গে শাহ সাহেবের এমনই হৃদ্যতাপূর্ণ সম্পর্ক ছিল বলে মনে হয়। তিনি তার থেকে বিরাট আশা রাখতেন, কাজেই তাকে বারবার তাগিদ দিয়ে বলেছেন, যখন তিনি সে লক্ষ্যে সংকল্পের সাথে ঝাণ্ডা উত্তোলন করবেন, তখন যেন অবশ্যই শাহ সাহেবকে অবহিত করেন। এমনকি শাহ সাহেব তাকে এ ব্যাপারে বিজয়-সফলতার আশাবাদ শোনান এবং বিজয়ের ভবিষ্যদ্বাণী করেন। শাহ সাহেব লিখেন,

فقیر کو اس بارے کوئی شک وشبہ نہیں۔

'অধমের এ ব্যাপারে কোনও সংশয়-সন্দেহ নেই।'

শাহ সাহেব নবাব নাজীবুদ্দৌলাহকেই একান্ত মাধ্যম বানান আহমদ শাহ আবদালীকে ভারতবর্ষে নিয়ে আসার জন্য। তার নামে সরাসরি পত্র (সামনে আসন্ন) লিখা ছাড়া তার (নাজীব) দ্বারাও চিঠিপত্র লেখান এবং তাকে বরাবরই তাগিদ দেন। নবাব নাজীবুদ্দৌলাহ শাহ সাহেবের ইন্তিকালের আট বছর পর রজব ১১৮৪ হি./৩১ অক্টোবর ১৭৭০ খৃস্টাব্দে মৃত্যুবরণ করেন। অধ্যাপক খালীক আহমদ নিযামী লিখেন, তার অনুপম ন্যায়পরায়ণতা, সচেতনতা ও দূরদর্শিতার এই ঘটনা ইতিহাসে সর্বদা জীবন্ত হয়ে থাকবে। তিনি যখন মৃত্যুশয্যায় শেষ নিঃশ্বাস নিচ্ছিলেন, তখনও তিনি তার সৈন্যদেরকে নির্দেশ দেন, গঙ্গার মেলায় যাতায়াতকারী হিন্দু তীর্থযাত্রীদের জান-মালের পূর্ণ হেফাযত করতে হবে।'

আহমদ শাহ আবদালী

শাহ সাহেব তার সচেতনতা সৃষ্টি, ভারতবর্ষের অবস্থা-পরিস্থিতির বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ, শাসনকর্তা ও দরবারী আমলা-উমারাদের নিষ্ক্রিয়তা এবং শাসক গোষ্ঠীর ক্রমাগত ব্যর্থতা-অযোগ্যতার ফলে দিবালোকের মত সুস্পষ্ট

দু'টি বাস্তব বিষয় উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। প্রথম প্রয়োজন দেশের এই নৈরাজ্য-বিশৃঙ্খলা দূর করা, যার হাতে না দেশবাসীর জান-মাল, ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ, না কোনও গঠনমূলক কাজ ও সুষ্ঠু আইন-শৃঙ্খলার অবকাশ আছে। যেমন পিছনে বলে এসেছি। এই অরাজকতা, পেরেশানী, অবিশ্বাস ও আতঙ্কের স্থায়ী পরিস্থিতির দায়-দায়িত্ব ছিল ঐ তিন বিচ্ছিন্নতাবাদী যুদ্ধবাজ দলের ওপর, যারা না এমন কোনও দেশে শাসনকার্যের অভিজ্ঞতা রাখত, যেখানে বিভিন্ন ধর্ম, জাতি ও সভ্যতা শত শত বছর ধরে বিদ্যমান ছিল এবং যার ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালনের জন্য উঁচু ধরনের দায়িত্ববোধ, সংরক্ষণ ও ধৈর্যশক্তি, প্রশস্ত দৃষ্টি ও উদার মনের প্রয়োজন ছিল। না তাদের নিকট দেশকে নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা দান, দেশবাসীর আস্থা অক্ষুণ্ন রাখা, আইন-শৃঙ্খলার উন্নতির জন্য কোনও পরিকল্পনা ছিল আর না ছিল কোনও চিন্তা-ভাবনা। এজন্য প্রথম কাজ ছিল, উক্ত তিন শক্তিকে বিশেষতঃ মারাঠীদের অগ্রযাত্রা ও দৌরাত্ম্য থেকে দেশকে নিরাপত্তা দান। যাদের কারণে ভারতবর্ষের ঐ কেন্দ্রীয় অংশ, যা রাজত্বের স্থায়িত্ব ছিল অর্থাৎ লাহোর থেকে দিল্লী এবং সংশ্লিষ্ট প্রদেশগুলো পর্যন্ত এলাকার কখনও শান্তি ছিল না, যে কোনও সময় কখন ময়দান রণাঙ্গণে পরিবর্তন এবং ফলের বাগান ও সুদর্শন শহর একটি উন্মুক্ত স্বাধীন শিকার অরণ্যে রূপান্তরিত হয়ে যাবে। যেখানে শিকারীদের শান্তিপূর্ণ শহরবাসীদেরকে পশুপাখির মত হত্যার অনুমতি থাকবে। আর তাদের পূর্বপুরুষ ও বংশধরদের সঞ্চয় দেখতে দেখতে লুটতরাজ হয়ে যাবে। এর দ্বারা দ্বিতীয়তঃ আশঙ্কা ছিল, শিখ ও জাঠদের আদলে সভ্যতা-সংস্কৃতি, সম্পদ ও প্রাচুর্যের কেন্দ্রগুলোতে আকস্মিক বিপদরূপে উপস্থিত হবে।

দ্বিতীয় বাস্তবতা ছিল, এই বিপদ-আশঙ্কা দূর করার জন্য প্রয়োজন তেমন কোনও অভিজ্ঞ কর্মধ্যক্ষ সামরিক নেতা ও কৌশলী সেনা নায়কের, যিনি আধুনিক সমরশক্তিতে সমৃদ্ধশালী হবেন ঠিক, কিন্তু মাতাল আত্মহারা হবেন না। তার মধ্যে সমর কৌশল, সৈন্যবিন্যাস ইত্যাদির যোগ্যতা, বীরত্ব, সাহসিকতা ছাড়াও ঈমানী ও ধর্মীয় মূল্যবোধ থাকবে। সাথে সাথে তিনি ভিতরগত ও অন্তর্দ্বন্দ্ব, গৃহবিবাদ এবং পুরোনো শত্রুতা-বিদ্বেষ থেকে মুক্ত হবেন, যা দিল্লীর রাজপ্রাসাদ ও দেশের রাজনীতিবিদদেরকে ঘুণের মত কুড়ে কুড়ে খাচ্ছিল এবং যেসবের উপস্থিতিতে এমন কোনও উঁচুতর উদ্দেশ্য পূরণের আশা করা যেত না, যাতে বংশগত শক্তি, ধর্মীয় সম্প্রদায় কিংবা ব্যক্তিগত স্বার্থ হাসিল ছাড়া মিল্লাত ও জাতির কোনও কল্যাণ, ইসলামের শক্তি বৃদ্ধি এবং দেশ রক্ষার উদ্দেশ্য সম্মুখে থাকবে।

শাহ্ সাহেবের দৃষ্টিতে একটি মাধ্যম ও অবলম্বন হিসেবে তো আমীরুল উমারা নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর (যেমন পূর্বে বলা হয়েছে) প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা ছিল। কিন্তু অবস্থা-পরিস্থিতির ভয়াবহতা ও বিভীষিকাময়তার প্রেক্ষিতে তিনি একা যথেষ্ট ছিলেন না। তার একার দ্বারা সেসব অপশক্তির দৌরাত্ম্য বন্ধ করা সম্ভব ছিল না, যারা তাদের সামরিক শক্তি এত সমৃদ্ধ করে নিয়েছিল যে, রাষ্ট্রের কোনও একক সামরিক শক্তির পক্ষে তাদেরকে পরাজিত করা ছিল অসম্ভব। এজন্য একটি চৌকস পরদেশী সেনানায়কের প্রয়োজন ছিল। যিনি এদেশের জন্য সম্পূর্ণ অচেনা-অপরিচিত কেউ হবে না বরং অবগত হবেন এদেশের উন্নতি-অবনতি, দেশের অধিবাসীদের রীতিনীতি এবং এখানকার শত্রু ও সৈনিকদলের মানসিকতা আর দুর্বলতাগুলো সম্পর্কে। যার সাহস-ইচ্ছা হল, এদেশকে সেসব সামরিক বিপর্যয়সমূহ থেকে মুক্ত করে রাজত্বে বাগডোর এখানকার পুরোনো শাসক বংশের কোনও যোগ্য সুদক্ষ ব্যক্তিত্ব, কৃতজ্ঞ ও কর্মনিষ্ঠ আমীর কিংবা উযীরকে সোপর্দ করে ফিরে যাবেন। কেননা এটিই বাস্তবপ্রিয়তা, জাতীয় স্বার্থ ও স্বদেশপ্রেমের দাবী।

এই স্পর্শকাতর ও কঠিক কাজের জন্য (যাতে বরাবরের মতই লাভ-লোকসানের দিক ছিল) শাহ্ সাহেবের সন্ধানী দৃষ্টি গিয়ে নিবদ্ধ হয়ে কান্দাহারের শাসনকর্তা (১১৩৬-১১৮৬ হি./১৭২৩-১৭৭২ খৃ.) আহমদ শাহ দুররানীর ওপর। যিনি ভারতবর্ষের জন্য অচেনা-অজানা নতুন কেউ ছিলেন না। তিনি জন্মগ্রহণ করে ছিলেন মুলতানে। সেখানে আজও একটি সড়কের নাম আবদালী সড়ক। তিনি বিভিন্ন প্রেক্ষাপট ও উদ্দেশ্য নিয়ে ১৭৪৭ খৃ.-১৭৬৯ খৃ. এর মধ্যে নয়বার ভারতবর্ষ আক্রমণ করেন। শাহ্ সাহেব এবং নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর আহবান আর পানিপতের যুদ্ধের পূর্বে তিনি ছয়বার ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি অবগত ছিলেন রাষ্ট্রের উন্নতি-অবনতি, যুদ্ধপদ্ধতি, সামরিক শক্তির পছন্দ-অপছন্দ এবং আমীর-উমারা ও রাজন্যবর্গ-শাসকদের চিন্তাধারা দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে। তিনি খৃস্টীয় আঠার শতক আর হিজরী বার শতকের মধ্যভাগের সেসব বিশিষ্ট সেনানায়কদের একজন ছিলেন, যারা বহুকাল পরপর জন্মগ্রহণ করেন এবং পৃথক স্বাধীন রাজত্বের ভিত্তিপ্রস্তর রাখেন। তিনি অত্যন্ত সুশৃঙ্খল ও সাফল্যের সাথে বিক্ষিপ্ত আফগানদেরকে সংঘবদ্ধ করেন। ন্যায়ানুগ আইনকানুন চালু করেন। হিসাব বিভাগ বা পরিসংখ্যান বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন। তিনি ছিলেন সৈন্য প্রশিক্ষক, উন্নত চরিত্র ও আত্মিক পবিত্রতার গুণাবলির আধার। শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগী। প্রভাব-প্রতিপত্তির সঙ্গে স্বজাতির কাছে সুপ্রিয় এবং আস্থাভাজন। ধার্মিক, মাযহাবের অনুগত, উলামা-মাশায়িখের সংশ্রব

প্রত্যাশী। সাইয়িদগণ এবং মাশায়িখের প্রতি শ্রদ্ধাশীল, নিজের ধর্মীয় জ্ঞান-প্রত্যয় সমৃদ্ধি এবং শিক্ষামূলক বিতর্ক বা চিন্তাভাবনা আদান-প্রদানে আগ্রহী, কোমলপ্রাণ, মহানুভব, সাম্য ও ধর্মীয় কমনীয়তার উপর আমলকারী।

তিনি এমন কিছু সুন্নত যিন্দা করেছেন, আফগানের অবস্থা পরিবেশে যার নাম নেওয়াও কঠিন ছিল। যেমন, বিধবাদের দ্বিতীয় বিয়ে। তিনি নিজেও শিক্ষিত এবং লেখক ছিলেন। নিজের আধ্যাত্মিক উন্নতির তীব্র বাসনা রাখতেন। ঐতিহাসিক ফেরির লিখেন, 'প্রাচ্যদেশগুলোর অনেক দুরাবস্থা (ও ক্ষয়ক্ষতি) থেকে আহমদ শাহ ছিলেন পবিত্র। মদ্যপান, আফিম ইত্যাদি সেবন থেকে বেঁচে থাকতেন পুরোপুরি। মোহগ্রস্থতা-লালসা ও কপট আচরণ থেকে ছিলেন পবিত্র। ছিলেন ধর্মের কঠোর অনুসারী। তার সাদাসিধে কিন্তু প্রভাবময় অভ্যাসগুলো তাকে প্রত্যেকের প্রিয়পাত্র বানিয়ে দিত। তার সাথে সাক্ষাৎ সহজ ছিল। তিনি ইনসাফের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখতেন। কখনও কেউ তার ফায়সালার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেনি।'

আহমদ শাহ দুররানী শাহ সাহেবের যুগে ছয়বার ভারতবর্ষে এসে স্থানীয় ও সময়ের প্রয়োজনগুলো পূরণ করে ফিরে গিয়েছিলেন। সেসব আক্রমণে নিজের সামরিক শক্তির প্রদর্শনী এবং সময়ের প্রয়োজন পূরণ করা ছাড়া তিনি অন্য কোনও জনহিতকর কাজ আঞ্জাম দেননি। তার সৈন্যদল সেসব ইসলামী শিক্ষা ও শিষ্টাচারের আনুগত্যও করেনি, শরীয়তের অনুগত একজন মুসলমানের কাছে যার আশা করা হয়। তার কোনও কোনও আক্রমণে শাহ সাহেব এবং শুভাকাঙ্খীদেরও বিভিন্ন পেরেশানী ও দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছিল।

কিন্তু সেসব দুর্বলতা ও তিক্ত অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন একটি আশার আলোক, যা সে অন্ধকার আকাশে ঝলমলে দৃষ্টিগোচর হত। মাওলানা আশেক মুহাম্মদ ফুলতী (র)-এর বর্ণনা মতে এরপরও শাহ্ সাহেব বলতেন, 'এ অঞ্চলে তারই জয় হবে।'

একবার বাহাদুর খানা বেল্লুচের প্রশ্নের জবাবে বলেন, 'এ দেশের উপর তার পূর্ণ বিজয় হবে।

একবার তার মৃত্যুর গুজব ছড়িয়ে পড়ে। তখন শায়খ মুহাম্মদ আশেকের জিজ্ঞাসার জবাবে বলেন, 'যা মনে হচ্ছে, তা হল, আহমদ শাহ্ দুররানী এদেশে আবার আসবেন এবং সেসব কাফিরদের ধ্বংস করে দিবেন তাদের জুলুম-অবিচার সত্ত্বেও । তাকে আল্লাহ্ তা'আলা এখনও বাঁচিয়ে রেখেছেন।'

শাহ সাহেবের আশা ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা শাহ্ আবদালী এ অবস্থার সংশোধন করবেন এবং তার দ্বারা এমন কাজ নিবেন, যা বাহ্যতঃ কোনও আমীর বা নেতার পক্ষে সম্ভব নয়। হাকীম আবুল ওফা কাশ্মীরীকে একবার

বলেন, আবদালীর উদ্দেশ্য হাসিলে যেসব বাঁধা-বিঘ্ন ও সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে, তা ঐ জুলুম-অবিচারের পরিণতি। যা তিনি (পূর্বের আক্রমণগুলোতে) ভারতের শহরগুলোর উপর করেছেন। পরবর্তী তার অবস্থার সংশোধন হয়ে যাবে।

শাহ সাহেব আহমদ আবদালী দ্বারা দেশকে এই অনিশ্চিত অবস্থা-পরিস্থিতি ও পেরেশানী থেকে নিরাপদ করা এবং রাজত্বকে রাজবংশের তুলনামূলক কোনও যোগ্য ব্যক্তির হাতে ন্যস্ত করার কাজ নিতে চাইতেন। শাহ সাহেব তার আগমনের পূর্বে ভবিষ্যদ্বাণী করে বলেছিলেন, আবদালী এখানে এসে অবস্থান করবেন না বরং এদেশের কোনও সন্তানের হাতে রাজত্বভার সোপর্দ করে ফিরে যাবেন।

অবশেষে শাহ সাহেব (র) আহমদ শাহ আবদালীকে নবাব নাজীবুদ্দৌলাহর দ্বারা চিঠিপত্র লেখান। এরপর সরাসরি একটি জোরাল ও প্রভাবময় চিঠি লিখেন। পত্রটি শাহ সাহেবের রাজনৈতিক প্রজ্ঞা, ধর্মীয় মূল্যবোধ, চারিত্রিক উৎকর্ষতা, সাহসিকতা ও রচনাশক্তির দর্পণ। উক্ত পত্রে ভারতবর্ষের উদ্ভূত অবস্থা পরিস্থিতি, এর প্রাচীন শাসনপদ্ধতি, এর বিভিন্ন প্রদেশের আইন-শৃঙ্খলা, দেশের বিভিন্ন বংশধর ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর সংখ্যা ও সাদৃশ্য, তাদের ব্যাপারে মুসলিম বাদশাদের রাজনৈতিক ভুলভ্রান্তি, সংকীর্ণ দৃষ্টি, তাদের ধারাবাহিকভাবে শক্তি সঞ্চয় ও নেতৃত্ব লাভের কথা উল্লেখ করা হয়েছে, এক্ষেত্রে মারাঠী ও জাঠদের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। অংকন করা হয়েছে তার নেতৃত্বে, বারবার আক্রমণের কারণে ইসলামের দৈন্যদশা ও মুসলমানদের নির্যাতিত হওয়ার হৃদয়বিদারক চিত্র। আর সেই আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান নেতা, যিনি এ সময় ভারতবর্ষ থেকে নিয়ে ইরান পর্যন্ত সবচেয়ে বড় সুদক্ষ সুশৃঙ্খল সামরিক শক্তিধর ছিলেন, তাকে এই অবস্থা-পরিস্থিতি মোকাবেলা করা, মোঘল সাম্রাজ্যকে স্বপদে উঠে দাঁড়ানো ও দেশের দায়িত্বভার রক্ষা করার সুযোগ দানের জন্য উৎসাহিত করা হয়। পরিস্কারভাবে লিখা হয়, 'এ যুগে শক্তি ক্ষমতার অধিকারী, বিরুদ্ধাচারী সৈন্যকে পরাভূত করতে সক্ষম, দূরদর্শী ও যুদ্ধে অভিজ্ঞ কোনও শাসক আপনি ছাড়া আর কেউ বিদ্যমান নেই।'

আমরা আল্লাহর বান্দাগণ হযরত রাসূলে কারীম (স) কে সুপারিশকারী বানাচ্ছি এবং মহান আল্লাহর নামে প্রার্থনা করছি, যেন আপনি পুণ্যময় সাহসিকতাকে এদিকে নিবিষ্ট করে বিরুদ্ধাচারীদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন, যাতে আল্লাহ পাকের কাছে বিরাট সাওয়াব জনাবের আমলনামায় লেখা হয় এবং আল্লাহর পথের মুজাহিদগণের তালিকায় আপনার নাম লিখে দেওয়া হয়। দুনিয়ার অশেষ গণীমত লাভ হয়। আর মুসলমান কাফিরদের হাত থেকে মুক্তি পায়।'

উক্ত চিঠিতে একই রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও অবস্থা-পরিস্থিতির গভীর উপলব্ধির ভিত্তিতে ভারতের সেসব নবউত্থিত শক্তিগুলো সম্পর্কে সঠিক ধারণা দিয়েছেন, যাদের বিপরীতে কোন সুশৃঙ্খল শক্তি না থাকার কারণে তাদের বীরত্ব ক্ষমতার খ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। তাদেরকে মনে করা হত অপরাজেয়। আর এরূপ ধারণা একজন অভিজ্ঞ নেতা এবং রাজনৈতিক সূক্ষ্মদর্শী ব্যক্তিই পেশ করতে পারেন। মারাঠীদের সম্পর্কে লিখেন, 'মারাঠা জাতিকে পরাজিত করা সহজ ব্যাপার। তবে ইসলামের গাজী-যোদ্ধাদেরকে সাহসের সাথে কোমর বাঁধতে হবে। বস্তুতঃ মারাঠা জাতি সংখ্যালঘু। কিন্তু তাদের সঙ্গে একটি সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মিলিত হয়েছ। যদি এ দলের একটি কাতারও ছত্রভঙ্গ করে দেওয়া যায়, তবে এ জাতি বিচ্ছিন্ন-বিক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে। আর এই পরাজয়ে আসল জাতি ভেঙ্গে পড়বে। কেননা এ জাতি শক্তিধর নয়। এজন্য তাদের সকল যোগ্যতা এমন বিশাল সৈন্যদল গঠন করা, যারা পিপড়া ও ফড়িং থেকেও বেশি হবে, বীরত্ব ও যুদ্ধোপকরণের ঘাটতির কোন অপবাদ তাদের মধ্যে নেই।'

শাহ সাহেব (র) -এর হেদায়াত মোতাবেক নাজীবুদ্দৌলাহ আহমদ শাহ আবদালীকে যে পত্রাবলি লিখেন, এরপর স্বয়ং শাহ সাহেব যে সুদীর্ঘ প্রভাবময় পত্র সরাসরি লিখেন, (সংক্ষিপ্ত উদ্ধৃতি প্রাগুক্ত) তা প্রতিক্রিয়াহীন নিষ্ফল পড়ে থাকেনি। আহমদ শাহ আবদালী ১১৭৩ হি. মোতাবেক ১৭৫৯ খৃ. মারাঠীদের শক্তি ভেঙ্গে দেওয়া এবং নাজীবুদ্দৌলাহ ও শুজাউদ্দৌলাহকে সাহায্য করার জন্য (যারা সে সময় রাজনৈতিক প্রজ্ঞা ও ইসলামী ঐক্য-সংহতির প্রমাণ দিয়েছিলেন) ভারত অভিযানের মনস্থ করেন। এক বছর কেটে যায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ড যুদ্ধ-লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে। অবশেষে ১১৭৪ হি. মোতাবেক ১৪ জানুয়ারী ১৭৬১ খৃস্টাব্দে পানিপতের রণাঙ্গনে মারাঠী এবং আফগানী ও ভারতীয় ইসলামী যৌথ শক্তির মধ্যে ঐতিহাসিক সেই চূড়ান্ত ভাগ্য নির্ধারণী যুদ্ধ সংঘটিত হয়, যা ভারতবর্ষের ইতিহাসের মোড় ঘুরিয়ে দেয়। আর মারাঠীদেরকে ভারতে নতুন উত্থানমুখী রাজনৈতিক চিত্র থেকে বাইরে ছুঁড়ে ফেলে। উক্ত যুদ্ধের সংক্ষিপ্ত অবস্থাচিত্র ও ফলাফল মৌলভী যাকাউল্লাহ সাহেব 'তারীখে হিন্দুস্তান' রচয়িতার ভাষায় লিখা হচ্ছে, 'তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। কিন্তু তখনও মারাঠীদের পাল্লা ভারী ছিল। আহমদ শাহ তার পলাতক সৈন্যদেরকে আবদ্ধ করে হত্যার নির্দেশ দিলেন আর বলে দিলেন, যে পলায়ন করবে, সে মারা পড়বে। এরপর তিনি তার কাতারকে সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার নির্দেশ দিলেন। এক সৈন্যকে নিজের বাম দিকে শত্রুর বাহুতে আক্রমণ করার হুকুম দিলেন। এই কৌশলে তীর যথার্থ

লক্ষ্যস্থলে গিয়ে পড়ে। বিপক্ষ সৈন্যের ভাও ও বিশ্বাস রাও অশ্বারোহণ করে যোদ্ধাদের লড়াই পরিচালনা করছিল। বর্শা-তরবারীর বাজি চলছিল। হঠাৎ আল্লাহ জানেন, কী হয়ে গেল। মারাঠী সৈন্যদের পা উঠে গেল রণাঙ্গণ থেকে। পদস্খলন মাত্রই তাদের মরদেহে রণাঙ্গণ ভরে গেল। ইসলামী সৈন্যদল অত্যন্ত আগ্রহ নিয়ে চতুর্দিকে পনের-বিশ মাইল পর্যন্ত তাদের ধাওয়া করে। মারাঠীদের মেরে মেরে লাশের স্তুপ বানিয়ে দেয়। আর যেসব মারাঠী এই শত্রুদের হাত থেকে বেঁচে গিয়েছিল, তাদেরকে গ্রাম্য বুদ্ধুরা মেরে ফেলে। বিশ্বাস রাও ও ভাও মারা পড়ে। যেই সিন্ধীকে কোনও দুররানী লুকিয়ে রেখেছিল, তাকেও খুঁজে বের করা হয় এবং ধরে এনে হত্যা করা হয়। ইবরাহীম খান গার্দীও বন্দি হয়। এক সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যু তার ক্ষতস্থানগুলোতেও পট্টি লাগায়। শামশীর বাহাদুরও পলায়নরত অবস্থায় মারা পড়ে। মালূহ-এর মধ্যে মিলহার রাও জান বাঁচিয়ে পালিয়ে যায়। আপাজী সিন্ধীও ল্যাংড়া হয়ে সেখানে গিয়ে পৌঁছে। এই দুই নেতা ব্যতিত প্রসিদ্ধ আর কোনও নেতা প্রাণে বাঁচেনি। মারাঠীদের এমন পরাজয় ইতোপূর্বে কখনও হয়নি। আর না এমন বিপর্যয় হয়েছিল। ফলে গোটা জাতির মন মৃতপ্রায় ও নিরস হয়ে গেল। এই শোকে বালাজীও কয়েকদিন পরে মারা যায়। পরাজয়ের সংবাদ শোনার পর থেকেই একটি মন্দিরে বসে সংস্কৃতি পাঠে সে মগ্ন হয়ে গিয়েছিল।'

জনৈক ঐতিহাসিকের মতে 'মারাঠীদের শক্তি চোখের পলকে তুলার মত উড়ে গেল।' স্যার যদুনাথ সরকার লিখেন, মহরা শহরে কোনও পরিবার এমন ছিল না, যাদের মধ্যে শোকের আবহ তৈরী হয়নি। নেতাদের পূর্ণ বংশধর এই যুদ্ধে গায়েব হয়ে যায়।'

শাহ সাহেব (র) -এর ছক অনুযায়ী আহমদ শাহ আবদালী সময়ের এই প্রয়োজনীয় কাজ আঞ্জাম দিয়ে কান্দাহারের পথে রওয়ানা হন। মৌলভী যাকাউল্লাহ লিখেন, 'এই বিজয়ের পর আহমদ শাহ আবদালী পানিপত থেকে দিল্লীর উপকূলে আসেন এবং কয়েকদিন অবস্থান করেন। ভারতের বাদশা নিযুক্ত করেন যুবরাজ আলী গওহার তথা শাহ আলমকে এবং বাদশাকে সুপারিশ করেন যেন শুজাউদ্দৌলাহ ও নাজীবুদ্দৌলাকে আমীরুল উমারা নিয়োগ করা হয়। শাহ আলম তখন দিল্লীতে ছিলেন না। এজন্য তার পুত্র জোয়া বখতকে বাদশার নায়েব হিসেবে দিল্লীতে নিযুক্ত করেন। নাজীবুদ্দৌলাহকে নিযুক্ত করেন দিল্লীর শাসক আর শুজাউদ্দৌলাহকে শাহী পোশাক দিয়ে উধহ ও এলাহাবাদ প্রদেশে পাঠিয়ে দেন। স্বয়ং চলে যান কান্দাহার।'

প্রফেসর খালিক আহমদ নিযামী লিখেন, 'পানিপতের যুদ্ধের পর আহমদ শাহ্ আবদালী শাহ্ আলমকে দিল্লী ডেকে আনার সীমাহীন চেষ্টা করেছেন। নিজের লোক পাঠিয়েছেন। যখন তিনি আসলেন না, তখন আহমদ শাহ আবদালী শাহ্ আলমের মাতা নবাব জিনাত মহলের দ্বারাও পত্র লেখান। শাহ্ আলমকে ডেকে আনার চেষ্টা আহমদ শাহ্ এজন্য করেছিলেন, যেন তিনি ইংরেজদের প্রভাব থেকে বেরিয়ে আসেন এবং দিল্লী এসে আহমদ শাহের উপস্থিতিতে নিজের শক্তিকে সুদৃঢ় করেন।'

খালীক সাহেব লিখেন, 'মারাঠী, জাঠ, শিখরা কোনও যুদ্ধে এত ব্যাপক ও প্রশস্ত ছিল না যে, তারা ভারতের কেন্দ্রীয়তা ও অখণ্ডতা অক্ষুণ্ন রাখার চিন্তা-ভাবনা করবে। শাহ্ সাহেব (র) তার নির্বাচিত ব্যবস্থায় আকবর, জাহাঙ্গীর, শাহজাহান ও আওরঙ্গজেবের শাসনামলের কেন্দ্রীয়তা এবং ভারত সাম্রাজ্যের উচ্চ শক্তিকে বহাল দেখতে চাইতেন। তবে সেই সাথে কামনা করতেন লাগামহীন বাদশাদের স্থলে যেন ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা হয়।

তখন যদি রাজত্বের ভেতর সামান্য প্রাণচাঞ্চল্যও থাকত, তবে সে পানিপতের যুদ্ধ থেকে ফায়দা লুটে নিজের শাসনক্ষমতাকে ভারতবর্ষে আবার কিছুকালের জন্য প্রতিষ্ঠিত করতে পারত। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে মোঘল সাম্রাজ্য তখন নিষ্প্রাণ দেহের মত ছিল। পানিপতের যুদ্ধের প্রকৃত ফায়দা হাসিল করে পলাশী যুদ্ধের বিজয়ীগণ।'

শাহ্ আলম তার কাপুরুষতা, হীনমন্যতা ও সংকীর্ণ দৃষ্টির কারণে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতছাড়া করে ফেলে। আর সকল চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং স্বয়ং আপন মাতা যিনাত মহলের স্নেহপূর্ণ চিঠি সত্ত্বেও পূর্ণ দশ বছর পর ১৭৭১ খৃস্টাব্দের শেষ দিকে অর্থাৎ ২৫ ডিসেম্বর ১৭৭১ খৃস্টাব্দে তিনি দুর্গে প্রবেশ করেন। এরপর তার সঙ্গে এবং তার সহচরদের সঙ্গে যা কিছু করা হয়েছে, তা ইতিহাসের পাতায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ আছে। এর চরম পরিণতি হচ্ছে, (Climax) ১৮৫৭ খৃস্টাব্দের রাজত্বের বিপ্লব তথা রাজত্ব হাতছাড়া হওয়া। (অবশ্য নামসর্বস্ব রাজত্ব ছিল), যা হয়েছে ইংরেজদের হাতে। যারা নিজেদের বিচক্ষণতা ও রাজনৈতিক প্রজ্ঞার দ্বারা ভারতবর্ষের উপর আধিপত্য বিস্তার ও দখল প্রতিষ্ঠার কোনও সুযোগ হাতছাড়া করেনি।

শাহ্ সাহেবের পরে তার যোগ্য উত্তরসূরী, জ্ঞান-প্রজ্ঞা এবং ধর্মীয় আত্মমর্যাদা ও আত্মসম্ভ্রমবোধের উত্তরাধিকারী তার সম্মানিত পুত্র সিরাজে হিন্দ হযরত শাহ্ আবদুল আযীয (র) স্বীয় মহান পিতার শুরু করা কাজকে কেবল চালুই রাখেননি বরং তার ব্যাপকতা ও পূর্ণতা দানের চেষ্টা করেছেন

এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি পরিবর্তনসহ নিজের মনোযোগিতা তখনকার রাজনৈতিক ময়দানের আসল শত্রু ও প্রকৃত শক্তি (ইংরেজ শক্তি) এর দিকে ঘুরিয়ে দেন। যারা তখন 'আশঙ্কা' থেকে অগ্রসর হয়ে (যা দেখার জন্য রাজনৈতিক প্রজ্ঞার প্রয়োজন হয়) বাস্তবরূপ ধারণ করে নিয়েছিল। যা দেখার জন্য দৃষ্টিশক্তি থাকাও যথেষ্ট।

শাহ আবদুল আযীয (র)-এর পরে তারই শিক্ষালয়ের দুই প্রাশিক্ষণপ্রাপ্ত, দৃঢ়চিত্ত দাঈ ও সংস্কারক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) এবং শাহ ইসমাঈল শহীদ (র) হযরত শাহ সাহেবের রাজনৈতিক চিন্তাধারা ও নকশায় (যা তিনি চিন্তা-দর্শনরূপে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' ও 'ইযালাতুল খফা' -এর পাতায় পাতায় ও জ্ঞান-প্রজ্ঞায় উপস্থাপন করেছিলেন) রঙ লাগানোর চেষ্টা করেন। একে নবুওয়াতের আদর্শিক খেলাফতের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজের জীবন বাজি রাখেন। তারা হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষা এবং তাঁর দেওয়া আলোকবর্তিকা দ্বারা কতটুকু উপকৃত হয়েছিলেন, তাদের ইচ্ছা শক্তি কত উঁচু! তাদের দৃষ্টি কত দূরদর্শী! তাদের মন ছিল কত প্রশস্ত ও উদার! তারা পাঞ্জাবের মুসলমানাদের উপর থেকে শিখদের সামরিক শাসনের বিপদ-আপদ থেকে বাঁচানোর পর (যেভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) মারাঠী ও জাঠদের নিত্যদিনের হত্যা-লুণ্ঠন থেকে সমকালীন পরিবেশ ও সমাজকে রক্ষা করার চেষ্টা চালিয়েছেন) এবং যে ইংরেজদেরকে তারা 'অচেনা ভিনদেশী ও বণিক গোষ্ঠী' বলে অভিহিত করেন, সে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করে ভারতবর্ষকে কিভাবে স্বাধীন এবং ইসলামের সাম্য-ন্যায় ও ইনসাফের নীতিমালায় এর আইন-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠিত করতে চাইতেন, এর অনুমান তাদের চিঠিপত্র থেকে পাওয়া যাবে, যেগুলো তারা সমকালের শাসক, আমীর-উমারা, আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন মুসলমান এবং সচেতন রাষ্ট্রপরিচালকগণকে লিখেছেন। এভাবে এ ধারার আহলে দাওয়াত ও আযীমত বাস্তবিকই বলতে পারেন,

آغشتہ ایم ہر سرِ خارے بخونِ دل۔
قانونِ باغبانیِ صحرا نوشتہ ایم۔

'করেছি একাকার মোরা সব কণ্টকের চূড়া,
বুকের তপ্ত খুনে লিখেছি মোরা
মরুদ্যান কার্যের সংবিধান।'

দশম অধ্যায়

উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর পরিসংখ্যান এবং তাদেরকে সংস্কার ও বিপ্লবের আহ্বান

শাহ্ সাহেবের স্বকীয়তা

সাধারণতঃ যেসব আকাবিরে উলামায়ে কিরামের শিক্ষা জ্ঞান-গবেষণা ও সাহিত্যমূলক হয়, যাদের দান করা হয় বুদ্ধিমত্তা, বিচক্ষণতা ও সূক্ষ্মদর্শিতার পূর্ণাঙ্গ অংশ, তারা সাধারণতঃ বিভিন্ন বই-পুস্তক পাঠ, শিক্ষামূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধের উপর গবেষণা, পর্যালোচনা কিংবা লেখালেখি ও সাহিত্যচর্চায় আপাদমস্তক ধ্যান-তন্ময় হয়ে ডুবে থাকেন। সমাজের বিভিন্ন শ্রেণী ও সাধারণ মুসলমানদের দুর্বলতা ও রোগ-ব্যাধি সম্পর্কে হয়ত তারা উদাসীন-বেখবর থাকেন অথবা তাদের পক্ষে এই সাধারণ পর্যায়ে পৌঁছা এবং এ শিক্ষাগত উঁচু দৃষ্টি থেকে (যার মধ্যে পৃথিবীর সকল প্রকার স্বাদ-মিষ্টতার উর্ধ্বে এক ভিন্ন স্বাদ ও মিষ্টতা থাকে) নেমে আসা কঠিন হয়।

প্রবীণ উলামায়ে কিরামের মধ্য হতে এক্ষেত্রে দুই ব্যক্তিকে পরিষ্কারভাবে ব্যতিক্রমভুক্ত করা যায়। প্রথমতঃ হুজ্জাতুল্লাহিল ইসলাম ইমাম গাযালী (র) (মৃত্যু ৫০৫ হি.)। যিনি তার জগদ্বিখ্যাত অমর গ্রন্থ 'এহইয়াউল উলূমিদ্দীন'-এর মধ্যে সমকালীন মুসলিম সমাজ ও মুসলিম উম্মাহর বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের রোগ-ব্যাধি ও দুর্বলতাগুলো এমনভাবে চিহ্নিত করেছেন, যাতে পরিষ্কার মনে হয়, তিনি সমকালের সাধারণ জীবনযাত্রা ও সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকদের সম্পর্কে, উলামায়ে কিরামের শিক্ষার আসর ও মাশায়িখের যিকির-ফিকিরের মজলিস থেকে নিয়ে খলীফা ও শাসকবর্গের দরবারসমূহ, আমীর-উমারা ও গভর্নরদের প্রাসাদসমূহ, নেতৃবৃন্দের আনন্দমহল পর্যন্ত আর সেসব রঙমহল থেকে নিয়ে পেশাজীবী ও ব্যবসায়ীদের দোকান এবং বাজার-বন্দরের কোলাহল ও উত্তেজনাপূর্ণ অবস্থা-পরিস্থিতি সম্পর্কে ওয়াকিফহাল ছিলেন। জানতেন নফস (প্রবৃত্তি) ও শয়তান কী কী পন্থায় উলামা ও নেতৃবৃন্দের বিভিন্ন শ্রেণীর লোকজন আর সাধারণ ও বিশেষ লোকদের বিভিন্ন গোষ্ঠীকে ধোঁকা দিচ্ছে? ধর্মীয় জ্ঞান-গবেষণা কিভাবে বদলে গেছে? আর তারা আসল অভীষ্ট (আল্লাহর সন্তুষ্টি ও পরকালীন সাফল্য) সম্পর্কে কত উদাসীন।

একই অবস্থা (সংক্ষিপ্ততা ও ব্যাখ্যা, রচনাশৈলী ও ভাবধারার পার্থক্যসহ) আল্লামা ইবনে জাওযী (র) (মৃত্যু ৫৯৭ হি.) এর রচিত 'তালবীসে ইবলীস' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে। এ গ্রন্থে তিনি সমকালের গোটা মুসলিম অবস্থাবলি পর্যালোচনা করেছেন। মুসলমানদের প্রত্যেক শ্রেণী ও দলকে সুন্নাহ ও শরীয়তের মানদণ্ডে যাচাই করেছেন। চিহ্নিত করেছেন তাদের দুর্বলতা, ভারসাম্যহীনতা, সীমালঙ্ঘন ও ভুলভ্রান্তিগুলো। এ ব্যাপারে তিনি কোনও শ্রেণীর পক্ষপাতিত্ব করেননি। উলামায়ে কিরাম, মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে কিরাম, ওয়ায়েযীন, কবি-সাহিত্যিক, রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গ, আবেদ-যাহেদ, আহলে দীনের সূফীগণ এবং সর্বসাধারণ নির্বিশেষে সকলেরই পর্যালোচনা করেছেন। উন্মোচন করেছেন তাদের ভুল-ভ্রান্তিগুলোর পর্দা।

কিন্তু (তালবীসে ইবলীসের সম্পর্ক যতদূর জানা যায়, তাতে দেখা যায়) ঐ সমালোচনা ও পরিসংখ্যান বেশিরভাগ নেতিবাচক ও অস্বীকারমূলক ভাবধারার। সেই সাথে অবস্থার উন্নয়ন ও সংশোধনের বিস্তারিত ও শক্তিশালী ইতিবাচক আহবান নেই। আর যদি থেকেও থাকে, তবে পরিমাণ ও প্রতিক্রিয়ায় সে পর্যায়ের নয়। সম্ভবতঃ এর কারণ, উক্ত কিতাবের আলোচ্য বিষয়ে তার চেয়ে বেশি আলোচনার অবকাশ ছিল না।

উম্মতের বিভিন্ন শ্রেণীর প্রতি বিশেষ সম্বোধন

এই দুই বিশ্বনন্দিত আলেম, দীনের দাঈ (ধর্ম প্রচারক) ও চরিত্র-আদর্শের শিক্ষক মহোদয়ের পরে (যারা নিজ নিজ সংশোধন ও দীক্ষামূলক মর্যাদার সঙ্গে উচ্চস্তরের আলেম এবং লেখক ছিলেন) আমাদের (নিজের সীমিত জ্ঞান-গবেষণামতে) এক্ষেত্রে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর কৃতিত্ব সবচেয়ে বেশি উজ্জ্বল ও দীপ্তিমান পরিলক্ষিত হয়। তিনি ইসলামের শাসকবর্গ, আমীর-উমারা, নেতৃবৃন্দ ও রাজন্যবর্গ, সামরিক সদস্য, বিভিন্ন শিল্প-কারিগরি পেশাজীবী, মাশায়িখের পুত্রগণ (পীরজাদাগণ), বিপথগামী উলামা-দরবেশ ও ভোজনবিলাসী ওয়ায়েজীন, দুনিয়াবিমুখ ও নির্জনতা অবলম্বনকারী সাধক ব্যক্তিবর্গকে পৃথক পৃথক সম্বোধন করেছেন। তাদের ব্যথাভরা শিরা-উপশিরায় অঙ্গুলী রেখেছেন। চিহ্নিত করেছেন তাদের আসল রোগ-ব্যাধি ও আত্মপ্রবঞ্চণাগুলো। তাছাড়া মুসলিম উম্মাহর প্রতি সাধারণ ও পরিপূর্ণ সম্বোধন করেছেন। তাদের রোগগুলোও নিরূপণ করেছেন। বাতলে দিয়েছেন সেসবের চিকিৎসা। এসব একান্ত সম্বোধনে শাহ সাহেবের মনোব্যথা, ইসলামী মূল্যবোধের চেতনা, দাওয়াতের আগ্রহ ও কলমের জোর এমন উচ্চশিখরে পৌঁছেছে, যার উপমা পূর্বোক্ত সংস্কারক ও নিরীক্ষক এবং

তাদের উপরিউক্ত কিতাবাদিতে পাওয়া কঠিন। শাহ সাহেবের রচিত 'আত্-তাফহীতুল এলাহিয়্যাহ' (খণ্ড ১-৩) থেকে চয়িত। বিভিন্ন উদ্ধৃতি নিম্নে পেশ করা হচ্ছে, যাতে তিনি তার যুগের বিভিন্ন বিশিষ্ট মহলের নেতৃবৃন্দের প্রতি সম্বোধন করেছেন। সেসব বিশেষ সম্বোধন থেকে শাহ সাহেবের গভীর দৃষ্টি, দাওয়াতের কৌশল-প্রজ্ঞা, চারিত্রিক বীরত্ব এবং সাধারণ ও অসাধারণ ব্যক্তিবর্গ সম্পর্কে অভিজ্ঞতার এমন বহিঃপ্রকাশ হয়, যা দেখে ইতিহাসের এমন এক জ্ঞানপিপাসু, যে এ যুগ ও সমাজের দুরাবস্থা, বিদ্বান-জ্ঞানী ও কলমসৈনিকের কল্যাণকামিতা এবং দাঈ ও সংস্কারকদের অবস্থার সংশোধন ও সংস্কারের ব্যাপারে নৈরাশ্য সম্পর্কে অবগত। সে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যায় আর অজান্তে অনিচ্ছায় বলে উঠে–

'হে আল্লাহ! এমন স্ফুলিঙ্গও ছিল তোমার ভস্ম ছাইয়ে!'

মুসলিম সম্রাটদেরকে সম্বোধন

'হে সম্রাটগণ! এ যুগে রাজাধিরাজ (মহান আল্লাহর) সন্তুষ্টি অন্তর্নিহিত হচ্ছে এর মধ্যে যে, তোমরা তরবারী কোষমুক্ত করে নিবে এবং ততক্ষণ পর্যন্ত তা কোষাবদ্ধ করবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না মুসলমান মুশরিকদের থেকে সম্পূর্ণ পৃথক হয়ে যায়। কাফির, ফাসিক-পাপিষ্ঠদের অহংকারী নেতা দুর্বলদের দলে গিয়ে শামিল না হয়ে যায়। অধিকন্তু তাদের হাতে যেন এরপর এমন কিছু না থাকে, যার বদৌলতে তারা পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে পারে।

وقاتلوهم حتى لاتكون فتنة ويكون الدين كله لله.

অর্থাৎ তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাক, যাবৎ না ফিৎনা নির্মূল হয়ে যায়। আর দীন কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট হয়ে যায়।

অনন্তর যখন কুফর ও ইসলামের মাঝে এরূপ প্রকাশ্য-সুস্পষ্ট পার্থক্য তৈরী হয়ে যাবে, তখন তোমাদের কতর্ব্য, প্রত্যেক তিন/চারদিনের দূরত্বের এলাকাসমূহে নিজেদের পক্ষ থেকে একজন শাসক নিযুক্ত করা। এমন শাসক, যে হবে ন্যায়-নিষ্ঠার আদর্শ পথিকৃৎ ও শক্তিশালী। যিনি জালেম-অত্যাচারী থেকে অত্যাচারিতের অধিকার আদায় করতে পারেন, আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠা করতে পারেন। এরপর তৎপর থাকবেন যেন মানুষের মাঝে বিদ্রোহ ও অবাধ্যতার অনুভূতি জাগ্রত না হয়। আর না ধর্মান্তরিত হওয়ার কোনও অবকাশ বাকী থাকে; না কারও কোনও কবীরা গুনাহে লিপ্ত হওয়ার পরিস্থিতি উদ্ভব হয়। ইসলামের ঘোষণা প্রকাশ্যে করা যায়। খোলাখুলি প্রকাশ করা যায়

ইসলামের নিদর্শনগুলো। প্রত্যেকেই তার নিজ দায়িত্ব-কর্তব্যগুলো যথাযথভাবে আদায় করে। প্রত্যেক শহরের শাসককে নিজের হাতে এতটুকু শক্তি রাখতে হবে, যার দ্বারা তিনি তার সংশ্লিষ্ট এলাকার সংশোধন-সংস্কার করতে পারেন। কিন্তু তাকে এতটুকু শক্তি অর্জনের অবকাশ দেওয়া যাবে না, যার উপর ভিত্তি করে সে স্বয়ং স্বার্থবাদী হওয়ার কৌশল খুঁজতে থাকে এবং রাজত্বের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে উদ্যত হয়ে যায়।

নিজের সংশ্লিষ্ট রাজ্যের বড় বড় অঞ্চল ও ভূ-খণ্ডে এমন আমীর বা শাসক নিযুক্ত করা উচিৎ, যিনি যুদ্ধাভিযানেরও সক্ষমতা রাখেন। এমন শাসকের অধীনে বার হাজার সৈন্যসমাগম রাখা যায়। তবে এই বাহিনী যেন এমন লোকদের দ্বারা পূরণ হয়, যাদের অন্তরে জিহাদের তামান্না আছে। আল্লাহর পথে যারা কারও ভর্ৎসনায় ভীত-সন্ত্রস্ত নয়। যে কোনও অবাধ্য-অহংকারী বিদ্রোহীর সাথে লড়াই ও যুদ্ধ করার শক্তি-ক্ষমতা তাদের মধ্যে আছে। হে বাদশাগণ! তোমরা যখন এ কাজগুলো করে ফেলবে, তখন রাজাধিরাজের সন্তুষ্টির প্রত্যাশা হবে, যেন তোমরা মানুষের পারিবারিক, বৈবাহিক ও বংশীয় জীবনের প্রতি মনোযোগ দাও। তাদের পারস্পরিক লেনদেন আচার-ব্যবহার পরিশুদ্ধ করে দাও এবং এমন বানিয়ে দাও যেন এরপর আর কোন ব্যাপার এমন না ঘটে বা না থাকে, যা শরয়ী আইন ও নিয়মনীতির অনুকূল নয়। এমনটি করার পরেই মানুষ শান্তি-নিরাপত্তার সঠিক আনন্দ-স্বাদে অভিভূত হতে পারে।'

শাসক ও রাজন্যবর্গের প্রতি সম্বোধন

ওহে শাসকবর্গ! দেখ, তোমরা কি আল্লাহকে ভয় কর না? দুনিয়ার ভঙ্গুর ক্ষণস্থায়ী ভোগ-বিলাসে তোমরা ডুবে যাচ্ছ? আর যেসব লোকের ব্যবস্থাপনা তোমাদের উপর ন্যস্ত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ছেড়ে দিয়েছ, যেন তারা একে অপরকে গ্রাস করতে ও শোষণ করতে থাকে। তোমরা কি প্রকাশ্যে মদ্যপান কর না? এরপর তোমাদের এ কাজকে তোমরা পাপও মনে কর না। তোমরা কি দেখ না, কত লোক উঁচু উঁচু মহল নির্মাণ করেছে? যেন সেখানে ব্যাভিচার করা যায়, মদ্যপান করা যায়, জুয়া খেলা যায়। কিন্তু তোমরা সেখানে হস্তক্ষেপ কর না। সে অবস্থার পরিবর্তন (সংশোধন) কর না। কী অবস্থা সেসব বড় বড় শহরের, যেখানে ছয়শ বছর ধরে কারও উপর শরয়ী দণ্ডবিধি কার্যকর করা হয়নি। যখন দুর্বল কাউকে পাওয়া যায়, তাকে ধরে এনে বন্দি কর আর যখন সবল কেউ হয়, তাকে ছেড়ে দাও। তোমাদের সকল চিন্তাশক্তি কেবল এ কাজেই ব্যয় হচ্ছে, যাতে তোমরা নানা সুস্বাদু

খাবারের আইটেম রান্না করাতে থাক, নরম কোমল কমনীয় নারীদের সাথে আমোদ কর, দামী দামী পোশাক আর উঁচু উঁচু বিলাসবহুল প্রাসাদ ছাড়া আর কোথাও তোমাদের দৃষ্টি নিবদ্ধ। তোমরা কি তোমাদের মাথা কখনও আল্লাহর সামনে নত করবে? আল্লাহর নাম তোমাদের কাছে নিছক নিজেদের স্মৃতিচারণ আর কিসসা-কাহিনীতে এ নামকে ব্যবহারের জন্যই রয়ে গেছে। মনে হয়, যেন আল্লাহ শব্দের দ্বারা তোমাদের উদ্দেশ্য যুগের পরিবর্তন। কেননা তোমরা প্রায়ই বল, আল্লাহ এরূপ করতে ক্ষমতাবান। অর্থাৎ যুগের পরিবর্তনের এ ব্যাখ্যা।'

সামরিক কমান্ডোদের প্রতি সম্বোধন

'ওহে সেনানায়ক! হে সৈনিকসকল! আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে জিহাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, আল্লাহর বাণী সমুন্নত হবে। আল্লাহর কালিমা উঁচু হবে। শিরক ও তার শেকড়গুলো তোমরা পৃথিবী থেকে উপড়ে ফেলবে। কিন্তু যে কাজের জন্য তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছিল, তোমরা তা ছেড়ে দিয়েছ। এখন তোমরা যে অশ্ব পালন কর, অস্ত্র মজুদ কর, এর উদ্দেশ্য কেবল এতটুকুই যে, তোমরা এর দ্বারা নিছক তোমাদের রাজ্য সম্প্রসারণ করবে। এক্ষেত্রে জিহাদের নিয়ত তোমাদের মোটেও নেই। তোমরা মদ্যপান কর। পেয়ালায় পেয়ালায় ভাং পান কর। দাড়ি মুণ্ডন কর। গোঁফ লম্বা কর। সর্বসাধারণের উপর বাড়াবাড়ি ও জুলুম কর। অথচ তাদের যা কিছু নিয়ে খাও, তার মূল্য তাদের পর্যন্ত পৌঁছে না। আল্লাহর শপথ! শীঘ্রই তোমরা আল্লাহর নিকট প্রত্যাবর্তন করবে। এরপর তিনিই তোমাদেরকে বলবেন, তোমরা কী কী করতে?

আল্লাহ চান তোমরা উত্তম পবিত্র নেককার যোদ্ধা-গাজীদের পোশাক এবং তাদের আদর্শ গ্রহণ কর। যেন দাড়ি লম্বা কর। গোঁফ ছোট কর। পাঁচ ওয়াক্ত নামায যথাযথ আদায় কর জনসাধারণের সম্পদ হরণ থেকে বেঁচে থাক। যুদ্ধ ও রণাঙ্গণে দৃঢ়পদ থাক। তোমাদের উচিৎ সফর ও যুদ্ধ ইত্যাদি অবস্থায় নামাযের ব্যাপারে যে সব সহজতা ও ছাড় রাখা হয়েছে, সেগুলো শিখে নেওয়া। যেমন– নামায সংক্ষেপ করা, একত্রিত করা, সুন্নত ছেড়ে দেওয়ার অনুমোদন প্রভৃতি সম্পর্কে অবগত হওয়া। এরপর নামাযকে অত্যন্ত মজবুতির সাথে আঁকড়ে ধরবে। নিজের নিয়তকে পাকা দুরস্ত করে নিবে। আল্লাহ তা'আলা তোমাদের সম্মান ও পদমর্যাদায় বরকত (কল্যাণ) দিবেন। শত্রুদের উপর তোমাদের দান করবেন বিজয় গৌরব।'

শিল্প-কারিগরি ও পেশাজীবীদের প্রতি সম্বোধন

'পেশাজীবীগণ! দেখ, আমানতের আগ্রহ তোমাদের থেকে হারিয়ে গেছে। তোমরা আপন প্রতিপালকের ইবাদত-আনুগত্য থেকে একদম চিন্তামুক্ত-উদাসীন হয়ে গিয়েছ। তোমরা নিজেদের মনগড়া উপাস্যদেরকে কুরবানী-নযরানা উৎসর্গ কর। তোমরা মাদার (শাহ বদীউদ্দীন) এবং কমান্ডার (সেনাপতি মাসউদ গাজী) এর হজ্জ কর। তোমাদের জ্যোতিষ, টোটকা, ঝাড়-ফুঁক ইত্যাদি পেশা অবলম্বন করেছে। এটাই তাদের সম্পদ। এটাই তাদের বৈশিষ্ট্য। ওরা বিশেষ ধরনের পোশাক-পরিচ্ছদ পরিধান করে। বিশেষ খাবার খায়। তাদের মধ্যে যার আয় কম হয়, সে তার স্ত্রী-সন্তানদের অধিকারের তোয়াক্কা করে না। তোমাদের কেউ কেউ কেবল জঘন্য মদকে পেশা বানিয়ে নিয়েছে। তোমাদেরই কোনও কোনও লোক স্ত্রীদেরকে ভাড়ায় খাটিয়ে পেট পালে। সে লোক কত জঘন্য হতভাগ্য! নিজের ইহকাল-পরকাল উভয়টিই ধ্বংস করছে। অথচ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য বিভিন্ন ধরনের পেশা ও কামাই রোজগারের পথ খুলে রেখেছেন। যা তোমাদের এবং তোমাদের পরিবার-পরিজনদের প্রয়োজনাদির জন্য যথেষ্ট হতে পারত। তবে তোমাদেরকে খরচের ক্ষেত্রে মিতাচারিতা অবলম্বন করতে হবে। আর এতটুকু জীবিকার উপর পরিতৃপ্ত থাকার জন্য উদ্বুদ্ধ ও প্রস্তুত হতে হবে, যা তোমাদেরকে সহজে পরকালীন সফলতা পর্যন্ত পৌঁছে দেবে। কিন্তু তোমরা আল্লাহর অকৃতজ্ঞতা করেছ। বেছে নিয়েছ জীবিকা নির্বাহের ভ্রান্ত পথ। তোমরা কি জাহান্নামের আযাবকে ভয় কর না, যা চরম নিকৃষ্ট ঠিকানা?

দেখ, তোমরা তোমাদের সকাল-সন্ধ্যা আল্লাহর স্মরণে কাটাবে, আর দিনের সিংহভাগ নিজ পেশায় ব্যয় করবে। রাত্রিযাপন কর নিজ স্ত্রীদের সঙ্গে। নিজের খরচকে নিজের আয় অপেক্ষা কম রাখ। এরপর যা কিছু বেঁচে থাকে, তা দিয়ে পথিক, মুসাফির, অভাবী-ভিক্ষুকদের সাহায্য করো। আর কিছু নিজের আকস্মিক বিপদাপদ ও প্রয়োজনাদির জন্য সঞ্চিত রাখবে। তোমরা যদি এ পথ অবলম্বন না করে থাক, তবে তোমরা ভুল পথে যাচ্ছ। তোমাদের ব্যবস্থাপনা যথার্থ নয়।'

মাশায়িখপুত্রদের প্রতি সম্বোধন

তারপর মাশায়িখের সন্তান, সে যুগের ইলম পিপাসু এবং দুনিয়া বিরাগী সাধক ওয়ায়েজীনদেরকেও তিনি বিশেষভাবে আহ্বান করেছেন। যেমন, মাশায়িখপুত্রদেরকে উপদেশ দিয়ে বলেন,

'ওহে সেসব লোক, যারা পূর্বপুরুষদের রুসমকে কোন প্রকার অধিকার ছাড়া আঁকড়ে আছ অর্থাৎ প্রবীণ বুযুর্গদের কারও পুত্র! তোমাদের কাছে আমার প্রশ্ন, তোমাদের কী হল যে, বিভিন্ন খণ্ডে খণ্ডে, দলে দলে তোমরা বিভক্ত হয়ে পড়েছ? প্রত্যেকেই নিজ নিজ গান নিজ নিজ সীমানায় গেয়ে যাচ্ছ। আর যে তরীকা ও আদর্শকে আল্লাহ্ তা'আলা তার প্রিয় হাবীব মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (স)-এর মাধ্যমে প্রেরণ করেছিলেন, তা পরিত্যাগ করে তোমরা প্রত্যেকেই এক একজন স্বতন্ত্র দিশারী হয়ে গিয়েছ এবং লোকজনকে সেদিকেই আহবান করছ। স্বস্থানে নিজেকে সত্যপন্থী ও পথপ্রদর্শক বানিয়ে নিয়েছ। অথচ মূলতঃ তা স্বয়ং ভ্রষ্টতার পথ এবং অন্যদেরকে বিভ্রান্তকারী। আমরা কখনও এ প্রকৃতির লোকদেরকে মোটেও পছন্দ করি না, যারা মানুষকে নিছক এ উদ্দেশ্যে মুরিদ করে, যাতে তাদের থেকে অর্থকড়ি হাতিয়ে নিতে পারে। তারা একটি মহান ইলম শিখে দুনিয়া সঞ্চয় করে। কারণ, যতক্ষণ পর্যন্ত আহলে দীন ধর্মভীরুদের রূপ, সাদৃশ্য ও ভাবধারা গ্রহণ না করবে, দুনিয়া উপার্জন হতে পারে না।

আর না আমরা সেসব লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট, যারা আল্লাহ্ ও রাসূল (স) কে বাদ দিয়ে স্বয়ং নিজের দিকে মানুষদেরকে ডাকে এবং লোকদেরকে তার মর্জির আনুগত্য করার হুকুম দেয়। এরা বাটপার ও লুটেরা। এদের স্থান প্রতারক, চরম মিথ্যাবাদী, দাঙ্গাবাজ এবং সেসব লোকদের সঙ্গে, যারা স্বয়ং বিপর্যয় ও পরীক্ষার শিকার।

সাবধান! সাবধান!! কখনও তার অনুসরণ করবে না, যে আল্লাহর কিতাব ও সুন্নাতে রাসূল (স)-এর প্রতি আহবান করে না। নিজের দিকে আহ্বান করে। হেঁয়ালী স্বভাবের সূফীদের ইশারা-ইংগিত সম্পর্কে খোলা মজলিসে আলোচনা করা অনুচিৎ। কারণ, উদ্দেশ্য তো (আধ্যাত্মিকতা দ্বারা) কেবল মানুষের অনুগ্রহ-কল্যাণের মাকাম লাভ করা। দেখ! তোমাদের জন্য কি আল্লাহ্ তা'আলার নিম্নোক্ত বাণীতে কোনও শিক্ষা নেই?

وان هذا صراطى مستقيما فاتبعوه، ولا بيبعوا السبيل فتفرق بكم من سبيله.

'এটি আমার সরল-সঠিক পথ, তোমরা তা অনুসরণ করো। আর বিভিন্ন পথের পিছনে পড়ো না। সেসব তোমাদেরকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। (সূরা আন'আম-১৫৩)

বিপথগামী উলামাদের প্রতি

এরপর তিনি এ যুগের ছাত্র-শিক্ষকের উদ্দেশ্যে বলেন,

'আরে নির্বোধের দল! যারা নিজেদের নাম 'আলেম-উলামা' রেখে নিয়েছ, তোমরা গ্রীক দর্শনে ডুবে আছ, মজে আছ নাহব-সরফ ও মা'আনী (বা অলংকার) শাস্ত্রে আর মনে করছ, এটাই ইলম-জ্ঞান। স্মরণ রেখো, ইলম হয়ত কুরআনের কোনও হুকুম সম্বলিত আয়াতের নাম কিংবা প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত সুন্নাত।

তোমাদের উচিৎ কুরআনে কারীম শিক্ষা করা। প্রথমে এর বিরল শব্দাবলি সমাধান (শাব্দিক তথ্যজ্ঞানার্জন) করবে। এরপর শানে নুযূল বা কুরআন অবতীর্ণের কারণ অনুসন্ধান কর এবং এর জটিল স্থানগুলোর মর্ম উদ্ধার করো। এভাবে যে হাদীস রাসূলে কারীম থেকে সঠিক বলে প্রমাণিত হয়ে গেছে, তা সংরক্ষণ কর। অর্থাৎ রাসূলে কারীম (স) নামায কিভাবে পড়তেন, নবীজীর অযু করার পদ্ধতি কী ছিল, নিজের জরুরত পূরণের জন্য কিভাবে যেতেন (কিভাবে প্রস্রাব-পায়খানা করতেন)? কিভাবে হজ্জ আদায় করতেন? তার জিহাদের নীতিমালা কী ছিল? বাচনভঙ্গি বা কথা বলার ধরন কিরূপ ছিল? নিজের যবানকে কিভাবে হেফাজত করতেন? রাসূলে কারীম (স)-এর পুরো জীবনাদর্শের আনুগত্য কর এবং সুন্নাতের উপর আমল কর। তবে এখানেও মনে রাখতে হবে, যেটি সুন্নাত, তাকে সুন্নাতই জ্ঞান করবে; তাকে ফরযের মর্যাদা দিবে না। অনুরূপভাবে তোমাদের উপর যেসব ফরয কর্তব্য রয়েছে, সেগুলো তোমাদের শিখা উচিৎ। যেমন, অযুর ফরযগুলো কী? নামাযের ফরযগুলো কী? যাকাতের নেসাব (ফরয হওয়ার পরিমাণ) কী? ওয়াজিব পরিমাণ কী? মাইয়েতের অংশগুলোর পরিমাণ কী? এরপর রাসূলে কারীম (স)-এর সাধারণ জীবন চরিত পাঠ করবে, যাতে পরকালের আগ্রহ-চিন্তা জন্মে। সাহাবায়ে কিরাম ও তাবেঈনের জীবনকর্ম পাঠ করবে। আর এসব বিষয় ফরযসমূহ থেকে বাড়তি ও অতিরিক্ত। কিন্তু আজ তোমরা যেসব বিষয়ে জড়িত রয়েছ, যাতে মাথা ঘামাচ্ছ, পরকালীন ইলম-জ্ঞানের সাথে এর কী সম্পর্ক; এসব জাগতিক জ্ঞান বিদ্যা।'

এরপর সেসব শিক্ষার্থীদের উদ্দেশ্যেই বলেন–

'যেসব বিদ্যার বৈশিষ্ট্য কেবল উপাদান-উপকরণের মত (যেমন, নাহব-ছরফ ইত্যাদি), সেগুলোকে সে অবস্থানেই থাকতে দাও। স্বয়ং সেগুলোকে স্বতন্ত্র শাস্ত্র বানিয়ে ফেল না। ইলম-জ্ঞান শিক্ষা করা ওয়াজিব তো এজন্য যে, তা শিখে মুসলমান এলাকাসমূহে ইসলামের শে'আর ও নিদর্শনসমূহ চালু

করবে। কিন্তু তোমরা ধর্মীয় নিদর্শন ও এর আহ্‌কাম তো প্রসার করনি। আবার মানুষদেরকে প্রয়োজনাতিরিক্ত বিষয়ের পরামর্শ দিচ্ছ।

তোমরা নিজেদের অবস্থাগুলোর দ্বারা সাধারণ মুসলমানদেরকে বিশ্বাস করিয়েছ যে, উলামাদের সংখ্যা অনেক হয়ে গেছে। অথচ এখনও কত বড় বড় এলাকা রয়েছে, যেখানে আলেম-উলামা নেই। আর যেখানে আলেম-উলামা পাওয়া যায়, সেখানেও ধর্মীয় নিদর্শনসমূহ প্রাধান্য লাভ করেনি।'

দীনের মধ্যে সংকীর্ণতা সৃষ্টিকারী নির্জনোপবেশনকারী সাধকদের প্রতি

এরপর তিনি সেসব লোককেও সম্বোধন করেছেন, যারা নিজেদের প্রবঞ্চনাগুলোর নাম রেখেছে দীন-ধার্মিকতা। আর যে তাদের প্রবঞ্চনামূলক মানদণ্ডে উত্তীর্ণ না হয়, সে যেন দীন থেকে খারেজ (বা ধর্মচ্যুত) হয়ে গেল। এ দলে বেশিরভাগ সন্ন্যাসী সাধক, আবেদ এবং ওয়ায়েজ বক্তাগণই সে যুগে আক্রান্ত ছিল। সেজন্য শিরোনামের সূচনা তাদের দ্বারাই করা হয়েছে। শাহ সাহেব বলেন–

'দীনের মধ্যে শীর্ণতা ও কঠোরতার পথ অবলম্বনকারীদের কাছে আমি জিজ্ঞাসা করি এবং উপদেশদাতা, আবেদ ও সেসব নির্জনাবাসকারীদের কাছে প্রশ্ন, যারা খানকাগুলোতে বসে আছে, বাধ্যতামূলক নিজের উপর দীনকে আরোপকারীরা! তোমাদের কী অবস্থা, যে কোনও ভাল-মন্দ বিষয়, প্রত্যেক শুষ্ক-তরলের উপর তোমাদের আস্থা-বিশ্বাস রয়েছে, মানুষকে তোমরা জাল ও কৃত্রিম হাদীসগুলোর উপদেশ শোনাও, আল্লাহর সৃষ্টিজীবের উপর তোমরা জীবন সংকীর্ণ করে ছেড়েছ। অথচ (হে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া) তোমরা তো এজন্য সৃষ্টি হয়েছিলে যে, তোমরা মানুষকে পরস্পরে সহজতা পৌঁছাবে। তাদেরকে কাঠিন্য-জটিলতায় লিপ্ত করবে না। তোমরা এমন লোকদের কথাগুলো প্রামাণ্য উদ্ধৃতিতে পেশ কর, যে অসহায় পর্যদুস্ত ছিল। আল্লাহর প্রেম-ভালবাসায় বিবেকবুদ্ধি হারিয়ে ফেলেছিল। অথচ প্রকৃত আশেক আল্লাহ ওয়ালাদের কথাগুলো যেনতেনভাবে ফেলে রাখা হয়, সেগুলোর চর্চা হয় না। তোমরা প্রবঞ্চনাকে নিজেদের জন্য পছন্দ করে নিয়েছ। আর এর নাম রেখেছ 'সতর্কতা'। অথচ তোমাদের কেবল উচিৎ ছিল, বিশ্বাস ও কার্যতঃভাবে ইহসান ও কল্যাণের মাকামের জন্য যেসব বিষয় জরুরী, নিছক সেগুলোই শিখে নিবে। কিন্তু যে অসহায় ব্যক্তি নিজ নিজ বিশেষ অবস্থায় পর্যুদস্ত-আত্মহারা ছিল। খামোখা তাদের কথাগুলোর উপকার সাধন, বিশেষ বিশেষ গোজামিল দেবার প্রয়োজন ছিল না। আর না তাতে কাশফের অধিকারী লোকবলের বিষয়গুলো সংমিশ্রিত করার প্রয়োজন ছিল! তোমাদের

উচিৎ মানুষকে মাকামে ইহসান ও কল্যাণের পথে আহবান করা। প্রথমে তা নিজে শিখে নিবে। এরপর অন্যদেরকে দাওয়াত দাও। তোমরা কি এতটুকুও বুঝ না যে, আল্লাহর সবচেয়ে বড় রহমত এবং সবচেয়ে বড় করুণা সেটিই, যা রাসূলে কারীম (স) পৌঁছিয়েছেন। কেবল তাঁর হেদায়াতই প্রকৃত হেদায়াত। এরপর তোমরা কি বলতে পার, তোমরা যেসব কাজ করছ, তা রাসূলে কারীম (স) এবং সাহাবায়ে কিরাম (রা) করতেন?'

সাধারণ মুসলিম উম্মাহর প্রতি সামগ্রিক সম্বোধন; বিভিন্ন রোগ নিরূপণ ও তার চিকিৎসা পত্র

অবশেষে একটি আম সম্বোধন করেছেন সাধারণ মুসলমানদের প্রতি, যেখানে বিশেষ কোন শ্রেণীর সুনির্দিষ্টতা নেই। শাহ সাহেব বলেন–

'আমি এবার সাধারণ মুসলমানদের উদ্দেশ্যে বলি, হে আদম সন্তানেরা! দেখ, তোমাদের চরিত্র নষ্ট হয়ে গেছে। তোমাদের উপর অন্যায়-লালসার ভূত সওয়ার হয়ে গেছে। তোমাদের উপর শয়তান নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করেছে। নারীরা পুরুষদের মাথায় উঠে গেছে। আর পুরুষ করছে নারীদের অধিকার হরণ। হারামকে তোমরা নিজেদের জন্য সুস্বাদু বানিয়ে নিয়েছ। আর হালাল হয়ে গেছে তোমাদের জন্য বিস্বাদ-তেতো। সুতরাং আল্লাহর শপথ! আল্লাহ তা'আলা আদৌ কাউকে তার সাধ্যাতীত কাজের আদেশ দেননি। তোমাদের উচিৎ নিজেদের যৌনচাহিদাগুলো বিবাহের পবিত্র পন্থায় পূরণ করা! চাই তাতে একাধিক বিবাহই করতে হোক না কেন। নিজের ব্যয় হ্রাস বৃদ্ধিতে তোমরা লৌকিকতা করো না। সে পরিমাণই খরচ কর, তোমাদের মধ্যে যার সামর্থ আছে।

স্মরণ রেখ, একজনের বোঝা অন্যজন বহন করে না। নিজের উপর খামোকা সংকীর্ণতা করো না। যদি তোমরা এমন কর, তাহলে তোমাদের তনু-মন অবশেষে পাপাচার পর্যন্ত পৌঁছে যাব। আল্লাহ তা'আলা চান তার বান্দা যেন তার সহজতাগুলো দ্বারা উপকৃত হয়; যেভাবে তিনি আরও পছন্দ করেন যে, কেউ ইচ্ছা করলে অতি উত্তমরূপে আহকামের আনুগত্যও করতে পারে। নিজের পেটের চাহিদাগুলো খাদ্যদ্রব্য দ্বারা পূর্ণ কর এবং এতটুকু উপার্জনের চেষ্টা কর, যার দ্বারা তোমাদের প্রয়োজনাদি পূরণ হয়। অন্যদের বোঝা হওয়ার ধান্ধা করো না যে, তার কাছ ভিক্ষা করে খাবে, তোমরা তাদের কাছে হাত পাতবে আর তারা দিবে। অনুরূপভাবে তোমরা বেচারা রাজা-বাদশা ও শাসকবর্গের উপরও বোঝা হয়ে দাঁড়িও না। তোমাদের জন্য নিজ হাতে উপার্জন করে খাওয়াই উত্তম। তোমরা যদি এরূপ করো, তাহলে

আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জীবিকারও সুব্যবস্থা করে দিবেন, যা হবে তোমাদের জন্য পর্যাপ্ত।

হে আদম সন্তান! আল্লাহ তা'আলা যাকে শান্তির নিবাস দিয়েছেন, যাতে সে আরাম পেতে পারে; এতটুকু পানি, যাতে সে পরিতৃপ্ত হতে পারে; এতটুকু খাবার, যাতে জীবন কেটে যায়; এতটুকু পোশাক, যার দ্বারা শরীর ঢেকে যায়; এমন স্ত্রী, যে তার লজ্জাস্থানের হেফাযত করতে পারে এবং জীবন সংগ্রামে সাহায্য করতে পারে। তাহলে স্মরণ রেখ, দুনিয়া তার পুরোপুরিভাবে হাসিল হয়ে গেছে। সে যেন আল্লাহর শোকর করে।

মোটকথা, মানুষকে আয়-রোজগারের যে কোন পথ অবলম্বন করতে হবে। সেই সাথে আত্মতুষ্টিকে নিজের জীবনের নিয়ামক বানাতে হবে। জীবন যাপনে মিতাচারের পথ গ্রহণ করতে হবে। আর আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করার যে সময়-সুযোগ পাওয়া যাবে, তাকে গণীমত মনে করতে হবে। অন্ত ত তিনবেলা সকাল-সন্ধ্যা ও শেষরাত্রের যিকিরের লক্ষ্য রাখতে হবে বিশেষভাবে। আল্লাহ তা'আলাকে স্মরণ করবে তার তাসবীহ্-তাহ্লীল ও কুরআন তিলাওয়াতের মাধ্যমে। রাসূলে কারীম (স)-এর হাদীস শুনবে এবং যিকিরের মজলিসে হাযির হবে।

হে আদম সন্তান! তোমরা এমন সব বিকৃত রীতিনীতি গ্রহণ করে নিয়েছ, যার ফলে দীনের আসল রূপরেখা বদলে গেছে। তোমরা আশুরার দিন মিথ্যে আচার-অনুষ্ঠানে একত্রিত হও। তদ্রুপ শবেবরাতে খেলাধুলায় লিপ্ত হও আর মৃত ব্যক্তিদের জন্য খাবার রান্না করে ভক্ষণ করাকে পুণ্য মনে কর। তোমরা সত্যবাদী হলে এর প্রমাণ পেশ কর।

এভাবে তোমাদের মধ্যে আরও খারাপ খারাপ প্রথা চালু আছে। যেগুলো তোমাদের জীবন সংকীর্ণ করে দিয়েছে। যেমন– উৎসব-অনুষ্ঠানগুলোতে তোমরা সীমাতিরিক্ত লৌকিকতা শুরু করে দিয়েছ। তদ্রুপ আরেকটি কুপ্রথা হল, যত কিছুই হয়ে যাক, তথাপি তালাককে যেন তোমরা নাজায়েয সাব্যস্ত করে নিয়েছ। এভাবে বিধবা বিয়ে থেকে তোমরা বিরত থাকছ। এসব পালনে তোমরা নিজেদের সম্পদ নষ্ট করছ। সময় নষ্ট করছ। আর যত ফলপ্রসূ রীতিনীতি ছিল, সেগুলো ছেড়ে দিয়েছ।

তোমরা তোমাদের নামাযকে বরবাদ করে দিয়েছ। তোমাদের কিছু লোক দুনিয়া উপার্জন ও নিজ ধান্ধায় এতটা ফেঁসে গেছে যে, তাদের নামাযের সময়ই মিলে না। কেউ কেউ কিসসা-কাহিনী শুনে সময় নষ্ট করে। যাহোক, এরপরও যদি মানুষ এমন মাহফিল মসজিদের সন্নিকটে কোনও স্থানে আয়োজন করত, তাহলে হয়ত তাদের নামায নষ্ট হত না। তোমরা

যাকাত দেওয়াও পরিত্যাগ করেছ। অথচ এমন কোন ধনাঢ্য ব্যক্তি নেই, যার নিকটাত্মীয় ও আপনজনদের মাঝে অভাবী-দরিদ্রলোক নেই। ধনাঢ্যরা যদি সেসব লোককে সাহায্য করে এবং তাদেরকে পানাহার করায় আর যাকাত প্রদানের নিয়ত করে, তবে এটাও তাদের জন্য যথেষ্ট হতে পারে।

তোমরা অনেকেই রোযা ছেড়ে দিয়েছ। বিশেষতঃ সামরিক কর্মকর্তারা বলে, তারা রোযা রাখতে সক্ষম নয়। অর্থাৎ তাদের যে পরিশ্রম করতে হয়, যে কষ্ট সহ্য করতে হয়, তার সাথে রোযা রাখা যায় না। তোমাদের জানা উচিৎ, তোমরা পথ ভুল করে ফেলেছ। তোমরা সরকারের মাথায় বোঝা হয়ে গেছ। সম্রাট (শাসক) যখন তার কোষাগারে (ত্রাণ তহবিলে) এতটুকু সুযোগ না পান, যার দ্বারা তোমাদের ভাতা দিবেন, তখন তোমরা জনসাধারণের জীবন দূর্বিষহ করে তোল। সৈনিকগণ! এটা তোমাদের কেমন বদঅভ্যাস! কিছু লোক এমনও আছে, যারা রোযা রাখে বটে। কিন্তু সাহরী খায় না। রমাযান সেসব কঠিন কাজকর্ম পরিহার করে না, যার কারণে রোযা তাদের উপর ভারী হয়ে যায়।'

অবশেষে শাহ সাহেব বলেন, 'মহান রাজাধিরাজ আল্লাহর পক্ষ থেকে সংস্কারমূলক উদ্দেশ্যসমূহের এ যুগে যেসব বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট চাহিদা হচ্ছে, তা একটি দীর্ঘ অধ্যায়। কিন্তু পিছনের দরজা দিয়ে মানুষ চুপিসারে বিরাট কল্যাণ দেখতে পাবে। আর বোকাদের জন্য তার নমুনা যথেষ্ট।'

রীতিনীতির সুস্থতা ও সমাজশুদ্ধি

শাহ সাহেব উক্ত বিশেষ শ্রেণীগুলোর প্রতি একান্ত সম্বোধনের উপরই ক্ষান্ত হননি বরং তৎকালীন মুসলিম সমাজে শত শত বছর ধরে হিন্দুদের মাঝে বসবাস, হাদীস ও সুন্নাতের প্রচার-প্রসার না হওয়া, ধর্মীয় উলামায়ে কিরামের উদাসীনতা ও ক্রটি-বিচ্যুতি ইসলামী সাম্রাজ্যের দায়িত্ব-অজ্ঞতা এবং ধর্মীয় হিসাব প্রস্তুতি না থাকার কারণে হিন্দু ধর্মীয় যেসব রীতিনীতি, বিদ'আত, কুসংস্কার ও অনৈসলামিক নিদর্শনাবলি প্রচলিত হয়ে গিয়েছিল আর মুসলমানরা সেগুলো মেনে চলত, সে সম্পর্কে শাহ সাহেব কঠোরভাবে সমালোচনা করেছেন। সেসব ভ্রান্ত আকীদা-বিশ্বাস, সংশয়-সন্দেহ এবং অমুসলিমদের অনুকরণের নিন্দা করেছেন। সাধারণতঃ যুক্তিবিদ্যা ও দর্শন শাস্ত্রের সম্পৃক্ত যেসব আলেম-উলামা ছিলেন, তারা উক্ত অভ্যাস ও রীতিনীতিগুলোকে তুচ্ছ জ্ঞান করে কিংবা এই বিক্ষিপ্ততা ও গণবিরোধিতার কবল থেকে আত্মরক্ষার জন্য এগুলো উপেক্ষা করত।

হযরত মুজাদ্দিদে আলফেসানী (র), যিনি স্বরচিত একাধিক বই-পুস্তকে সেসব শিরকী আকীদা-বিশ্বাস, জাহেলিয়াতের নিদর্শন ও ভ্রান্ত রীতিনীতির

নিন্দাবাদ ও প্রত্যাখ্যান করেছেন, তাঁর পরে ইসলাহে রুসুম বা রীতিনীতির সংশোধন ও সমাজশুদ্ধির কাজ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ (র)-এর মাধ্যমে শুরু হয়েছে। যার পূর্ণতা দান করেছেন তার সম্মানিত পুত্রগণ এবং তারই বংশের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত মুছলিহীনে উম্মত (বা জাতির সংশোধনকারী) হযরত সাইয়্যিদ আহমদ শহীদ (র), শাহ্ আবদুল আযীয (র), হযরত শাহ্ ইসমাঈল শহীদ (র) (যিনি শাহ্ সাহেবের নাতি)। নিম্নে 'তাফহীমাত' ও 'অসীয়তনামা' (ফার্সী)-এর একটি উদ্ধৃতি পেশ করা হচ্ছে।

'হিন্দুদের নিকৃষ্ট স্বভাবগুলোর মধ্যে একটি হল, যখন কোনও স্ত্রীর স্বামী মারা যায়, তাকে তখন দ্বিতীয় বিয়ে করতে দেয় না। এ স্বভাবরীতি মোটেও ছিল না আরবদের মধ্যে। না রাসূলে কারীম (স) পূর্বে, না তার যুগে, আর না তার পরে। আল্লাহ্‌র তা'আলা তার উপর রহমত করুন, যে এই কুপ্রথাকে বিলীন করবে। যদি জনসাধারণের দ্বারা এই কুপ্রথার বিলুপ্তি সম্ভব না হয়, তাহলে স্বগোত্রেই আরবদের রীতিকে চালু করা উচিৎ। আর যদি তা-ও সম্ভব না হয়, তাহলে ঐ রীতিকে নিকৃষ্ট জ্ঞান করবে এবং মন থেকে এর বিদ্বেষ রাখবে। কেননা এটাই ঘৃণার সর্বনিম্ন পর্যায়।

আমাদের দ্বিতীয় বদঅভ্যাস হল, আমরা অনেক বড় অংকের মোহর ধার্য করি। রাসূল কারীম (স) (যিনি ছিলেন শ্রেষ্ঠ মানব, যার সঙ্গে আমাদের ইজ্জত-সম্মান জড়িত) তাঁর সহধর্মীনীদের মোহর সাড়ে বার উকিয়া নির্ধারণ করে ছিলেন, যার পরিমাণ দাঁড়ায় পাঁচশ দিরহাম।

আমাদের আরেকটি বদঅভ্যাস অপব্যয়ের। কাজেই বিভিন্ন আনন্দ-উৎসব ও রুসম-রেওয়াজে আমরা প্রচুর খরচ করি। রাসূলে কারীম (স) থেকে বিয়ে-শাদীতে কেবল অলীমা ও আকীকার বিষয়টি প্রমাণিত আছে। সুতরাং এতদুভয় বিষয়ের আনুগত্য করা উচিৎ। আর এর অন্যথা থেকে বেঁচে থাকা উচিৎ কিংবা সেসবের তেমন গুরুত্ব না দেওয়া উচিৎ।

আমাদের বদঅভ্যাসগুলোর মধ্যে দুঃখ-শোকের মুহূর্তগুলো রজত (তিযা, চতুর্থিয়া), চল্লিশা, ষান্মাসিক, ফাতিহা ও বার্ষিকী নামেও অপব্যয় রয়েছে। অথচ এসবের কোনটিরই প্রাচীন আরবে প্রচলন ছিল না। উত্তম হল, মৃত ব্যক্তির উত্তরাধিকারীগণের প্রতি তিনদিন সমবেদনা প্রকাশ এবং একদিন এক রাত খাবারের ব্যবস্থা ছাড়া আর কোন রেওয়াজ পালন করবে না। তিনদিন পর বংশের নারীগণ সমবেত হয়ে মৃত ব্যক্তির মহিলাদের কাপড়ে সুগন্ধি মাখাবে। আর যদি মৃতব্যক্তির স্ত্রী জীবিত থাকে, তবে ইদ্দতকাল অতিবাহিত হয়ে শোক পালনের ক্রমধারা সমাপ্ত করে দিবে।'

মাওলানা সাইয়িদ আবুল আ'লা মওদূদী তার রচনা 'মানসাবে তাজদীদ কী হাকীকত' এবং 'তারীখে তাজদীদ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ মাকাল' (আল ফুরকান-ওয়ালীউল্লাহ সংখ্যা) এর মধ্যে 'ইযালাতুল খফা' ও 'তাফহীমাত' এর বিভিন্ন উদ্ধৃতি সন্নিবেশিত করার পর যথার্থই লিখেছেন, 'এসব উদ্ধৃতি থেকে যথেষ্ট অনুমিত হয় যে, শাহ সাহেব মুসলমানদের অতীত-বর্তমানের কী পরিমাণ বিস্তারিত তদন্ত করেছেন এবং কী পরিমাণ সামগ্রিকতার সাথে সেসবের সমালোচনা করেছেন? এ ধরনের সমালোচনার আবশ্যকীয় ফলাফল দাঁড়ায়– সমাজে যতগুলো সৎ উপাদান বিদ্যমান থাকে, যাদের অন্তর ও বিশ্বাসে সতেজতা, যাদের হৃদয়ে ভালমন্দের পার্থক্য থাকে, তাদেরকে শোচনীয় অবস্থা-পরিস্থিতির অনুভূতি চরমভাবে ব্যথিত করে। তাদের ইসলামী মূল্যবোধ বিরাট তীক্ষ্ম হয়ে যায়। এমনকি তাদের আশপাশের জীবনযাত্রায় প্রচলিত জাহেলিয়াতের (অন্ধকার যুগের) প্রত্যেক প্রভাব তাদেরকে পীড়িত-ক্ষতবিক্ষত করতে থাকে। তাদের পার্থক্যশক্তি এত বেড়ে যায় যে, তারা জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে ইসলাম ও জাহেলিয়াতের সংমিশ্রণকে উপলব্ধি করতে থাকেন। তাদের ঈমানী শক্তি এত বেশি সজাগ-সচেতন হয়ে যায়, যার ফলে মর্মন্তুদ জাহেলিয়াতের প্রতিটি অশনি সংকেত তাদেরকে সংশোধনের জন্য ব্যাকুল করে দেয়। এরপর একজন মুজাদ্দিদ (সংস্কারক)-এর জন্য তাদের সম্মুখে নতুন সংস্কারের একটি নকশা সুস্পষ্টরূপে উপস্থাপন করা জরুরী হয়ে পড়ে। যেন বিদ্যমান অবস্থাকে যে রূপরেখায় পরিবর্তন করা উদ্দেশ্য, তার উপর লোকজন আপন দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারে। সে দিকেই নিয়োজিত করে দেয় নিজেদের সকল প্রচেষ্টা ও কার্যক্রমকে । এই সংস্কার ও গঠনমূলক কাজও শাহ সাহেব সেই মাধুর্য ও পূর্ণাঙ্গতার সাথে আঞ্জাম দিয়েছেন, যা তার সমালোচনামূলক কর্মে আপনারা ইতোপূর্বে লক্ষ্য করেছেন।'

একাদশ অধ্যায়

শ্রদ্ধাভাজন পুত্র, উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন খলীফা প্রসিদ্ধ সমসাময়িক ব্যক্তিত্ব

সুযোগ্য পুত্র ও উত্তরসূরীগণ

উম্মতের সংশোধনকারী ও ইসলামের সংস্কারকগণের মধ্যে হাকীমুল উম্মত হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র)-এর উপর আল্লাহ্ তা'আলার যে বিশেষ নেয়ামতরাজি আর আহ্লে দাওয়াত ও আযীমতের মধ্যে তার যত স্বকীয়তা রয়েছে, তন্মধ্যে একটি ঐতিহাসিক স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং তাঁর সাথে আল্লাহ পাকের বিশেষ একটি ব্যাপার ছিল, আল্লাহ্ তা'আলা তাকে এমন পুত্র ও উত্তরসূরী দান করেছেন, যার ফলে অকুণ্ঠচিত্তে বলতে হয় نعم الخلق لنعم السلف তথা সুযোগ্য পূর্বসূরীর যোগ্য উত্তরসূরী। যারা শাহ সাহেবের জ্বেলে যাওয়া প্রদীপ নিছক প্রজ্জ্বলিত ও দীপ্তিমানই রাখেননি বরং এর দ্বারা শত-সহস্র প্রদীপ জ্বালিয়েছেন। তারপর ঐ প্রদীপগুলোর মধ্যে সে প্রদীপ জ্বলতে থাকে, যার দ্বারা গোটা ভারত উপমহাদেশ এবং এর বাইরেও কুরআন-হাদীস, বিশুদ্ধ আকীদা-বিশ্বাস, নিখুঁত একত্ববাদের প্রসার, শিরক-বিদ'আতের খণ্ডন, রীতিনীতির সংশোধন, আত্মশুদ্ধি, ইহসান ও কল্যাণের মর্যাদা লাভ, এলায়ে কালিমাতিল্লাহ, আল্লাহর আইন সমুন্নত করা, আল্লাহর রাহে জিহাদ, ধর্মীয় মূল্যবোধ, ধর্মীয় বিদ্যাপীঠ ও শিক্ষাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা, সঠিক ধর্মীয় শিক্ষার ব্যাখ্যা ও তাবলীগের (প্রচারের) জন্য সংকলন ও গ্রন্থ রচনা, কুরআন-হাদীস, ফিকহের কিতাবাদির অনুবাদ, তাফসীরুল কুরআনের বরকতময় ধারাবাহিকতা সেকাল থেকে আজ পর্যন্ত চালু রয়েছে। যদি সেই পুণ্যময় পদক্ষেপ ও প্রচেষ্টাগুলোর ইতিহাস লক্ষ্য করা হয় আর কল্যাণ ও বরকতের সেসব কেন্দ্র ও সিলসিলাগুলোর 'শাজারায়ে নসব' (বংশ তালিকা)-এর পর্যালোচনা করা হয়, তাহলে অনুভূত হবে যে, এক চেরাগ থেকে আরেকটি চেরাগ জ্বলছিল যথারীতি। আর এসব চেরাগ দীপ্তিমান হয়েছে সেই চেরাগ দ্বারা, যা হিজরী বার শতকের মাঝামাঝি হাকীমুল ইসলাম হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ্ দেহলভী (র) নানা অন্ধকারের ঝড়ের মধ্যে জ্বালিয়েছিলেন। এ পর্যায়ে অনিচ্ছাতেই নিম্নোক্ত ফার্সী কবিতা মুখে চলে আসে-

ایک چراغیست دراین خانہ کہ از پرتو آں-
ہر کجامی نگرم انجمنے ساختہ اندر

বিস্ময়কর সাদৃশ্য

সুযোগ্য পুত্রগণ এবং তাদের দ্বারা শাহ সাহেবের বিশেষ দাওয়াত ও এই সিলসিলার প্রচার-প্রসারে (যা অন্যান্য সহস্র গুণাবলি সত্ত্বেও জীবন চরিত ও স্মারক গ্রন্থাবলিতে উল্লেখিত একটি বিরল ও দুর্লভ বৈশিষ্ট্য) তার (শাহ সাহেবের) স্বয়ং আপন সিলসিলায়ে নকশেবন্দিয়া মুজাদ্দেদিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও শায়খুল মাশায়িখ হযরত মুজাদ্দিদে আলফে সানী (র)-এর সঙ্গে বিস্ময়কর সাদৃশ্য রয়েছে। হযরত মুজাদ্দিস (র) এর সুযোগ্য চারপুত্র কামালাতের স্তরে পৌঁছে। খাজা মুহাম্মদ সাদিক, খাজা মুহাম্মদ সাঈদ, খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম ও খাজা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া (র)। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত বুযুর্গ খাজা মুহাম্মদ সাদিকের ২৫ বছর বয়সে ১০২৫ হিজরীতে ইন্তিকাল হয়ে যায়। হযরত মুজাদ্দিদ (র) থেকে তার ব্যাপারে উচ্চাঙ্গের বাক্য বর্ণিত আছে। এই সিলসিলায়ে মুজাদ্দেদিয়ার প্রসার ঘটে শেষোক্ত সম্মানিত তিন পুত্রের মাধ্যমে। আর হযরত সাইয়িদ আদম বিন্নুরী (র) কে বাদ দিয়ে (যার সম্পর্ক হযরতের সঙ্গে বংশের পরিবর্তে আত্মীয়তার ছিল। আর এই আত্মীয়তার সম্পর্ক এত শক্তিশালী ও মাকবূল ছিল যে, তারই বংশ পরম্পরায় জন্ম নিয়েছেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র), হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র), হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ মুহাজিরে মক্কী (র) এবং তার প্রসিদ্ধ খলীফাগণ ও বড় বড় উলামায়ে কিরাম।) এই উঁচু সিলসিলার প্রচার-প্রসার এবং হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর শুরু করা সংস্কার কর্ম ও বিপ্লবের পূর্ণতা লাভ করেছে উক্ত মহান তিন পুত্রের মাধ্যমে। এরপর উক্ত তিন বুযুর্গের মধ্যে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম (র) ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। তার মাধ্যমে এই সিলসিলা তুর্কিস্তান, আরব এবং তুরস্কবাসী পর্যন্ত পৌঁছেছে। জনৈক কবি যথার্থই বলেছেন–

چراغ ہفت کشور خواجہ معصوم-
منور از فروغش ہند تا روم-

'খাজা সপ্ত বিশ্বের প্রদীপ। ভারত থেকে রোম পর্যন্ত তার আলো আভায় উজ্জ্বল দীপ্তিমান।'

অনন্তর তারই (মুজাদ্দিদ র. -এর) অদৃশ্য হাত এবং বাতেনী তাওয়াজ্জুহ -এর বরকতে আকাবিরের সিংহাসনে দুই পুরুষ পরই সেই

আত্মমর্যাদাবোধসম্পন্ন, মুজাহিদ ও গাজী, শরীয়তের অনুবর্তী, ধর্মভীরু ফকীহ শাসক অধিষ্ঠিত হন, যিনি দীন বিলুপ্তকারী হওয়ার পরিবর্তে দীনের সাহায্যকারী এবং জাতির ধ্বংসকারী হওয়ার পরিবর্তে জাতির সেবক স্বীকৃতি পান। যাকে হযরত খাজা প্রথম থেকেই তাঁর চিঠিপত্রে 'দীনের আশ্রয় বাদশা মহোদয়!' লিখে এই মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করছিলেন।

ঠিক তদ্রুপভাবে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) রেখে যান চারজন সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র। হযরত শাহ সাহেবের সম্মানিত পুত্রদেরও একই অবস্থা ছিল। তার চার পুত্রের মধ্যে শাহ আবদুল গণী (র) (যিনি তার ভাইদের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন) এর আপন ভাইদের সবার আগে (১২২৭ হি.) ইন্তিকাল হয়ে গেল। শাহ সাহেবের শিক্ষাদীক্ষা তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার প্রচার-প্রসার, মহাপুরুষদের তরবিয়ত ও পূর্ণতা দান এবং সংকলন ও রচনার সেই বিশেষ ভাবধারা, যাতে শাহ সাহেবের আগ্রহ-চেতনা এবং ইজতিহাদ ও সংস্কারের রঙ চমকাত, উক্ত তিন পুত্রের মাধ্যমে চালু থাকে। এরপর এই তিন বুযুর্গের মাঝে 'সিরাজুল হিন্দ' (ভারতের সূর্য) হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর আপন ভাইদের মধ্যে সেই মর্যাদা হাসিল হয়, যা হাসিল হয়েছিল হযরত মুজাদ্দিদ (র)-এর পুত্রদের মধ্যে হযরত খাজা মুহাম্মদ মা'ছূম (র)-এর। আর তার (শাহ আবদুল আযীয র.-এর) মাধ্যমে শাহ সাহেব (র)-এর সিলসিলা এবং তার জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও শিক্ষাদীক্ষার বিশ্বব্যাপী প্রসার হয়। কোনও কোনও শাখার তো এমনভাবে সম্প্রসারণ ও পূর্ণতা দেওয়া হয় যে, বিনয়ের সাথে বলতে হয়, 'পিতা যদিও (সম্পন্ন করতে) পারেনি; পুত্র পূর্ণতা দান করেছেন।'

আমরা শাহ সাহেবের শুরু করা (হাতে নেওয়া) কাজকর্মগুলোর এই পূর্ণতা দান, সম্প্রসারণ ও উন্নতি দান, যা শাহ আবদুল আযীয (র) এর হাতে বাস্তবায়িত হয়েছে- এর আলোচনার পূর্বে তার (শাহ আবদুল আযীয র.-এর) সংক্ষিপ্ত জীবনকর্ম, জীবনচরিত ও পরিচিতি পেশ করছি। এ প্রসঙ্গে আমরা মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই হাসানী (র) রচিত 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থের সপ্তম খণ্ড থেকে সংগৃহিত তার আলোচনা উদ্ধৃত করার উপরই যথেষ্ট করব, যা বস্তুনিষ্ঠ প্রামাণ্য হতে পারে।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) দেহলভী

আলেমদের নেতা, বিজ্ঞজনদের মাথা মুহাদ্দিসুল আল্লাম শাহ আবদুল আযীয ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইবনে শাহ আবদুর রহীম উমারী দেহলভী (র) খোদ সমকালের আলেমগণের সর্দার এবং আলেমদের শিরোমণি, সকলের নয়ন ও প্রদীপ, কেউ কেউ তাকে 'সিরাজুল হিন্দ' আর কেউ

'হুজ্জাতুল্লাহ' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তিনি বৃহস্পতিবার রাত ২৫ রমযান ১০৫৯ হিজরীতে জন্মগ্রহণ করেন। যেমনটি তার ঐতিহাসিক নাম 'গোলাম হালীম' থেকে জানা যায়। তিনি কুরআনে কারীম হিফয করা থেকে অবসর হয়ে স্বীয় পিতার কাছে শিক্ষা গ্রহণ শুরু করেন। তিনি তার কাছে পাঠ-শ্রবণ উভয়ভাবে পূর্ণ তত্ত্বানুসন্ধান, প্রামাণ্যভাবে ও মনোযোগিতার সাথে ইলম হাসিল করেন। যার ফলে তার বিভিন্ন শাস্ত্র ও বিদ্যায় প্রদীপ্ত জ্ঞান অর্জিত হয়ে যায়। যখন তার বয়স ষোল বছর, তখন তার সম্মানিত পিতা ইন্তিকাল করেন। এরপর তিনি শায়খ নূরুল্লাহ বড়হানবী, শায়খ মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী থেকে উপকৃত হন। তিনি শিক্ষাগত ইযাযত লাভ করেন শাহ মুহাম্মদ আশেক ইবনে উবাইদুল্লাহ ফুলতী থেকে। যিনি তার সম্মানিত পিতার সংশ্রবপ্রাপ্ত ও ঘনিষ্ট ব্যক্তি ছিলেন। তিনি সেসব বুযুর্গ ব্যক্তিবর্গ থেকে এমন সব শাস্ত্র জ্ঞানে উপকার ও পূর্ণতা লাভ করেন, যা পিতার ইন্তিকালে পূর্ণতার জন্য তৃষ্ণার্ত ছিল। স্বয়ং তিনি স্বরচিত একটি গ্রন্থে স্বীয় পিতা এবং অন্যান্য উলামায়ে কিরাম থেকে উপকৃত হওয়ার বিশদ বিবরণ পেশ করেছেন। যার দ্বারা বুঝা যায়, তিনি হাদীস গ্রন্থাবলির মধ্যে পূর্ণ মুয়াত্তা মুসাওয়াসহ এবং মিশকাতুল মাসাবীহ স্বীয় পিতার কাছে পড়েছেন। হিসনে হাসীন ও শামায়েলে তিরমিযীর সবক পিতার সামনে তিনি শ্রবণ করেছেন আর পাঠ করেছেন তারই আপনভাই শায়খ মুহাম্মদ (র)। সহীহ বুখারী হজ্জ পূর্ব পর্যন্ত শ্রবণ করেছেন সাইয়িদ গোলাম হুসাইন মক্কীর পাঠ। জামে তিরমিযী, সুনানে আবী দাউদ শ্রবণ করেন মাওলানা যহূরুল্লাহ মুরাদাবাদীর পাঠ আর মুকাদ্দামায়ে সহীহ মুসলিম ও এর কতিপয় হাদীস এবং সুনানে ইবনে মাজাহ -এর কিয়দাংশ শ্রবণ করেন মুহাম্মদ জাওয়াদ ফুলতীর কিরাত (পঠন)। মুসালসালাত ও মাকছিদে জামেউল উসূলের কিয়দাংশ শ্রবণ করেন মাওলানা জারুল্লাহ নুযাইলে মক্কা (মক্কার অতিথি) থেকে। সুনানে নাসায়ীর কিছু অংশ শ্রবণ করেন আপন পিতার সবকের মজলিস থেকে। সিহাহ সিত্তাহর অবশিষ্ট অন্যান্য অধ্যায়গুলো শ্রবণ করেন আপন পিতার খলীফাগণ থেকে। যেমন– শায়খ নূরুল্লাহ ও খাজা মুহাম্মদ আমীন থেকে শ্রবণ করেছেন। এছাড়া অন্যান্য কিতাবাদির আম ইযাযত লাভ করেন আপন পিতার একান্ত খলীফা ও মামাতো ভাই শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী এবং খাজা মুহাম্মদ আমীন থেকে। আর এই দুই বুযুর্গের জন্য তার আব্বাজানের ইযাযতনামা 'তাফহীমাত' ও 'শিফাউল আলীল'-এর মধ্যে বিদ্যমান আছে। সেসব বুযুর্গ তার পিতার কাছে পড়েছেন। আর শাহ মুহাম্মদ আশেক তার

পিতা শায়খ আবু তাহের মাদানীর খিদমতে পঠন-শ্রবণ এবং তার থেকে ইযাযতেও শরীক ছিলেন। তার সনদগুলো তারই রচিত, 'আল-ইরশাদ ফী মুহিম্মাতিল ইসনাদ' ইত্যাদি পুস্তকসমূহে উল্লেখ আছে।

তিনি দীর্ঘদেহী, ক্ষীণকায়, বাদামী বর্ণের, প্রশস্ত চোখের অধিকারী ছিলেন। দাঁড়ি ছিল ঘন। খত্তে নসখ ও রুকআ খুবই চমৎকারভাবে লিখতেন। তীর নিক্ষেপণ, অশ্বারোহণ ও সংগীতেও দক্ষতা রাখতেন। তার থেকে সবক নেন তার ভ্রাতাগণ- শাহ আবদুল কাদের, শাহ রফীউদ্দীন, শাহ আবদুল গণী এবং তার জামাতা মাওলানা আবদুল হাই ইবনে হেবাতুল্লাহ বড়হানবী। মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলবী ও সাইয়িদ কামরুদ্দীন সোনাপতি তার কাছে পঠন ও শ্রবণে তার ভাইদের সঙ্গে ছিলেন। হযরত শাহ গোলাম আলী মুজাদ্দেদী (র) (খলীফা– হযরত মিযা মাযহার জানে জানা র.) তার কাছে সহীহ বুখারী পড়েন। মাওলানা সাইয়িদ কুতুবুল হুদা ইবনে মাওলানা মুহাম্মদ ওয়াযেহ (র) রায়বেরেলী তার কাছে সিহাহ সিত্তাহর সবক নেন।

তার অন্যান্য সঙ্গীসাথী তার ভাইদের কাছে পড়েছেন আর সনদ নিয়েছেন তার কাছ থেকে। তার সবকে হাযির থাকেন। তার দরসে কুরআন শ্রবণ করেন। তার থেকে যথাসাধ্য উপকার লাভ করেন। তার এখানে কারী ছিলেন তারই দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক ইবনে আকল উমারী, যিনি প্রতিদিন কুরআনে কারীমের এক রুকু তিলাওয়াত করতেন। শাহ সাহেব তার তাফসীর করতেন। এটাই ছিল তার মহান পিতা শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর নীতি। শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর শেষ দরসে কুরআন 'اعدلوا هو اقرب للتقوى' আয়াতখানা পর্যন্ত তাফসীর হয়েছিল। সেখান থেকে শাহ আবদুল আযীয (র) তার সবক (পাঠদান) শুরু করেন। তার শেষ সবক 'ان اكرمكم عند الله اتقاكم' আয়াত পর্যন্ত হয়েছিল। সেখান থেকে তার দৌহিত্র শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) তার সবক শুরু করেন। যেমনটি 'মাকালাতে তরীকত' -এ রয়েছে। তিনি নিজের জ্ঞান-প্রজ্ঞা, বুদ্ধি-মেধা ও তীক্ষ্ম মুখস্থ শক্তিতে যুগশ্রেষ্ঠ ছিলেন। পনের বছর বয়সেই তিনি পাঠদান ও ইফাদাহ (উপকার করা) -এর ধারাবাহিকতা শুরু করেন। আর তার থেকে অনেক বড় বড় জ্ঞানীজনেরা উপকার লাভ করেন। প্রায়ই দিক-দিগন্তের শিক্ষার্থীরা তার খেদমতে এমন আবেগ-উচ্ছ্বাস নিয়ে হাযির হয়, যেমন পিপাসার্ত ব্যক্তি পানির উপর ঝাপিয়ে পড়ে।

পঞ্চান্ন বছর বয়স থেকে নানা যন্ত্রণাদায়ক রোগ-ব্যাধি ঘিরে ধরে। ফলে তিনি মস্তিষ্ক বিকৃতি, ধবল ও কুষ্ঠরোগে আক্রান্ত হন। দৃষ্টিশক্তিও হ্রাস পায়।

কোনও কোনও জীবনী লেখক তার চৌদ্দটি যন্ত্রণাদায়ক রোগের কথা উল্লেখ করেছেন। এ কারণে তিনি তার লেখালেখির দায়িত্বভার অর্পণ করেন আপন দুই ভাই শাহ রফীউদ্দীন ও শাহ আবদুল কাদির (র)-এর ওপর। তবে তিনি নিজে দরস দিতেন। লেখালেখি, ফাতওয়া প্রদান এবং ওয়াজ-নসীহতের ধারাবাহিকতাও চালু রেখেছিলেন। প্রত্যেক মঙ্গলবার তার সাপ্তাহিক বয়ান ও কুরআনে কারীমের তাফসীরের জন্য ধার্য ছিল। শেষ জীবনে তিনি মজলিসে সামান্য সময়ও বসতে পারতেন না। এজন্য তিনি নতুন-পুরাতন মাদরাসাগুলো পরিদর্শন করে বেড়াতেন আর অসংখ্য মানুষ এ অবস্থায়ও তার থেকে উপকৃত হত। তার পাঠদান, ফাতওয়া ও বয়ান চলত। এভাবে আসর ও মাগরিবের মাঝামাঝি সময় দু'জন লোকের সাহায্যে মাদরাসা ও জামে মসজিদের মাঝের সড়কে বের হতেন। মানুষ পথিমধ্যে তার অপেক্ষায় থাকত এবং নিজ নিজ সমস্যাগুলো সমাধান করে নিত।

সেসব রোগ-ব্যাধির মধ্যে খাবারে অরুচি এত বেড়ে গিয়েছিল যে, কয়েকদিন পর্যন্ত খাবার মুখে দেওয়ার আগ্রহ হত না। মাঝে মধ্যে জ্বরও আসত। তিনি 'মানাকেবে হায়দারিয়া' এর অভিমতে লিখেন,

'এই অভিমতের অপূর্ণাঙ্গতার জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করছি। তা হয়েছে অপারগতা ও রোগ-ব্যাধির কারণে। যদ্দরুন ক্ষুধা একেবারেই নিঃশেষ হয়ে গেছে। জ্বরের মতই খাবারের পালা আসে। সম্ভবতঃ এটা পিত্তের আধিক্যের কারণে। শক্তি অন্তর্হিত হয়ে গেছে। ইন্দ্রিয় জ্ঞান লোপ পেয়েছে। অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ দুর্বল হয়ে গেছে। দুর্বল হয়ে গেছে অস্থি-মজ্জাও।'

আমীর হায়দার ইবনে নূরুল হুসাইন বলঘারামীকে পত্রে লিখেন, 'আপনি যদি আপনার প্রিয়জনের অবস্থা জানতে চান, তবে সে খুবই খারাপ আছে। সকাল-সন্ধ্যা তা বৃদ্ধি পায়। তাকে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য নানা রোগ-ব্যাধি ঘিরে ধরেছে। হারিয়ে গেছে স্বস্থি ও শান্তি। বেড়ে গেছে কষ্ট-যাতনা। আর এসব এমন রোগ-ব্যাধির কারণে, যার একটিই মানুষকে অস্থির-চিন্তিত করার জন্য যথেষ্ট। যেমন, অর্শ্বরোগ, পাকস্থলী ও নাড়িতে গ্যাস সমস্যা। এত বেশি অরুচি, যদ্দরুণ কয়েক দিনরাত পর্যন্ত খাবারের সুযোগ হয় না, ক্ষুধামন্দা। জ্বরতাপ যখন বুকের দিকে উঠে, তখন নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। যখন মস্তিষ্কের দিকে উঠে, তখন যন্ত্রণাদায়ক মাথাব্যথা শুরু হয়ে যায়। মনে হয় যেন হামানদিস্তার পিটুনী। 'والى الله المشتكى وهو المستعان' এই অবস্থা একটি শব্দও ব্যক্ত করার অনুমতি দেয় না, কোনও গ্রন্থ রচনা কিংবা বার্তা লিখা তো দূরের কথা।'

আপনারা শুনে বিস্মিত হবেন যে, তিনি এতসব যন্ত্রণাদায়ক রোগ-ব্যাধি থাকা সত্ত্বেও সচেতন, প্রত্যুৎপন্নমতি ও মিষ্টভাষী ছিলেন। বিনয়-নম্রতা, ভদ্রতা-প্রফুল্লতা, স্নেহ-ভালবাসা তেমনই ছিল, যেমন ছিল শুরু থেকে। তার সংশ্রব মেধা-চিন্তাকে শানিত করত। সেসব সংশ্রব-সান্নিধ্য বিস্ময়কর খবরাদি, নির্বাচিত শের-আশ'আর (কবিতা), দূর-দূরান্তের দেশসমূহ এবং সেখানকার অধিবাসী ও সেখানকার আশ্চর্যগুলোর বয়ান এমনভাবে হত, শ্রোতাদের মনে হত যেন তিনি নিজের প্রত্যক্ষ দেখা বিষয়গুলো বর্ণনা করছেন। অথচ তিনি কলকাতা ছাড়া আর কোনও শহর দেখেননি। তবে তিনি ছিলেন অসাধারণ ধীমান ও অনুসন্ধিৎসু স্বভাবের লোক। বই-পুস্তক থেকে (যেগুলোর গভীর অধ্যয়নে পর্যবেক্ষণ অবস্থা তৈরী হত) এই তত্ত্ব-জ্ঞান নিজের মস্তিষ্কে সংরক্ষিত করে নিয়েছিলেন।

মানুষ তার কাছে শিক্ষামূলক উপকারিতা লাভের জন্য হাযির হত। কবি-সাহিত্যিকগণ আসতেন সাহিত্য উপকার ও নিজের রচনা দেখানোর জন্য। অভাবী-দরিদ্র লোকজন আসত ধনিক-শাসকদের কাছে সুপারিশ করানো এবং তার থেকে যথাসাধ্য সাহায্য পাওয়ার জন্য। কারণ, তাঁর অনুপম চরিত্রের খ্যাতি ছিল চারদিকে। এভাবে রুগ্নরা চিকিৎসা-পথ্যের জন্য হাযির হত। সূফী-সাধক সালেকগণ আসতেন আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক উপকারিতা লাভের উদ্দেশ্যে। বিদেশী-বিভূঁইয়ের উলামা-মাশায়িখকে তিনি নিজের কাছে থাকতে দিতেন; তাদের প্রয়োজনাদি পূরণ করতেন। যদি তার কাছে কোনও বিরুদ্ধবাদী কিংবা এমন ব্যক্তি বসত, যার ধর্মীয় বিষয়াদিতে মতানৈক্য রয়েছে, তবে তিনি নিজের যাদুময় বর্ণনাশৈলীতে আগুন-পানি ও পরস্পর বিরোধী বিষয়গুলোর মধ্যে এমন অভিন্নতা সৃষ্টি করে দিতেন, সে তার সঙ্গে ঐকমত্য হয়ে প্রস্থান করত।

শায়খ মুহসিন 'اليانع الجنى' গ্রন্থে লিখেন, 'তিনি জ্ঞান, পরাকাষ্ঠা, খ্যাতি ও গ্রহণযোগ্যতার এমন উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, যার ফলে গোটা ভারতের লোকজন তার সাথে আত্মীয়তা সম্পর্ক বরং তার ছাত্র-শিষ্য অপেক্ষাও নগণ্য সম্পর্কের উপর গর্ববোধ করত। তার সেসব পরাকাষ্ঠা, যাতে তার সমসাময়িকদের কেউ তার প্রতিদ্বন্দ্বিতার যোগ্য ছিল না, এর মধ্যে উপস্থিত বুদ্ধি এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্বও ছিল। যার কারণে বিতর্কে তারই জয় হত। শ্রোতাকে করে দিতেন নিরুত্তর । তন্মধ্যে আরও ছিল তার বাগ্মীতা, যাদুময় বাচনভঙ্গী ও চমৎকার রচনাশৈলী, যাতে বিজ্ঞমহল তাকে সবার চেয়ে অগ্রগামী স্বীকার করে নিয়েছিলেন। তার এ ধরনের পূর্ণাঙ্গতার মধ্যে আরও ছিল তার

অন্তর্দৃষ্টি, যার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাকে স্বপ্নের ব্যাখ্যাদানের স্বতন্ত্র যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি স্বপ্নের এমন ব্যাখ্যা দিতেন, যা পূর্ণ হত এবং তার প্রত্যক্ষ বাস্তবতা মনে হত। এই যোগ্যতা অত্যন্ত পুণ্যাত্মা মানুষেরই নসীব হয়। এছাড়াও তার অনেক পূর্ণাঙ্গতা ও পরাকাষ্ঠা রয়েছে। সংক্ষেপে বলা যায়, আল্লাহ্ তা'আলা তার সত্ত্বায় নানা ধরনের এবং বহুমুখী প্রতিভা ও শ্রেষ্ঠত্ব একত্রিত করে দিয়েছিলেন, যা সমকালীন লোকদের মধ্যে ছড়িয়ে ছিল। যদি নিম্নোক্ত কবিতা রচয়িতা দেখত, তবে তার সুস্পষ্ট মনে হত, তার এ আতিশয্যও অপর্যাপ্ত, অক্ষম। কবি বলেন,

ولم أر أمثال الرجال تفاوتا # لدى المجد حتى عد الف بواحد

'আমি মানুষদের মত মর্যাদাসমূহের পার্থক্য দেখিনি
যদ্দরুণ সহস্র মানুষ একজনের সমান গণ্য হয়।'

এ অবস্থায় তার গৌরব ও শ্রেষ্ঠত্বগুলো কে গণনা করতে পারে? শাহ আবদুল আযীয (র)-এর সকল রচনা-গ্রন্থনাকে উলামায়ে কিরামের মহলে সাধারণতঃ সম্মান ও গ্রহণযোগ্যতার নযরে দেখা হয়। সেসবের দ্বারা প্রমাণ পেশ করা হয়। তার রচনাশৈলীতে এমন শক্তি, প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মীতা রয়েছে, যাতে কান আনন্দ পায়। মন স্বাদ অনুভব করে। তার কথায় এতই প্রভাব ও বশীকরণ শক্তি রয়েছে, তাতে প্রভাবিত ও একমত না হওয়া কঠিন। তিনি কোনও দুর্বল ও আপত্তিকর রচনা দেখলে অত্যন্ত নৈপুণ্যের সাথে তার জবাব লিখতেন। দার্শনিক বিষয়ে শী'আ ধর্মমত গ্রহণ তার আলোচনা-সমালোচনার বিশেষ প্রতিপাদ্য ছিল। তিনি এমন বিজ্ঞচিত ও দার্শনিক ভঙ্গিতে এ প্রসঙ্গে আলোচনা করেছেন, আজও যার যথাযথ জবাব লিখা সম্ভব হয়নি।

তার রচিত কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে, তাফসীরে কুরআন যেটি 'ফাতহুল আযীয' নামে প্রসিদ্ধ এবং যা তিনি কঠিন রোগ ও দুর্বল অবস্থায় লিখিয়েছিলেন। এটি ছিল কয়েকটি বৃহৎ খণ্ডে রচিত, যার বড় অংশ সাতান্ন খৃস্টাব্দের গোলযোগে বিলীন হয়ে যায়। কেবল শুরু ও শেষের দুই খণ্ড রক্ষা পায়। *তন্মধ্যে একটি 'আল-ফাতওয়া ফিল মাসাইলিল মুশকিলাহ'। এটি কলেবরে অনেক বড় ছিল। কিন্তু আজ কেবলএর সারাংশ দু'খণ্ডে পাওয়া যায়। *তুহফায়ে ইছনা আশারিয়াহ'। এটি শী'আ মতাদর্শের সমালোচনা ও খণ্ডন প্রসঙ্গে একটি অতুলনীয় কিতাব। অন্যান্য কিতাবাদির মধ্যে রয়েছে ১. বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন। এটি হাদীস গ্রন্থাবলি ও মুহাদ্দিসগণের বিস্তারিত নামতালিকা ও জীবনালেখ্য, যা অপূর্ণাঙ্গ থেকে যায়। ২. العجالة النفية -এটি উসূলে হাদীস সম্পর্কিত একটি ফার্সী পুস্তিকা। হাদীসের ছাত্রদের মুখস্থ

করার জন্যও একটি পুস্তিকা রয়েছে। ৩. মীযানুল বালাগাহ। এটি বালাগাত শাস্ত্রের একটি উন্নততর মতন (মূলপাঠ)। ৪. তদ্রুপ মীযানুল কালাম দর্শন শাস্ত্রের একটি মতন। ৫. একটি পুস্তিকা المر الجليل فى مسئلة التفضيل, যাতে খোলাফায়ে রাশেদীনের মর্যাদাগত পার্থক্যের বিবরণ রয়েছে। ৬. একটি পুস্তিকা 'সিররুশ শাহাদাতাইন', যা হযরত হুসাইন (রা)-এর বর্ণনায় একটি উত্তম পুস্তিকা। আরেকটি পুস্তিকা আছে বংশ সম্পর্কে। একটি পুস্তিকা আছে 'স্বপ্নের ব্যাখ্যার ওপর। এছাড়াও আরও অনেক বই-পুস্তক রয়েছে। যুক্তি ও দর্শন শাস্ত্রে 'মীর যাহেদ রিসালাহ, মীর যাহেদ মোল্লা জালাল, মীর জাহেদ শরহে মাওয়াকফ'-এর উপর তার একাধিক টীকা-টিপ্পনী রয়েছে। হাশিয়ায়ে মোল্লা কোসাজ -এর উপর 'আযীযিয়্যাহ' নামে তার রচিত হাশিয়াহ। সদরে শীরাজীর 'শরহে হেদায়াতুল হিকমাহ' -এর উপরও তার টীকা রয়েছে। 'আরজুয়ায়ে আছমাঈ'-এর শরাহও লিখেছেন। আলেম-উলামা ও সাহিত্যিকদের নামে অনেক চিঠিপত্রও আছে। স্বীয় মুহতারাম পিতার 'বা' ও 'হামযা' বর্ণে রচিত কবিতাগুলোর চমৎকার তাখমীসও (পাঁচ পংক্তিতে তৈরী কবিতা) লিখেছেন। গদ্য-পদ্য, লিখনী শক্তি, রচনাশৈলী, বর্ণনায়াদুতে তিনি নিজেই নিজের উপমা ছিলেন। তার রচনাবলি সময়োপযোগিতা, দ্ব্যর্থহীনতা, কলমের তীক্ষ্মতা ও বাকপটুতার উৎকৃষ্ট উদাহরণ।

ফজর নামাযের পর রবিবার ৭ শাওয়াল ১২৩৯ হিজরী আশি বছর বয়সে তিনি ইন্তিকাল করেন। তার কবর দিল্লীতে শহরের বাইরে তার সম্মানিত পিতার পাশে অবস্থিত।

শাহ সাহেবের বিশেষ কর্মকাণ্ডের প্রসারতা ও পূর্ণতা দান

শাহ সাহেবের সংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডগুলোকে আমরা পাঁচটি শাখায় বিভক্ত করতে পারি। যথা,

১. কুরআনে কারীমের ভাষান্তর। মুসলমানদের মাঝে কুরআনের শিক্ষা-দীক্ষা ও বিষয়বস্তুগুলোর ব্যাপক প্রসার। এর মাধ্যমে আকীদা-বিশ্বাসগুলোর সংশোধন এবং শাশ্বত ধর্মের সাথে সর্বসাধারণের সরাসরি সুসম্পর্ক তৈরীর ঐকান্তিক প্রচেষ্টা।

২. হাদীসের প্রচার-প্রসার। এর পাঠদান ও ইযাযতের ক্রমধারার জীবন দান। শিক্ষার আসর চালু করা এবং হাদীসের শিক্ষক ও হাদীস গ্রন্থাবলির শারেহগণের পৃষ্ঠপোষকতা।

৩. রাফেজী ও শী'আ ফিতনার মোকাবেলা। সাহাবায়ে কিরাম (রা) এবং কুরআনে কারীমকে আহত (বিতর্কিত) ও সংশয়পূর্ণ বানানোর অপতৎপরতায় লিপ্ত ও কুচক্রীদের পথ রুদ্ধ করে দেওয়া।

৪. জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহকে পুনর্জীবিত করা। ভারতে ইসলামী শক্তি ও স্বাধীনতার জন্য সবচেয়ে বড় হুমকি ও চ্যালেঞ্জের মোকাবেলা।

৫. সেসব মহাপুরুষদের প্রতিপালন ও পৃষ্ঠপোষকতা, যারা অবস্থা-পরিস্থিতি, সময়ের চাহিদা ও দীনের প্রকৃত লক্ষ্য-উদ্দেশ্য মাফিক দাওয়াত ও সংস্কারকর্ম আঞ্জাম দেন।

কুরআনের প্রচার-প্রসার

সাধারণ মানুষদের কাছে কুরআন পৌঁছানো এবং এর মাধ্যমে বাতিল আকীদা-বিশ্বাস ও ভ্রান্ত রীতিনীতির সংস্কার-সংশোধন, আল্লাহর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক সৃষ্টির প্রচেষ্টার ব্যাপারে যতদূর জানা যায়, তাতে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) তার সম্মানিত পিতার এই মহান কাজকে অনেক অগ্রগতি দান করেন। শাহ সাহেবের দরসে কুরআন সূরা নিসার 'إعدلوا هو اقرب للتقوى' আয়াতখানা পর্যন্ত পৌঁছে ছিল। ইত্যাবসরে তার ইন্তিকাল হয়ে গেল। শাহ আবদুল আযীয (র) এখান থেকেই দরস শুরু করেন। তিনি সূরা হুজুরাতের 'إن اكرمكم عند الله اتقاكم' আয়াত পর্যন্ত পৌঁছেছিলেন। তার ইন্তিকালের পর তার দৌহিত্র (কন্যার পুত্র, যিনি ছিলেন পুরোপুরিভাবে তারই সাহচর্য ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং খাঁটি উত্তরসূরী) শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) দরস শুরু করেন।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর দরসে কুরআন প্রতি সপ্তাহে বুধ ও শুক্রবার হত। যেখানে বিশিষ্ট লোকজন বিশেষভাবে আর সাধারণ মানুষ অত্যন্ত আগ্রহ-উচ্ছ্বাস নিয়ে অংশগ্রহণ করত। এই দরসে তার মানসিকতা নিজের পূর্ণ উদ্যমে আর বিষয়বস্তুর আগমন অবারিত প্লাবনের মত হতে থাকত। এ দরসের দ্বারা রাজধানী দিল্লীতে (যা ছিল তখনকার উলামা-মাশায়িখ ও বিজ্ঞজনদের কেন্দ্রস্থল) কুরআনের আগ্রহ ব্যাপক বেড়ে যায়। আকীদা সংশোধনের এক শক্তিশালী ক্রমধারা চলে। কুরআন অনুবাদ ও দরসে তাফসীরের সেই মুবারক সিলসিলা শুরু হয়, যা আজও পর্যন্ত এই উপমহাদেশে চালু আছে। যার দ্বারা লাখ লাখ মানুষের সংশোধন হয়েছে। তাদের মন-মস্তিষ্ক তাওহীদের মিষ্টতা ও কুরআনিক স্বাদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছে। খোদ আরবী মাদরাসাগুলোতে এই দরসেরই ফয়েজ-বরকত ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত উলামায়ে কিরামের প্রভাবে মতনে কুরআনের দরস ও তত্ত্ব-জ্ঞান বুঝা-বুঝানোর ধারাবাহিকতা শুরু হয়। যাকে পাঠ্যসূচীতে বরকতস্বরূপ স্থান দেওয়া হয়েছিল সংক্ষিপ্ত তাফসীররূপে। আর দুনিয়ালোভী আলেমদের ছড়ানো এই ধাঁধাঁ ভেঙে দেন যে, সর্বসাধারণের মাঝে কুরআনের প্রসার

বিরাট বড় ধর্মীয় হুমকী বরং পথভ্রষ্টতার অগ্রণী পদক্ষেপ। এখানে এই গোপন মনোভীতি কাজ করছিল যে, সাধারণ মানুষ এসব পেশাদার-ব্যবসায়ী আলেমদের হাত থেকে বের হয়ে যাবে। যারা কুরআনকে বানিয়ে রেখেছিল জটিল-কুহেলিকাময়। চালিয়েছিল সর্বসাধারণকে এর থেকে দূরে সরিয়ে রাখার অপচেষ্টা।

হযরত শাহ সাহেবের শিক্ষা ও সংস্কারমূলক দ্বিতীয় কৃতিত্ব 'ফাতহুল আযীয' তাফসীর গ্রন্থ। যাকে 'তাফসীরে আযীযী' এবং 'বুস্তানুত তাফসীর'ও বলা হয়। এটি শাহ সাহেবের যথারীতি লিখিত স্বতন্ত্র রচনা। খোদ শাহ সাহেবের স্পষ্ট বর্ণনা মাফিক এতে সূরা ফাতিহা, সূরা বাকারা এরপর সূরা মুলক্ থেকে কুরআনের শেষ পর্যন্ত তাফসীর রয়েছে। তবে সূরা বাকারা পরিপূর্ণ হয়নি। (যার কারণ জানা যায়নি)। শুধুমাত্র দ্বিতীয় পারার এক-চতুর্থাংশের কাছাকাছি 'ان تصوموا خيرا لكم' পর্যন্ত প্রকাশিত হয়েছে। মূল ফার্সী তাফসীরের একাধিক মুদ্রণ ছাপা হয়েছে। কিতাবটি তিন খণ্ডে সমাপ্ত। প্রথম খণ্ড সূরা ফাতিহা থেকে নিয়ে দ্বিতীয় পারার এক-চতুর্থাংশ পর্যন্ত, দ্বিতীয় খণ্ড ২৯ পারার সূরা মুলক্ থেকে নিয়ে সূরা মুরসালাতের শেষ পর্যন্ত আর তৃতীয় খণ্ড সূরা নাবা 'عم يتسائلون' থেকে নিয়ে কুরআনের শেষ তথা সূরা নাস-এর শেষ পর্যন্ত রয়েছে।

শাহ সাহেবের পরে তার একান্ত শাগরেদ আল্লামা হায়দার আলী ফয়যাবাদী (মৃত্যু ১২৯৯ হি.) 'মুনতাহাল কালাম' রচয়িতা এর পরিশিষ্ট লিখেন। 'মাকালাতে তরীকত' গ্রন্থকার লিখেন, 'এ অধম (লেখক) দেখেছেন, মাওলানা হায়দার আলী 'মুনতাহাল কালাম' গ্রন্থকার ভূপালের শাসক সেকান্দর বেগমের প্রত্যাশানুযায়ী 'ফাতহুল আযীয' তাফসীরখানার ২৭ খণ্ডে পরিশিষ্ট লিখেছেন। উক্ত পরিশিষ্ট কেবল পাঁচ পারার শেষ পর্যন্ত নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানায় সংরক্ষিত পাওয়া যায়। তবে প্রথমাংশের দু'এক পৃষ্ঠা নেই।

আরেকটি কিতাব পাওয়া যায়, মাতবায়ে আনসারী দিল্লীর ছাপা 'ওয়াজে আযীয' নামে খ্যাত 'তাফসীর আযীযী'-এর উর্দূ সংস্করণ। যাতে তার বিন্যস্ত আবুল ফরীদ মুহাম্মদ ইমামুদ্দীন সাহেবের সুস্পষ্ট ভাষ্য অনুযায়ী শাহ সাহেবের দরসে কুরআন ও হাদীস (যা প্রতি মঙ্গল ও শুক্রবার হত) লিখিতভাবে পেশ করা হয়। এটি ১২৫৯ হিজরীর রচনা এবং সূরা মুমিমূন থেকে সূরা আছ-ছাফফাত পর্যন্ত সন্নিবেশিত।

কিন্তু এই অপূর্ণতা সত্ত্বেও এ তাফসীর গ্রন্থে অনেক এমন এমন তত্ত্ব ও গবেষণা রয়েছে, যা অনেক প্রসিদ্ধ তাফসীরসমূহেও পাওয়া যায় না। শাহ

সাহেবের দরসে তাফসীর এবং তার রচিত ফাতহুল আযীয কিতাবে সেসব ব্যাপারে বিশেষভাবে গবেষণামূলক আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলোর ব্যাপারে তখনকার আলেমগণ তত্ত্ব-গবেষণা ও দ্ব্যর্থহীনতার সাথে কাজ করেননি। এ কারণে জনসাধারণের একটি বিরাট সংখ্যা ভ্রান্ত আকীদা ও শিরকী কাজে পর্যন্ত লিপ্ত ছিল। যেমন 'وما أهل به لغيرالله' আয়াতে কারীমার তাফসীর, যা উক্ত কিতাবের বিশেষ স্থানের একটি। এভাবে যাদুর আলোচনা (وما كفر سليمان ... الخ আয়াতের আওতায়) এবং অন্যান্য আরও কতিপয় আয়াতের অধীনে দুর্লভ তত্ত্ব-গবেষণার আলোচনা, উক্ত কিতাবে বৈশিষ্ট্যাবলির অন্তর্ভুক্ত।

হাদীস সংকলন ও সম্প্রসারণ

তার দরসে হাদীস ও এর প্রচার-প্রসার সম্পর্কে যতখানি জানা যায়, তাতে ভারতে শিক্ষা ও ধর্মীয় ইতিহাসে তার উদাহরণ খুঁজে পাওয়া কঠিন। তাঁর দরসে হাদীসের মেয়াদ প্রায় চৌষট্টি বছর। এই সুদীর্ঘ সময়ে তিনি না কেবল সিহাহ সিত্তার দরস দিয়েছেন এবং বুস্তানুল মুহাদ্দিসীন, العجالة النافعة এর মত উপকারী কিতাবাদি রচনা করেছেন, যা হাদীসের যথার্থ সঠিক আগ্রহ, তবাকাতে হাদীস সম্পর্কে জ্ঞান এবং মূলনীতি সম্পর্কে অবগত করায় আর যার বিবরণে লক্ষ লক্ষ পৃষ্ঠার সুগন্ধি এসে গেছে। তিনি হাদীস শাস্ত্রের এমন এমন সুযোগ্য-সুবিজ্ঞ শিক্ষক ও একান্ত শাগরেদ তৈরী করেছেন, যারা ভারতবর্ষই নয়, সুদূর হিজাযে পর্যন্তদরসে হাদীসের কল্যাণের ধারা প্রসারিত করেছেন এবং কল্যাণময় এক বিশ্ব গড়েছেন। তার সুযোগ্য শাগরেদগণের সংখ্যা, যাদের জীবনালেখ্য কেবল 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে বিদ্যমান। তারা চল্লিশের উর্ধ্বে। তন্মধ্যে নিম্নোক্ত মহাপুরুষগণ রয়েছেন, যাদের দ্বারা হাদীস শাস্ত্রের শিক্ষা মজলিস কায়েম হয়েছে এবং যারা হাদীস শাস্ত্রের অন্যান্য শায়খ ও শিক্ষকদের জন্ম দিয়েছেন–

- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসহাক দেহলভী (র)।
- মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব দেহলভী (র)।
- মাওলানা হুসাইন আহমদ, মুহাদ্দিস মালীহাবাদী (র)।
- মাওলানা হায়দর আলী ট্রাঙ্কী (র)।
- মাওলানা খুররাম আলী বলহাওরী (র)।
- মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী (র)।
- মাওলানা সাইয়িদ আওলাদ হাসান কানুজী (র)।
- মির্যা হাসান আলী শাফিঈ লাখনৌবী (র)।

- মুফতী ছদরুদ্দীন দেহলভী (র)।
- মাওলানা মুফতী আলী আকবর মিছলী শহরী (র)।
- মাওলানা সাইয়িদ কুতুবুল হুদা হাসানী রায়বেরেলী (র)।

এছাড়া যারা তার কাছ থেকে হাদীস শাস্ত্রের সনদ নিয়েছেন, তাদের তালিকা এত দীর্ঘ যে, তাদের নাম পেশ করা কঠিন। এখানে কতিপয় বুযুর্গের নাম লিখে দেওয়া হচ্ছে, যারা নিজেদের অন্যান্য যোগ্যতা-দক্ষতা কিংবা সিলসিলায়ে তরীকাত কিংবা খ্যাতির দিক থেকে ছিলেন বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। যেমন,

- হযরত শাহ গোলাম আলী দেহলভী, প্রধান খলীফা হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (র)।
- হযরত শাহ আবু সাঈদ দেহলভী, খলীফা হযরত শাহ গোলাম আলী (র)।
- হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (র), খলীফা শাহ মুহাম্মদ আফাক দেহলভী (র)।
- মাওলানা বুযুর্গ আলী মারাহবী, শিক্ষক– মুফতী এনায়েত আহমদ দাকুরবী।
- শাহ বাশারতুল্লাহ বাহরায়েজী, মুজাদ্দেদী সিলসিলার বড় এক শায়খ।
- শাহ পানাহ আতা সালওনবী সিলসিলায়ে চিশতিয়ায়ে নেযামিয়ার বড় এক শায়খ, যার লিখিতভাবে এযাজত ছিল।
- শাহ যহূরুল হক ফালওয়ারবী।

এত হাদীসের ছাত্র এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শায়খগণের মধ্যে হাদীসের সবচেয়ে প্রসার হয় হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র)-এর মাধ্যমে। যিনি ১২৫৮ হিজরীতে মক্কায় হিজরত করেন। আর তার থেকে হিজাযের বিশিষ্ট আলেমগণ হাদীসের সনদ নেন।

তার ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন মুহাদ্দিসে দেহলভী (র) ওরফে মিয়া সাহেব, কারী আবদুর রহমান পানিপতি (র), মাওলানা সাইয়িদ আলম আলী মুরাদাবাদী, মাওলানা আবদুল কাইয়ূম ইবনে মাওলানা আবদুল হাই বড়হানবী (বিশিষ্ট খলীফা, হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র.), হযরত মাওলানা ফযলে রহমান গঞ্জেমুরাদাবাদী (র), নবাব কুতুবুদ্দীন দেহলভী (মাযাহেরে হক রচয়িতা), মাওলানা আহমদ আলী সাহারানপুরী (সহীহ বুখারীর টীকাকার ও প্রকাশক) মুফতী এনায়েত আহমদ কাকুরবী (শিক্ষক, উস্তাদুল উলামা মাওলানা লুৎফুল্লাহ আলীগড়ী) সহ আরও অনেক

উলামায়ে কিরাম রয়েছেন, যাদের তালিকা অতি দীর্ঘ। 'নুযহাতুল খাওয়াতির' রচয়িতার ভাষ্যমতে ভারতে এই সনদে হাদীসই অবশিষ্ট থাকে।

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক সাহেব (র)-এর ছাত্রদের মধ্যে কেবল মাওলানা সাইয়িদ নযীর হুসাইন সাহেব মুহাদ্দিসে দেহলভী (মৃত্যু ১৩২০ হি.) দিল্লীতে বহু বছর হাদীসের দরস দেন। তার দরস থেকে হাদীস শাস্ত্রের অনেক বিশিষ্ট প্রকাশক ও ব্যাখ্যাকার জন্ম নিয়েছে। তন্মধ্যে মাওলানা আবদুল মান্নান উযীরাবাদী (যার অসংখ্য ছাত্র-শিষ্য পাঞ্জাবে দরস ও ইফাদায় নিয়োজিত ছিলেন), আরিফ বিল্লাহ সাইয়িদ আবদুল্লাহ গজনবী অমৃতাসরী এবং তার বড় ছেলে মাওলানা সাইয়িদ আবদুল জাব্বার গযনবী অমৃতাসরী (মাওলানা সাইয়িদ দাউদ গযনবীর মুহতারাম পিতা), মাওলানা শামসুল হক ডিয়ানবী 'গায়াতুল মাকছূদ' রচয়িতা, মাওলানা মুহাম্মদ বটালবী, মাওলানা গোলাম রাসূল কালঙ্গ, মাওলানা মুহাম্মদ বশীর সাহসোয়ানী, মাওলানা হাফেয আবদুল্লাহ গাজীপুরী, আবু মুহাম্মদ মাওলানা ইবরাহীম আরবী 'তরীকুন নাজাত' রচয়িতা, মাওলানা সাইয়িদ আমীর আলী মালীহাবাদী, মাওলানা আবদুর রহমান মুবারকপুরী 'তুহফাতুল আহওয়াযী' রচয়িতা, (আর আরব আলেমদের মধ্যে) শায়খ নাসের নজদী, শায়খ সা'দ বিন আহমদ বিন আতীক নজদী প্রমুখের নাম এই দরসের প্রশস্ততা ও কল্যাণধারা উপলব্ধি করার জন্য যথেষ্ট।

হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাকের ছাত্রদের মধ্যে হযরত শাহ আবদুল গণী মুহাজিরে মাদানী (র) (মৃত্যু ১২৯৫ হি.)ও গণ্য। যার থেকে ভারতবর্ষের বড় বড় আলেম-উলামা ও হাদীসের শিক্ষকগণের শিষ্যত্বের গৌরব অর্জিত হয়েছে। তার মাধ্যমে গোটা ভারতবর্ষ হাদীসের নূরে নূরান্বিত ও পরিপূর্ণ হয়ে যায়। সে সময়কার সকল শিক্ষাকেন্দ্র ও আরবী মাদরাসাগুলো তার সঙ্গে গৌরবময় সম্পর্ক রাখত। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) এবং হযরত মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম নানুতবী (র) (দারুল উলূম দেওবন্দের প্রতিষ্ঠাতা) তারই প্রসিদ্ধ শাগরেদ। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহীর বিশিষ্ট শাগরেদদের মধ্যে মাওলানা মুহাম্মদ ইয়াহইয়া কান্ধলবী (র) ও হযরত মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র) (বযলুল মাজহুদ রচয়িতা)-এর নামই যথেষ্ট। মাওলানা খলীল আহমদ সাহারানপুরী (র)-এর ছাত্রদের মধ্য শায়খুল হাদীস মাওলানা মুহাম্মদ যাকারিয়া কান্ধলবী, 'আওজাযুল মাসালিক' রচয়িতা প্রমুখের নাম যথেষ্ট। মাওলানা মুহাম্মদ কাসেম সাহেব (র) ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ আহমদ হাসান আমরূহী ও শায়খুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী আর তার ছাত্রদের মধ্যে মাওলানা সাইয়িদ আনওয়ার শাহ কাশ্মীরী ও মাওলানা

সাইয়িদ হুসাইন আহমদ মাদানী (র)-এর নাম ও কৃতিত্ব বলার অপেক্ষা রাখে না। শাহ সাহেব (র)-এর সনদের উচ্চতা, ব্যাপক ফয়েয ও উঁচু মর্যাদার জন্য তার একান্ত শাগরেদ মাওলানা মুহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারহতী (র)-এর বিখ্যাত 'اليانع الجنى فى اسانيد الشيخ عبد الغنى' গ্রন্থখানা অধ্যয়নে জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও অন্তর্দৃষ্টি বিরাটভাবে সমৃদ্ধ হয়।

সুন্নাতের সাহায্য ও শী'আ মতবাদর প্রত্যাখ্যান

রাফেযী ও শী'আ মতবাদের প্রতিরোধ ও এর প্রভাব থেকে আহলে সুন্নাতকে সংরক্ষিত রাখার কৃতিত্বের পরিধি যতদূর এবং যার সূচনা করেছিলেন হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার ভূতপূর্ব কিতাব 'ইযালাতুল খফা'-এর মাধ্যমে, এর পূর্ণাঙ্গতা ও শক্তি দান করেন হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) তার যুগের বিরল রচনা 'ইছনা আশারিয়াহ'-এর মাধ্যমে। যাকে একটি যুগান্তকারী কিতাব বলা যায়। যেভাবে মোল্লা মুহিব্বুল্লাহ বিহারী রচিত 'সুল্লামুল উলূম' ও 'মুসাল্লামুস সুবূত' গ্রন্থ দু'টি প্রায় শত বছর পর্যন্ত ভারতে আলেমদেরকে তার শরাহ ও টীকা-টিপ্পনী রচনায় ব্যস্ত রেখেছে। নিবিষ্ট করে রেখেছে তাদের উৎকৃষ্টতর বিচক্ষণতা ও মেধাশক্তিকে। অনুরূপভাবে এ কিতাবের জবাব বিশিষ্ট বিশিষ্ট শী'আ আলেমদেরকে বিভিন্ন লিখনী ও সংকলনে ব্যস্ত রেখেছে। কেবল 'আবকাত' যার পূর্ণ নাম 'عبقات الأنوار فى إمامة الأئمة الاطهار' এবং যার লেখক মৌলভী সাইয়িদ হামিদ হুসাইন কানতূরী (মৃত্যু ১৩০৬ হি.)– আট খণ্ডে লিখিত। এ কিতাবের স্থূলতা অনুমিত হয় এর প্রথম খণ্ডের কলেবর ১২৫১ পৃষ্ঠা, দ্বিতীয় খণ্ড ৯৭৭ পৃষ্ঠা, তৃতীয় ৬০৯ পৃষ্ঠা, চতুর্থ ৩৯৯ পৃষ্ঠা, পঞ্চম ৭৪৫ পৃষ্ঠা, ষষ্ঠ ৭০৪ পৃষ্ঠা বাকীগুলোও এরূপ সংখ্যক পৃষ্ঠায় রচিত হওয়ার অবস্থা দেখে। পূর্ণ কিতাবটি এরকম ৩০ খণ্ডে সমাপ্ত। লেখকের পুত্র মাওলানা সাইয়িদ নাসির হুসাইন কিতাবটি সমাপ্ত করেন। নজমুস সামা গ্রন্থ থেকে জানা যায়, মাওলানা সাইয়িদ হামিদ হুসাইন সাহেব ছাড়া মাওলানা দিলদার আলী সাহেব মুজতাহিদে আউয়াল, হাকীম মির্যা মুহাম্মদ কামেল দেহলবী, মুফতী মুহাম্মদ কুলী খান কানতূরী এবং সুলতানুল উলামা সাইয়িদ মুহাম্মদ সাহেবও এই কিতাবের জবাবে এবং এর প্রভাবকে দূর করার জন্য মোটা মোটা কিতাবপত্র লিখেছেন। এই ধারাবাহিকতা মির্যা হাদী রিসওয়া লাখনৌবী পর্যন্ত গিয়ে শেষ হয়। যিনি ছিলেন সাহিত্য ও দর্শন জগতের মানুষ। কিন্তু তিনি একাজে অংশ নেওয়ার চেষ্টা করেছেন।

লিখনী ব্যস্ততা ও নিমগ্নতা, দরসে তাফসীর ও হাদীস, কুরআন সুন্নাহর প্রচার-প্রসার, বায়'আত ও ইরশাদ, মুরীদগণের তরবিয়ত-প্রশিক্ষণ দান,

ফাতওয়া প্রদান, বিবাদ-বিসম্বাদ মীমাংসা, সুদূরপ্রসারী কার্যক্রম এবং বিভিন্ন ধরনের টানাপোড়েন ও রোগ-ব্যাধি সত্ত্বেও শাহ্ সাহেবের এ বিষয়টির প্রতি আপাদমস্তক নিবিষ্ট হওয়ার চিন্তা এবং এরূপ একটি গ্রন্থ রচনার সুযোগ কিভাবে হল, যার জন্য বিশোর্ধ্ব কিতাবাদি ও শত-সহস্র পৃষ্ঠা অধ্যয়ন, মানসিক একাগ্রতা ও পূর্ণ মনোযোগিতার প্রয়োজন ছিল? এর ধারণা ততক্ষণ পর্যন্ত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত হিজরী বার শতকের মধ্য ও শেষভাগ (আঠার খৃস্ট শতকের শেষার্ধ) এর ভারতবর্ষ বিশেষতঃ উত্তর ভারত, দিল্লী ও তার আশপাশের এলাকা, উড়িষ্যা, বিহার ও বাংলা মুলুকের মুসলিম সমাজ ও সভ্যতা-সংস্কৃতির উপর গভীর দৃষ্টি না হবে এবং এই চিন্তাগত বিক্ষিপ্ততা, ধর্মীয় সংশয় ও মুসলিম বংশগুলো বিশেষতঃ অভিজাত, শাসক শ্রেণী ও প্রভাবশালী মহলের উপর শী'আ মতাদর্শ গ্রহণের প্রতিক্রিয়া, এর আগ্রাসী ও আক্রমণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক অবগত না হবে। এর উপলব্ধি সে লোক করতে পারে না, যে হুমায়ূনের ইরান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর ফুররাখ সিয়ার ও তার পরবর্তী সময়কার রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিবর্তন, বিপ্লবসমূহ, ইরান বংশোদ্ভূত শাসক ও আলেমদের প্রভাব-প্রতিপত্তি, দুই সাইয়িদ ভ্রাতা (হাসান আলী খান ও হুসাইন আলী খান) এর দিল্লীর রাজদরবারে দাপট ও প্রভাব, এরপর দিল্লীতে নবাব নাজিফ আলী খানের আগ্রাসনের বিশদ বিবরণ, অপরদিকে উড়িষ্যায় নবাব আবুল মানসূর খান সফদর জং নীশাপুরীর বংশধরদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং শুজাউদ্দৌলাহর পর থেকে শী'আ মতবাদের দৌরাত্ম্য ও প্রভাবের জরিপ না নিয়ে থাকেন। এর খানিক ধারণা আসে শাহ্ আবদুল আযীয (র)-এর সেই ভাষ্য থেকে, যা তার 'তোহফাহ' -এর ভূমিকায় সতর্ক শাণিত কলম থেকে বের হয়েছে।

তিনি বলেন, 'এদেশে আমরা যেখানে বসবাস করছি আর এই যুগে আমরা যা পেয়েছি, এখানে 'ইছনা-আশারিয়্যাহ' মতবাদের প্রচার-প্রসার ও প্রচলন এমন পর্যায়ে গিয়ে ঠেকেছে যে, (সুন্নীদের) খুব কম ঘরই এমন পাওয়া যাবে, যে ঘরের দু'একজন এ মতবাদের অনুসারী ও এই আকীদা-বিশ্বাসের প্রতি আসক্ত-অনুরাগী নেই। তাদের অধিকাংশ লোকই ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে অজ্ঞ এবং আপন পূর্বপুরুষদের জীবনালেখ্য ও নীতিমালা সম্পর্কে উদাসীন-বেখবর পরিলক্ষিত হয়। যখন বিভিন্ন বৈঠক ও মাহফিলে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাতের সঙ্গে কথাবার্তা বলে, তখন গোলমেলে বক্রকথা ও অপ্রাসঙ্গিক কথায় কাজ সারতে চেষ্টা করে। সে লক্ষ্যে আল্লাহর ভরসায় এই পুস্তিকা রচনা করা হয়েছে, যাতে তর্ক-বিতর্কের সময় এ মাযহাবের আনুগত্য ও প্রাচীন ফলক থেকে সরে আসতে না পারে; স্বয়ং

নিজের মূলনীতি অস্বীকারকারী না হয় আর যেসব বিষয় বাস্তবতার উপর নির্ভরশীল, তাতে সংশয়-সন্দেহের অবকাশ না দেয়।

শাহ সাহেব এ গ্রন্থে সেসব তর্ক ও দার্শনিকসুলভ কিতাবাদি ও নীতিমালার অনুসরণ করেননি, যা লিখা হয় কোনও বিরোধীপক্ষের প্রত্যাখ্যান ও জবাবে এবং তাদের বিশেষ বাগধারা অনুসারে। প্রথমতঃ এ গ্রন্থে শী'আ মতবাদের উত্থান এবং তাদের দলে-উপদলে বিভক্ত হওয়ার বর্ণনা রয়েছে। তদ্রুপভাবে শী'আ মতবাদের প্রবীণ আলেম ও তাদের রচনাবলির পরিচিতি রয়েছে। এরপর খেলাফতের আলোচনা এবং সাহাবায়ে কিরামের উপর নানা অভিসম্পাত ও ভর্ৎসনার বিবরণ এবং তার জবাবসমূহের উপর ক্ষ্যান্ত করার স্থলে মৌলিক মাসায়েল, খোদায়িত্ব, নবুওয়াত, পরকাল ও ইমামত (শাসনব্যবস্থা)-এর উপর স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ রচনা করা হয়েছে। তিন খলীফা, উম্মুল মুমিনীন হযরত আয়েশা (রা) এবং অন্যান্য সাহাবায়ে কিরামের উপর শী'আ মতাবলম্বীদের পক্ষ থেকে যেসব আপত্তি-অভিযোগ ও বিষেদাগার করা হয়েছে, সেগুলোর বিস্তারিত জবাব দেওয়া হয়েছে। তারপর শী'আ মতবাদের বৈশিষ্ট্য, তাদের সংশয়-সন্দেহ ও উগ্রতার সমালোচনা করা হয়েছে। তাদের ভুল-ভ্রান্তি ও কুধারণাগুলোর পর্যালোচনাও রয়েছে। শেষ অনুচ্ছেদ (১২তম অনুচ্ছেদ) মহব্বত ও ঘৃণা প্রসঙ্গে। যা দশটি মুকাদ্দমায় বিন্যস্ত। গ্রন্থখানা অত্যন্ত সূক্ষ্ম ছাপায় চারশত পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ভাষার মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও বস্তুনিষ্ঠতা; যা ভারত ও ইরানের অনেক শী'আ আলেমও স্বীকার করেছে। খোদ নাম থেকেও এই চিন্তাধারা ও লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের বহিঃপ্রকাশ হয়, যা এ গ্রন্থ রচনার প্রেরণা হয়েছে। এর বিপরীতে যেসব কিতাবাদি লিখা হয়েছে, সেগুলোর নাম থেকে অধিকাংশই বিদ্বেষ ও উত্তেজনা প্রকাশ পায় এবং তরবারী ও বর্শার ঝলক দেখা যায়। যেমন– কিতাবের 'صوارم الالهيات' একটির নাম 'হুসামুল ইসলাম', একটির নাম 'সাইফে নাসেরী', অপর একটির নাম 'যুলফাকার' প্রভৃতি।

এ যুগের তার কল্পনাও করাও কঠিন যে, উক্ত সময়োপযোগী গ্রন্থ রচনা কত কি উপকার বয়ে এনেছে? অধম লেখক নবাব 'ইয়ারে জং' (যুদ্ধপ্রিয়দের) প্রধান মাওলানা হাবীবুর রহমান খান শারওয়ানী সাবেক 'আছ ছুদূর উমূরে মাযহাবী (ধর্মীয় বিষয়সমূহের সংরক্ষণ সংস্থা) হায়দারাবাদ জেলার প্রধান (যার বংশ হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) ও তার খলীফাগণের সাথে সম্পৃক্ত) -এর মুখে স্বয়ং শুনেছি, 'এ গ্রন্থ রচনার শী'আ মতবাদের ক্রমবর্ধমান প্লাবন প্রতিরোধে একটি মজবুত বাঁধের কাজ করেছে।' এ গ্রন্থখানা শাহ সাহেবের জীবদ্দশায়ই

১২১৫ হিজরীতে ছাপা হয়ে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছিল এবং এর নানা জবাব প্রদানের ধারাবাহিকতা শুরু হয়েছিল। শাহ সাহেবের এক বিজ্ঞ শাগরেদ মাওলানা আসলামী মাদ্রাজী এর আরবী অনুবাদ করেন। লেখক এই অনুবাদ গ্রন্থটি বাবে জিবরীলে মদীনা তাইয়্যিবায় অবস্থিত শায়খুল ইসলাম আরেফে হেকমত বে -এর কুতুবখানায় দেখেছে।

ইংরেজ শক্তি বিরোধিতা ও মুসলমানদের জাতীয় নিরাপত্তা

ভারতবর্ষে ইসলামী শক্তির নিরাপত্তা এবং মুসলমানদের স্বাধীনতার পথে আসন্ন হুমকি ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলার পরিধি যতদূর, এক্ষেত্রে শাহ সাহেব অবস্থা-পরিস্থিতির সেই বাস্তবধর্মী পর্যবেক্ষণ, সচেতনতা, দূরদর্শিতা ও বিস্ময়কর লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, যা একজন বিচক্ষণ তীক্ষ্ম দৃষ্টিসম্পন্ন আলেমে দীন, দাঈ ও সংস্কারক এবং সমকালের ধর্মীয় দিশারীর একান্ত বৈশিষ্ট্য। হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর যুগে সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা ছিল মারাঠীদের আক্রমণ এবং তাদের সেই সামরিক অভিযান ও লুটতরাজ দমন করা, যা একটি নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। যার কারণে একদিকে মোঘল সাম্রাজ্য নিরুপায়, শক্তিহীন, অকার্যকর ও অপদস্ত হচ্ছিল। অপরদিকে মুসলমানদের ইজ্জত-আব্রু নিরাপদ ছিল না। শহরের অধিবাসীদের সাধারণ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা অক্ষুণ্ন ছিল না। সে সময় এই হুমকি দূর করা ও একে দমন করার জন্য কোনও সম্ভাব্য সাহায্য লাভ করা এমনই ব্যাপার ছিল, যেমন কোনও ঘর কিংবা মহল্লায় আগুন লাগার সময় আগুন নিভানোর জন্য কোনও দমকলবাহিনী খোঁজা হয়। শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে আহমদ শাহ আবদালী ও তার সৈন্যবাহিনীর বাস্তবতা এটাই ছিল। আর তাদের সঙ্গে চুক্তি হয়েছিল যে, এ আগুন নিভানোর পর তারা স্বদেশে ফিরে যাবে। শাহ সাহেবের দৃষ্টিতে মোঘল সাম্রাজ্য রক্ষার সুযোগ দান এবং কোনও সুব্যবস্থা-সুশাসন সে স্থান দখলের জন্য (যদি এছাড়া উপায় না থাকে) এটি একটি অস্থায়ী ব্যবস্থা ও কৌশলের পর্যায়ভুক্ত ব্যাপার ছিল, যা তৎকালীন মোঘল সম্রাট শাহ আলমের কাপুরুষতা ও অদূরদর্শিতার কারণে সফলতার মুখ দেখতে পারেনি। তখন পর্যন্ত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ভারতবর্ষের নেতৃত্বের লাগাম টেনে ধরা, তারপর এই বিশাল রাজ্যে সাত সমুদ্রের ওপারের একটি দেশের শাসনকর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়ার সেই প্রভাব প্রকাশ পায়নি, যা শাহ সাহেবের তীক্ষ্মদৃষ্টিকে পুরোপুরি এদিকে নিবিষ্ট করত।

কিন্তু শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর ভারতবর্ষের অবস্থা চিত্র অতি দ্রুত বদলে যায়। ১৭৬৫ খৃস্টাব্দ মোতাবেক ১১৭৯ হিজরীতে (শাহ ওয়ালীউল্লাহ

(র)-এর ইন্তিকালের তিন বছর পর) বাংলা, বিহার, উড়িষ্যা তিনটি প্রদেশের বন্দোবস্ত অন্য কারও অংশীদারিত্ববিহীন রাজকীয় পুরস্কার বা দানস্বরূপ বন্দোবস্ত সনদ হিসেবে সরকার ঐ কোম্পানীকে দিয়ে দিয়েছিল। আশ্রয়দাতা সরকার এবং গাজীপুর জায়গীর হিসেবে কোম্পানী পেয়ে গিয়েছিল। এখন তৈমুর বংশের অধঃস্তন সম্রাট শাহ্ আলমের হাতে রাজ্যের মাত্র একটি প্রদেশ (এলাহাবাদ) ছিল। আর আয়ের মধ্যে ছিল সেসব অর্থকড়ি, যা তাকে ইংরেজরা দিত। ৮ মার্চ ১৭৮৭ খৃস্টাব্দে (১২০২ হি.) কলকাতা গেজেটে প্রকাশ করা হয়, 'মুসলমানদের রাজত্ব তো নিতান্তই ক্ষুদ্র ও তুচ্ছ হয়ে গেছে, হিন্দুদের নিয়ে আমাদের কোনও উদ্বেগ-আশংকা নেই।' ১৭৫৭ খৃস্টাব্দে ইংরেজরা পলাশীর ময়দানে সিরাজুদ্দৌলাহকে আর ২৩ অক্টোবর ১৭৬৪ খৃস্টাব্দে (১১৭৮ হি.) বকসারের ময়দানে শুজাউদ্দৌলাহকে পরাজিত করে। ১৭৯৯ খৃস্টাব্দে (১২১৪ হি.) শহীদ টিপু সুলতান পাটন ময়দানে শাহাদাত বরণ করেন। যেন তখন ভারতবর্ষে মুসলমানদের শাসন ক্ষমতার ললাটে সীলগালা লেগে গিয়েছিল। সুলতান শহীদের লাশ দেখে জেনারেল হ্যারিস তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় বলেছিল, 'আজ ভারতবর্ষ আমাদের।'

শাহ্ আবদুল আযীয (র), যিনি দিল্লীতে দরস-তাদরীসে নিয়োজিত ছিলেন। কিন্তু তার বাস্তবদর্শী দৃষ্টি গোটা ভারতের উপর ছিল। আল্লাহ তা'আলা তাকে অসাধারণ বাস্তবদর্শী মেধা, আত্মমর্যাদাবোধ ও দৃঢ়চিত্ততা দান করেছিলেন। তিনি এই পরিবর্তনের পূর্ণ জরিপ নেন এবং এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, এ সময়টি শিশু-কিশোর, ইসলামী নেতৃত্ব-শাসন ও এদেশে মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য বিপদজনক। তার একটি আরবী কবিতায় এই বাস্তবতার পূর্ণ চিত্র ফুটে উঠে। যার থেকে অনুমিত হয়, তিনি ইংরেজদের প্রভাবকে ভারতবর্ষ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ মনে করতেন না; একে আরও ব্যাপক ও সুদূরপ্রসারী মনে করতেন। তিনি বলেন,

وإنى أرى الافرنج أصحاب ثروة # لقد أفسدوا ما بين دهلى وكابل

'আমি দেখেছি, এই যে ইংরেজরা ধন-সম্পদের মালিক,
এরা দিল্লী ও কাবুলে মাঝে বিপর্যয় সৃষ্টি করছে।'

আমাদের জানামতে তিনিই প্রথম ব্যক্তি, যিনি ঐ মুহূর্তে ভারতকে 'দারুল হরব' (শত্রু কবলিত রাষ্ট্র) আখ্যা দেওয়ার দুঃসাহস করেছেন। সেই সাথে উদ্ভুত পরিস্থিতির বাস্তবধর্মী জরিপ নিয়ে ফিকাহ ও উসূলে ফিকাহের আলোকে সমস্যার এমন পর্যালোচনা করেছেন, যার দ্বারা তার অন্তর্দৃষ্টিরও বহিঃপ্রকাশ ঘটে এবং চারিত্রিক-নৈতিক ও ধর্মীয় সাহসিকতারও। ফাতওয়ায়ে আযিযিয়্যার প্রথম খণ্ডে

নিম্নোক্ত প্রশ্ন অর্থাৎ 'দারুল ইসলাম দারুল হরব হতে পারে কি না?' এর জবাবে 'দুররে মুখতার' -এর দীর্ঘ এক উদ্ধৃতি চয়ন করার পর তিনি লিখেন–

'এ শহরে (দিল্লীতে) মুসলমানদের শাসকের হুকুম মূলতঃ কার্যকর নেই। খৃস্টান শাসকদের হুকুম অতিমাত্রায় চালু রয়েছে, ফকীহগণ যাকে কাফিরের আহকাম বাস্তবায়ন বা কুফরী শাসন বলেন। এর দ্বারা উদ্দেশ্য হল, রাষ্ট্র ব্যবস্থা, প্রজাসাধারণের বন্দোবস্ত, ট্যাক্স-কর, ব্যবসার সম্পদের এক-দশমাংশ উসূল করা, চোর-ডাকাতদের শাস্তি বিধান, বিচারকার্য ও অপরাধ দমনে কাফির গোষ্ঠী ব্যক্তিগতভাবে শাসক ও স্বাধীন। যদি কোনও কোনও ইসলামী বিধান পরিপালন যেমন, জুমআ, দুই ঈদ, আযান ও গরু কুরবানী ইত্যাদিতে তারা আপত্তি নাও করে, তথাপি মূলকথা এটাই যে, এসব বিষয় তাদের দয়া-করুণার উপরই হচ্ছে। আমরা দেখেছি, তারা মসজিদগুলো নির্বিচারে ধ্বংস করছে। কোনও মুসলমান কিংবা (অমুসলিম) যিম্মি তাদের অনুমতি ছাড়া এই শহর ও এর উপকূলে প্রবেশ করতে পারে না। নিজেদের স্বার্থে তারা বহিরাগত মুসাফির ও বণিকদের নিষিদ্ধ করে না। কিন্তু অন্যান্য পদমর্যাদার অধিকারী লোক যেমন শুজাউল মালিক, বেলায়েতী বেগম প্রমুখ তাদের অনুমতি ছাড়া এসব শহরে প্রবেশ করতে পারে না। এই দিল্লী শহর থেকে কলকাতা পর্যন্ত খৃস্টানদের শাসনকর্তৃত্ব বিস্তৃত। তবে ডানে বামে যেমন– হায়দারাবাদ, লাখনৌ ও রামপুরে তারা তাদের হুকুম জারি করেনি। কোথাও তো নিজেদের স্বার্থ রক্ষার তাগিদে আর কোথাও সেসব রাজ্যের শাসনকর্তা তাদের আনুগত্য স্বীকার করে নেওয়ার কারণে।'

হযরত শাহ সাহেবের চিন্তাধারা এবং ইংরেজদের সম্পর্কে তার যে দৃষ্টিভঙ্গি ছিল, এর সম্পূর্ণ বিপরীত চিন্তাধারা ও দৃষ্টিভঙ্গি পাওয়া যায় তার বিশিষ্ট খলীফা ও সংশ্রবপ্রাপ্ত দাঈ ও সংস্কারক হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)-এর মধ্যে। যার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি তার চিঠিপত্রগুলোতে পরিলক্ষিত হয়। যেগুলো তিনি সেসময় ভারতের কতিপয় প্রভাবশালী ও শাসনকর্তা নেতৃবৃন্দ এবং কোনও কোনও বিদেশী মুসলমান শাসকবর্গকে লিখেছিলেন। চিত্রালের শাসক শাহ সুলাইমানকে একটি পত্রে তিনি লিখেছিলেন, 'নিয়তির সিদ্ধান্তে কয়েক বছর ধরে ভারতবর্ষের রাজত্ব ও শাসনের অবস্থা এমন হয়ে গেছে যে, খৃস্টান ও মুশরিকরা ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলে বিজয় পেয়ে গেছে এবং শুরু করে দিয়েছে জুলুম-শোষণ ও দখলের রাজত্ব।'

এর চেয়ে আরও সুস্পষ্ট ভাষায় হিন্দু রাজপুত উযীর গবালিয়া...কে লিখেন, 'জনাব খুব ভালভাবেই জানেন যে, এই ভিনদেশী সমুদ্র উপকূলবাসী,

বিশ্বময় বণিক এবং এই সওদাগররা রাজত্বের কর্তা (শাসক) হয়ে গেছে। বড় বড় শাসকদের রাজত্ব এবং তাদের ইজ্জত-সম্মানকে ধূলায় মিশিয়ে দিয়েছে।'

গবালিয়ার এক সামরিক অফিসার গোলাম হায়দার খানের নামে লিখেন, 'ভারত সাম্রাজ্যের বিরাট অংশ বিদেশীদের দখলে চলে গেছে। তারা সর্বত্রই জুলুম-শোষণ ও নিপীড়নের জন্য কোমর বেঁধে নিয়েছে। ভারতের শাসকদের রাজত্ব ধ্বংস হয়ে গেছে।'

সাইয়িদ সাহেবের রাজপুত্র ও শাসকবর্গের নামে লিখিত এসব চিঠিপত্র থেকে পরিষ্কার মনে হয়, এই জিহাদের দ্বারা তার মৌলিক উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষ, যা ক্রমান্বয়ে ইংরেজদের দখলে চলে যাচ্ছিল। চিঠিতে তিনি লিখেন, 'এই যুদ্ধ (সীমান্ত ও পাঞ্জাব) থেকে অবসর হওয়ার পর এই অধম পুণ্যবান মুজাহিদগণের সঙ্গে কুফর ও দাম্ভিকতার মূলোৎপাটনের নিয়তে ভারতের প্রতি মনোযোগী হবে। কেননা এটাই মূল লক্ষ্য।

এ ধারণাজ্ঞান এ থেকেও হতে পারে যে, সাইয়িদ সাহেব ১২১৭ হিজরীতে (শাহ আবদুল আযীয র.-এর ইন্তিকালের বার বছর পূর্বে) আমীর খানের সেনাবাহিনীতে তাশরীফ নিয়ে গেলেন, যা সে সময় ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত ছিল। তাদের সঙ্গে ছিল ভারতবর্ষের উন্নততর সামরিক শক্তি, মুসলমানদের দুর্নিবার সাহসী পুরুষ, লৌহমানব, ভারতের বিজয়ী শক্তির দুর্ভেদ্য পুঁজি এবং সময়ের অনেক সিংহশাবক অশ্বারোহী। এটা ছিল ভারতের একটি বর্ধিষ্ণু স্বাধীন শক্তি। যাকে সমকালের কোনও তীক্ষ্মদৃষ্টি উপেক্ষা করতে পারত না। যাকে স্বার্থক ও সুশৃঙ্খল বানিয়ে ইংরেজদের ক্রমবর্ধমান শক্তির মোকাবেলায় এনে দাঁড় করানো যেত। কেননা বিভিন্ন দেশ ও জাতির ইতিহাসে এমন সুযোগ্য শক্তিগুলো স্বীয় জনবল ও অস্ত্রশস্ত্রের দুর্বলতা সত্ত্বেও অবস্থার গতিধারা বদলে দিয়েছে। এর কোনও লিখিত প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি যে, হযরত সাইয়িদ (র) হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এর সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও আদেশে নবাব আমীম খান এর সৈন্যদলে তাশরীফ নিয়ে গিয়ে ছিলেন। কিন্তু বিভিন্ন ইশারা-ইংগিত অবশ্যই পাওয়া যায়। যাতে অনুমিত হয়, এ পদক্ষেপ হযরত শাহ সাহেবের ইংগিতে কিংবা ন্যূনপক্ষে তার সমর্থন ও পছন্দ হয়েছে। কেননা ১২২৩ হিজরীতে যখন নবাব সাহেব ইংরেজদের সঙ্গে আপোস রফা করে নেন। রাজপোতানা ও মালের কতিপয় বিক্ষিপ্ত ও গুরুত্বহীন অঞ্চল পেয়ে সন্তুষ্ট হয়ে (একত্রে যাকে টোঙ্গ জেলা বলা হত) ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ করা থেকে দূরে সরে আসেন আর সাইয়িদ সাহেব

এরপর সেখানে আরও বেশি অবস্থান করাকে অনর্থক মনে করেন। তখন তিনি পৃথক হয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন এবং শাহ আবদুল আযীয (র) কে একটি পত্র লিখেন, যার বিষয়বস্তু ছিল নিম্নরূপ,

'অধম পদচুম্বনের জন্য হাযির হচ্ছে। এখানে সৈন্যদের কর্মকাণ্ড উলট-পালট হয়ে গেছে। নবাব সাহেব ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছেন। এরপর এখানে থাকার কোনও অবস্থা নেই।'

উক্ত উদ্ধৃতি থেকে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়, এ সফর শাহ সাহেবের ইংগিত ও পরামর্শে হয়েছিল। এজন্য প্রত্যাবর্তনকালে তাকে এ সংবাদ জানানোর প্রয়োজন ছিল।

এভাবে শাহ সাহেব তৎকালীন মুসলমান ও ভারতের উপর অত্যাসন্ন বিপদাশঙ্কা উপলব্ধি করায় আল্লাহ প্রদত্ত বিচক্ষণতা ও মুমিনসুলভ বুদ্ধিমত্তার দ্বারা কাজ করেছেন। এর জন্য তিনি তার যুগে যে চেষ্টা-সংগ্রাম করতে পারতেন, তাতে কোনও ত্রুটি করেননি। তার এই অন্তর্দৃষ্টি ও চেতনা তার সাথে সম্পর্ক রক্ষাকারী মুজাহিদ দল (যার নেতৃত্ব হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র. ও শাহ সাহেবের সুযোগ্য ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত শাহ ইসমাঈল শহীদ র. দিচ্ছিলেন) -এর মধ্যে পুরোপুরি সক্রিয় ছিল এবং যার পূর্ণ প্রদর্শনী মাওলানা বেলায়েত আলী আযীমাবাদী, মাওলানা ইয়াহইয়া আলী সাদেকপুরী, মাওলানা আহমদুল্লাহ ও মাওলানা আবদুল্লাহ সাহেবের ইংরেজদের বিরুদ্ধে সীমান্ত যুদ্ধগুলো এবং সাদেকপুরের মহান কুরবানীগুলোতে দীপ্তিমান– যার দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া মুশকিল।

এরপর এই চেতনা এ দল থেকে সেসব আলেম ও ধর্মীয় নেতৃবৃন্দের দিকে স্থানান্তরিত হয়, যারা ১৮৫৭ খৃস্টাব্দে এর জন্য জীবনের শেষ রক্তবিন্দু বাজী রেখেছেন। তন্মধ্যে মাওলানা আহমদুল্লাহ শাহ মাদ্রাজী (র), মাওলানা লিয়াকত আলী এলাহাবাদী (র), হযরত হাজী এমদাদুল্লাহ থানবী (র) এবং হযরত হাফেয যামেন শহীদ (র)-এর নাম সুপ্রসিদ্ধ। এরপর সেসব উলামায়ে কিরামের প্রতি, যারা এই অগ্নিশিখা প্রজ্জ্বলিত রেখেছেন এবং ১৯৪৭ খৃস্টাব্দ পর্যন্ত এই ধারা কোনও না কোনওভাবে সতেজ রেখেছেন। কবির ভাষায়–
'আল্লাহ তা'আলা এসব পুণ্যাত্মা আশেকদের উপর রহম করুন।'

মহাপুরুষদের পৃষ্ঠপোষকতা

যতদূর এসব মহাপুরুষদের তরবিয়ত ও পৃষ্ঠপোষকতার পরিধি, যারা অবস্থা-পরিস্থিতি ও সময়ের চাহিদাসমূহ এবং দীনের মৌলিক অভীষ্ট অনুযায়ী দাওয়াত ও সংস্কারকর্ম আঞ্জাম দিয়েছেন, সংগ্রাম ও জিহাদের ঝাণ্ডা উত্তোলন

করেছেন, এক্ষেত্রে মহান আল্লাহ পাকের কুদরত ও প্রজ্ঞার নিদর্শন মতে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর অংশ তার অনেক মাশায়িখ ও পূর্বসূরী এবং কতিপয় এমন ব্যক্তিত্ব অপেক্ষাও বেশি, যাদের মর্যাদা সম্ভবতঃ (আর বিভিন্ন আলামত তা প্রমাণ করে) আল্লাহ পাকের দরবারে তাদের অপেক্ষা বেশি রয়েছে। শাহ সাহেবের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা এমন কতিপয় উচ্চ যোগ্যতা, সাহসিকতা ও বিস্ময়কর ইচ্ছাশক্তির অধিকারী আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের পৃষ্ঠপোষকতার কাজ নিয়েছেন, যারা হাজার হাজার মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং এক পূর্ণ শতক সামলে রেখেছেন। শাহ সাহেব (র)-এর জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও জীবন-সমুদ্রে ছিল স্থিতিশীলতা। তবে আল্লামা ইকবালের ভাষায়,

اسی دریا سے اٹھتی ہے وہ موج تند جولاں بھی۔

نہنگوں کے نشیمن جس سے ہوتے ہیں تہ وبالا۔

হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)

এই দাবীর সত্যতার জন্য কেবল তার একান্ত খলীফা সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র) (১২০১-১২৪৬ হি.)-এর নাম নেওয়াই যথেষ্ট। যিনি এই উপমহাদেশে এই মহান ইসলামী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিয়েছেন, যার স্বয়ংসম্পূর্ণতা, প্রভাব শক্তি এবং ইসলামের সুমহান দাওয়াত, নববী আদর্শের নৈকট্য ও সাদৃশ্যতায় না কেবল এই তের হিজরী শতকে দৃষ্টিগোচর হয় বরং বিগত কয়েক শতকেও এ ধরনের ঈমানী চেতনা সৃষ্টিকারী আন্দোলন এবং নেককার বুযুর্গদের এমন সুবিন্যস্ত ও সুশৃঙ্খল জামাতের কোনও খোঁজ পাওয়া যায় না। তিনি আকাইদ ও আমলের সংশোধন, মানুষের তরবিয়ত, ওয়াজ-নসীহত, তাবলীগে দীন, জিহাদ ও নির্ভীকতার বিশাল বিস্তৃত রণাঙ্গণে যেভাবে কর্মতৎপর ছিলেন, এর প্রভাব কেবল তার কর্মময় স্থান ও তার সমসাময়িক বংশধর পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকেনি বরং তা ভবিষ্যত প্রজন্ম, তৎপরবর্তীকালে আগত আহলে হক, দীনের দাঈ, ঝাণ্ডাবাহী ও খাদেমদের উপর গভীর ও দীর্ঘস্থায়ী ছাপ ফেলে, ক্রমবর্ধমান ইংরেজ শক্তির মোকাবেলায় ভারতবর্ষ ও তার প্রতিবেশি মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর হেফাজত, খোলাফায়ে রাশেদার আদর্শে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা-সংগ্রামের সূচনাও তিনিই করেছেন। এই আন্দোলন ও চেষ্টা-সংগ্রামের নেতৃত্বের লাগাম ভারতে প্রথম প্রথম এই শ্রেণীর উলামায়ে কিরাম ও নেতৃবৃন্দের হাতে থাকে. ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে ধর্মীয় কিতাবাদি রচনা ও সংকলন, অনুবাদ ও

প্রচার-প্রসারের আধুনিক আন্দোলন (যা সাধারণ মুসলমান এবং সঠিক ইসলামী শিক্ষা-দীক্ষা ও কুরআন-সুন্নাহর মাঝে বিদ্যমান প্রশস্ত-গভীর ঘাটতি পূরণ করেছে) তারই চেষ্টা-সংগ্রামেরই অবদান, মুসলমানদের ধর্মীয় ও রাজনৈতিক জাগরণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে এই দাওয়াত ও আন্দোলনেরই ফলাফল ও সাফল্য। এই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া, শিক্ষা-সাহিত্য, ইসলামী চিন্তাধারা, ভাষা ও বাচনভঙ্গি বর্ণনায়ও পড়েছিল। এ আন্দোলন সমাজ সংস্কার, জাহেলী রীতিনীতির ভ্রান্ততা প্রমাণ, হিন্দু ধর্মের প্রভাব দূরীভূত করা এবং সঠিক ইসলামী জীবনের প্রতি প্রত্যাবর্তনের মহান কাজ আঞ্জাম দিয়েছে। সাইয়িদ আহমদ (র) এবং তার দাওয়াত ও তরবিয়তের প্রভাবের ব্যাপকতা, শক্তি ও গভীরতা-কার্যকারিতা অনুমান করার জন্য এখানে আমরা কতিপয় চিন্তাবিদের রচনাবলি থেকে কিছু উদ্ধৃতি পেশ করছি।

ভারতবর্ষের বিখ্যাত লেখক ও ঐতিহাসিক নবাব সিদ্দীক হাসান খান, গভর্নর, ভূপাল (মৃত্যু ১৩০৭ হি.), যিনি সাইয়িদ (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষার প্রভাব স্বয়ং প্রত্যক্ষ করেছিলেন এবং তাকে প্রত্যক্ষকারীদের এক বিরাট দলের যুগ পেয়েছিলেন, তিনি 'تقصار جيود الاحرار' গ্রন্থে লিখেন, 'সৃষ্টিজীবের পথপ্রদর্শন এবং আল্লাহর পথে ফিরিয়ে আনা ও প্রত্যার্পণে তিনি ছিলেন আল্লাহর একটি নিদর্শন। এক বিরাট মানবগোষ্ঠী ও এক পৃথিবী তার আত্মিক ও শারীরিক তাওয়াজ্জুহে বেলায়েতের মর্যাদায় পৌঁছে গেছে। তার খলীফাগণ ওয়াজ-নসীহতের মাধ্যমে ভারতের মাটিকে শিরক-বিদ'আত ও কুসংস্কারের খড়কুটো থেকে পবিত্র করে দিয়েছে, কুরআন-সুন্নাহর বিশ্বরোডে এনে দাঁড় করিয়েছে। আজও তাদেও ওয়াজ-নসীহতের বরকত যথারীতি চালু আছে।'

আরেকটু সামনে এগিয়ে লিখেছেন, 'মোটকথা এ যুগে পৃথিবীর কোনও রাষ্ট্রে এমন সুযোগ্য ব্যক্তিত্বের কথা শোনা যায়নি, যে ফয়েয-বরকত এই হকপন্থী দলের মাধ্যমে সৃষ্টিজীবের হয়েছে, তার দশ ভাগের একভাগও এ যুগের উলামা-মাশায়িখের দ্বারা হয়নি।

যুগশ্রেষ্ঠ আলেম, উস্তাদের উস্তাদ, হযরত মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী টোঙ্কী (মৃত্যু ১২৭৩ হি.) শাগরেদ হযরত শাহ আবদুল আযীয দেহলভী (র) 'صيانة الناس' গ্রন্থে লিখেছেন, 'তার হেদায়াতের নূর সূর্যের মত পূর্ণ ক্ষিপ্রতার সাথে বিভিন্ন শহর-নগর ও মানুষের অন্তরে উদ্ভাসিত হয়। চতুর্দিক থেকে ভাগ্যবান লোকজন পরকালের প্রতি মনোযোগী হয়ে শিরক-বিদ'আত ইত্যাদির নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে (রীতিমত যুগ যাতে অভ্যস্ত ছিল) তাওবা করে তাওহীদ ও সুন্নাতের শাশ্বত পথ অবলম্বন করতে থাকে। আর প্রায়ই হযরতের পুণ্যাত্মা খলীফাগণ নানা স্থান সফর করে করে লাখ

লাখ মানুষকে দীনে মুহাম্মাদীর সরল সঠিক পথ বাতলে দেন। যাদের জ্ঞান-বুদ্ধি ছিল এবং আল্লাহর অনুগহ যাদের সাহায্য করেছে, তারা এই পুণ্যের পথে চলেন।'

ভারতের এক বিজ্ঞ ও নির্ভরযোগ্য আলেমে দীন মাওলানা আবদুল আহাদ সাহেব, যিনি এই মুবারক জামাতের অনেক সদস্যের সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন, যারা সময়কাল সাইয়িদ (র)-এর নিকটতর ছিল, তিনি লিখেন, 'হযরত সাইয়িদ সাহেব (র)-এর হাতে চল্লিশ হাজারের অধিক হিন্দু প্রমুখ কাফির মুসলমান হয়েছে। ত্রিশ লাখ মুসলমান তার হাতে বায়'আত গ্রহণ করেছেন। আর বায়'আতের যে ক্রমধারা তার খলীফাগণের খলীফাদের মাধ্যমে গোটা বিশ্বে চালু রয়েছে, এই সিলসিলায় তো কোটি কোটি মানুষ তার বায়'আতে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।'

এই বিশাল সংস্কার ও সংশোধনমূলক কৃতিত্বের কারণে প্রায় সকল চিন্তাবিদ ও ইনসাফপ্রিয় লোক তাকে তের শতকের মুজাদ্দিদ বলে স্বীকার করেন।

মাওলানা আবদুল হাই বড়হানবী ও মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র)

শাহ্ আবদুল আযীয (র) শিক্ষা-দীক্ষার দ্বিতীয় দৃষ্টান্ত তার দুই একান্ত ছাত্র ও অত্যন্ত স্নেহভাজন মাওলানা আবদুল হাই বড়হানবী (র) ও মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র)। শাহ্ আবদুল আযীয (র) স্বয়ং এ দুই বুযুর্গের শিক্ষাগত মর্যাদা ও জ্ঞানের অথৈ গভীরতার স্বীকৃতি দিতেন। তিনি এক পত্রে এ দুই বুযুর্গকে 'মুফাসসিরগণের মুকুট, মুহাদ্দিসগণের গৌরব গবেষক উলামায়ে কিরামের শিরোমণি' লিখেছেন এবং বলেছেন, 'দুই হযরত তাফসীর ও হাদীস, ফিকহ্ ও উসূলে ফিকহ্, মানতিক ইত্যাদি শাস্ত্রে এ অধম থেকে কম নয়। মহান আল্লাহর যে সাহায্য এই দুই বুযুর্গের সাথে রয়েছে, তার কৃতজ্ঞতা আমার দ্বারা আদায় হতে পারে না। এই দু'জনকে আল্লাহওয়ালা আলেমদের মধ্যে হিসেব করো। আর যেসব প্রশ্ন-সমস্যা সমাধান না হয়, তার সামনে উপস্থাপন করো।'

মাওলানা আবদুল হাই সাহেব (র)-এর মর্যাদা বিজ্ঞমহলের নিকট প্রচলিত শাস্ত্র-জ্ঞানে অনেক উর্ধ্বে ছিল। আর তাফসীর শাস্ত্রে খোদ শাহ সাহেব মাওলানাকে নিজের সকল ছাত্র-শিষ্যের উপর সম্মান দিতেন। বলতেন, সে আমার মতই। 'শায়খুল ইসলাম' উপাধি, যা ইসলামের বিশেষ বিশেষ আলেমকে দেওয়া হয়েছে, শাহ্ সাহেব স্বয়ং এক চিঠিতে মাওলানাকে তা লিখে দেন।

শিক্ষাগত জ্ঞানের গভীরতা ও মেধাগত যোগ্যতাগুলোর উপরেও যে বিষয়টি অগ্রগণ্য, তা হচ্ছে, তার লিল্লাহিয়াত ও ইখলাছ (অর্থাৎ সব কিছুই একমাত্র আল্লাহকে সন্তুষ্ট করার নিয়তে করা); যা এই জ্ঞান-প্রজ্ঞার সঙ্গে সাইয়িদ সাহেব (র)-এর প্রতি নিবিষ্ট হয়। বয়সে যিনি তার থেকে কয়েক বছর ছোট আর ইলম-জ্ঞানে তার শিষ্যত্বের মর্যাদার অধিকারী। বায়'আত হওয়া মাত্র তিনি সাইয়িদ সাহেবের রঙে রঙিন হয়ে গেলেন। নিজের সমস্ত জ্ঞান-প্রজ্ঞাকে তার উপর ব্যবহার করেছেন। আর দাওয়াত ও জিহাদের কাজের দৃঢ়তা, কলমশক্তি, ভাষা ও আল্লাহ প্রদত্ত প্রত্যেক শক্তি ও যোগ্যতাকে সত্যের প্রসার ও সাহায্যের জন্য ওয়াকফ করে দিয়েছেন। ঘরে-বাইরে ও জিহাদেই এই জীবনকে জীবনস্রষ্টার জন্য সোপর্দ করেন।

মাওলানা শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল শহীদ (র) এর সম্পর্কে যতদূর জানা যায়, তাতে সুস্পষ্ট যে, তিনি ছিলেন বহু শতক পর জন্ম নেওয়া দৃঢ়চিত্ত, উচ্চ সাহসী, ধীমান, বিচক্ষণ ও অসাধারণ ব্যক্তিদের একজন। তিনি ছিলেন মুজতাহিদসুলভ মেধার অধিকারী। তার মধ্যে অনেক শাস্ত্র জ্ঞান নতুনভাবে সংকলনের ক্ষমতা ও যোগ্যতা ছিল বললেও অত্যুক্তি হবে না। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) একটি পত্রে তাকে 'হুজ্জাতুল ইসলাম' উপাধিতে ভূষিত করেছেন। তার রচনাবলি ও জ্ঞানে হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর ভাবধারা লক্ষ্য করা গেছে বিরাটভাবে। ছিল সেই জ্ঞানের সতেজতা, প্রমাণ দানের সূক্ষ্মতা, তাত্ত্বিকতা, সুস্থ রুচিশীলতা, কুরআন-হাদীসের বিশেষ ব্যুৎপত্তি এবং উপস্থিত বুদ্ধি ও বাগ্মীতা।

শাহ সাহেবের বড় বৈশিষ্ট্য হল, তিনি শিক্ষানবীশ উলামায়ে কিরাম, মেধাবী-ধীমান লোকদের ঐ গণ্ডি থেকে বাইরে ও উর্ধ্বে পদক্ষেপ নিয়েছেন, যা বছরের পর বছর বরং শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে এ শ্রেণীর জন্য সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। তিনি ব্যাপক ইছলাহ ও ইরশাদ, জিহাদ ও দৃঢ় সংকল্পের গণ্ডিতে কেবল অগ্রণী ভূমিকাই রাখেননি বরং আঞ্জাম দিয়েছেন এ জগতে নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব। তার নিছক 'তাকবিয়াতুল ঈমান'-এর মাধ্যমে বিশ্ববাসীর এমন কল্যাণ এবং আকীদা-বিশ্বাসের সংশোধন হয়েছে, যা হয়ত কোনও সরকারের সুচারু-সুপরিকল্পিত প্রচেষ্টায়ও মুশকিল হত। হযরত মাওলানা রশীদ আহমদ গাঙ্গুহী (র) বলেন, 'মৌলভী ইসমাঈল সাহেব (র)-এর জীবদ্দশায়ই আড়াই লাখ মানুষ সংশোধন হয়ে গিয়েছিল। আর তার পরে যে কল্যাণ হয়েছে, তার তো কোনও ধারণাই করা যায় না।'

ব্যাপক দাওয়াত ও ইছলাহের জন্য নিজেকে তিনি পুরোপুরিভাবে প্রস্তুত করেন। সাইয়িদ সাহেব (র)-এর (যার হাতে তিনি সুলূক ও জিহাদের বায়'আত

গ্রহণ করেছিলেন) না কেবল সহকর্মী ও বন্ধুত্বের হকই তিনি আদায় করেছেন বরং এ মহান কাজে তার অবস্থান ছিল আন্দোলনের একজন নেতা এবং শাসকের উযীর ও নায়েবের পর্যায়ে। অনন্তর তিনি এ মহান কাজে নিজের জীবন সত্ত্বাকে উৎসর্গ করে দেন। শাহাদাতের মর্যাদা লাভে ধন্য হন বালাকোটের ময়দানে। আল্লামা ইকবাল এমন মহাপুরুষ সম্পর্কেই বলেছেন,

تکیہ بر حجت و اعجاز بیاں نیز کنند۔ ☆ کار حق گاہ بشمشیر و سناں نیز کنند۔

گاہ باشد کہ نہ خرقہ زرہ می پوشند۔ ☆ عاشقاں بندۂ حال اند و چناں نیز کنند۔

মাওলানা শাহ্ মুহাম্মদ ইসহাক (র) ও শাহ্ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র)

শাহ সাহেবের একান্ত রুচি-অভিপ্রায়, দরসে হাদীস, এযাযত ও ইসনাদ এবং ধর্মীয় জ্ঞান-বিদ্যার প্রচার-প্রসারে তার উত্তরসূরী ছিলেন তারই দুই দৌহিত্র হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) (১১৯৭-১২৬২ হি.) আর শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র) (১২০০-১২৮২ হি.)– যিনি ছিলেন শাহ মুহাম্মদ আফযাল (র)-এর সুযোগ্য পুত্র। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) হযরত শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র) কে নিজের স্থলাভিষিক্ত করেন। তাকেই দান করে দেন নিজের কিতাবাদি, বাড়িঘর ইত্যাদি। তিনি শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর তার দরসের মসনদে (শিক্ষকতার আসনে) বসেন এবং ১২৩৯ হিজরী থেকে নিয়ে ১২৫৮ হিজরী পর্যন্ত দিল্লীতে আর ১২৫৮ হিজরী থেকে (মক্কায় হিজরতকালে) ১২৬২ হিজরী পর্যন্ত পবিত্র হিজাযে হাদীসের শিক্ষাদান ও খেদমতে নিমগ্ন ও ডুবে থাকেন আপাদমস্তক। ভারতবর্ষের শত শত উলামায়ে কিরাম তার থেকে হাদীসের দরস (শিক্ষা) নেন। বিভিন্ন শহর-নগর থেকে এসে তার কাছে ইস্তিফাদাহ ও উপকার লাভ করেন বড় বড় আলেম-উলামা ও হাদীসের শিক্ষকগণ। গ্রহণ করেন হাদীসের সনদ। যার মধ্যে রয়েছেন শায়খ আবদুল্লাহ সিরাজ মক্কীসহ অন্যান্য অনেক বড় বড় আলেম-উলামা। হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) আল্লাহর শুকরিয়া করতেন যে, তাকে শাহ মুহাম্মদ ইসমাঈল (ভ্রাতুষ্পুত্র) এবং শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (দৌহিত্র) রূপে দুটি বাহুশক্তি ও বার্ধক্যের যষ্ঠি দান করা হয়েছে। প্রায় তিনি এই আয়াতে কারীমা পড়তেন–

الحمد لله الذى وهب لى على الكبر إسمعيل واسحاق.

সোমবার দিন ২৭ রজব ১২৬২ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় তিনি ইন্তিকাল করেন। তাকে দাফন করা হয় জান্নাতুল মুতাল্লায় হযরত খাদীজা (রা)-এর কবরের পাশে।

শাহ মুহাম্মদ ইয়াকুব (র)ও দিল্লীতে এক দীর্ঘ সময় পর্যন্ত অধ্যাপনা ও কল্যাণের ধারা চালু রাখেন। এরপর আপন বড় ভাই শাহ মুহাম্মদ ইসহাক (র)-এর সঙ্গে ১২৫৮ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় হিজরত করেন এবং সেখানেই স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। তাঁর কাছে নবাব সাইয়িদ সিদ্দক হাসান খান কনূজী (গভর্নর, ভূপাল), হযরত মাওলানা সাইয়িদ খাজা আহমদ হাসানী নাসিরাবাদী (র)সহ বিরাট সংখ্যক মানুষ উপকার লাভ করেন। শুক্রবার দিন ২৭ যিলকদ ১২৮২ হিজরীতে পবিত্র মক্কায় তিনি ইন্তিকাল করেন এবং জান্নাতুল মু'আল্লায় সমাহিত হন।

বিশিষ্ট আলেম ও বড় বড় অধ্যাপক

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) এর দরস, তরবিয়ত ও সোহবত থেকে যেসব উলামায়ে কিরাম ফায়দা লাভ করেছেন আর অনন্তর স্বয়ং শিক্ষা মজলিস কায়েম করে গোটা ভারতবর্ষে সুনাম কুড়িয়েছেন, ধর্মীয় শিক্ষা ব্যবস্থায় জীবনের এক নতুন প্রাণ সঞ্চার করেছেন। এরপর খোদ সে শিক্ষাকেন্দ্রের ফয়েয-বরকতে অসংখ্য বিজ্ঞ আলেম-উলামা তরী হয়ে বেরিয়েছেন। তন্মধ্যে এখানে কতিপয় নাম উল্লেখ করা হচ্ছে, যারা ছিলেন নিজের অধ্যাপনা শক্তি ও যোগ্যতা, কুরআন-হাদীস ও যৌক্তিকতার সমন্বয় এবং গভীর জ্ঞান-প্রজ্ঞায় প্রসিদ্ধ ও স্বীকৃত। যারা ছিলেন স্ব স্ব স্থানে স্বয়ং একটি মাদরাসা ও বিদ্যাপীঠ।

১. মাওলানা মুফতী এলাহী বখশ কান্ধলভী (র)।
২. মাওলানা ইমামুদ্দীন দেহলভী (র)।
৩. মাওলানা হায়দার আলী রামপুরী টোঙ্কী (র)।
৪. মাওলানা হায়দার আলী ফয়যাবাদী (র), 'মুনতাহাল কালাম' রচয়িতা।
৫. মাওলানা রশীদুদ্দীন দেহলভী (র)।
৬. মাওলানা মুফতী ছদরুদ্দীন দেহলভী (র)।

এসব বিদ্বান ও শাস্ত্রীয় পণ্ডিত, প্রবীণ অধ্যাপক এবং এছাড়া আরও যেসব আহলে দাওয়াত ও আযীমত, ইছলাহ ও সংস্কার আন্দোলন এবং জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ -এর নেতৃবৃন্দের নাম এসেছে, যারা শাহ সাহেবের সঙ্গে আধ্যাত্মিক ও বাতেনী কল্যাণ লাভের সম্পর্ক রাখতেন, তাদের কারণে বলা যায়, হিজরী তের শতক ছিল হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর শিক্ষা-দীক্ষা, ইরশাদ ও মানুষ গড়ার শতাব্দী। আর এটা মহান আল্লাহর অপার অনুগ্রহ। তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء।

শাহ সাহেবের জীবনালেখ্য, যা ওয়ালীউল্লাহী সিলসিলার বহুমুখী মৌলিক চিন্তাধারা এবং তার সুযোগ্য উত্তরসূরী পুত্র ও শিষ্যদের জ্যোতির্মালায় দুর্লভ মুক্তাতুল্য -এর বিবরণ থেকে অবসর হওয়ার পর আমরা সাহেবের অপর দুই পুত্র হযরত রফীউদ্দীন (র) ও হযরত আবদুল কাদির (র) এবং শাহ সাহেবের তিন প্রধান খলীফা হযরত শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র), খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী (র) ও সাইয়িদ শাহ আবু সাঈদ হাসানী রায়বেরেলী (র)-এর জীবনালেখ্য পেশ করব, যা চয়িত ও উদ্ধৃত করা হচ্ছে 'নুযহাতুল খাওয়াতির' সপ্তম খণ্ড থেকে।

শাহ রফীউদ্দীন দেহলভী (র)

শায়খে ইমাম, প্রবীণ আলেম আল্লামা রফীউদ্দীন আবদুল ওয়াহহাব বিন ওয়ালীউল্লাহ বিন আবদুর রহীম উমারী দেহলভী (র) ছিলেন সমকালের প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস, দার্শনিক, উসূলবিদ, সময়ের নির্ভরযোগ্য, অনন্য বিরল ব্যক্তিত্ব। তার জন্ম ও ক্রমবিকাশ হয় দিল্লীতে। তিনি ইলম হাসিল করেন আপন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র)-এর কাছে। এক সুদীর্ঘ সময় পর্যন্ত তার সঙ্গে কাটান। তরীকতে শাহ মুহাম্মদ আশেক ইবনে উবাইদুল্লাহ ফুলতী (র) থেকে ফায়দা লাভ করেন। বিশ বছর বয়সেই জ্ঞান-প্রজ্ঞা, ফাতওয়া প্রদান ও অধ্যাপনায় স্বকীয়তা ও খ্যাতি লাভ করেন। পূর্বোক্ত আপন ভাইয়ের জীবদ্দশায়ই তিনি লেখালেখি ও গ্রন্থ রচনার কার্যক্রম শুরু করে দিয়েছিলেন এবং আকাবিরে উলামাদের মধ্যে গণ্য হতেন। শাহ সাহেবের দৃষ্টিশক্তি লোপ পেয়ে গেলে তিনিই শিক্ষা ও অধ্যাপনার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ন রাখেন। শিক্ষার্থীদের ভীড় জমে যায় তার দরসে এবং তারা তার জ্ঞানের গভীর বারিধারা থেকে উপকৃত হন যথাযোগ্যভাবে। বিশ্বের বড় বড় উলামায়ে কিরাম তার জ্ঞান-প্রজ্ঞার স্বীকৃতি দিয়েছেন। বিরাট গ্রহণযোগ্যতা, সমাদর ও প্রসিদ্ধি লাভ করে তার রচনাবলি।

তার বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র) শায়খ আহমদ বিন মুহাম্মদ শারওয়ানী (র) কে শাহ রফীউদ্দীন সাহেব (র) সম্পর্কে লিখেছিলেন, 'এখন প্রিয় ভাই ও সময়ের সুজনের যুগ। যিনি সম্পর্কে আমার সহোদর ভাই। শাস্ত্রীয় জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও সাহিত্যে (মানুষ আমার সাথে যেসবের সম্বন্ধ করে) আমার অংশীদার। সে বয়সে আমার থেকে সামান্য ছোট। কিন্তু জ্ঞান-প্রজ্ঞায় আমার সমান। আল্লাহ তা'আলা নিজ মেহেরবাণীতে তার লালন-পালন করেছেন আমার হাতে। আর তার পূর্ণাঙ্গতার মাধ্যম আমাকে বানিয়ে অনুগ্রহ করেছেন আমার ওপর। সে কয়েকদিনের সফর থেকে ফিরে এসে আমাকে

একটি সংক্ষিপ্ত তবে অতি মূল্যবান পুস্তিকা উপহার দিয়েছে। সেটি এমন তত্ত্ব-উপাত্তে ভরা, যাতে সে অদ্বিতীয়। তার পূর্বে সেগুলো কেউ লিখেনি। তার এই স্বকীয়তা আয়াতে নূরের তাফসীর ও তাতে সুপ্ত মর্মগুলোর প্রকাশ্য উন্মোচন। আমি পূর্ণ আস্থার সঙ্গে বলছি, এ অধ্যায়ে তার বিবরণগুলো এমনই বিস্ময়কর, যার মাধ্যমে সে বাণীর মূলবস্তু প্রকাশ করে দিয়েছে। আলোময় করে দিয়েছে সমূহ আত্মার প্রদীপ। নিজের স্বকীয় রচনাশৈলীতে ভাগ্যবানদের করেছে প্রাণবন্ত।'

শায়খ মুহসিন ইবনে ইয়াহইয়া তারহতী 'اليانع الجنى' গ্রন্থে লিখেন, 'সেসব প্রচলিত শাস্ত্র-বিদ্যা ছাড়া শাহ্ সাহেবের প্রাথমিক জ্ঞান-বিদ্যায়ও তার পরিপূর্ণ দক্ষতা ছিল, যা তার মত অনেক কম বিদ্বানের দখলে থাকে। তার রচনাবলি খুবই উন্নত ও মূল্যবান। আমি তার কয়েকটি কিতাব পড়ে দেখেছি। তাতে হযরতের জ্ঞানগত ও শাস্ত্রীয় ভাষায় এমন তথ্য-উপাত্ত দেখতে পেয়েছি, যে রকম সূক্ষ্ম জ্ঞান খুব কমই হয়ে থাকে। অল্প শব্দে তিনি অনেক বিষয় একত্রিত করে দিয়েছেন। যাতে তার জ্ঞানের গভীরতা ও সূক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার ধারণা হয়। তার রচিত 'دمغ الباطل' গ্রন্থটি তাত্ত্বিক কিছু কঠিন বিষয়ের উপর লিখিত। শাস্ত্রীয় পণ্ডিতগণ যার প্রশংসা করেছেন। তার আরও একটি সংক্ষিপ্ত ও স্বয়ংসম্পূর্ণ পুস্তিকা রয়েছে। যাতে তিনি প্রত্যেক বিষয়ে মহব্বতের কার্যকারিতা দেখিয়েছেন ও তার ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এর নাম 'আসরারুল মুহাব্বত'। এমন কম লোকই পাওয়া যাবে, যারা এ বিষয়ের উপর অভিমত প্রকাশ করেছেন। আমার ধারণামতে এ বিষয়ের উপর তার পূর্বে কেবল দু'জন দার্শনিক আবু নছর ফারাবী ও বু আলী ইবনে সীনা কলম ধরেছেন। যেমনটি জানা যায় নাসীরুদ্দীন তূসীর কোনও কোনও গ্রন্থ থেকে।'

শায়খ মুহসিন এর উল্লেখিত কিতাবাদি ছাড়াও তার আরও বিভিন্ন কিতাব রয়েছে। তন্মধ্যে ছন্দ-জ্ঞানের উপর একটি পুস্তিকা, মুকাদ্দামায়ে ইলম, ইতিহাস, চাঁদ দ্বিখণ্ডিত করার প্রমাণ, দার্শনিকদের মূলনীতির উপর দার্শনিক প্রামাণ্যের ভ্রান্ততা, তাহকীকে আলওয়ান (রং নিয়ে গবেষণা), কিয়ামতের আলামত, পর্দা, বুরহানে তামানু (বিপরীতমুখী প্রমাণ), আকদে আনামিল (দশ আঙ্গুলের সাহায্যে বিশেষ গণনা), আরবাইনে কাফফাতের শরাহ, মানতিকসহ সাধারণ নানা বিষয়েও তার পুস্তিকা রয়েছে। রিসালায়ে মীর যাহেদ এর উপর টীকাও লিখেছেন।

তার রচনাবলির মধ্যে 'تكميل الصناعة' এমন একটি বিস্ময়কর কিতাব। অনেক কম লেখকেরই এরূপ গ্রন্থ রচনার সৌভাগ্য হয়েছে।।

এছাড়াও তার একাধিক উঁচু মাপের কিতাব রয়েছে। আপন পিতার কোনও কোনও আরবী কবিতার তাখলীসও লিখেছেন। তার আরবী কবিতার একটি নমুনা নিম্নরূপ।

يا احمد المختار يا زين الورى # يا خاتما للرسل ما اعلاكا

يا كاشف الضراء من مستنجد # يا منجيا فى الحشر من والاكا

هل كان غيرك فى الأنام من استوى # فوق البراث وجاوز الافلا كا... الخ

তার একটি আরও ফসীহ-বলীগ কবিতা রয়েছে। যার দ্বারা যুক্তিবিদ্যায় তার উচ্চতা ও আরবীতে দক্ষতার প্রমাণ পাওয়া যায়। তিনি এতে বূ আলী সীনার কবিতা 'আইনিয়াহ'-এর জবাব লিখেছেন, যাকে 'قصيدة الروح' বলা হয়। যার সূচনা-

هبت إليك من المحل الارفع # ورقاء ذات تعزيز وتمنع.

এই কবিতায় ইবনে সীনার আরবী ভাষার উপর দক্ষতা, একই সঙ্গে মাধুর্য, প্রাঞ্জলতা ও বাগ্মীতার বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। এর জবাব দেওয়া যে কোনও সাধারণ মানুষের কাজ ছিল না। হযরত শাহ রফীউদ্দীন (র) এর জবাব লিখেছেন। যার দ্বারা বাকপটুতা ও আরবী ভাষাজ্ঞান প্রকাশ পায়। তার কবিতার শুরু হচ্ছে,

عجبا لشيخ فيلسوف ألمعى # خفيت لعينية منارة مشرع.

তিনি আপন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র) এর জীবদ্দশায়ই ৬ শাওয়াল ১২৩৩ হিজরী সনে দিল্লীতে ইন্তিকাল করেন। শহরের বাইরে সম্মানিত পিতা ও পিতামহের পাশে তিনি সমাহিত হন।

শাহ আবদুল কাদির দেহলভী (র)

শায়খে ইমাম বিশিষ্ট আলেম, বিখ্যাত আরেফ শাহ আবদুল কাদির ইবনে শাহ ওয়ালীউল্লাহ ইবনে আবদুর রহীম উমারী দেহলভী ছিলেন খোদায়ী জ্ঞানের প্রবীণ উলামায়ে কিরামের একজন। তার বেলায়েত ও মাহাত্মের উপর মানুষের বরাবরই বিস্ময় রয়েছে। কেননা তার শৈশবেই তার সম্মানিত পিতার ইন্তিকাল হয়ে যায়। তিনি আপন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র)-এর কাছে ইলম হাসিল করেন। তরীকতের দীক্ষা লাভ করেন শাহ আবদুল আদল দেহলভী থেকে। লাভ করেন ইলম-আমল, যুহদ-তাকওয়া (দুনিয়াবিমুখতা-আল্লাহভীরুতা) বিনয়-নম্রতা ও সুলূকের সৌন্দর্যে

স্বকীয় মর্যাদা। এসব মর্যাদা ও বৈশিষ্ট্যের কারণে আল্লাহ তা'আলা তার শ্রদ্ধা-মহব্বত সৃষ্টি করে দেন তার বান্দাদের অন্তরে। তিনি নিজ শহরে গণআশ্রয়স্থল হয়ে যান। ইলম-রিওয়ায়েত, দিরায়াত (জ্ঞান-বিদ্যা, প্রামাণ্য দলীল) আত্মশুদ্ধি ও আধ্যাত্মিক প্রশিক্ষণে মানুষ তার শরণাপন্ন হতে শুরু করে দলে দলে।

তিনি ব্যস্ত থাকতেন দরস ও ইফাদা নিয়ে। অবস্থান করতেন দিল্লীর আকবরাবাদী মসজিদে। তার থেকে মাওলানা আবদুল হাই বিন হেবাতুল্লাহ বড়হানবী, মাওলানা মুহাম্মদ ইসমাঈল বিন শাহ আবদুল গণী দেহলভী (র), মাওলানা ফযলে বিন ফযলে ইমাম খায়রাবাদী, মির্যা হাসান আলী শাফিঈ লাখনৌভী (র), শাহ ইসহাক ইবনে শাহ আফযল উমারী দেহলভী (মক্কায় সমাহিত), মাওলানা সাইয়িদ মাহবুব আলী জাফরী, মাওলানা সাইয়িদ ইসহাক ইবনে ইরফান রায়বেরেলী (হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ র.-এর বড় ভাই) সহ আরও অনেক উলামায়ে কিরাম উপকার লাভ করেন।

তার উপর আল্লাহ তা'আলার সবচেয়ে অনুগ্রহ ছিল এই যে, তিনি ভারতীয় ভাষায় কুরআনে কারীমে অনুবাদ ও তাফসীর লেখার তাওফীক পেয়েছেন। উলামায়ে কিরাম একে যথেষ্ট মূল্যায়ন করেন এবং একটি নববী মুজিযা বলে স্বীকৃতি দেন। মুহতারাম আব্বাজান (র) 'মহরে জাহাতাব' গ্রন্থে লিখেছেন, 'শাহ আবদুল কাদির (র) উক্ত তরজমা লিখার পূর্বে স্বপ্নে দেখেন, তার উপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। তিনি এ স্বপ্ন বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র)-এর কাছে খুলে বলেন। তখন তিনি জবাবে বললেন, এটি সত্য স্বপ্ন। কিন্তু যেহেতু রাসূলে কারীম (র)-এর তিরোধানের পর থেকে অহী অবতীর্ণের ধারাবাহিকতা স্থগিত হয়ে গেছে, তাই এখন এ স্বপ্নের ব্যাখ্যা হচ্ছে– আল্লাহ তা'আলা তোমার দ্বারা কুরআনে কারীমের ভূতপূর্ব খেদমত নিবেন।' সুতরাং এই ভবিষ্যদ্বাণী 'موضع القران' রূপে পূর্ণতা পেয়েছে।

তার আরেকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, তিনি সাধারণ ভাষার বিপরীতে এমন কথ্যভাষা অবলম্বন করেছেন, যাতে সাধারণ, অসাধারণ, শর্তমুক্ত ও শর্তযুক্ত এবং ব্যবহারিক স্থানের প্রতি পূর্ণ লক্ষ্য রেখেছেন। এটি আল্লাহর এমন এক অনুগ্রহ, যার জন্য এরূপ কিছু মানুষকেই তিনি মনোনীত করেন।

আমি 'মূযিহুল কুরআন' শ্রবণ ও রিওয়ায়েত করেছি আপন নানী সাহেবা সাইয়িদাহ হুমাইরা বিনতে শাহ আলম আল-হুদা হাসানী নাসিরাবাদী থেকে। তিনি শাহ আবদুল কাদির সাহেব (র)-এর কন্যা থেকে রিওয়ায়েত করেন। তিনি রিওয়ায়েত করতেন তার সম্মানিত পিতা থেকে। তার ইন্তিকাল হয় ১৯

রজব ১২৩০ হিজরীতে আর সমাহিত হন স্বীয় পিতার পাশে। সে সময় বড় ভাই শাহ আবদুল আযীয (র) ও শাহ রফীউদ্দীন (র) জীবিত ছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই এটা তাদের জন্য একটি কষ্টের বিষয় ছিল। তারা ছোটভাইকে দাফন করার সময় বারবার বলছিলেন, 'আমরা একজন মানুষকে নয় বরং ইলম ও ইরফানের আপাদমস্তক দাফন করছি।'

এটিও যুগের একটি বিস্ময় যে, শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর উক্ত চার পুত্র জন্ম নিয়েছিলেন ইরাদত খাতুন বিনতে সাইয়িদ ছানাউল্লাহ (র)-এর উদরে। যাদের মধ্যে সকলের বড় ছিলেন শাহ আবদুল আযীয (র), এরপর শাহ রফীউদ্দীন (র), তারপর শাহ আবদুল কাদির (র) আর সর্বকনিষ্ঠ শাহ আবদুল গণী (র) (যিনি ছিলেন ইসমাঈল শহীদ (র)-এর পিতা। কিন্তু সর্বপ্রথম ছোট ভাই শাহ আবদুল গণী (র) এর ইন্তিকাল হয়ে যায়। এরপর শাহ আবদুল কাদির (র)-এর, তারপর শাহ রফীউদ্দীন (র)-এর, আর সবার পরে ইন্তিকাল হয় শাহ আবদুল আযীয (র)-এর। এই প্রত্যেক ভাই ইলম-আমল, ইফাদা ও ফয়েজ রেসানীতে (উপকার ও কল্যাণ পৌঁছানোতে) সমকালীন উলামা-বুযুর্গানে দীনের মাঝে (শাহ আবদুল গণী (র) ব্যতীত, কেননা তিনি যৌবনের শুরুতেই ওপরে চলে গিয়েছিলেন) স্বকীয় মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। শাহ আবদুল গণী (র)-এর সম্মানিত পুত্র হযরত মাওলানা ইসমাঈল শহীদ (র) কে আল্লাহ তা'আলা এমন তাওফীক দান করেছিলেন, যার বদৌলতে তিনি তার মুহতারাম পিতার পক্ষ থেকে পূর্ণ ক্ষতিপূরণ করে দেন।

শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী (র)

বিজ্ঞ আলেম ও বিশিষ্ট মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা শাহ মুহাম্মদ আশেক ইবনে উবাইদুল্লাহ ইবনে মুহাম্মদ সিদ্দীকী ফুলতী ছিলেন প্রবীণ মাশায়িখদের মধ্যে অন্যতম। তার বংশপরম্পরা একুশ পূর্বপুরুষের মধ্য দিয়ে হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবু বকর সিদ্দীক (রা)-এর সাথে গিয়ে মিলিত হয়। শৈশব থেকেই তিনি ইলম অর্জনে নিয়োজিত হন। গ্রহণ করেন মহান শায়খ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর সাহচর্য (যিনি ছিলেন তার ফুফাতো ভাই)। তার থেকে তিনি ইলম ও মারিফত হাসিল করেন। তার সঙ্গে ১১৪৩ হিজরীতে তিনি হারামাইন শরীফাইনের সফরও করেন। ধন্য হন পবিত্র মক্কা-মদীনা যিয়ারত ও মহান হজ্জ পালন করে। হারামাইন শরীফাইনের বিশিষ্ট উলামায়ে কিরাম থেকে জ্ঞান আহরণ ও উপকারিতা লাভে তার সঙ্গে শরীক থাকেন। যার মধ্যে শায়খ আবু তাহের মুহাম্মদ ইবনে ইবরাহীম কুর্দী মাদানী বিশেষ মর্যাদার অধিকারী। শায়খ মাদানী তাকে ইজাযতও দিয়েছেন।

শায়খ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সঙ্গীসাথীদের মধ্যে তিনি ইলম-জ্ঞান ও মারেফাতের দিক থেকে সকলের শীর্ষে ছিলেন। এভাবে তিনি শাহ সাহেব দেহলভী (র)-এর মুহরিমে আসরার (জ্ঞানের রহস্যভেদ) হয়ে গেলেন। যেমন শায়খ আবু তাহের (র) তার ইজাযত নামায় (অনুমতিপত্রে) তার সম্পর্কে লিখেছেন, 'এ লোক তাঁর (শাহ ওয়ালীউল্লাহ র.-এর) কামালাতের (যোগ্যতা-পূর্ণাঙ্গতার) দর্পণ এবং উন্নত গুণাবলির নমুনা।' তার উস্তাদ শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তাকে সম্বোধন করে বলেছিলেন,

يحدثنى نفسى بأنك واصل # إلى نقطة قصراء وسط المراكز

وأنك فى تيك الابلاد مفخم # بكفيك يوما كل شيخ وناهز.

'আমার মন বলছে, তুমি শিক্ষাকেন্দ্র ও বিদ্যাপীঠগুলোর উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হবে। সেসব শহরে তুমি হবে বিরাট সম্মানের পাত্র। তোমার অনুগত হবে ছোট বড় সকলেই।'

অন্যত্র বলেন,

وإن يك حقاما علمت فانه # سيلقى إليك الأمر لا بد سابغا

سياتيك أمر لا يطاق بهاءه # إلى كل سر لا محال بالغا

وثلج ويرد يجمعان شتاتكم # بريحان هما فى فوادك لاذعا.

'যদি আমার বিশ্বাস সত্য হয়, তবে সম্পর্কে গোপন শক্তি তোমার হস্তগত হবে। তোমর এমন জ্যোতির্ময় আলো হাসিল হবে, যা তোমার অন্তর্চক্ষু খুলে দিবে এবং সকল রহস্যভেদ উন্মোচন করে দিবে। আর পরিপূর্ণ জ্ঞানের দ্বারা এমন আত্মতৃপ্তি লাভ হবে, যা তোমার কষ্ট-ক্লেশ বিদূরিত করে দিবে।

শরহে দু'আয়ে ই'তিছাম -এর অভিমতে শাহ সাহেব (র) লিখেন,

ليهنك ما أوفيت ذروة حقه # من الفحص والتفتيش والفهم والفكر

وبحثك عن طى العلوم ونشرها # ونظمك اصناف الجواهر والدر

وحفظك للرمز الخفى مكانه # وخوضك بحراز خرا ايما يجر

فلله ما اوتيت من حلل المتى # ولله ما أعطيت من عظم الفخر

'জ্ঞান-প্রজ্ঞা ও চিন্তা-গবেষণার উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হওয়া বরকতময় হোক। জ্ঞান-বিদ্যার গভীরতা, প্রসার ও জ্ঞানের মনিমুক্তারা শৃঙ্খলা-বিন্যাসও পুণ্যময় হোক। সেই সাথে আছে গোপন তত্ত্বভেদ সংরক্ষণ এবং ইলম-

আমলের অথৈ সমুদ্রে সন্তরণ ও ডুব দান। তোমার এই সাফল্য লাভ হয়েছে আল্লাহ্ তা'আলার পক্ষ থেকেই। আর গৌরবময় পুঁজিও আল্লাহরই দান।'

তার থেকে শাহ আবদুল আযীয (র) ও তার ভাই শাহ রফীউদ্দীন (র), সাইয়িদ আবু সাঈদ রায়বেরেলী (র) সহ এক মানবগোষ্ঠী উপকার লাভ করেছে। তার রচনাবলির মধ্যে ১. 'সাবীলুর রাশাদ' ফার্সীতে তাসাওউফের উপর বিস্তৃত একটি গ্রন্থ। ২. আরেকটি কিতাব ' القول الجلى فى مناقب الولى'-এটি তার শায়খ হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর জীবনকর্ম সম্পর্কিত। ৩. 'দু'আয়ে ই'তিছাম' এটি শাহ সাহেবের হাকায়েক ও মা'আরেফ সম্পর্কিত কিতাবাদির শরাহ। ৪. তার সবচেয়ে বৃহৎ রচনা 'তাবঈযুল মুছফফা শরহুল মুয়াত্তা', যা শাহ সাহেব (র)-এর রচিত 'মুছফফা' কিতাবের সাথে সম্পর্কিত। তিনি ১১৮৭ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। যেমনটি জানা যায়, সাইয়িদ আবু সাঈদ রায়বেরেলী (র)-এর নামে হযরত শাহ আবদুল আযীয (র)-এর লিখিত 'গারামীনামাহ' থেকে।

খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী ওয়ালীউল্লাহী

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর যে চার খলীফা ও একান্ত সাহচর্যধন্য শাগরেদদের মাধ্যমে তার শিক্ষা-দীক্ষা ও লক্ষ্য উদ্দেশ্যের সিলসিলার প্রচার-প্রসার হয়েছে, তাদের মধ্যে বিশিষ্ট এক শাগরেদ ছিলেন খলীফা খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী (র)। মাওলানা হাকীম সাইয়িদ আবদুল হাই (র) 'নুযহাতুল খাওয়াতির' গ্রন্থে তার জীবনালোচনা করতঃ লিখেন, 'তিনি মূলতঃ কাশ্মীরের লোক ছিলেন। বসবাস করতেন দিল্লীতে। তিনি শাহ সাহেবের বিশিষ্ট প্রবীণ শাগরেদদের অন্যতম। নিজেকে আপন শায়খের প্রতি সম্বন্ধিত করতেন। আর 'ওয়ালীউল্লাহী' লিখতেন এবং বলতেন। তার স্বকীয়তা ও সম্মানের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, শাহ আবদুল আযীয (র) মুহতারাম পিতা শাহ সাহেবের ইন্তিকালের পর তার থেকে বিভিন্ন শাস্ত্র-জ্ঞানের পূর্ণতা লাভ করেন। যেমনটি স্বয়ং আবদুল আযীয (র) তার 'উজালায়ে নাফি'আহ' পুস্তিকায় পরিষ্কারভাবে ব্যক্ত করেছেন। তার মর্যাদা ও স্বকীয়তার দ্বিতীয় প্রমাণ হচ্ছে, হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র) তার জন্য বিশেষভাবে বিভিন্ন পুস্তিকা রচনা করেছেন।

হযরত শাহ আবদুল আযীয (র) কর্তৃক হযরত শাহ আবু সাঈদ রায়বেরেলী (র) এর নামে লিখিত ও প্রেরিত 'গারামীনামাহ' থেকে জানা যায়, তার ইন্তিকাল ১১৮৭ হিজরী অথবা এর কাছাকাছি কোন সময় হয়েছে। কেননা হযরত সাইয়িদ শাহ আবু সাঈদ (র) রবীউল আউয়াল ১১৮৭ হিজরীতে হজ্জের

উদ্দেশ্যে গমন করেছিলেন। আর প্রত্যাবর্তন করেছিলেন ১১৮৮ হিজরীতে। শাহ সাহেবের এই চিঠি হজ্জ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর হস্তগত হয়।

খাজা মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী (র) স্বকীয় মর্যাদা এ থেকেও বুঝা যায় যে, 'কালিমাতে তাইয়িবাত' গ্রন্থে তার নামে শাহ সাহেবের লিখিত গুরুত্বপূর্ণ চারটি পত্র রয়েছে। যেগুলো হাকায়েক ও মা'আরেফের সূক্ষ্মতা সম্পর্কিত।

উক্ত চার মহান খলীফা (১. শাহ মুহাম্মদ আশেক ফুলতী, ২. শাহ মুহাম্মদ আমীন কাশ্মীরী, ৩. শাহ নূরুল্লাহ বড়হানবী ও ৪. শাহ আবু সাঈদ বেরলভী) ছাড়াও শাহ সাহেবের অন্যান্য আরও খলীফা ছিলেন, যাদের জীবনকর্ম বিস্তারিতভাবে পাওয়া যায় না। তন্মধ্যে অনন্য একজন ছিলেন হাফেয আবদুন নবী ওরফে আবদুর রহমান, যার সঙ্গে শাহ সাহেবের একান্ত সম্পর্ক ছিল বলে জানা যায়।

শাহ আবু সাঈদ হাসানী রায়বেরলভী

সাইয়িদ আবু সাঈদ বিন মুহাম্মদ জিয়া বিন আয়াতুল্লাহ বিন শায়খে আযল আলামুল্লাহ নকশেবন্দি বেরলভী (র) ছিলেন অনন্য এক আল্লাহওয়ালা আলেম। রায়বেরেলীতে তার জন্ম ও ক্রমবিকাশ হয়। শিক্ষা লাভ করেন মোল্লা আবদুল্লাহ আমিঠাবী (র)-এর কাছে। এরপর আপন চাচা সাইয়িদ মুহাম্মদ সাবের বিন আয়াতুল্লাহ নকশেবন্দী (র)-এর কাছে বাই'আত হন এবং আধ্যাত্মিকতা শিক্ষা-দীক্ষায় এক সুদীর্ঘ সময় আত্মনিয়োজিত থাকেন। এরপর দিল্লী এসে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র)-এর কাছে থেকে উপকার লাভ করেন। আর তার মৃত্যুর পর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করে শাহ সাহেবের বিশিষ্ট শাগরেদ শায়খ মুহাম্মদ আশেক উবাইদুল্লাহ ফুলতি থেকেও ইস্তেফাদা লাভ করেন। শাহ মুহাম্মদ আশেক (র) তার অনুমতিপত্রে লিখেন, 'সাইয়িদে তাকী ও নকী (খোদাভীরু পুণ্যাত্মাদের সরদার), আরেফ বিল্লাহ, প্রশংসাযোগ্য ওয়ালী মীর আবু সাঈদ আমাদের শায়খ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর সঙ্গে থেকেছেন। তার কাছ থেকে তরীকতের কতিপয় নিয়মনীতি জেনে নিয়ে সেগুলোর উপর অটল থেকেছেন। এমনকি তার উপর শায়খের তাওয়াজ্জুহ (অন্তর্দৃষ্টি)-এর বরকতে প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য তথ্য-উপাত্ত ও রহস্যভেদের পথ খুলে যায়। তার ব্যক্তিত্বে আধ্যাত্মিকতার অবস্থা ও প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় এবং তার সেই শুহূদ হাসিল হয়, যা আধ্যাত্মিকতার মৌলিক উদ্দেশ্য।'

অন্যস্থানে লিখেন, 'এরপর যখন হযরত শায়খ (র) দারে রিযওয়ানে ইন্তিকাল করেন, তখন তার খেয়াল হল, নকশেবন্দিয়াহ, কাদেরিয়াহ, চিশতিয়াহ প্রভৃতি সিলসিলার অবশিষ্ট নিয়মনীতি অধম থেকে হাসিল করবেন

এবং আধ্যাত্মিকতার প্রতিক্রিয়াশীল তরীকায় দাখিল হবেন। আমি তার পিপাসা দেখে হাদীসে 'ইলজাম'-এর ভয়ে উদ্দেশ্য হাসিলে তাকে সাহায্য করি এবং সেসব নিয়ম-নীতির উৎসাহ ও প্রশিক্ষণ দেই। আর যখন তার মধ্যে সেসবের আলামত, প্রতিক্রিয়া ও অবারিত আলো প্রত্যক্ষ করি এবং তার পরিপক্কতার পরিমাপ করে ফেলি, তখন ইস্তিখারার পর তাকে জ্ঞানপিপাসু ও সালেকীনের পথপ্রদর্শনের ইজাযত দেই। তিনি সকল তরীকায় বায়'আত গ্রহণ করেন। তাকে স্থলাভিষিক্ততা ও ইজাযরতরূপে 'গৌরবময় বুযুর্গীর বিশেষ পোশাক' পরিধান করিয়েছি। যেভাবে আমাদের শায়খ আমাদেরকে পরিধান করিয়েছিলেন এবং তার ইজাযত দিয়েছিলেন; যেভাবে শায়খ উবাইদুল্লাহ আমাদেরকে আপন পূর্বপুরুষ ও মাশায়িখে কিরামের মাধ্যমে হাসিলযোগ্য পোশাক ও ইজাযতে ভূষিত করেছিলেন। সেই সাথে আমি তাকে তাফসীর, হাদীস, ফিকহ ও তাসাওউফের শিক্ষাদান (মুতালা'আ ও শরাহসমূহের আশ্রয় নেওয়ার শর্তে) এবং নাহব-ছরফ শাস্ত্রের অধ্যাপনার অনুমতি দিয়েছি। জায়েয প্রয়োজনাদির সময় তাবীয এবং মাশায়িখের আমল গ্রহণের অনুমতিও দিয়েছি। 'القول الجميل فى بيان سواء السبيل' এবং 'الإنتباه فى سلاسل اولياء الله'-এর মধ্যে উল্লেখিত সকল আমল ও নিয়মনীতি গ্রহণের ইজাযত দিয়েছি।'

সাইয়িদ শাহ আবু সাঈদ (র) ছিলেন একজন সম্ভ্রান্ত পুণ্যবান, অতি দয়াবান, অতিথিপরায়ণ, গরীবের বন্ধু ও আল্লাহভীরু ব্যক্তি। আপনজনদের সঙ্গে তিনি হিজায সফর করেন। মক্কা শরীফে গিয়ে পৌঁছেন ২৮ রবিউল আউয়াল ১১৮৭ হিজরী সনে। পবিত্র হজ্জ পালন শেষে মদীনা মুনাওয়ারায় হাযির হন এবং সেখানে ছয় মাস অবস্থান করেন। শায়খ আবুল হাসান সিন্ধী-এর কাছে 'মাছাবীহ' শ্রবণ করেন। সহসা দেখলেন, রাসূলুল্লাহ (স) বরকতময় হুজরা থেকে বাইরে তাশরীফ রাখছেন। প্রথমে নবীজীর পবিত্র স্কন্ধের ঝলক প্রকাশিত হয়। এরপর পবিত্র দেহ প্রকাশ পায় এবং সম্মুখে তাশরীফ নিয়ে তিনি মুচকি হাসেন। তার (শায়খ আবু সাঈদ র. এর) মুরীদ ও মাজায (যোগ্য উত্তরসূরী) শায়খ আমীন ইবনে হুমাইদ উলওয়া কাকুরবী স্বরচিত পুস্তিকায় লিখেন, 'শায়খ আবু সাঈদ (র) বলতেন, আমি রাসূলুল্লাহ (র) কে পবিত্র মদীনায় স্বপ্নে আপাদমস্তক দেখেছি।'

তারপর মক্কায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং শায়খ মুহাম্মদ মীর দাদ আনসারীর কাছে 'জাযরিয়্যাহ' পড়েন। এরপর তায়েফ হয়ে ভারত আসেন এবং মাদ্রাজে প্রবেশ করেন। সেখানে বেশ কিছুদিন অবস্থান করেন এবং

গ্রহণযোগ্যতা ও আস্থা অর্জন করেন। আর তার থেকে অনেক মানুষ উপকৃত হন। তন্মধ্যে আলহাজ্জ আমীনুদ্দীন ইবনে হুমাইদুদ্দীন কাকূরবী, মাওলানা আবদুল কাদির খান খালেছপুরী, মীর আবদুস সালাম বদোখশী, শায়খ মীর দাদ আনসারী মক্কী, মাওলানা জামালুদ্দীন বিন মুহাম্মদ সিদ্দীক কুতুব, মাওলানা আবদুল্লাহ আকনুদী ও শায়খ আবদুল লতীফ হুসাইনী মিসরীসহ আরও অনেক লোক ছিলেন। তিনি ৯ রমাযান ১১৯৩ হিজরীতে রায়বেরেলীতে ইন্তিকাল করেন এবং সেখানেই সমাহিত হন।

বিখ্যাত এক সমসাময়িক ও সংস্কারক শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (র)

হযরত শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর বিখ্যাত এক সমসাময়িক ও মহান সংস্কারক নজদের এক বিশিষ্ট আলেম এবং দৃঢ়চিত্ত দাঈ ও শুদ্ধিকারক হলেন শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব বিন সুলাইমান তামীমী হাম্বলী (১১১৫-১২০৬ হিজরী মোতাবেক ১৭০৩-১৭৯২ খৃ.)। তিনি জন্মতারিখ হিসেবে শাহ সাহেবের কাছাকাছি বয়সের (এক বছরের বড়) আর মৃত্যুতারিখ হিসেবে তার চেয়ে ত্রিশ বছর পরের। সমসাময়িক হওয়া এবং একাধিক বিষয়ে উভয়ে পরিস্কার মিল থাকা সত্ত্বেও তাদের কখনও সাক্ষাত তো দূরের কথা খোদ একজন সম্পর্কে অন্যজনের জানাশোনারও অদ্যাবধি কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। হযরত শাহ সাহেব (র) ১১৪৩ হিজরীতে হজ্জের জন্য গমন করেন এবং এক বছরের কিছু অধিক সময় হিজাযে অবস্থান করেন। এটা সে সময়ের কথা, যখন শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (র)-এর দাওয়াত ও সংস্কার আন্দোলন নজদের সীমিত কিছু অঞ্চল উইয়াইনা, দুরাইয়াহ প্রভৃতি এলাকায় সীমাবদ্ধ ছিল। আমীর মুহাম্মদ ইবনে সাউদ তখন পর্যন্ত শায়খের হাতে বায়'আত হননি। আর না তাদের দুজনের মধ্যে (দাওয়াতের প্রচার-প্রসার এবং তার ভিত্তিতে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা ও এর সমর্থন দানের) কোনও চুক্তি ও সমঝোতা হয়েছিল। পরবর্তীতে এই সন্ধিচুক্তি হয় ১১৫৮ হিজরীতে। যার ফলে দুরাইয়াহ দাওয়াতের কেন্দ্রস্থল ও একটি ধর্মীয় রাজধানী হয়ে যায়। হিজাযে শায়খের দাওয়াতের পরিচিতি, প্রভাব ও কার্যকারিতা সৃষ্টি হয় সে সময়, যখন ১২১৮ হিজরীতে (শায়খের ইন্তিকালের ১২ বছর আর শাহ সাহেবের ইন্তিকালের বিয়াল্লিশ বছর পরে) মক্কা শরীফের উপর সউদ পরিবারের দখল প্রতিষ্ঠা হয়।

শায়খ মুহাম্মদ বিন আবদুল ওয়াহহাব (র)-এর দাওয়াত ও চেষ্টা-সংগ্রামের মূল পরিধি ছিল খালেছ তাওহীদের দাওয়াত ও তাবলীগ, শিরক

প্রতিরোধ, জাহেলিয়াতের রীতিনীতির মূলোৎপাটন (যার কিছু দৃশ্য ও নিদর্শন সময়ের দূরত্ব, মূর্খতা ও উলামায়ে কিরামের উদাসীনতার কারণে আরব উপদ্বীপের পশ্চিমাঞ্চলের কোনও কোনও এলাকা ও গোত্রে ছড়িয়ে পড়েছিল), তাওহীদে উলূহিয়্যাহ ও তাওহীদের রুবূবিয়্যাতের (তথা খোদায়িত্বের ও প্রভুত্বের একত্ববাদের) পার্থক্য, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার বান্দাদের প্রতি যে একত্ববাদের দাবী এবং কুরআনে কারীমে যার সুস্পষ্ট আহবান রয়েছে, তার বিশ্লেষণ ও অনুসন্ধান। এক্ষেত্রে শায়খ যে সফলতা লাভ করেন, অতীত যুগের সংস্কারকদের মধ্যে এর নযীর পাওয়া কঠিন। অবশ্য ড. আহমদ আমীনের ভাষ্যমতে এর ভিত্তিতে একটি শাসনব্যবস্থা (সউদিয়াহ শাসন) প্রতিষ্ঠিত হওয়া এবং তার উক্ত দাওয়াত গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা দানের পেছনে বিরাট দখল রয়েছে। কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে শায়খ এক্ষেত্রে একটি বৈপ্লবিক সংস্কারের কৃতিত্ব স্থাপন করেছেন। আর যদি তার চিন্তাধারা, দাওয়াত প্রদানের অবস্থা-প্রকৃতি ও কর্মপদ্ধতির সঙ্গে কোনও বিজ্ঞজনের শতভাগ ঐকমত্য না-ও হয়, তথাপি এই দাওয়াতের উপকারিতা, প্রভাব-প্রতিক্রিয়া, ফলপ্রসূতা এবং বিশেষ অবস্থা-প্রেক্ষিতে এর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করা যায় না।

একত্ববাদের আকীদা-বিশ্বাসের সুস্পষ্টতা ও ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ, কুরআনের আলোকে এর সত্যতা প্রমাণ এবং তাওহীদে উলূহিয়্যাত ও তাওহীদে রুবূবিয়্যাতের মধ্যে পার্থক্যের পরিধি যতদূর, তাতে শাহ সাহেব (র) এবং শায়খ মুহাম্মদ আবদুল ওয়াহহাব (র)-এর চিন্তাধারা ও জ্ঞান-গবেষণায় বিরাট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, যা কুরআনে কারীমের গভীর ও যথার্থ মুতালা'আ, চেষ্টা-সাধনা এবং কুরআন-সুন্নাহ সম্পর্কে অগাধ ব্যুৎপত্তির ফসল, যা তৎকালীন সময়ে শায়খুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়াহ (র) এবং নিজ নিজ যুগে অন্যান্য গবেষক ও সংস্কারকদেরকে তদ্রুপ সাফল্য পৌঁছিয়েছে এবং তাদেরকে প্রকাশ্য ও দু'গণ্ড দাওয়াতে তাওহীদের প্রচার-প্রসারে উদ্বুদ্ধ করেছে।

কিন্তু শাহ সাহেবের কর্মপরিধি এবং তার ইসলাহ ও সংস্কারকর্মের সীমানা এর চেয়ে আরও অনেক বেশি বিস্তৃত। তাতে ইসলামী জ্ঞান-প্রজ্ঞার পুনর্জীবন দান, ইসলামী চিন্তাধারার সংস্কার, শরীয়তের উদ্দেশ্য ও রহস্যভেদের পর্দা উন্মোচন, শরীয়ত ও ইসলামী শিক্ষাকে সুবিন্যস্ত ও পূর্ণাঙ্গ উপস্থাপনের বৈজ্ঞানিক কর্মকাণ্ড, শিক্ষাগত স্থিরতা ও ফিকহী মাযহাবগুলোর কট্টরতা সংশোধন, যৌক্তিক ও নকলী দলীলের মাঝে সামঞ্জস্য বিধান, ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে আল্লাহর করুণা মুজতাহিদসুলভ কাজ, ভারতবর্ষে

ইসলামী শক্তি ও নেতৃত্ব রক্ষার প্রচেষ্টা, হাদীসের সূক্ষ্ম মুতালা'আ ও এর প্রচার-প্রসারের সংস্কারকসুলভ চেষ্টা, আত্মশুদ্ধি, ইহসান-অনুগ্রহের মর্যাদা হাসিলের দাওয়াত ও এর শিক্ষা দান এবং মহাপুরুষদের তরবিয়ত ও পৃষ্ঠপোষকতা দানও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। সেই সাথে শাহ সাহেবের ওখানে (আল্লামা ইকবালের ভাষা) 'হিজাযী রেগযার' তথা খাঁটি তাওহীদের পুণ্যভূমিতে যমযমের মধুর প্রস্রবণও (ইশক-প্রেম ও হৃদ্যতার মধুর ধারা বা পাহাড় খোদাই করে তৈরী ঐতিহাসিক এক নদী) ছিল, যা শাহ সাহেবের খাছ পরিবেশ, তরবিয়ত এবং তাসাওউফ ও সুলূকের সুফল। যার নমুনা তার স্তুতিমূলক গজল ও আবেগময় ছন্দ-কবিতায় পরিলক্ষিত হয়। এদিক থেকে তার এবং শায়খ মুহাম্মদ ইবনে আবদুল ওয়াহহাব (র) (যার সংগ্রাম সর্বাবস্থায় গৌরবময়)-এর তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং তাদের মধ্যে সাদৃশ্য ও সমন্বয় সৃষ্টির তত্ত্বানুসন্ধান অপেক্ষা শাহ সাহেব এবং শায়খুল ইসলাম হাফেয ইবনে তাইমিয়া (র)-এর তুলনামূলক আলোচনা এবং তাদের ঐকমত্য ও মতবিরোধের তত্ত্বানুসন্ধান করা অধিক উপযোগী। কারণ, দুজনই জ্ঞানের গভীরতা, কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞান-গবেষণায় ইমাম ও ইজতিহাদের মর্যাদায় পৌঁছে যাওয়া দৃষ্টিভঙ্গির গভীরতা ও প্রশস্ততা, ইসলাম ও সংস্কারকর্মে বৈচিত্র, ব্যক্তিত্বের শ্রেষ্ঠত্ব ও বুদ্ধি-মেধায় অধিক সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। (আর এ কিতাবের স্থানে স্থানে এদিকে ইংগিত করে এসেছি) সেই ভিন্নতা সত্ত্বেও যা তালীম-তরবিয়ত ও শিক্ষা-দীক্ষার পরিবেশ, স্থান ও কালের পার্থক্য এবং সুলূক ও বাতেনী তরবিয়ত (আধ্যাত্মিক দীক্ষা) -এর সফল পরিণতি।

দ্বাদশ অধ্যায়

শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ (র)-এর রচনাবলী

গ্রন্থ ও পুস্তকসমূহ

এখানে শাহ সাহেবের ছোট-বড়, আরবী-ফার্সী রচনাবলির আরবী বর্ণমালা হিসেবে তালিকা দেওয়া হয়েছে। গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির সংক্ষিপ্ত পরিচিতিও পেশ করা হচ্ছে। হস্তলিখিত, মুদ্রিত এবং ভাষাও চিহ্নিতকরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

(الف)

১. الأربعين : এটি চল্লিশ হাদীসের আরবী সংকলন এবং সেসব সংক্ষিপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ হাদীস সম্পর্কিত, যেগুলোকে جوامع الكلم (বাগ্মীতা) বলা হয়। মাত্বায়ে আনোয়ার মুহাম্মদী লাখনৌ থেকে ১৩১৯ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে। ১২৫৪ হিজরীতে এর উর্দু অনুবাদ হযরত সাইয়িদ আহমদ শহীদ (র)-এর খলীফা সাইয়িদ আবদুল্লাহ (র) মাতবায়ে আহমদী কলকাতা থেকে প্রকাশ করেন। এরপর এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। মাওলানা আবদুল মাজেদ দরিয়াবাদী ১৩৮৩ হি./১৯৬৭ খৃস্টাব্দে এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা করেছেন, যা ভারত ও পাকিস্তানে 'চেহেল হাদীস ওয়ালীউল্লাহী' ও 'আরবাইনে ওয়ালীউল্লাহী' নামে প্রকাশিত হয়েছে।

২. الإرشاد إلى مهمات علم الإسناد : এটি আরবী এবং মুদ্রিত পুস্তিকা। এতে শাহ সাহেব আপন উস্তাদ এবং হিজাযের শায়খগণের বিবরণ পেশ করেছেন।

৩. إزالة الخفاء عن خلافة الخلفاء : এটি ফার্সীতে রচিত। বিষয়বস্তু, কলেবর, প্রকাশন এবং গুরুত্বপূর্ণ আলোচনাগুলোর সারসংক্ষেপ ইতোপূর্বে কিতাবটির পরিচিতিতে বলে এসেছি।

৪. أطيب النغم فى مدح سيد العرب والعجم : এটি আরবী কিতাব। শাহ সাহেবের স্তুতিমূলক কাব্যসমগ্র। যার দ্বারা শাহ সাহেবের বাক্‌পটুতা ও ইশকে নববী (স)-এর ধারণা পাওয়া যায়। মাতবায়ে মুজতবাঈ দিল্লী থেকে ১৩০৮ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৫. الإمداد فى مآثر الاجداد : এটি সংক্ষিপ্ত একটি ফার্সী পুস্তিকা। এতে শাহ সাহেব (র) তার এতে নিজের বংশ তালিকাও লিখেছেন। 'আনফাসুল আরেফীন' এর সাথে এটিও সংযুক্ত। তাছাড়া মাতবায়ে আহমদী দিল্লী কর্তৃক প্রকাশিত 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভী (র) পাঁচটি পুস্তিকা সমগ্র' এর মধ্যেও সন্নিবেশিত আছে।

৬. الطاف القدس : এটি ফার্সীতে রচিত লাতায়েফে বাতেনীর ব্যাখ্যা এবং তাসাওউফের মৌলিক মাসায়েলের বিশ্লেষণ সম্পর্কে রচিত। সাইয়িদ যহীরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে মাতবায়ে আহমদী থেকে প্রকাশিত।

৭. الإنتباه فى سلاسل اولياء الله : এটি ফার্সীতে রচিত তাসাওউফের বিভিন্ন সিলসিলার ইতিহাস ও তাদের শিক্ষা-দীক্ষার সংক্ষিপ্ত বিবরণ। ১৩১১ হিজরীতে সাইয়িদ যহীরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে উর্দু তরজমাসহ মাতবায়ে আহমদী থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

৮. إنسان العين فى مشائخ الحرمين : এটি একটি ফার্সী পুস্তিকা শাহ সাহেবের জীবনালেখ্যের বর্ণনায় এর পরিচিতি উল্লেখ করা হয়েছে। 'আনফাসুল আরেফীন'-এর একটি অংশ এটি। মাতবায়ে আহমদী থেকে প্রকাশিত 'মাজমূআয়ে খামসাহ রাসায়েলে শাহ ওয়ালীউল্লাহ (র)'-এর সাথে সন্নিবেশিত।

৯. الإنصاف فى بيان اسباب الإختلاف : এটি একটি আরবী পুস্তিকা। এর পরিচিতি সম্পর্কিত বিবরণে বইটির গুরুত্ব, প্রকাশন ও বিভিন্ন সংস্করণের বিস্তারিত বর্ণনা পূর্বে দেওয়া হয়েছে।

১০. إنفاس العارفين : এটি ফার্সীতে রচিত। এর পরিচিতি পিছনে শাহ সাহেবের জীবনালেখ্যে বর্ণিত হয়েছে। ১৩৩৫ হি. ১৯১৭ খৃস্টাব্দে মাতবায়ে মুজতবাঈ দিল্লী থেকে প্রকাশিত। এ গ্রন্থখানা মূলতঃ নিম্নোক্ত সাতটি পুস্তি কার যৌথ নাম। যথা–

(١) بوارق الولاية (٢) شوارق المعرفة (٣) الإمداد فى مآثر الأجداد (٤) النبذة الابريزية فى اللطيف العزيزية (٥) العطية الصمدية فى نفاس المحمدية (٦) انفاس العين فى مشائخ الحرمين (٧) الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف.

এর মধ্যে প্রায় পুস্তিকাই পৃথকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

(ب)

১১. البدور البازغة : এটি ধর্মীয় দর্শন সম্পর্কিত আরবী কিতাব। কিন্তু এতে দর্শনের স্বভাবগত পরিভাষাসমূহ, মানবিক গঠনপ্রণালী, শ্রেণী-গোষ্ঠী

এবং ব্যক্তির স্বভাব-চরিত্রের দার্শনিক ও প্রাচ্যবিদের রঙে বিবরণ দেওয়া হয়েছে। প্রাকৃতিক বিদ্যা ও চারিত্রিক জ্ঞানের আলোচনাও সংমিশ্রিত আছে। ইরতিফাকাতের (আশ্রয় অবলম্বনের) আলোচনা বিস্তারিতভাবে করা হয়েছে। মানব গোষ্ঠীর সঠিক শৃঙ্খলা, খেলাফত ও নেতৃত্বের আহকাম, শিষ্টাচারও বর্ণনা করা হয়েছে। এরপর আল্লাহর মারেফাত, নামসমূহ ও গুণাবলির পর্দা উন্মোচন করা হয়েছে। ইহসানের স্তরসমূহ ও এর পর্দা আচ্ছাদনগুলোও উল্লেখ করা হয়েছে। শিরকের ব্যাধি, তার প্রকার ও শ্রেণীগুলোরও উল্লেখ আছে। ফিতান (বিপর্যয়-বিপদ) ও কিয়ামতের প্রমাণও রয়েছে। আলমে বরযখ (কবর জগৎ) ও হাশর (পুনরুত্থান) এর ঘাটিসমূহ, ফাযায়েলে আ'মাল (বা বিভিন্ন আমলের উপকারিতা, মর্যাদা) ও শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা, নবুওয়াতের প্রমাণ, নবী-রাসূলগণের প্রকার এবং অহীর ধরন-প্রকৃতির বিশদ বিবরণ রয়েছে। জাতির মূলতত্ত্ব, তার আত্মপ্রকাশের শ্রেণীভাগ, প্রথম জাহেলিয়াতের আলোচনা এবং পূর্বেকার উম্মত ও জাতিসমূহের পরিচিতিও দেওয়া হয়েছে। এরপর এই উম্মতের শরীয়ত, তার দীনের মৌলিক বিষয়সমূহ, শরীয়তের জ্ঞান ও শরীয়তের লক্ষ্য-উদ্দেশ্যসমূহের বর্ণনা বিস্তারিতভাবে রয়েছে। আরকানে আরবাআ বা রুকন চতুষ্টয়ের রহস্য ও হুকুম সম্পর্কে বিশেষভাবে আলোচনা করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' এর তুলনায় বিষয়বস্তুর আধিক্য ও এর শ্রেণীভাগ বেশি রয়েছে। এতে এমন কিছু 'খোদায়িত্বের বিতর্ক' ও দার্শনিক বিষয়ও এসে গেছে, যেগুলো সংখ্যাগরিষ্ঠ মুতাকাল্লিমীন ও উম্মতের দার্শনিকগণ বর্ণনা করেননি। কিন্তু 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' বিষয়বস্তুর অতলতা, জ্ঞান ও দৃষ্টির পরিপক্কতা, চিন্তাধারা ও দার্শনিক উচ্চতা, বিজ্ঞান ও মূলতত্ত্বসমূহকে শরীয়ত ও সুন্নাহর ভাষায় এবং আরও বেশি শক্তিশালী আরবী বাগধারায় বর্ণনা করার ক্ষেত্রে অগ্রগণ্য। সাহিত্য পরিষদ ডাভীল (মজলিসে ইলমী, ডাভীল) ১৩৫৪ হিজরীতে মদীনা প্রেস বাজনূর থেকে এটি প্রকাশ করেছে।

১২. بوارق الولاية : এ পুস্তিকাটি ফার্সী এবং 'আনফাসুল আরেফীন' এর অংশবিশেষ। এতে আপন পিতা শাহ আবদুর রহীম (র)-এর অভিমত, অবস্থা ও ঘটনাবলি, কার্যক্রম ও জীবনকর্ম আলোচনা করেছেন।

(ت)

১৩. تاويل الأحاديث : এটি আরবী রচনা। এতে কুরআনে কারীমে বর্ণিত আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ)-এর সেসব ঘটনাবলি, সূক্ষ্মতা ও তত্ত্বাবলি এবং

সেসব থেকে উৎসারিত অনেক শরয়ী মূলনীতির বর্ণনা রয়েছে। সংক্ষিপ্ততা সত্ত্বেও কিতাবটিতে বেশি কিছু মূল্যবান ইংগিত এবং কুরআনে কারীমের অতল জ্ঞানের নমুনাও রয়েছে। শাহ ওয়ালীউল্লাহ একাডেমী হায়দারাবাদ (পাকিস্তান)-এর পক্ষ থেকে কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে।

১৪. تحفة الموحدين : এটি তাওহীদের আকীদা-বিশ্বাসের ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে শাহ সাহেবের ফার্সী ভাষায় সংক্ষিপ্ত একটি পুস্তিকা। যার মূলপাঠ 'আফযালুল মাতাবে', দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছিল। মাওলানা হাফেয মুহাম্মদ রহীমবখশ দেহলভী 'হায়াতে ওয়ালী' রচয়িতা এর উর্দু তরজমা করেছেন। ১৩৮১ হিজরী/১৯৬২ খৃস্টাব্দে এই উর্দু তরজমা প্রকাশিত হয়েছে 'মাকতাবায়ে সালফিয়া শীশমহল রোড, লাহোর -এর পক্ষ থেকে। শাহ সাহেবের রচনাবলির মধ্যে সাধারণতঃ এই পুস্তিকার আলোচনা হয় না। পুস্তিকাটির মৌলিক বিষয়বস্তু যদিও শাহ সাহেবের অন্যান্য রচনাবলির মতই, কিন্তু কোনও কোনও বিষয়বস্তুর কারণে এটিকে শাহ সাহেবের প্রতি সম্পৃক্ত করার ব্যাপারে কোনও কোনও জ্ঞানীজনের সংশয় রয়েছে। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

১৫. تراجم ابواب البخارى : এটি আরবী। এতে মৌলিক এমন কতিপয় নিয়মনীতি বর্ণনা করা হয়েছে, যার মাধ্যমে তারজিমে বুখারী তথা বুখারী শরীফের অধ্যায়-অনুচ্ছেদগুলোর শিরোনামের মর্মোদ্ধারে সাহায্য পাওয়া যায়। 'মাজমূ'আয়ে রাসায়েলে আরবা'আসহ মুসালসালাতে মাতবূআহ মাতবায়ে নূরুল আনওয়ার আরাহ -এর শেষে ছাপা হয়েছে।

১৬. التفهمات الالهية : এটি আরবী ও ফার্সী। এতে রয়েছে শাহ সাহেবের কলবী বা আত্মিক বিপত্তি ও জ্ঞানলব্ধ বিষয়বস্তুসমূহ। যার বেশিরভাগ আরবী আর কিছু অংশ ফার্সী। এর মর্যাদা এমন একটি কাব্যগ্রন্থের মত, যাতে মানুষ তার অভিব্যক্তি ও প্রত্যক্ষ বিষয়গুলো লিপিবদ্ধ করে থাকে। আর তা সুবিন্যস্ত করা হয় একান্ত বন্ধুমহল ও ছাত্রদের পাঠের জন্য। অনেক কাব্যকার তার উন্মুক্ত প্রকাশকে পছন্দ করেন না। একে সাহিত্য পরিষদ ডাভীল ১৩৫৫ হি./১৯৩৬ খৃস্টাব্দে মদীনা প্রেস বাজনূর থেকে ছাপিয়েছে। এ কিতাবে শাহ সাহেব মুসলমানদের বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার লোকজনের প্রতি বিশেষভাবে সম্বোধন করে উপদেশ দিয়েছেন। যা কিতাবটির সর্বাধিক প্রভাবময় ও ফলপ্রসূ অংশ। কিতাবটি দু'খণ্ডে রচিত।

(ঙ)

১৭. الجزء اللطيف فى ترجمة العبد الضعيف : এটি তার ফার্সী একটি পুস্তিকা। তাঁর ব্যক্তিগত অবস্থার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, স্মৃতিচারণ ও

জীবনালেখ্যের বর্ণনায় এর পরিচিতি পেশ করে এসেছি। 'আনফাসুল আরেফীন'-এর একটি অংশ এটি। আবার পৃথকভাবেও তা প্রকাশিত হয়েছে।

(ح)

১৮. حجة الله البالغة : এটি আরবী। কিতাবের পরিচিতি, এর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়বস্তু ও এর প্রকাশনের বর্ণনা সপ্তম অধ্যায়ে করে এসেছি।

১৯. حسن العقيدة : এটি আরবী কিতাব। এতে ইসলামের মৌলিক আকীদা-বিশ্বাসগুলো আহলে সুন্নাতের মতাদর্শ ও কুরআন-হাদীসের আলোকে পূর্ণাঙ্গরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। পুস্তিকার পরিচিতি, প্রকাশন ও মুদ্রণের বিবরণ পঞ্চম অধ্যায়ে উল্লেখ হয়েছে। পুস্তিকাটি العقيدة الحسنة নামেও প্রসিদ্ধ। মরহুম মাওলানা মুহাম্মদ আবীস সাহেব নেগরানী নদভী العقيدة الحسنة নামে এর ব্যাখ্যা লিখেছেন, যা মাকতাবায়ে নদওয়াতুল উলামা থেকে প্রকাশিত এবং দারুল উলূম নদওয়াতুল উলামার পাঠভূক্ত।

(خ)

২০. الخير الكثير : এটি আরবীতে রচিত একটি ধর্মীয় দর্শনের কিতাব। এতে সত্ত্বার পরিচয়, খোদায়ী নামসমূহের মূলতত্ত্ব, অহীর বাস্তবতা, কালামে এলাহী ইত্যাদির ব্যাখ্যা করা হয়েছে। ওয়াহদাতুল উজুদ (খোদায়িত্বের একত্ব) সম্পর্কেও দার্শনিক ভঙ্গিতে আলোচনা করা হয়েছে। আরশ, মাটি, স্থান-কাল, নভোমণ্ডল ও পরমাণু, খণিজ, উদ্ভিদ ও প্রাণী, প্রমাণিত স্বাধিষ্টবস্তু, সাদৃশ্য জগৎ ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। কিতাবটির الخزانة الخامسة অধ্যায়টি অতি গুরুত্বপূর্ণ। যাতে নবী প্রেরণ, নবুওয়াতের পাঁচটি বৈশিষ্ট্য ও আম্বিয়াগণের (র) শ্রেণী ইত্যাদির বর্ণনা আছে। কিতাবটি দর্শন, প্রাকৃতিক তত্ত্ব, তাসাওউফ, সূর্যোদয়ের রহস্য সবক'টির সমষ্টি। খাযানায়ে ছালেছাতে দূত প্রেরণ বলে প্রথমে রাসূলে কারীম (স)-এর গুণাবলি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। খাযানায়ে ছামিনাতে (অষ্টম ভাণ্ডারে) শরীয়তের ক্রমবিকাশ ও এর উন্নতি সম্পর্কে, খাযানায়ে তাসিয়াতে পরকালের অবস্থাসমূহ ও স্তর সম্পর্কে আর খাযানাতে আশেরাতে বিভিন্ন উপকারিতা সম্পর্কে আলোচনা রয়েছে। কিতাবটি প্রকাশিত হয়েছে ১৩৫২ হিজরীতে সাহিত্য পরিষদ ডাভীল থেকে।

(د)

২১. الدر الثمين فى متشرات النبى الأمين : এটি আরবী পুস্তিকা। রাসূলে কারীম (স)-এর প্রদত্ত 'সুসংবাদ সমগ্র' একটি সংকলন, যা স্বয়ং শাহ

সাহেব র. কিংবা বুযুর্গদের সাথে সম্পৃক্ত। পুস্তিকা 'মুসালসালাত' ও 'আন নাওয়াদির' -এর সাথে ১৩৯১ হি./১৯৭০ খৃস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে। আবার ইয়াহইয়া প্রকাশনী সাহারানপুর থেকেও প্রকাশিত হয়েছে।

২২. ديوان الشعار : একটি আরবী সংকলন, যা শাহ্ আবদুল আযীয (র) একত্রিত করেছেন আর বিন্যাস করেছেন শাহ রফীউদ্দীন (র)। এতে শাহ সাহেবের বিভিন্ন কবিতা সংকলিত হয়েছে। এটা কুতুবখানায়ে নদওয়াতুল উলামা লাখনৌ-এর হস্তলিখিত একটি কিতাব।

(ر)

২৩. 'রিসালাহ' : এটি হযরত খাজা খুর্দ শায়খ আবদুল্লাহ বিন আবদুল বাকীর জবাবে নিজের কাশফ অনুযায়ী লিখিত একটি পুস্তিকা।

২৪. 'রিসালায়ে দানেশমন্দী : এটি ফার্সীতে রচিত অধ্যাপনার মূলনীতি ও শিক্ষকদের জন্য অমূল্য দিকনির্দেশনা সম্বলিত একটি বুদ্ধিদীপ্ত, তাত্ত্বিক ও কার্যকরী পুস্তিকা। এর উর্দু অনুবাদ 'আর-রহীম' সেপ্টেম্বর ১৯৬৪ খৃস্টাব্দে হায়দারাবাদ সিন্ধু থেকে প্রফেসর মুহাম্মদ সুরূর প্রকাশ করেছেন। আর এর আরবী অনুবাদ 'البعث الاسلامى' চতুর্থ বর্ষ ২৭ সংখ্যা মহররম ১৪০৩ হিজরীতে মুহাম্মদ আকরাম নদভী -এর কলম থেকে 'أصول الدراسة التعليم' শিরোনামে প্রকাশিত হয়েছে।

(ز)

২৫. زهراوين : এটি সূরা বাকারাহ ও সূরা আলে ইমরানের তাফসীর।

(س)

২৬. سطعات : এটি ফার্সী কিতাব। খোদায়ী কুদরতের যাদু প্রসঙ্গে অর্থাৎ নিছক একত্ব, প্রত্যক্ষ জগত, ইন্দ্রিয় ও এর প্রভাবসমূহের বর্ণনা সম্পর্কে।

কিতাবটিকে বুঝতে হবে খোদায়ী দর্শনে। যাতে দার্শকি ও সূফীসুলভ পরিভাষা এবং ওয়াহদাতুল উজূদের বাচনভঙ্গি ব্যবহার করা হয়েছে। বস্তুতঃ এতে 'প্রাচীনের সঙ্গে নশ্বরের সম্পর্ক' (ربط الحادث بالقديم)-এর জটিলতা সমাধানের চেষ্টা করা হয়েছে। কিতাবখানা কেবল একান্ত বিশেষ মহলের পাঠ উপযোগী, যারা প্রাচীন দর্শনের তত্ত্ব পুরোপুরি জ্ঞাত এবং ওয়াহদাতুল উজূদের সমর্থন ও প্রত্যাখ্যানমূলক আলোচনার সরুপথ সম্পর্কে সম্যক অবগত; ব্যাপক প্রসার ও দাওয়াতের বিষয় নয়। দর্শন ও প্রাকৃতিক তত্ত্বের

বিষয়বস্তুও আলোচনাভুক্ত রয়েছে। সেসব মূলনীতির আওতায় কতিপয় আয়াতের সূক্ষ্ম তাফসীরও আছে। কোথাও কোথাও নিজ গবেষণায় দার্শনিক এবং মুতাকাল্লিমীন উভয়ের সাথে মতানৈক্য প্রকাশ করেছেন। খোদায়ী শিক্ষার ধরন সবিস্তর বর্ণনা করেছেন এবং তার চিত্র ও রূপরেখা তুলে ধরেছেন। স্থানে স্থানে ব্যবহার করেছেন 'শখছে আকবর' (প্রধান ব্যক্তিত্ব) পরিভাষাটি। বর্ণনা দিয়েছেন আল্লাহর হেদায়াত ও নবী-রাসূল প্রেরণ সম্পর্কে। তাছাড়া তারা কোন কোন পরিবেশে আবির্ভূত হন, খোদায়ী নূরের ঝলক, তার শ্রেণী ও বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কেও আলোকপাত করেছেন। পূর্ণ পুস্তিকাটি ২৪ পৃষ্ঠায় রচিত। পুস্তিকাটি মাতবায়ে আহমদী (বা আহমদিয়াহ লাইব্রেরী) থেকে সাইয়িদ যহীরুদ্দীন সাহেবের তত্ত্বাবধানে প্রকাশিত হয়েছে। ১৯৩৯ খৃস্টাব্দে মৌলভী ফযলে আহমদ 'বাইতুল হিকমাত করাচী' থেকে এবং ১৯৬২ খৃস্টাব্দে মাওলানা গোলাম মুস্তফা কাসেমী 'শাহ ওয়ালীউল্লাহ একাডেমী' থেকেও প্রকাশ করেছেন।

২৭. سرور المحزون : এটি ফার্সী ভাষায় রচিত ইবনে সাইয়িদুন নাস-এর জীবনকর্মের উপর প্রসিদ্ধ কিতাব। نور العين فى سير الامين المامون-এর সারসংক্ষেপ। তার বিখ্যাত সমসাময়িক এবং মুজাদ্দেদিয়াহ সিলসিলার প্রবীণ শায়খ হযরত মির্যা মাযহার জানে জানা (র)-এর নির্দেশে রচনা করেন। উর্দুতে এর একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে।

(ش)

২৮. شرح تراجم ابواب صحيح البخارى : এটি সহীহ বুখারীর তারাজিম, শিরোনাম এবং হাদীস অনুযায়ী বিভিন্ন সূক্ষ্ম-তত্ত্ব, রহস্য সম্বলিত একটি আরবী গ্রন্থ। ১৩২৩ হিজরীতে দাকায়েকুল মাআরিফ হায়দারাবাদ থেকে প্রকাশিত। এর শুরুতে বুখারী শরীফের শিরোনামগুলোও উল্লেখ আছে।

২৯. شفاء القلوب : এটি হাকায়েক ও মাআরেফ সম্পর্কিত একটি ফার্সী পুস্তিকা।

৩০. شوارق المعرفة : এটি শাহ সাহেবের চাচা শায়খ আবুর রযা (র)-এর জীবনকর্মের উপর একটি ফার্সী রচনা। আনফানুল আরেফীনের একটি অংশ।

(ع)

৩১. العطية الصمدية فى انفاس المحمدية : এটি শায়খ মুহাম্মদ ফুলতী (র) জীবনকর্মের উপর সংক্ষিপ্ত একটি ফার্সী পুস্তিকা। যিনি ছিলেন শাহ

সাহেবের মামা। এটি আনফাসুল আরেফীন -এর একটি অংশ। পাঁচ পুস্তিকা সমগ্র -এর সাথেও সন্নিবেশিত আছে।

৩২. عقيد الجيد فى احكام الاجتهاد و التقليد : এটি আরবী পুস্তিকা। ষষ্ঠ অধ্যায়ে এর পরিচিতি বর্ণিত হয়েছে। আরেকটি পুস্তিকা العقيدة الحسنة যার অপর নাম حسن العقيدة – সেখানে দ্রষ্টব্য।

(ف)

৩৩. فتح الرحمن : কুরআনে কারীমের ফার্সী অনুবাদ। পঞ্চম অধ্যায়ে এর পরিচিতি ও বিবরণ উদ্ধৃত হয়েছে। মাতবায়ে ফারুকী দিল্লী থেকে ১২৯৪ হিজরীতে শাহ সাহেবের ফার্সী জ্ঞাতব্য টীকাসমূহ এবং শাহ আবদুল কাদির (র)-এর উর্দু অনুবাদ ও মুযিহুল কুরআনের ফাওয়ায়িদসহ সঙ্গে প্রকাশিত হয়, যা কলকাতার প্রকাশিত সংস্করণের অনুলিখন।

৩৪. فتح الخبير : এটি কুরআনে কারীমের জটিল শব্দাবলির আরবী ব্যাখ্যা। এ পুস্তিকাটি 'الفوز الكبير' এর পরিশিষ্টরূপে সন্নিবেশিত আছে।

৩৫. فتح الورود لمعرفة الجنود : এর প্রকাশনা লেখকের দৃষ্টিগোচর হয়নি। মাওলানা আবদুর রহীমবখশ 'হায়াতে ওয়ালী'-এর মধ্যে এটিকে চরিত্র ও তাসাওউফ সম্পর্কিত কিতাব বলে লিখেছেন। কিন্তু নামের দ্বারা সেকথা সুস্পষ্ট হয় না।

৩৬. الفضل المبين فى المسلسل من حديث الامين : এটি আরবী প্রকাশনা। মুসালসালাত নামে পরিচিত ও হাদীস শাস্ত্রের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি পুস্তিকা।

৩৭. الفوز الكبير : এটি ফার্সী পুস্তিকা। আলোচনা পরিচিতি পঞ্চম অধ্যায়ে বর্ণিত হয়েছে।

৩৮. فيوض الحرمين : এ কিতাবখানা আরবী। এর বেশিরভাগ অংশ হিজায অবস্থানকালে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা, পর্যবেক্ষণ, বাতেনী মূলতত্ত্ব, দার্শনিক বিষয়াবলি এবং তাসাওউফ সংক্রান্ত। এটিও বিশেষ মহলের পাঠ্য আর যারা দর্শন ও তাসাওউফের ব্যাপারে সম্যক জ্ঞান রাখে না, তাদের ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে।

৩৯. قرة العينين فى تفضيل الشيخين : এটি হযরত শায়খাইন (র)-এর শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ সম্পর্কে একটি ফার্সী কিতাব। এর একাধিক সংস্করণ ছাপা হয়েছে।

৪০. القول الجميل فى بيان سواء السبيل : এটি আরবী পুস্তিকা। এতে বাই'আতের প্রমাণ, বাই'আতের সুন্নত হওয়া, কোনও কোনও যুগের শুরুতে

এর প্রচলন ও আনুগত্য না হওয়ার কারণ, বাই'আতের হেকমত, মুর্শিদ ও মুরীদের শর্তাবলী, সূফীগণের বাই'আতের প্রকার, বাই'আতের পুনরাবৃত্তির হুকুম সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া আরও বর্ণনা করা হয়েছে তরবিয়াতের (প্রশিক্ষণ দানের) পদ্ধতি, মুরীদের শিক্ষাদান, আল্লাহওয়ালা আলেমের গুণাবলি এবং ওয়ায-নসীহতের শিষ্টাচার। এরপর লিখেছেন সিলসিলায়ে কাদিরিয়াহ, চিশতিয়াহ, নকশেবন্দিয়ার নিয়ম-নীতির পরিশিষ্ট, পরিভাষাসমূহের ব্যাখ্যা। শাহ সাহেব এতে তার বংশগত কার্যক্রম, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, পর্যবেক্ষণ-অভিজ্ঞতাও লিখে দিয়েছেন। যেগুলো বিভিন্ন অবস্থা-প্রেক্ষিত ও প্রয়োজনাদিতে পরীক্ষিত। মোটকথা, কিতাবখানা সেসব জ্ঞানপিপাসু শিক্ষার্থীর কর্মপদ্ধতি, দিকনির্দেশনা ও হেদায়াতনামার পর্যায়ভুক্ত, যারা উক্ত তিন সিলসিলায় কারও সঙ্গে সম্পৃক্ত। আর তাদের বিশুদ্ধ সুন্নতের গুরুত্ব, দাওয়াত ও ইছলাহেরও আগ্রহ রয়েছে।

এ কিতাবের কোথাও কোথাও শাহ সাহেবের সেই মুহাদ্দিস ও মুজতাহিদসুলভ রঙ পাঠকবর্গের দৃষ্টিগোচর হবে না, যা তার গুরুত্বপূর্ণ ও প্রসিদ্ধ কিতাবাদির বৈশিষ্ট্য। এমনকি এ কিতাবের কোনও কোনও প্রতিপাদ্য তাওহীদের ব্যাপারে শাহ সাহেবের প্রসিদ্ধ বিজ্ঞচিত ও সংস্কারমূলক মতাদর্শের সঙ্গে খাঁপ খায় না। যেমন, আসহাবে কাহফের নামের ব্যাপারে তিনি লিখেছেন, اسماء أصحاب الكهف امان من الغرق الحرق والنهب الشرق এরপর তাদের নাম লিখেছেন। অথচ এসব নামও কোনও বিশুদ্ধ হাদীস কিংবা অকাট্য প্রমাণ দ্বারা সাব্যস্ত নয়।

এর কারণ সম্ভবতঃ এ কিতাবখানা হারামাইন সফরের (১১৪৩-১১৪৫ হি.) অনেক পূর্বের লেখা। এর একটি বড় প্রমাণ হচ্ছে, কিতাবখানার যে অংশে আপন মাশায়িখে তাসাওউফ, তাদের এযাযত ও বিশেষ পোশাকের আলোচনা করেছেন, সেখানে তার মাহবূব ও মুরব্বী উস্তাদ শায়খ আবু তাহের মাদানী (র)-এর কথা উল্লেখ নেই। অথচ الجزء اللطيف এর মধ্যে তার সুস্পষ্ট আলোচনা বিদ্যমান। শাহ সাহেব লিখেন–

ولبست الخرقة الصوفية عن الشيخ ابو طاهر المدنى رحمة الله ولعلها حاوية لخرق الصوفية كلها.

হাদীসের সনদসমূহ এবং শায়খগণের মধ্যেও সম্মানিত পিতা (শাহ আবদুর রহীম) ও হাজী মুহাম্মদ আফযাল (র)-এর কথা উল্লেখ করেছেন। শায়খ আবু তাহের (র) এবং হিজাযী শায়খগণের কারও কথা উল্লেখ নেই। অথচ এক্ষেত্রে এটা জরুরী ও যৌক্তিক ছিল। তদুপরি এ কিতাবে শাহ

সাহেবের ইছলাহী ও সংস্কারমূলক রঙ প্রকাশ পেয়েছে। সূফীগণের ইবাদত-বন্দেগীর কোনও কোনও পদ্ধতি যেমন, সালাতে মা'কূস (বিপরীত নামায) এর বর্ণনা দেননি। কেননা হাদীস ও ফকীহগণের উক্তি দ্বারা এর প্রমাণ নেই। তদ্রুপ কুরআনে কারীমকে সামনে-পিছনে, ডানে-বামে রেখে যরব (বিশেষ আঘাত) লাগানো সম্পর্কে মতানৈক্য করেছেন এবং বেয়াদবী (শিষ্টাচার পরিপন্থী) সাব্যস্ত করেছেন। কোনও কোনও হাদীস যেগুলো সেসব সিলসিলায় রাসূলে কারীম (স) থেকে সুলূকের (বিশেষ চাল-চলন ও বিশেষ রীতিনীতির) উৎসাহ দান প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে, তার উপর মুহাদ্দিসসুলভ আলোচনা করেছেন। শাহ সাহেবের মতাদর্শ ও প্রকৃত রুচি নিম্নোক্ত উদ্ধৃতি থেকে প্রতিভাত হয়ে যায়।

'এটি আমার অসীয়ত যে, সংশ্রব-সাহচর্য গ্রহণ করবে না মূর্খ সূফীদের আর না সুন্নাত ইবাদত অজ্ঞাত বেয়াদবদের, না এমন ফকীহদের যারা ভণ্ড-প্রতারক, না বাহ্যিক মুহাদ্দিসদের যারা ফিকহের প্রতি বিদ্বেষ রাখে আর না যুক্তিবিদ ও দার্শনিকদের, যারা নকলী দলীলগুলোকে নিকৃষ্ট মনে করে যৌক্তিক প্রমাণ দানে বাড়াবাড়ি করে বরং খাঁটি তালেব (অনুসন্ধিৎসু) এর উচিৎ যেন সে আলেম সূফী সাধক হয় দুনিয়াবিমুখ, প্রতিনিয়ত আল্লাহর ধ্যানে উচ্চাবস্থায় নিমজ্জিত, নববী আদর্শ ও সুন্নতে আসক্ত, হাদীস ও সাহাবায়ে কিরামের আমলগুলোর অনুসন্ধিৎসু-অনুরাগী, হাদীস ও আছারসমূহের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ সন্ধান করে সেসব গবেষক পণ্ডিত ফকীহগণের ভাষ্য থেকে, যারা যুক্তি অপেক্ষা হাদীসের প্রতি অধিক অনুরাগী এবং সেসব আকাইদ শাস্ত্রবিদগণের উক্তি থেকে, যাদের আকীদা-বিশ্বাস সংগৃহীত হয়েছে সুন্নত থেকে– যারা যৌক্তিক প্রমাণাদিতে চিন্তা করেন নিঃস্বার্থ ও অনাবশ্যকীয় পন্থায়। আর সেসব আহলে সুলূক (আধ্যাত্মিকতার পথিক) এর দর্শন থেকে, যারা ইলম ও তাসাওউফের সমন্বয়কারী; কঠোরতা আরোপকারী নয় নিজের আত্মার ওপর আর না সুন্নতে নববী (স)-এর উপর বাড়িয়ে সূক্ষ্ম চিন্তায় কাজ হাসিলকারী।'

এ কিতাবে শাহ সাহেবের সামঞ্জস্য বিধানের (উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এবং তার স্বভাবগত আকর্ষণের) মানসিকতা ফুটে উঠেছে। তিনি ফিকহী মাযহাবগুলোর মধ্যে একটিকে অপরটিকে উপর প্রাধান্য দানকে অপছন্দ করেছেন। তার মতে যথোচিত হচ্ছে, সেগুলোকে মৌলিকভাবে গ্রহণযোগ্যতার দৃষ্টিতে দেখবে আর যেটি সুস্পষ্ট এবং মশহূর সুন্নাতের অনুকূলে তা মনেপ্রাণে মেনে চলবে।

ভারতের হস্তলিখিত সংস্করণ ছাড়াও এ পুস্তিকাটি মাওলানা মুহাম্মদ সাদেক মাদ্রাজীর সংক্ষিপ্ত ভূমিকা ও ব্যাখ্যাসহ ১২৯০ হিজরীতে আলহাজ্ব মনসূর মুহাম্মদের প্রকাশনায় (আল-জামালিয়া মিসর-এ) আবদুল আল আহমদের হস্তলিখিত বর্ণাক্ষরে ছাপা হয়েছে। সংস্করণটি নদওয়াতুল উলামার কুতুবখানায়ও বিদ্যমান আছে। কিতাবটির অনুবাদ মাওলানা খুররাম আলী বলহাওরী (মৃত্যু ১২৭১ হি.) ১২৬০ হিজরীতে উর্দু ভাষায় করেছেন। তিনি লিখেন, 'যে টীকা মহান লেখক ও তার সুযোগ্য উত্তরসূরী যুগশ্রেষ্ঠ ও সময়ের নির্ভরযোগ্য আলেম মাওলানা শাহ আবদুল আযীয (র) কর্তৃক এ কিতাবের উপর লিখিত বিশুদ্ধ পর্যায়ের পেয়েছি, অতিরিক্ত ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ ফাওয়াইদ (উপকারিতাসমূহ) সহ তার অনুবাদও সংশ্লিষ্ট ফাওয়ায়েদের আওতায় লিখে দিয়েছি। এই অনুবাদ প্রথমবার ১২৭৮ হিজরী মোতাবেক ১৮৬১ খৃস্টাব্দে মাতবায়ে দুরাখশা-তে এবং দ্বিতীয়বার ১৩০৭ হিজরী মোতাবেক ১৮৮৯ খৃস্টাব্দে মাতবায়ে নিযামী কানপুর থেকে ছাপা হয়।

(ك)

৪১. كشف الغين عن شرح الرباعيتين : এটি খাজা বাকীবিল্লাহ (র)-এর দুটি রুবাঈ (চার পংক্তির দু'টি কবিতা)-এর ব্যাখ্যার ফার্সী ব্যাখ্যা। প্রথমে খাজা সাহেব রুবাঈ দুটির ব্যাখ্যা দিয়েছেন। এরপর শাহ সাহেব উক্ত ব্যাখ্যার বিশ্লেষণ করেছেন ফার্সী ভাষায়। এটি মাতবায়ে মুজতবাঈ দিল্লী থেকে ১৩১০ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৪২. لمعات : এটি ফার্সীতে রচিত। বিষয়বস্তু ইলমে তাসাওউফের সাথে সংশ্লিষ্ট।

৪৩. المقالة الوضعية فى النصيحة والوصية : এটা ফার্সীতে রচিত। 'অসীয়তনামা' নামে একাধিকবার ছাপা হয়েছে। মাতবায়ে মতীউর রহমান থেকে কাযী ছানাউল্লাহ পানিপতি (র)-এর শরাহসহ ১২৬৮ হিজরীতে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে। কাযী সাহেবের ব্যাখ্যাসমূহ তার প্রসিদ্ধ পুস্তিকা 'ইরশাদুত তালেবীন' থেকে সংগৃহীত।

৪৪. المقدمة السنية فى الانتصار الفرقة السنية : এটি আরবীতে রচিত। মুজাদ্দিদ (র)-এর পুস্তিকা 'রদ্দে রাওয়াফিয' এর টোঙ্ক ও ভূপালের কুতুবখানাগুলোতে এর হস্তলিখিত সংস্করণ বিদ্যমান। মাওলানা আবুল হাসান যায়েদ মুজাদ্দেদী এর তত্ত্বাবধানে দিল্লী থেকে প্রকাশিত হয়েছে

৪৫. المقدمة فى قوانين الترجمة : এটি ফার্সী সংস্করণ। ফাতহুর রাহমানের শুরুতেও সন্নিবেশিত হয়েছে।

৪৬. المسوى من احاديث المؤطا : এটি মুয়াত্তার আরবী শরাহ। দিল্লী থেকে দু'বার আর মক্কা শরীফ থেকে একবার প্রকাশিত হয়েছে।

৪৭. مصفى : এটি মুয়াত্তা ইমাম মালেক (র)-এর ফার্সী শরাহ। যা অনেক ফাওয়ায়েদ ও তত্ত্ব-গবেষণা সমৃদ্ধ এবং শাহ সাহেবের গুরুত্বপূর্ণ কিতাবাদির একটি। প্রথম খণ্ড মাতবায়ে ফারুকী দিল্লী আর দ্বিতীয় খণ্ড মুর্তাযা প্রকাশনী দিল্লী থেকে ১২৯৩ হিজরীতে প্রকাশিত হয়েছে।

৪৮. المكتوب المدنى : (আরবী সংস্করণ) এটি ওয়াহদাতুল উজূদ ও ওয়াহদাতুশ শহূদ এর মুখোমুখি আলোচনায় লিখিত একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র। যা শায়খ ইসমাঈল ইবনে আবদুল্লাহ রোমীর নামে লিখিত হয়েছে। এটি التفهيمات الإلهية-এর অন্তর্ভুক্ত। আবার পৃথকভাবেও অন্যান্য পুস্তিকার সঙ্গে ছাপা হয়েছে।

৪৯. مكتوبات مع مناقب امام بخارى وفضيلت ابن تيميه رح : এটি ফার্সী রচনা। মৌলভী আবদুর রউফ সাহেব সত্ত্বাধিকারী কুতুবখানায়ে নযীরিয়াহ এটি প্রকাশ করেছে। এটা স্বতন্ত্র কোনও রচনা নয়; কালিমাতে তাইয়িবাতের একটি অংশ। যা ইমাম বুখারী (র)-এর মর্যাদা-বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে লিখেছিলেন। আরেকটি রচনা হাফেয ইবনে তাইমিয়া (র)-এর জবাবে লিখা হয়েছে। সেখান থেকে এনে দুটিকে একত্রিত করে দিয়েছেন।

৫০. النبذة الإبريزية فى اللطيفة العزيزية : এটি ফার্সী কিতাব। এতে শাহ আবদুর রহীম (র) এর মাতৃকুলের উর্ধ্বতন পুরুষ শায়খ আবদুল আযীয দেহলভী (র) এবং তার পূর্বপুরুষ ও উত্তরসূরীদের জীবনালেখ্য বর্ণিত হয়েছে। এটিও আনফাসুল আরেফীনের অংশবিশেষ। মাতবায়ে আহমদীর প্রকাশনা 'মাজমূআয়ে খমসাহ রসায়েল'-এর মধ্যেও যুক্ত রয়েছে।

৫১. النوادر من أحاديث سيد الأوائل والأواخر : এটি আরবী কিতাব। প্রকাশিত মুসালসালাতের সাথে মুদ্রিত।

(৫)

৫২. همعات : এটি ফার্সী কিতাব। কলেবর ৬০ পৃষ্ঠা। মাঝারী সাইজের বই। তোহফায়ে মুহাম্মদিয়ার একটি প্রকাশনা। 'আল্লাহর সাথে সম্পর্ক' এর উপর লিখিত। ভূমিকায় বলা হয়েছে, 'আল্লাহ পাক যখন দীনে মুহাম্মদীর হেফাযতের দায়িত্ব নিলেন এবং সকল ধর্মের উপর তা প্রাধান্য লাভ করে, তখন আরব-অনারব জাতিগুলোর হিংস্র সভ্যতা এবং তাদের মাঝে বিরাজমান জুলুম-অন্ধকার, সবই ভাবনাতীতভাবে চমৎকাররূপে দূরীভূত হয়ে যায়। আর যেহেতু দীনে মুহাম্মদীর রয়েছে একটি প্রকাশ্য দিক; আরেকটি

রয়েছে অপ্রকাশ্য-বাতেনী দিক। তন্মধ্যে প্রকাশ্য দিক বা যাহেরের সম্পর্ক হল, আকার-আকৃতি ও বাহ্যিক অবস্থা, সময় নির্ধারণ, প্রচলন ও সংখ্যার সাথে। আর এর পূর্ণ যত্ন নেওয়া হয়েছে। রুদ্ধ করা হয়েছে বিকৃতির সকল পথ। অপরদিকে বাতেনের সম্পর্ক ইবাদত-বন্দেগীর নূর ও ক্রিয়াশীলতা অর্জনের সঙ্গে। আবার এর সম্পর্ক দুটি বিষয়ের সাথে। যাহেরের ধারক নবীর উত্তরসূরীগণ। যারা প্রকাশ্য শরীয়ত সংরক্ষণ করেছেন। তাদের মধ্যে ফকীহ, মুহাদ্দিস, মুজাহিদ ও কারীগণও অন্তর্ভুক্ত। আর বাতেন এহ্সানের ধারক সেসব ইবাদতের জ্যোতির্ময় আলো, মধুরতার অনুভূতি, উন্নত চারিত্রিক গুণাবলির আধার এবং সুন্নাতী জীবনাদর্শের ধারক সুফিয়ায়ে কিরাম। তাদের উপর প্রত্যেক যুগে সেসব দু'আ-দরূদ ও নিয়মনীতি প্রক্ষিপ্ত হয়েছে, যা ছিল সমকালীন মানুষের স্বভাবরীতির উপযোগী। তাদের কথা ও সাহচর্যে আল্লাহ তা'আলা এক বিশেষ আকর্ষণ ও প্রতিক্রিয়া শক্তি দান করেছেন। তাদেরকে ভূষিত করেছেন কারামত ও বাতেনী নূরে। প্রত্যেক সিলসিলায় বিশেষ নিয়ম-নীতি ও ওযীফা, দু'আ-দরূদ নির্দিষ্ট হয়েছে। আর মানুষ সেসবের আনুগত্য করে আরোহণ করেছে সাফল্যের চূড়ায়। প্রত্যেক যুগে এক পরিবারের সাথে সম্পর্কিত লোকজন নিজ পরিবারকে অন্যান্য পরিবারসমূহের উপর প্রাধান্য দেয়। এটা একদিক থেকে সঠিক। আবার কোনও কোনও দিক থেকে পার্থক্য হয়। কিন্তু সীমাবদ্ধকরণ শুদ্ধ নয়।

এরপর শাহ সাহেব সেসব পরিবার (সূফীগণের বংশপরিক্রমা) এবং সে পরিবারগুলো থেকে নির্গত শাখা-প্রশাখা এবং সেগুলোর প্রতিষ্ঠাতাগণের আলোচনা করেছেন। এরপর শাহ সাহেব সেসব মৌলিক পরিবর্তনসমূহের বর্ণনা দিয়েছেন, যা তাসাওউফের তরীকায় ঘটে থাকে। নবুওয়াতের যুগের পর কালের আবর্তন-বিবর্তনের কারণে এহ্সানের মর্যাদা লাভের যে পথ-পদ্ধতি ও চিকিৎসা-পথ্য নির্বাচন করা হয়েছে, সেসব বর্ণনা করেছেন। এক্ষেত্রে শাহ সাহেব যে সূক্ষ্মদৃষ্টি, দূরদর্শিতা ও গভীর পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে কাজ করেছেন, তা একান্ত তাঁরই বৈশিষ্ট্য। 'শায়খে আকবর' এবং وحدة الوجود (ওয়াহদাতুল উজূদ) মতাদর্শের বহিঃপ্রকাশ সম্পর্কেও বিবরণ দিয়েছেন। তিনি বলেছেন, সাইয়িদুত তাইফাহ হযরত জুনাইদ বাগদাদী (র) হলেন মাসলাকে তাসাওউফ (আধ্যাত্মিক দর্শন)-এর সবচেয়ে বড় আইনজ্ঞ ও সংকলক। এরপর তার মতে এর জন্য যেসব শর্ত ও মৌলিক স্তম্ভ রয়েছে, তা উল্লেখ করেছেন। তারপর যুগে যুগে যেসব মুজাদ্দিদ (সংস্কারক) ও মুজতাহিদ সমকালীন মানুষের যোগ্যতা ও মেধা-মনন অনুযায়ী এর যে পাঠ্য ও কর্মপদ্ধতি বিন্যাস করেছেন,

তার বিশদ বিবরণ দিয়েছেন। অনন্তর শাহ্ সাহেব (র) তার যুগের সালেক (আধ্যাত্মিক পথের পথিক) এর জন্য যে নেসাব (পাঠ্য ও কর্মপদ্ধতি) হওয়া প্রয়োজন, তা বর্ণনা করেছেন। আরও বর্ণনা করেছেন, কোন কোন বিষয়ের প্রতি একজন সালেকের মনোনিবেশ করা উচিৎ। এরপর এ পথের অন্তরায় বাঁধা ও ক্ষতিকর বিষয় এবং কারণগুলো উল্লেখপূর্বক সেসবের চিকিৎসাপদ্ধতিও বর্ণনা করেছেন। এ পথে আগত মনযিল ও ঘাটিগুলোর প্রতিও দিকেও ইংগিত দিয়েছেন। এরপর উল্লেখ করেছেন সংযোগ-সম্বন্ধগুলো। এক্ষেত্রে সাহাবায়ে কিরাম (রা), তাবেঈন এবং জমহূরে ওয়ালীআল্লাহ-সালেহীনের সম্বন্ধ বর্ণনা করেছেন। একে নাম দিয়েছেন এহসান। অনন্তর এর সংজ্ঞা দিয়েছেন। এরপর বিভিন্ন মানুষের যোগ্যতা-দক্ষতাসমূহের আলোচনা করেছেন। আবার সূক্ষ্ম তথ্যকণিকাও বর্ণনা করেছেন। পূর্ণ কিতাবখানা জটিল বিষয়বস্তুসহ সূক্ষ্ম তত্ত্ব-উপাত্ত এবং সত্ত্বাগত জ্ঞান-গবেষণায় এমনভাবে পরিপূর্ণ, মনে হয় যেন কোনও বিজ্ঞ উস্তাদ আর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন কোনও চিকিৎসক মানবিক, দেহমন ও সুস্থতা-অসুস্থতার কারণসমূহ এবং সেসবের চিকিৎসা-পথ্য বাতলে দিচ্ছেন।

৫৩. هوامع شرح حزب البحر: শাহ্ সাহেবের আরেকটি কিতাব। এটি ফার্সীতে মুদ্রিত।

সমাপ্ত

সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস [৫ম খণ্ড]
[হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী (র)-এর জীবন ও কর্ম]
মূল ঃ সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র)
অনুবাদ ঃ শাহ্ আবদুল হালীম হুসাইনী

প্রকাশক
মুহাম্মদ ব্রাদার্স
৩৮, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
ফোন ঃ ৭১২৫৪৮১, ০১১৯০-৫২৯৪১১

প্রকাশকাল
সেপ্টেম্বর ২০০৯ ইং

মুদ্রণে
মেসার্স তাওয়াক্কুল প্রেস
৬৬/১, নয়া পল্টন
ঢাকা-১০০০, ফোন ঃ ৮৩১২১০৫

মূল্য
২০০.০০ টাকা মাত্র।

ISBN : 984-622-001-9

Shangrami Shadhakder Itihash : (History of Saviors of Islamic Spirit) written by Syed Abul Hasan Ali Nadavi in Urdu and translated by Shah Abdul Halim Hossainy into Bengali and published by Muhammad Abdur Rouf. Muhammad Brothers, 38, Banglabazar, Dhaka-1100; Bangladesh. Phone : 7125481, September, 2008. Price- Tk. 200.00 only. U.S. Dollar : 5.00 only.

হযরত শাহ্ ওয়ালী উল্লাহ
মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.-এর

জীবন ও কর্ম
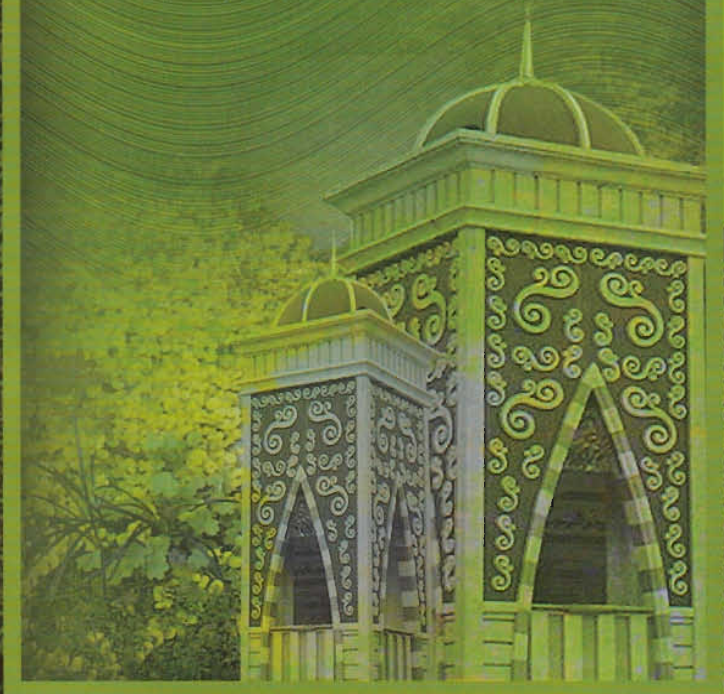
সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী র.

গ্রন্থাকার

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরুল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমেদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দু সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন, তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত তারিখে দাওয়াত ও আযীমত-এর ভাবানুবাদ 'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস' তার এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা যা খাসিরাল আলামু বিন্ হিতাতিল-মুসলিমীন" এর বঙ্গানুবাদ "মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?" একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। নবীয়ে রহমত ছাড়াও তাঁর রচিত আল-মুরতাযা শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দু ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। হযরত নিযামুদ্দীন আওলিয়া (র.) তাঁর একটি অনবদ্য রচনা। **"হযরত শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী র. -এর জীবন ও কর্ম"** তাঁর লিখিত তারিখে দাওয়াত ও আযীমত পঞ্চম খণ্ডের অনুবাদ।

সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারেও তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান 'দারুল উলূম নদওয়াতুল-উলামা' এর রেক্টর ভারতীয় মুসলমাদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফর্ম মুসলিম পারসনাল 'ল বোর্ড' এর সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমাদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নিয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফর করেছেন। তাঁর আত্মজীবনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত সাত খণ্ডে প্রকাশিত কারওয়ানে যিন্দেগী শুধু তাঁর আত্মজীবনী মূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাকওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), হযরত মাওলানা মনযূর নোমানী (র) ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মূল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং হযরত মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়সীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক করবস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

গ্রন্থকার ঃ

মাওলানা সাইয়েদ আবুল হাসান আলী নদভী (র) সেই যে ত্রিশের দশকে তাঁর পূর্বপুরুষ বালাকোটের শহীদ আমীরু'ল-মু'মিনীন হযরত সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর অনুপম চরিত গ্রন্থ "সীরাত সাইয়েদ আহমদ শহীদ" লিখে তারুণ্যদীপ্ত বয়সেই উর্দূ সাহিত্যের আসরে নিজের একটি উল্লেখযোগ্য আসন করে নিলেন তারপর বিগত প্রায় পৌণে এক শতাব্দী ধরে তাঁর কলম অবিশ্রান্তভাবে লিখে গেছে মুসলিম ইতিহাসের গৌরবদীপ্ত অধ্যায়গুলোর ইতিবৃত্ত। পাঁচ খণ্ডে রচিত 'তারিখে দাওয়াত ও আযীমত'-এর ভাবানুবাদ **'সংগ্রামী সাধকদের ইতিহাস'** তাঁর এমনি একটি অমূল্য গ্রন্থ। সীরাত থেকে ইতিহাস, ইতিহাস থেকে দর্শন ও সাহিত্য পর্যন্ত সর্বত্রই তাঁর অবাধ গতি। তাঁর "মা-যা খাসিরা'ল-আলামু বিনহিতাতি'ল-মুসলিমীন" **Islam and the World**-এর বঙ্গানুবাদ 'মুসলমানদের পতনে বিশ্ব কী হারালো?' একখানি চিন্তাসমৃদ্ধ অনবদ্য আরবী গ্রন্থ যার অনুবাদ পৃথিবীর অনেক ভাষায় হয়েছে। 'নবীয়ে রহমত' ছাড়াও তাঁর রচিত "আল-মুরতাযা" শীর্ষক হযরত আলী (রা)-এর জীবনী গ্রন্থখানা আরবী, উর্দূ ও ইংরেজী ভাষায় প্রভূত সুনাম অর্জন করেছে। সমসাময়িক বিশ্বে তাঁর চাইতে অধিকতর খ্যাতিমান ও বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী অন্য কোনও আলেম জন্মেছেন কি না এবং থাকলেও তাঁর মত এত অধিক স্বীকৃতি লাভ করেছেন কিনা সন্দেহ রয়েছে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের প্রায় সকল জনপদে যেমন তিনি আমন্ত্রিত হয়ে সে সব দেশ সফর করেছেন, তেমনি নোবেল পুরস্কার তুল্য মুসলিম বিশ্বের সব চাইতে মূল্যবান 'বাদশা ফয়সাল' পুরস্কারে তিনি পুরস্কৃত হয়েছেন। তিনি একাধারে রাবেতায়ে আলমে ইসলামী-এর অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা সদস্য, লখনৌর বিখ্যাত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দারুল উলুম নদওয়াতুল-উলামা-এর রেকটর, ভারতীয় মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ প্লাটফরম মুসলিম পার্সোন্যাল ল' বোর্ডের সভাপতি ছিলেন। তাঁর অস্তিত্ব কেবল ভারতীয় মুসলমানদের জন্যই নয়, গোটা বিশ্বের মুসলমানদের জন্যই এক বিরাট নেয়ামত ছিলেন। তাঁর বেশ কটি বই ইতিমধ্যেই বাংলা ভাষায় প্রকাশিত হয়েছে। একাধিকবার তিনি বাংলাদেশ সফরও করেছেন। তাঁর আত্মজীবিনীমূলক গ্রন্থ এ পর্যন্ত ৭ খন্ডে প্রকাশিত 'কারওয়ানে যিন্দেগী' শুধু তাঁর আত্মজীবনীমূলক নয়, এটা সমসাময়িক বিশ্বের অনেক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা ও ব্যক্তির এক অপূর্ব আলেখ্যও বটে। তাঁর রচনায় আল্লামা শিবলীর অনবদ্যতা, আল্লামা সাইয়েদ সুলায়মান নদভীর সূক্ষ্মদর্শিতা, মাওলানা মানাযির আহসান গিলানীর সতর্কতা, মাওলানা আশরাফ আলীর থানবীর তাক্ওয়া, সর্বোপরি তাঁর পূর্বপুরুষ সাইয়েদ আহমদ বেরলভী (র)-এর দরদ প্রতিফলিত হয়েছে। শায়খুল হাদীস হযরত মাওলানা যাকারিয়া (র), মাওলানা মনযূর নোমানী (র), ও রঈসুত-তাবলীগ মাওলানা ইউসুফ (র)-এর অনেক মুল্যবান গ্রন্থে তাঁর লিখিত সারগর্ভ ভূমিকাগুলো পড়বার মতো। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে তিনি মাওলানা আহমদ আলী লাহোরী (র) এবং মাওলানা আবদুল কাদির রায়পুরী (র)-এর খলীফা। বিগত হিজরী ১৪২১ সনের ২২ রমযান জুম'আর পূর্বে সূরা ইয়াসীন তেলাওয়াতরত অবস্থায় ইন্তিকাল করেন। রায়বেরেলীর পারিবারিক কবরস্থানে রওযায়ে শাহ্ আলামুল্লাহ্য় তাঁকে দাফন করা হয়।

মুহাম্মদ ব্রাদার্স-ঢাকা